হৃষীকেশ সিরিজ—১৮

সুবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তি

প্রথম খণ্ড

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

কলিকাতা

১৯৪০

মূল্য—৬৲ টাকা

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা

লোকশিক্ষার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, দেশের রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাস অপেক্ষা সামাজিক ইতিহাসের মূল্য কম নহে। জাতীয় ইতিহাস সংকলন করিতে হইলে, সামাজিক জীবনের আলোচনা আবশ্যক। বর্তমান সময়ে বাংলা দেশে বিভিন্ন জাতি বর্তমান রহিয়াছে। এই সমস্ত জাতির মধ্যে কোন কোনটির সামাজিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে। সেই দিক্ হইতে সুবর্ণবণিক্ জাতির সামাজিক ইতিহাসেরও একটা বিশেষ মূল্য আছে; এই কারণে প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে এ বিষয়ে আমার আগ্রহ জন্মে। এই সময়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় আমার এই আগ্রহে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন এবং অদ্যাবধি তিনি আমাকে উপকরণ সংকলনে সমভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আমি এজন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া দেখিলাম যে, উহাতে নানাবিধ বাধা বর্তমান। যে সমস্ত প্রতিভাবান্ ব্যক্তি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কর্মী ও হৃদয়বান্ দাতা তাঁহাদের প্রতিভা, কর্মশক্তি বা দানের মহিমায় জাতির মধ্যে বরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিলাম যে, অনেক স্থলে তাঁহাদের বংশধরগণ পূর্বপুরুষগণের অনুষ্ঠিত কার্যাবলী ও কীর্তির গুরুত্ব বোঝেন নাই। ফলে কোথাও বা তৎসম্পর্কিত উপকরণাদি এমন বিশৃঙ্খলভাবে রাখিয়াছিলেন যে, অনেক আয়াসে সেগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। কোন কোন স্থলে সেগুলি অনেকাংশে রক্ষিত হয় নাই। ঐ সমস্ত মূল্যবান্ তথ্য ও উপকরণ পাইলে, উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের বিষয়ে অনেক সংবাদ সহজে ও আরও বিশদভাবে জানা যাইত। তথাপি যে সমস্ত পুরাতন কাগজপত্র ও পুস্তকাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে, কিছুদিন পরে কার্য আরম্ভ করিলে, হয়ত যাহা পাওয়া

গিয়াছে তাহাও পাওয়া যাইত না। এই সমস্ত আয়াসলব্ধ উপাদান হইতে, সুবর্ণবণিক্ জাতির অতীত কীর্তির বহু নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

বর্তমান সময়ে জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল মত বর্তমান থাকিলেও, যতদিন এই প্রথা এই দেশে বর্তমান আছে, ততদিন প্রায় দেড় লক্ষ সুবর্ণবণিক্‌কেও দেশের একটা স্বতন্ত্র অংশ হিসাবে স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। নানা কারণে সুবর্ণবণিক্ জাতি আত্মবিস্মৃত এবং যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই জাতি দেশের কাছে যথোচিত সম্মান পান নাই। এখন তাঁহাদের এই সমস্ত কীর্তিকলাপ প্রকাশিত হইলে লোক-সমাজে তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে করি। অধিকন্তু এই সমস্ত সংগৃহীত উপকরণ বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসের অংশরূপে গৃহীত হইতে পারিবে।

এক্ষণে সুবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তির প্রথম খণ্ড ৫০৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। আগামী দেড় বা দুই বৎসরের মধ্যে এইরূপ আরও দুইটি খণ্ড প্রকাশিত হইবে। এই সমস্ত উপকরণ বহু স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া ধারাবাহিক ভাবে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে "সুবর্ণবণিক্ সমাচারে" ও অন্যান্য সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের সংগৃহীত সমগ্র উপকরণ প্রায় দুই হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইবে।

এই গ্রন্থে কয়েকটি কীর্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা দ্বারা সমাজের গৌরবময় অতীতের কিয়দংশ লোকচক্ষুর গোচরে আনিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই যে, এই সমস্ত কাহিনী হইতে সুবর্ণবণিক্ জাতির আত্মবিস্মৃতি দূর হইবে এবং সুবর্ণবণিক্‌গণ জীবনের নানা কর্মক্ষেত্রে ইহা দ্বারা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইবেন।

৯৬ আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩৪৭

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচীপত্র

চিত্র-সূচী

জন্ম—বঙ্গীয় সন ১১৯৮ সাল,

মতিলাল শীল

মৃত্যু—সন ১২৬১ সাল, ৮ই জ্যৈষ্ঠ

দানবীর স্বর্গীয় মতিলাল শীল

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত দানবীর জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সুবর্ণবণিক্‌কুলোদ্ভব মতিলাল শীল মহাশয় তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর, রাজা বৈদ্যনাথ রায় তাঁহাদের পুত্রগণ, স্বর্গীয় নিমাইচরণ মল্লিক এবং তাঁহার সন্ততিবর্গ, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, সাগর দত্ত, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতি দানবীরগণ সমাজের কল্যাণকল্পে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন, তাহাতে তাঁহারা দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

স্বর্গীয় মতিলাল শীল মহাশয় মধ্যবিত্ত অবস্থার মধ্যে লালিত-পালিত হইলেও, নিজের প্রতিভা, অধ্যবসায় ও কর্মকুশলতা দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এবং এই অর্থ কেবল নিজের ব্যবহারে নিয়োগ না করিয়া, দেশের বহু জনহিতকর কার্যে ও পরোপকারে ব্যয় করেন। দেশের বিবিধ মঙ্গলপ্রসূ অনুষ্ঠান ও আন্দোলন তৎকালে তাঁহার সহানুভূতি এবং সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইত না। প্রকৃত পক্ষে তিনি সে সময়ে দেশের যে কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জন্ম ও বাল্যজীবন

১১৯৮ সালে (ইং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতা নগরীর কলুটোলা পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চৈতন্যচরণ শীল মহাশয়ের পুত্র। চৈতন্য বাবু একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, চীনাবাজারে তাঁহার একখানি কাপড়ের দোকান ছিল। সে সময়ে সুপরিচিত ডাকাইত মোহনকে, নিজের কৌশল ও বুদ্ধি দ্বারা গ্রেপ্তার করাইয়া চৈতন্যচরণ দেশের জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রশংসাভাজন হন।

বাল্যাবস্থায় মতিলালের পিতৃবিয়োগ হয়। এই আকস্মিক বিপদে মুহ্যমান না হইয়া মতিলাল অবহিতভাবে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কোন বাধা বা আঘাত যত কঠিন হউক না কেন, কোনদিন মতিলালকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার স্থিরবুদ্ধি সর্বদাই তাঁহাকে কর্তব্যের পথে পরিচালিত করিয়াছে। ইহার সহিত তাঁহার অপূর্ব অধ্যবসায় যুক্ত হইয়া তাঁহাকে একদিন সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিতে পরিণত করে।

শৈশবে তিনি পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করেন। পরে তিনি মিঃ মার্টিন বোন নামক একজন ইয়োরেসিয়ান প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাথমিক ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানকার পাঠ সমাপ্ত করিয়া মতিলাল কলুটোলায় নিত্যানন্দ সেন প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তৎকালে এই বিদ্যালয়টিই গৌরমোহন আঢ্য প্রতিষ্ঠিত 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী'র অগ্রদূতস্বরূপ ছিল এবং এই বিদ্যালয়ে তৎকালে গোঁড়া হিন্দু ও ধনি-পরিবার-ভুক্ত বালকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিত। এখান হইতে মতিলাল প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

গণিত-শিক্ষার দিকে তাঁহার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। ইংরেজী ও বাংলা উভয় হস্তাক্ষরই তাঁহার সুন্দর ছিল; এ ছাড়া তিনি ছেলে-বেলায় বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের চালচলন ও কথাবার্তার সুন্দর অনুকরণ* করিতে সমর্থ ছিলেন। তিনি অনেক বাদ্য-যন্ত্র বাজাইতে পারিতেন। সময়ে সময়ে তিনি সখের কবির দলে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেন। সরস্বতী পূজা ও অন্যান্য আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠানে তাঁহাকে নানাপ্রকার আবৃত্তি ও অনুকৃতি-কৌতুকাভিনয়ে যোগদান করিতে দেখা যাইত।

বিবাহ ও দেশভ্রমণ

মতিলালের তৎকালীন অভিভাবক বীরচাঁদ শীল তাঁহার বিবাহ দেন। মতিলালের বয়স তখন সতের বৎসর। বিবাহের পূর্বে মতিলাল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ায়, বিবাহের পর তাঁহার শ্বশুর মোহনচাঁদ বাবু তাঁহাকে লইয়া দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন। সে সময় দেশে রেলপথ স্থাপিত হয় নাই;

* Life of Mutty Lall Seal, p. 3

কাজেই তাঁহারা নৌকাযোগে কাশী-যাত্রা করেন এবং তিন মাস পরে তথায় পৌছান। কাশী হইতে তাঁহারা বৃন্দাবন যাত্রা করেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ ও নানা স্থান পরিদর্শনে মতিলালের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটিল না। চব্বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত এইরূপ উদ্দেশ্য-হীন জীবন-যাপনের পর, মতিলালের চরিত্রের একটা পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এই সময় কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে অবস্থিত কয়েকজন সামরিক কর্মচারীর সহিত মতিলালের পরিচয় হয় এবং এই পরিচয়ের ফলে তিনি দুর্গবাসীদের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি সরবরাহের ভার প্রাপ্ত হন। দুই বৎসর কাল এইভাবে কার্য্য করিবার পর, তিনি উত্তরপাড়ার সন্নিকটস্থ বালিখালের কাষ্টম্‌স্‌-দারোগার পদ পান। এই পদে তিনি অল্প দিন কাজ করেন।

ভাগ্য-পরিবর্তনের সূচনা

এই সময়ে একটি ঘটনায় তাঁহার ভাগ্য-পরিবর্তনের সূচনা দেখা যায়। মতিলালের খুল্লতাত গৌরমোহন শীল মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্বে প্রভূত ধনসম্পত্তি রাখিয়া মারা যান। গৌরমোহন বাবুর কোন পুত্র না থাকায়, তাঁহার একমাত্র কন্যাই এই সম্পত্তির অধিকারিণী হন। ইনি কমললোচন মল্লিকের পত্নী। যে সময়ে মতিলাল কাষ্টম্‌স্‌-দারোগার পদে নিযুক্ত সেই সময় কমললোচনেরও মৃত্যু হয়। তখন কমললোচনের একমাত্র বিধবা পত্নী ও দুইটি নাবালক পুত্র বর্তমান। কমললোচনের বিধবা পত্নীর আগ্রহ ও অনুরোধে, মতিলাল তাঁহাদের সম্পত্তির পর্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন।

মতিলালের কর্মজীবন

ভারতবর্ষ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় লিখিত "স্বর্গীয় মতিলাল শীল" নামক ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে মতিলালের 'কর্মজীবন'-অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"বাল্যকালে আমরা 'চরিতাষ্টক' গ্রন্থে মতিলাল শীল মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত

* ভারতবর্ষ, ১৩৩৮, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৯৯৪-৯৯৫।

জীবন-চরিত পাঠ করিয়াছিলাম। শৈশবে পঠিত মতিলাল-জীবনীর একটি কথা এখনও মনে আছে—মতিলাল খালি শিশি-বোতল ও কর্কের ব্যবসায় করিয়া ধনশালী হন। মতিলালের জীবনে সেই খালি শিশির ব্যবসায়ের সূত্রপাত এই সময়ে হয়। একদা তিনি অত্যন্ত সুলভে প্রচুর পরিমাণে খালি শিশি-বোতল বিক্রীত হইতে দেখিয়া সমুদয় বোতল ক্রয় করিয়া লন। কিছুদিনের মধ্যে বাজারে শিশি-বোতলের মূল্য বৃদ্ধি হয়। তখন উহা বিক্রয় করিয়া তিনি বিলক্ষণ লাভবান্ হন।

"ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এইরূপ দূরদর্শিতা মতিলাল শীল মহাশয়ের উন্নতির প্রধান কারণ। বাজারের তেজীমন্দী অনুসারে ব্যবসায়ীদের উত্থান-পতন ঘটিয়া থাকে। কোন্ সময়ে কোন্ জিনিসের চাহিদা বেশী হইবে, তাহা লক্ষ্য করা এবং তদ্বিষয়ে ওয়াকিব-হাল থাকা চতুর ব্যবসায়ীর প্রধান গুণ। ইহা বহুদর্শিতা, ভূয়োদর্শন, অভিজ্ঞতা এবং সুবিবেচিত বিচার-শক্তির ফল। মতিলাল এই গুণটি অজস্রভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ি-মহলে শীঘ্রই তাঁহার এই গুণটির কথা প্রচারিত হইয়া পড়ে, এবং মতিলাল ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অখণ্ড প্রতিপত্তি লাভ করেন। সে যুগের অন্যান্য যাঁহারা প্রচুর ধন উপার্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও অনেকেরই এই গুণটি অল্লাধিক পরিমাণ ছিল।

"এই প্রতিপত্তির ফলে মতিলাল অচিরে ইয়োরোপীয় বণিক্-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তৎকালে ষ্ট্র্যাণ্ড ফ্লাওয়ার মিলের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ স্মিথসন প্রসিদ্ধ ইংরেজ ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মতিলাল তাঁহার বেনিয়ান বা মুৎসুদ্দি হইলেন। এই কার্যে তাঁহার প্রভূত অর্থাগম হয়। ক্রমে ক্রমে বহু বিলাতী জাহাজের অধ্যক্ষগণ তাঁহার দ্বারা তাহাদের পণ্য ক্রয় করাইয়া লইতে লাগিল। ভারতে * * * ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অস্তিত্ব লোপের কাল—১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মতিলাল এই সকল কার্যে লিপ্ত ছিলেন। বেনিয়ান রূপে তিনি কেবল যে বিলাতী জাহাজের মাল বিক্রয় করাইয়া দিতেন তাহা নহে—এ দেশে অবস্থান-কালে এবং এদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে জাহাজে যে সকল মালের প্রয়োজন হইত, এতদ্দেশীয় বাজার হইতে মতিলাল তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেন। এইরূপে

তিনি ভারতবর্ষের সহিত বিলাতের বাণিজ্য-ব্যাপারে মধ্যবর্তিতা করিয়া উভয় দিক্ হইতে উপার্জন করিতেন।

"জাহাজের মুৎসুদ্দিগিরি এবং মিঃ স্মিথসনের মুৎসুদ্দিগিরি ব্যতীত, শীল মহাশয় নিম্নলিখিত সাহেব কোম্পানীগুলিরও বেনিয়ান ছিলেন—

মেসার্স লীচ, কেট্‌লওয়েল
" লিভিংষ্টোন, সাইরেরেস এণ্ড কোং
" ম্যাকলাউড, ফাগান এণ্ড কোং
" চ্যাপম্যান এণ্ড কোং
" টুলো এণ্ড কোং
" র‍্যালি, মাভ্রোজানি
" ওসওয়াল্ড, শীল এণ্ড কোং
" কেলসাল এণ্ড কোং

"এই শেষোক্ত কোম্পানীর আফিসে সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত মতিলালের পরিচয় হয়। রামগোপাল তখন তরুণ যুবক—কেলসাল কোম্পানীর আফিসে সহকারীর কর্ম করিতেন। জহুরী জহর চেনে—রামগোপালকে দেখিয়া ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া শীল মহাশয় তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন—ইনি একটি রত্ন। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বন্ধুসমাজে রামগোপাল 'রবার্ট' নামে অভিহিত হইতেন। মতিলাল মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—রবার্টের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। সেই ভবিষ্যদ্বাণী যে কিরূপ সফল হইয়াছিল, রামগোপলের জীবনীতে আমরা তাহা দেখিয়াছি।

"বাংলাদেশে যে নীলের ব্যবসায় এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, মতিলাল তাহার প্রথম বাজারের গোড়াপত্তন করেন। মেসার্স মূর, হিকে এণ্ড কোংর নামে নীলের ব্যবসায় প্রথম প্রবর্তিত হয়। মতিলাল দেশীয় পণ্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে এবং নীল, চিনি, চাউল ও সোরা সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। এই অভিজ্ঞতার তুলনা হয় না। একজন ইয়োরোপীয়ান বণিকের সহিত বাজী রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কেবল হস্ত দ্বারা অনুভব করিয়া নীলের একটা নমুনা পরীক্ষা করিয়া তিনি তাহার গুণাগুণ ও বাজার-দর বলিয়া দিয়াছিলেন। ফলে তিনিই বাজী জিতেন।

চাউল, সোরা, চিনিও তিনি এইরূপে কেবল অনুভূতিশক্তি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া তাহাদের গুণাগুণ ও বাজার-দর নির্ণয় করিতে পারিতেন।

"কিছুকাল মুৎসুদ্দিগিরি করিবার পর মতিলাল স্বয়ং আমদানি-রপ্তানির কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। এ দেশ হইতে তিনি নীল, রেশম, চিনি, সোরা ও চাউল ইয়োরোপে রপ্তানি করিতেন, এবং ইয়োরোপ হইতে বস্ত্র ও লৌহজাত দ্রব্য আমদানী করিতেন। তাঁহার পড়তা এমন ভাল ছিল যে, তিনি যে কোন ব্যবসায়ে হাত দিতেন, তাহাতেই আশাতীত লাভ করিতেন। ধূলিমুষ্টি ধরিলে স্বর্ণমুষ্টি হওয়া যাহাকে বলে, তাঁহার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইয়াছিল। তিনি কোম্পানীর কাগজ বা কোনরূপ 'সিকিউরিটী'তে টাকা আবদ্ধ রাখিতে ভালবাসিতেন না, টাকা খাটানো তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া, এবং তাহা বিনিয়োগের অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইয়া মতিলাল অবশেষে জাহাজের কাজ আরম্ভ কবিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিজের ছোট বড় ১২।১৩ খানি জাহাজ হইল। এই সকল জাহাজ চীন ও ইয়োরোপে বাণিজ্য করিতে যাইত। এই সকল জাহাজের মধ্যে কলিকাতায় নির্মিত একখানির নাম তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার নামে, 'রাজ-বাণী' রাখা হয়। কলিকাতায় টানা জাহাজের প্রথম প্রবর্তন তিনিই করিয়াছিলেন। তাঁহার এই শ্রেণীর প্রথম জাহাজখানির নাম—বেনিয়ান।

"জাহাজের কার্যেও প্রচুব অর্থাগম হওয়ায় মতিলাল উদ্বৃত্ত অর্থে জমিদারী ক্রয় করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি বাংলার অন্যতম বড় জমিদাব হইয়া উঠিলেন। কলিকাতা এবং সন্নিহিত স্থানসমূহেও তিনি বহু ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং বিষয়-কর্মে লাভ ও ক্ষতি দুইই হয়। মতিলাল যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন, তদ্রূপ মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে কিছু কিছু ক্ষতিও সহ্য করিতে হইত। এইরূপ ক্ষতি একত্র করিলে অর্ধকোটির কম হইবে না। তথাপি তিনি কুবেরের ঐশ্বর্য তাঁহার পুত্রগণের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যবসায়ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন।"

মতি শীলের ঠাকুরবাড়ী, বেলঘরিয়া, ২৪-পরগণা

মতি শীলের ঠাকুরবাড়ী সংলগ্ন অতিথিশালা,
বেলঘরিয়া, ২৪-পরগণা

[ছবির ব্লকগুলি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল শীল মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

মতিলালের সন্তান-সন্ততি

মতিলালের পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা। তাঁহার পাঁচ পুত্রের নাম—হীরালাল, চুণিলাল, পান্নালাল, গোবিন্দলাল ও কানাইলাল। মতিলাল তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হীরালালকে কোন প্রকার চাকুরী বা মুৎসুদ্দিগিরিতে নিযুক্ত করেন নাই। সরকারী কর্মেও তাঁহার আস্থা এবং সহানুভূতি ছিল না। হীরালালের জন্য তিনি Messrs. Oswald Seal & Co. নামে একটি সওদাগরী আফিস স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর ইহা সোৎসাহে পরিচালিত হয়। তারপর নানা কারণে ঐ আফিস উঠিয়া যায়।

বেলঘরিয়ার অতিথিশালা ও ঠাকুরবাড়ী

মৃত্যুর প্রায় চৌদ্দ বর্ষ পূর্বে তিনি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে বেলঘরিয়ায় ব্যারাকপুর ট্রাঙ্করোডের উপর এক দেবালয় ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় এখানে প্রতিদিন ৫০০ শত হইতে এক হাজার পর্যন্ত লোককে অন্নদান করা হইত। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র হীরালাল বাবু প্রতিদিন তিন হাজার লোককে অন্নদান করিতেন। ইহাদের মধ্যে অনেককে বস্ত্রদানও করা হয়।

বর্তমানে এই ঠাকুরবাড়ী ও অতিথিশালা মতিলালের ট্রাষ্ট ফণ্ডের আয় হইতে পরিচালিত হইতেছে। এখন এখানে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে ১৫০।২০০ শত পর্যন্ত লোক অন্নগ্রহণ করে। হিন্দুমুসলমান সকলেই এখানে পৃথক্‌ভাবে আহার পায়। গোঁড়া হিন্দুধর্মাবলম্বী হইয়াও মতিলাল যে কত উদার ছিলেন, তাঁহার এই ব্যবস্থা হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

যেস্থানে এই অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত, সে স্থানের নাম রথতলা। রথযাত্রার সময় এখানে প্রতিবৎসর একটি মেলা বসে। ত্রিশ বিঘা জায়গার উপর এই মন্দির ও অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীর দুইদিকে সানবাঁধান ঘাট। পুষ্করিণী ব্যতীত মন্দির-সংলগ্ন স্থানে একটি টিউবওয়েল বর্তমান। ঠাকুরের সেবার জন্য বাগানে ভাল ভাল আম গাছ ও নানাপ্রকার ফলের গাছ আছে। মন্দিরের বিগ্রহ জগন্নাথ ও গৌর-

নিতাই। পুনর্যাত্রার সময় এখানে বিশেষ উৎসব হয়। তখন ৭০০৷৮০০ লোক আহার করে। সেই সময় তাহাদিগকে ঘটা করিয়া খাওয়ান হয়।

মন্দিরটি আড়াই বিঘা জমির উপর নির্মিত—দুই মহল। প্রথম মহলে ঠাকুরের গৃহ, ভোগগৃহ, ঠাকুরের শয়ন-গৃহ ও ভাণ্ডার। এগুলি সমস্তই উত্তর দিকে; পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে চক্‌মিলান বারান্দা—এই সুবিস্তৃত তিনটি বারান্দায় হিন্দু-কাঙ্গালীরা ভোজন করে। মন্দিরের বাহিরে বিস্তৃত টিনের সেডে মুসলমানদিগের আহারের স্থান। প্রতিদিন বেলা ১২টা হইতে ১২৷৷টার মধ্যে ভোজনার্থীরা আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রতিদিন ১৷ মণ হইতে ১৷৷ মণ চাউল অতিথিদের জন্য বরাদ্দ আছে। ভাত, ডাইল, দুইরকম তরকারী ও অম্বল—ইহাই দৈনন্দিন ব্যবস্থা। উৎসবাদি উপলক্ষে বিশেষ আয়োজনের ব্যবস্থা হয়।

ভিতর-মহলে অনেকগুলি ঘর এবং চারিদিকে চকমিলান বারান্দা। এখানে অভ্যাগত ভদ্রলোক বা ভদ্র-পরিবারভুক্ত মহিলারা আহার করেন। ঠাকুরের ভোগের জন্য প্রতিদিন /২৷৷ আতপ চাউলের ও ১৩৷১৪ রকম ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা আছে। অতি যত্ন করিয়া অভ্যাগতদিগকে খাওয়ান হয়। মন্দিরের কার্য-পরিচালনার জন্য পূজারী—১ জন, পাচক—৩ জন এবং মালী ও চাকর প্রভৃতিতে আরও ৯৷১০ জন লোক আছে। মন্দিরের বর্তমান পূজারী ও তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত অপূর্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতি সজ্জন ব্যক্তি। দেবতা ও মানুষের সেবা তিনি বিশেষ যত্নপূর্বক করিয়া থাকেন। মন্দিরের ব্যয়নির্বাহার্থ প্রতি মাসে আনুমানিক এক হাজার টাকা খরচ হয়। এই টাকা মতিলাল শীল ট্রাষ্ট ফণ্ড হইতে আসে। এই মন্দিরের একটি বিশেষত্ব—এখানে দর্শনী বা বকসিসের কোন হাঙ্গামা নাই। সহর হইতে দূরে, পল্লীর নিভৃত ক্রোড়ে স্থাপিত এই দেবালয় ও অন্নসত্র মনে বেশ একটা শান্তির ভাব আনিয়া দেয়।

মতিলাল শীলস্‌ ফ্রি কলেজ

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে প্রায় চুরানব্বই বর্ষ পূর্বে মতিলাল শীল মহাশয় কর্তৃক এই অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মতিলাল নিজে উচ্চ-শিক্ষিত না

শীল্‌স ফ্রি কলেজ
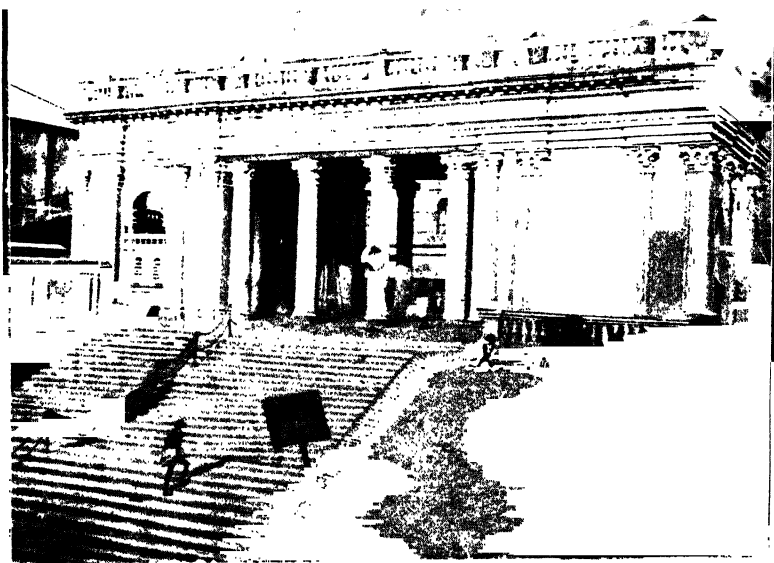
মতি শীলের ঘাট, কলিকাতা

[ছবির ব্লকগুলি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল শীল মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

হইলেও, দেশের লোক যাহাতে উচ্চশিক্ষা পায় তাহার জন্য তাঁহার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা উচ্চশিক্ষা-লাভের পক্ষে অনুকূল নহে, ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়াই তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে অবৈতনিক করিয়াছিলেন। সর্বশ্রেণীর বালক যাহাতে এই বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়িবার সুযোগ পায়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা তিনি করেন, যাহার ফলে এই সুদীর্ঘ কাল বিদ্যালয়টি বিনা বাধায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

এই বিদ্যালয়ের সমগ্র ব্যয় মতিলাল শীল ট্রাষ্ট ফণ্ড হইতে প্রদত্ত হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২০এ মে মতিলাল পরলোক গমন করেন। সেই জন্য প্রতিবৎসর ঐ তারিখে মতিলালের স্মৃতি-বার্ষিকী এবং বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণ-কার্য অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৯৪ বৎসরে কত দরিদ্র বালক বিনাবেতনে উচ্চ-শিক্ষালাভ করিয়া মতিলালের কীর্তি বিঘোষিত করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য-বিবরণী (১৯২২-২৭) হইতে এই বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"Mutty Lal Seal's Free College, so named after its founder, the late Mutty Lal Seal, of Kalutola, was established in Calcutta in the year 1842 A. D., when Western Education was just beginning to spread in this country. A public-spirited wealthy man, having a truly kind and compassionate heart, Babu Mutty Lal Seal realised, that the establishment of a free institution for the education of the poor students of his country would confer a real blessing on his countrymen. He at once opened his purse for the spread of Western Education enabling the people of this country to converse freely with foreigners, and within a very short time this free college came into existence. It was named 'college' after the name of the then existing 'Hindu College,' because there were two departments, Junior and Senior, and in the latter, college students were being taught.

But with the establishment of the Calcutta University in 1857 the authorities of this college considered it expedient to close the Senior Department without changing its old beloved name, which it retains up to the present day. Since then the college has been teaching up to the Entrance Standard, now called the Matriculation Standard, of the Calcutta University. The existence of old free institution is solely due to the princely munificence of its venerable Founder, who, by a duly executed testament, bequeathed to his posterity valuable Trust Estate for its proper maintenance on a footing of efficiency."*

সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ রাস্তার (পূর্বে ইহার নাম হ্যালিডে ষ্ট্রীট ছিল) উপর, হ্যারিসন রোডের অনতিদূর দক্ষিণে সুবৃহৎ বাড়ীতে এই বিদ্যালয় অবস্থিত।

শীলস্ ফ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠা

মতিলাল শীল মহোদয় একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনে সংকল্প করিয়াছেন জানিতে পারিয়া, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের একজন জেসুইট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের সময় শীল মহাশয়কে তিনি জানান, তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করিবার সহায়তাকল্পে তিনি সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। তাঁহার এই প্রস্তাব মতিলাল সানন্দে গ্রহণ করেন এবং এ সম্বন্ধে কার্যপদ্ধতি স্থির করিবার জন্য মতিলাল পরদিন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে যাইতে সম্মত হন। পরদিন তিনি শীলস্ ফ্রি কলেজের সুদক্ষ ও উৎসাহী সম্পাদক কৃষ্ণমোহন মল্লিক মহাশয়ের সহিত উক্ত কলেজে গমন করেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের কার্যপদ্ধতি ও শিক্ষাপ্রণালী পরিদর্শন করিয়া মতিলাল বিশেষ প্রীত হন এবং তাঁহার সংকল্পিত বিদ্যালয়-পরিচালনার ভার উক্ত কলেজের পরিচালকবর্গের হস্তে অর্পণ করিতে দৃঢ়সংকল্প করেন। তাঁহার বন্ধু (কৃষ্ণমোহন বাবু) হঠাৎ এই কার্য করা এবং জেসুইটদিগের হস্তে বিদ্যালয়ের ভারার্পণ করা সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিলে, মতিলাল উত্তর করেন

* পৃঃ ১

যে, এ বিষয় তিনি বহুদিন ভাবিয়া দেখিয়াছেন। অর্থাভাবে যাহারা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে পারিতেছে না, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা আশু কর্তব্য। এবং পৃথিবীর মধ্যে বর্তমান সময়ে জেসুইটেরাই সুদক্ষ শিক্ষক এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-পরিচালনায় তাঁহারা যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার পর তিনি বলেন, আমি একজন ব্যবসায়ী, দেশের ব্যবসার উন্নতিবিধান করিতে হইলে, দেশবাসীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।* ইহার পরে, তিনি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের কলুটোলার বাড়ীতে একটি মহতী সভা আহ্বান করেন। এই সভার একটি বিস্তৃত বিবরণ সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ সম্পাদিত "Bengal Spectator" পত্রে (মার্চ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ, পৃঃ ৭১-৭২) প্রকাশিত হয়। নিম্নে উক্ত বিবরণ উদ্ধৃত হইল—

"OPENING OF SEAL'S COLLEGE

On Wednesday morning (10 O'clock), March the 1st, a very numerous and highly respectable gathering of European and Native gentlemen (including several Ladies) took place at the house of Baboo Mutty Lal Seal, for the purpose of formally opening the college, which the worthy Baboo in his munificence, has founded for the education of the Hindoo youth; the number receiving education at one time, to be limited to five hundred. The institution will be under the entire management of the Directors of the Parent College of St. Xavier; arrangements had been made at St. Xavier's College for affording the pupils in Seal's College the benefit of the instructions of their various professors.

"The prospectus of the new college states that—The object of this institution is to provide for the education of Hindoos so as to fit them to occupy posts of trust and emolument in their own country.

"The course of education will comprise English literature in all its branches, History, Geography, Elocution, Writing,

* Life of Mutty Lall Seal, p. 30-31

Arithmetic, Algebra, Geometry, and the higher Mathematics, the Philosophical Sciences, and the practical application of Mathematics.

"Among the party assembled at the opening ceremony were the Chief Justice, Sir J. P. Grant, the Advocate-General, the Principal members of the Bar, Baboo Dwarka Nath Tagore, Captain Birch, Rev. K. M. Bannerjee, George Tompson Esq., the Professors of St. Xavier's College, J. Pattle etc., etc."

প্রথমে এই কলেজ পটলডাঙ্গায় বর্তমানে যেখানে হেয়ার স্কুল আছে সেইখানে স্থানান্তরিত হয় (কোথা হইতে স্থানান্তরিত হয় তাহা জানা যায় না)।

শীলস্‌ ফ্রি কলেজের পরিচালনা

তিনি স্কুলের ছাত্রগণকে পুস্তক এবং খাতা, কাগজ, পেন্সিল প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিতেন এবং সেই প্রাথমিক অবস্থায় নামমাত্র এক টাকা বেতন ধার্য করিয়া দেন। সে সময়ে আড়াই শত ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। সাত জন জেস্যুইট এবং তিনজন দেশীয় শিক্ষক বিদ্যালয়ের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মতিলালের সহিত জেস্যুইটদিগের মতান্তর ঘটায়, বিদ্যালয়ের সহিত তাঁহাদিগের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এই ঘটনার পরে কাপ্তেন পামার ও কয়েকজন ইংরাজ ও দেশীয় শিক্ষকের উপর বিদ্যালয়-পবিচালনার ভার অর্পিত হয়। এবং এই সঙ্গে তিনি এই বিদ্যালয়কে একেবারে অবৈতনিক করিয়া দেন, এবং ইহার নাম হয়—"Seal's Free College"। পূর্বে ইহার নাম ছিল, "Seal's College"। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিরানব্বই বৎসর এই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টি অবৈতনিকভাবে পরিচালিত হইতেছে। কত অক্ষম ও দরিদ্র ছাত্র এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে তাঁহার ইয়ত্তা নাই।

মধ্যে কয়েক বৎসর এই বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হয়, কিন্তু নানা অসুবিধা হেতু ইহার কলেজ-শ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়-পরিচালনার সমুদয় ব্যয় ৺মতিলাল শীলের ট্রাষ্ট ফণ্ড হইতে নির্বাহ হয়।

মতি শীলের ঠাকুরবাড়ী, দুর্গাপুর (বেহালা), ২৪-পরগণা
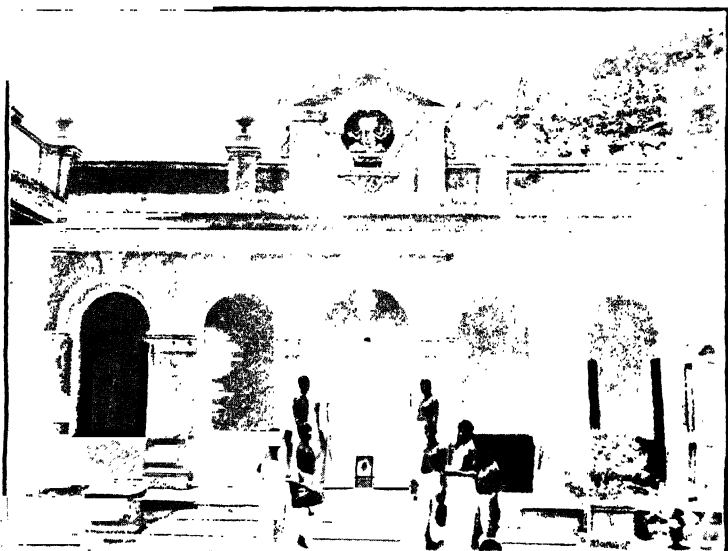
মতি শীলের ঠাকুরবাড়ী সংলগ্ন অতিথিশালা
দুর্গাপুর (বেহালা), ২৪-পরগণা

[ছবির ব্লকগুলি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল শীল মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

শীলস্ ফ্রি কলেজের পরীক্ষার ফল

এই বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রগণের পরীক্ষার ফলও আশাপ্রদ। নিম্নে ১৯২২ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষার ফল উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য-বিবরণী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।*

	১ম বিভাগে উত্তীর্ণ	২য় বিভাগে উত্তীর্ণ	৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ	মোট সংখ্যা
১৯২২ খৃঃ	২৪	৩	×	২৭
১৯২৩ ,,	১৬	৬	৩	২৫
১৯২৪ ,,	১৪	১১	১	২৬
১৯২৫ ,,	১৪	৬	২	২২
১৯২৬ ,,	১৩	৮	২	২৩
১৩২৭ ,,	৯	১১	১	২১

মতিলাল নিজে উচ্চ-শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু উচ্চ-শিক্ষা-প্রচলনে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও ইচ্ছা ছিল। ব্যবসার দ্বারা তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন ; সেই অর্থের সদ্ব্যয় দ্বারা তিনি দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে উচ্চ-শিক্ষাদানের চিবস্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া মহৎ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার নামে স্থাপিত ট্রাষ্ট ফণ্ডের আয় হইতে এই বিদ্যালয়, দুইটি দেবালয় ও অতিথিশালা এবং "Widow and Orphan Fund" পরিচালিত হইতেছে। কলিকাতাব কতকগুলি মূল্যবান্ ভূসম্পত্তি ও বাড়ীর আয় এই Trust ফণ্ডের অন্তর্ভুক্ত আছে।

দুর্গাপুরের অতিথিশালা ও দেবালয়

বেহালার নিকট দুর্গাপুর গ্রামে (ট্রাম রাস্তার ধারে) এই প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে (১৩২৪ সালে রথের দিন) ইহা মতিলাল শীলের ট্রাষ্ট ফণ্ডের ট্রাষ্টিগণ কর্তৃক স্থাপিত হয়। এই অতিথিশালা ও দেবালয়ের যাবতীয় ব্যয় পূর্বোক্ত ট্রাষ্টফণ্ডই বহন করে।

* Eighty-First Annual Report of Mutty Lal Seal's Free College for the years 1922-1927, p 3

আন্দাজ বিশ বিঘা জমির উপর এই ঠাকুরবাড়ী ও অতিথিশালা স্থাপিত। ইহার মধ্যে বহু ফল ও ফুলের গাছ এবং দুইটি পুষ্করিণী আছে। বাগানের উৎপন্ন ফল, ফুল ও শাকসব্জী সমস্তই ঠাকুরের সেবায় ব্যয়িত হয়। ঠাকুর-বাড়ীটি চকমিলান এবং আধুনিক ধরণে নির্মিত। ইহার দক্ষিণাংশ দ্বিতল। সমস্ত বাড়ীটি বৈদ্যুতিক আলোক ও পাখা দ্বারা সজ্জিত। বাড়ীর ভিতরে বিস্তীর্ণ উঠান, তাহার চারিপাশে বারান্দা ও ঘর। উত্তর দিকে ঠাকুর-ঘর এবং তাহার দুই পাশে শয়নঘর, তৈজসপত্র ও নৈবেদ্যের ঘর, শীতল ও ভোগের ঘর, দেবসেবার ও অতিথি-সেবার ভাণ্ডার প্রভৃতি আছে। পশ্চিম দিকে রান্নাঘর, পূর্বদিকে একটি বিস্তৃত দালান ও তৎসংলগ্ন একটি ঘর—এখানে মন্দিরদর্শনার্থী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা আহার করেন। দক্ষিণদিকের ভিতরের অংশে পূজারী, 'সূপকার, চাকর প্রভৃতির ঘর। দক্ষিণ দিকের বাহিরের অংশে দুই পাশে দুইটি বড় ঘর—এ দুটি সমাগত ভদ্রলোকদিকের বিশ্রামের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দ্বিতলে মেয়েদের জন্য দুইটি বড় ঘর এবং দুই পাশে সুবৃহৎ বারান্দা আছে। ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণাংশে প্রকাণ্ড একটি টিনের সেড। তাহার একাংশে অতিথিদিগের জন্য রন্ধনাদি হয়। বাকী অংশে হিন্দু অতিথিরা আহার করে। এই টিনের সেডের কিছু দূরে মুসলমান অতিথিদিগের আহার করিবার স্থান। বর্ষার সময় মুসলমান অতিথিরা ঠাকুরবাড়ীর গাড়ী-বারান্দার নীচে আহার করে।

মন্দিরের কার্যপরিচালনার জন্য তের জন কর্মচারী ও একজন দরওয়ান নিযুক্ত আছে। রথযাত্রার দিন প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, প্রতিবৎসর ঐ দিন বিশেষভাবে উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসবকে জন্মতিথি-পূজা-উৎসব বলা হয়। এই উৎসব ব্যতীত ঝুলনের সময় পাঁচ দিন এবং রাসযাত্রার তিন দিন বিশেষ উৎসব হয়। এই কয়টি পর্বদিনে সমাগত ভদ্রলোক ও অতিথিদিগকে বিশেষভাবে খাওয়ান হয়।

মন্দিরের বিগ্রহ—রাধাগোবিন্দদেব (যুগল মূর্তি) ; রাধিকা ও গোবিন্দ-দেবের বিগ্রহ দুইটি সুন্দর। বেলঘরিয়ার মন্দিরের মত এখানেও ঠাকুরের জন্য দৈনিক আড়াই সের আতপ চাউলের ভোগ ও তের রকম ব্যঞ্জন হয়।

অতিথি-সেবার জন্য প্রতিদিন সওয়া মণ সিদ্ধ চাউলের অন্ন বরাদ্দ আছে। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সমাগত প্রত্যেক অতিথিই এখানে অন্ন পাইয়া থাকে।

অনাথ ও বিধবাদিগের বৃত্তি

মতিলাল শীলের ট্রাষ্ট ফণ্ড হইতে অনাথ ও বিধবাদিগের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। এই বৃত্তি বাবদ মাসিক ৬০০।৭০০৲ টাকা দান করা হয়। প্রত্যেককে মাসিক তিন টাকা হইতে দশ টাকা পর্যন্ত প্রদত্ত হইয়া থাকে। ট্রাষ্ট ফণ্ডের কার্যালয় (শীলস্ ফ্রী কলেজ ভবন) হইতে নির্দিষ্ট দিবসে এই টাকা বিতরণ করা হয়। প্রার্থী নির্বাচনের ভার ট্রাষ্টিগণের উপরে ন্যস্ত আছে।

মতিলাল শীলের স্নানের ঘাট

হাওড়া পুলের দক্ষিণে আরমানি ঘাটের নিকট এই ঘাটটি অবস্থিত। বর্তমান ঘাটের উত্তর বা ডান দিকে মেয়েদের বস্ত্রাদি পরিবর্তনের জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে। দক্ষিণ বা বামদিগের স্থান পুরুষ স্নানার্থীদিগের জন্য নির্দিষ্ট। প্রথমে ঘাটটি বর্তমান ঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। পোর্ট কমিশনারগণ কর্তৃক উহা দখল হওয়ায়, তাঁহারাই উহার পরিবর্তে বর্তমান ঘাটটি নির্মাণ করাইয়া দেন।

মতিলাল শীল মহাশয়ের অন্যান্য দান

১। জ্যেষ্ঠপুত্র হীরালাল শীলের বিবাহের সময় বহু ঋণদায়ে কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে অর্থদানে কারামুক্ত করেন। দুর্গা-পূজা ও অন্যান্য পার্বণাদিতেও তিনি এইভাবে বহু ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত করেন।

২। পূর্বে সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে একটি মেডিকেল কলেজ ছিল। তাহাতে ত্রিশটি রোগী থাকিত। শীল মহাশয় ইহাদের ব্যয় নির্বাহ করিতেন।

৩। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য চাঁদার খাতা খোলা হইলে মতিলাল তাহাতে ১২০০০৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং ঐ চাঁদা বাবদ তাঁহার বাটীর দক্ষিণ-পূর্বদিকের ভূমিখণ্ড দান করেন। ঐ ভূমির উপর মেডিকেল কলেজ নির্মিত হয়।

৪। কলিকাতার জ্বর-চিকিৎসার হাসপাতালে মতিলাল শীল মহাশয় প্রচুর সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই দানের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রভূত প্রশংসা করেন, এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অন্তর্গত একটি রোগিনিবাস (ওয়ার্ড) এই দানের জন্য কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হিসাবে "মতিলাল শীলস্ ওয়ার্ড" নামে অভিহিত হয়।

৫। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২৯এ ফেব্রুয়ারী তারিখের "লিটারারী গেজেটে" প্রকাশ মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের পারিতোষিক বিতরণের জন্য মতিলাল শীল মহাশয় এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

৬। হীরা বুলবুল নামক একটি পতিতা নারীর পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা হইলে হিন্দুগণ ক্রুদ্ধ হন, এবং বহুবাজারের রাজেন্দ্র দত্ত (রাজা বাবু) ও মতিলাল শীল মহাশয়ের চেষ্টায় হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপিত হয়। ইহার ব্যয়-নির্বাহের জন্য শীল মহাশয় মাসিক ৫০০৲ টাকা দিতেন।

৭। মতিলাল বিধবা-বিবাহের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রথম বিধবা-বিবাহকারীকে তিনি ২০০০০৲ বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন ইহা ঘোষণা করেন। তাঁহার এই ঘোষণা অনুসারে এক ব্যক্তি বিধবা-বিবাহ করিয়া এই পুরস্কার প্রাপ্ত হন।*

ব্যক্তিগত দানের দৃষ্টান্ত

এই সমস্ত দান ব্যতীত মতিলালের কত গুপ্ত ও ব্যক্তিগত দান ছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বর্গীয় রাম গোপাল সান্যাল প্রণীত "Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India" পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ হইতে এখানে একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হইল। সান্যাল মহাশয় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়" পত্র হইতে, ইহা তাঁহার পুস্তকে অনুবাদ পূর্বক উদ্ধৃত করেন।

"We have, on various former occasions, made known acts of benevolence practised by our wealthy countryman,

* এক হইতে সাত পর্যন্ত দানের তালিকাটি ১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের (পৃঃ ৯৯৫-৯৯৭) "ভারতবর্ষ" পত্রিকা হইতে গৃহীত।

Babu Mutty Lal Seal. We have now to announce an additional instance. A Brahmin named Juggomohan Thakur was known to the Babu. On an occasion of pecuniary difficulty he obtained from the Babu a loan of 3 or 4 thousand rupees on the mortgage of a house belonging to him. This debt, however, he was unable to liquidate; and some time ago he fell dangerously ill, and being on the point of death, his friends were conveying him to the river's brink. The Brahmin was in the possession of his mental faculties, and his last journey to the ghaut was by the way of the Babu's house. While passing it, he desired his khat to be put down, and wished to have an interview with the Babu, ere bidding farewell for ever to this world. The intelligence reaching the Babu, he was much affected by it, and immediately proceeded to meet the dying Brahmin who had been known to him for a long time. The Brahmin imparted his blessing to the Babu, but remarked that he could not take his final departure in peace, as he was bound to the Babu under unfulfilled engagement. The Babu being convinced of the Brahmin's approaching dissolution immediately brought out and returned to him all the papers connected with the loan and mortgage; released the Brahmin from all liability, and bestowed some money in the bargain on the Brahmin's friends for the expenses of his funeral rites."

মতিলালের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ব্যয়

বেলঘরিয়ার অতিথিশালা ও ঠাকুরবাড়ী, শীলস্ ফ্রি কলেজ, দুর্গাপুরের অতিথিশালা ও দেবালয়, এবং অনাথ ও বিধবাদিগের বৃত্তি ফণ্ড—এই চারিটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বাবদ মাসিক পাঁচ হাজার হইতে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়। এতদ্ব্যতীত শীলস্ ফ্রি কলেজের পুরস্কার-বিতরণের দিন ১০০০৲ এক হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। ঐ দিন বিদ্যালয়ের

সমস্ত ছাত্র ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে জলযোগে পরিতৃপ্ত করিবার প্রথা আছে। দুইটি অতিথিশালা ও শীলস্ ফ্রি কলেজ মেরামত বাবদেও বৎসরে কিছু ব্যয় হইয়া থাকে। সর্বসাকল্যে প্রতি বর্ষে ৬০।৬৫ হাজার টাকা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান-পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হয়। কলিকাতার অনেকগুলি বড় বড় বাড়ী এবং কোম্পানীর কাগজের আয় ট্রাষ্ট ফণ্ডের পরিপুষ্টি সাধন করে।

ট্রাষ্ট ফণ্ডের সম্পত্তির তালিকা

কলিকাতার নিম্নলিখিত কয়টি বাড়ী ট্রাষ্ট ফণ্ডের মূল্যবান্ সম্পত্তি—

১। চৌরঙ্গী রোডস্থিত 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার পুরাতন বাড়ী

২। ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থিত বটকৃষ্ণ পালের ঔষধালয় ও কার্যালয়ের অংশ

৩। লায়ন্স রেঞ্জস্থিত মেকেঞ্জি লায়াল এণ্ড কোম্পানীর নীলাম-বাড়ী

৪। ওয়েলেস্‌লি প্লেসস্থিত ক্যালিডোনিয়ান প্রিন্টিংএর কার্যালয় ইত্যাদি ;

ট্রাষ্ট ফণ্ডের আয় পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। এই আয়-বৃদ্ধি দ্বারা ট্রাষ্ট ফণ্ড ক্রমশই সমৃদ্ধ হইতেছে। এই ফণ্ডের অধীনে বর্তমানে যে সমস্ত সম্পত্তি আছে, তাহাদের আনুমানিক মূল্য ১২ বার লক্ষ টাকা।

ট্রাষ্ট ফণ্ডের বর্তমান ট্রাষ্টিগণ

মতিলাল শীলের বংশধরগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়জন ব্যক্তি বর্তমানে এই ফণ্ডের ট্রাষ্টি আছেন:—

১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল শীল (ইনি মতিলাল শীলের পৌত্র পিয়ারী-লালের কনিষ্ঠ পুত্র)

২। শ্রীযুক্ত মণিলাল শীল (ইনি মতিলাল শীলের পৌত্র অমৃতলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র)

৩। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল শীল (ইনি মতিলাল শীলের পৌত্র কুঞ্জলালের পুত্র)

৪। শ্রীযুক্ত গোপীলাল শীল (ইনি মতিলালের পৌত্র গোষ্ঠলালের পুত্র)

৫। শ্রীযুক্ত মনোহরলাল শীল (ইনি মতিলালের তৃতীয় পুত্র পান্নালাল শীলের দৌহিত্র মাণিকলালের পুত্র)

৬। শ্রীযুক্ত গৌরমোহন মল্লিক (ইনি মতিলালের পৌত্র গোপাললাল শীলের ভাগিনেয়)

প্রতি বুধবার সেণ্ট্র্যাল অ্যাভেনিউ-স্থিত শীলস্ ফ্রি কলেজ-ভবনে ট্রাষ্ট-কমিটির অধিবেশন হয়।

মতিলালের বংশলতা

মতিলালের দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নী নাগরী দাসীর কোন পুত্রসন্তান (ইঁহার একটি মাত্র কন্যা) না হওয়ায়, তিনি দ্বিতীয়বার হুগলীতে বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী আনন্দময়ীর পাঁচ পুত্র (হীরালাল, চুণিলাল, পান্নালাল, গোবিন্দলাল ও কানাইলাল) এবং পাঁচ কন্যা হয়। এই পাঁচ কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজরাণীর সহিত জোড়াসাঁকোনিবাসী শ্যামলাল মল্লিকের বিবাহ হয়। শ্যামবাবুর কন্যা পুরসুন্দরী দাসী বিপুল অর্থব্যয়ে বীডন ষ্ট্রীটে (কলিকাতা) জনসাধারণের জন্য একটি ধর্মশালা নির্মাণ করিয়া দেন এবং ইহার পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ রাখিয়া যান।

মতিলালের প্রথম পুত্র হীরালালের রসিকলাল নামে একটি পুত্র হয়। রসিকলাল নিঃসন্তান। মতিলালের দ্বিতীয় পুত্র চুণিলালের কোন সন্তান হয় নাই। ইনি কলিকাতার মেডিকেল কলেজ-সংলগ্ন "চুণিলাল শীল দাতব্য ঔষধালয়ের" জন্য বহু অর্থ উৎসৃষ্ট করেন। ইঁহার স্থাপিত দাতব্য ঔষধালয় হইতে প্রতিদিন বহু শত লোক বিনামূল্যে ঔষধ পাইয়া আসিতেছেন।*

মতিলালের তৃতীয় পুত্র পান্নালালের কোন পুত্র হয় নাই। তাঁহার দৌহিত্র মাণিকলাল স্বীয় মাতামহের নামে বেলগাছিয়ায়, পাতিপুকুরের নিকট "পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির" স্থাপন করেন।

---

* ১২০০০৲ টাকা বাড়ী নির্মাণ ও ৫০০০০৲ টাকা পরিচালন-ব্যয়; বেলগাছিয়া হাসপাতালেও চুণিলাল শীলের নামে ওয়ার্ড আছে।

মতিলালের চতুর্থ পুত্র গোবিন্দলালের নয় পুত্র (বিহারীলাল, পিয়ারী-লাল, ব্রজলাল, মাণিকলাল, বলাইলাল, অমৃতলাল, কুঞ্জলাল, গোষ্ঠলাল ও জহরলাল)। তন্মধ্যে ১ম পুত্র বিহারীলালের কোন পুত্র নাই, দ্বিতীয় পুত্র পিয়ারীলালের সুরেন্দ্রলাল ও যতীন্দ্রলাল নামে দুই পুত্র। গত ১৩২০ সালের আশ্বিন মাসে সুরেন্দ্রলাল পরলোকগমন করিয়াছেন। যতীন্দ্রলাল জীবিত, এবং ইনিই এখন শীল বংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবীণ। গোবিন্দ-লালের তৃতীয় পুত্র ব্রজলালের কোন পুত্র নাই, মাত্র একটি কন্যা। চতুর্থ পুত্র মাণিকলাল নিঃসন্তান। পঞ্চম পুত্র বলাইলালের ৭ পুত্র, তন্মধ্যে বর্তমানে ৪ জন জীবিত—ইঁহাদের নাম,—বিশ্বলাল, তারকলাল, কেদারলাল ও নকুলাল। ইঁহারা রামকৃষ্ণপুরে বাস করেন। গোবিন্দলালের ষষ্ঠ পুত্র অমৃতলালের পাঁচ পুত্র (মণিলাল, চুনিলাল, প্রিয়লাল, নারায়ণলাল ও যদুলাল)। সপ্তম পুত্র কুঞ্জলালের এক পুত্র—কৃষ্ণলাল। অষ্টম পুত্র গোষ্ঠলালের এক পুত্র—গোপীলাল। গোবিন্দলালের নবম বা কনিষ্ঠ পুত্র জহরলালের একটি মাত্র কন্যা।

মতিলালের পঞ্চম বা কনিষ্ঠ পুত্র কানাইলালের পুত্র গোপাললাল শীল বহু পূর্বে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইঁহার পাঁচ ভাগিনেয় (কান্তমোহন মল্লিক, গৌরমোহন মল্লিক, গিরিমোহন মল্লিক, পঞ্চানন মল্লিক ও যোগেন্দ্র-লাল মল্লিক) বর্তমানে গোপাললালের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। হাওড়ায় আদালতের নিকটে কানাইলাল শীল মহাশয়ের নামে একটি দাতব্য ঔষধালয় বর্তমান আছে।

প্রসূতি-হাসপাতাল

মতিলাল শীল মহাশয় যে সমস্ত সৎকার্য করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে "প্রসূতি-হাসপাতাল" অন্যতম। তাঁহার এই দান সম্বন্ধে সমাচার দর্পণ হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল লক্ষমুদ্রা বার্ষিক ব্যয়ে ডাক্তার ওসাগ্নসী সাহেবের অধীনে গর্ভিণী স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থ এক চিকিৎসালয়

সংস্থাপন করিয়াছেন এবিষয় আমারদিগের সম্বাদ পত্রে প্রকাশের উপযুক্ত হইয়াছে।

"পাঠকবর্গ মনোযোগ করহ যে স্থূলাকায় এবং অতি মান্য জমিদারেরা পিত্রাদি শ্রাদ্ধে এবং বিবাহাদি উপলক্ষে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন যাহাতে সাধারণ লোকের দুরবস্থার ন্যূনতা হয় এমত বিষয়ে কদাচ এক পয়সা দিতে পারেন না অতএব এই মহাত্মাব্যক্তির দানের মাহাত্ম্য যাহা এইক্ষণে জন মণ্ডলীমধ্যে প্রকাশ পাইবার যোগ্য হইয়াছে। অনেক বিষয়ে জানা গিয়াছে যে এই বাবু বিধবা স্ত্রীগণের পরম বন্ধু কারণ কিয়ৎকাল হইল উক্ত বাবুজী বিধবাদিগের বিবাহার্থ অত্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদিগের অনর্থক অভিমান দ্বারা এবিষয় সম্পন্ন হইল না। এই বাবুর এই প্রকার সৎকর্ম অতিশয় প্রশংসনীয় হইয়াছে এবং ইহাতে আমরা প্রত্যয় করি যে বিধবা গর্ভিনী স্ত্রীগণের মহোপকার এবং তদ্ভিন্ন স্ত্রীগণের অসংখ্য উপকার হইতে পারে। বাবুজী বিলক্ষণ অবগত আছেন যে হিন্দু স্ত্রীগণেরা বিধবাবস্থায় গর্ভবতী হইলে তাহার কুটুম্বাদির অতি অপমান হয় এবং সেই বিধবা চিকিৎসালয়ে গমনাপেক্ষা বরং প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হয়।"

সমাচার দর্পণ, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪০ (১১ ফাল্গুন, ১২৪৬)*

ব্যবসায়ী মতিলাল

মতিলালের তীক্ষ্ণ ব্যবসা-বুদ্ধি ছিল। বাজার-দর কবে উঠিবে বা কখন নামিবে, তাহা, তিনি ভালরূপই বুঝিতে পারিতেন। কোন্ জিনিষ কোথা হইতে ক্রয় করিলে সুবিধা হয়, তাহা তিনি ভালরূপই জানিতেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, তিনি বহু সওদাগরী অফিসের বেনিয়ান বা মুৎসুদ্দি ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে মফস্বলের নানাস্থান হইতে কৃষি-জাত বহু দ্রব্য আনাইতে হইত। এই কার্যনির্বাহের নিমিত্ত মফস্বলের বহু স্থানে তাঁহার স্থাপিত এজেন্সী ছিল। এই সমস্ত এজেন্সীর মারফতে তিনি সস্তাদরে মাল (চাউল, গম, সরিষা, তিসি প্রভৃতি) ক্রয় করিয়া কলিকাতায় প্রচলিত বাজার-দরে বিক্রয় করিতেন। ভূমি-উৎপন্ন দ্রব্যাদি ব্যতীত তিনি সোরা

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩৫

কিনিবার জন্য ছাপরায়, চিনি কিনিবার জন্য গাজীপুরে, সিল্ক কিনিবার জন্য রামপুর বোয়ালিয়ায় (রাজসাহী) লোক পাঠাইতেন। তিনি মফস্বল হইতে আনীত মাল কলিকাতায় ও বিদেশীয় সওদাগরদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান হইতেন। এই লাভের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া তিনি আমদানি-রপ্তানির কার্য আরম্ভ করেন। এদেশের উৎপন্ন মাল অধিক পরিমাণে বিলাতে পাঠাইয়া বিলাতের জিনিষ এদেশে আমদানি করিতেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতে ভারতবর্ষীয় চিনির উপর শুল্ক টন পিছু ২৪ হইতে ৩২ শিলিং (কখনও ২৪, কখনও ২৫, কখনও ২৬, এইরূপে ৩২ শিলিং পর্যন্ত) কমিয়া যাওয়ায়, তিনি প্রায় বার লক্ষ টাকার কাশীর চিনি পাটনা ও গাজীপুর হইতে নয় টাকা মন হিসাবে ক্রয় করেন। পরে ঐ চিনি কলিকাতায় মন পিছু ২।৩ টাকা বেশী দরে বিক্রয় করিয়া কম-বেশী তিন লক্ষ টাকা পান। বিলাত হইতে তিনি লোহা ও পীস্‌-গুড আমদানি করিতেন। তিনি আজকালকার বড়লোকদের মত কোম্পানীর কাগজ-ক্রয়ে তাঁহার অর্থ নিয়োগ করিতে চাহিতেন না। তাঁহার সমস্ত টাকা তিনি ব্যবসায়ে খাটাইতেন।

জাহাজ-পরিচালনায় মতিলাল

১৮৩৬ সালের পর হইতে মতিলাল জাহাজের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সঞ্চিত অর্থের একটা বৃহৎ অংশ তিনি এই কারবারে নিয়োগ করেন। এই বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে (পৃঃ ৬)।

মহাজন মতিলাল

অর্থকষ্টে পড়িয়া দেশের জমিদার ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কখনও কখনও জমিদারী বা সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া মতিলালের নিকট টাকা ধার লইতেন। যাঁহারা ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিতেন, তাঁহাদের অনেকের সম্পত্তি মতিলালের অধিকারে আসিত। এইভাবে তিনি মঙ্গলঘাট, মহিষাদল ও অন্যান্য স্থানের জমিদারীর মালিক হন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা ও সহর-তলীর বহু বাড়ী ও ভূমি এইভাবে তাঁহার হস্তগত হয়। অবশ্য বহু স্থলে

তিনি অসমর্থ ঋণদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে কপর্দকও না লইয়া ঋণমুক্ত করিয়াছেন। কলিকাতার ধর্মতলা অঞ্চলে তৎকালে "ধর্মতলা বাজার" নামে একটি সুবৃহৎ বাজার ছিল; জ্যাক্‌সন সাহেবের নিকট হইতে তিনি এই বাজার ক্রয় করেন। পরলোকগত পণ্ডিত কালীময় ঘটক তাঁহার রচিত "প্রথম চরিতাষ্টক" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার অর্থ উপার্জনের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি কখন টাকার জন্য অসৎপথে গমন করেন নাই এবং দুরাকাঙ্ক্ষও ছিলেন না। যখন তাঁহার চারিদিক্ হইতে অজস্র অর্থ আসিতেছিল, সেই সময়েই তিনি ভাড়াটিয়া বাটি প্রস্তুত করিবার জন্য কলিকাতার ও তৎপার্শ্ববর্তী অনেক ভূমি ও গৃহ ক্রয় করিলেন। এইরূপ দেখিয়া যাঁহারা তাঁহাকে অর্থগৃধ্নু মনে করিবেন তাঁহাদিগের এই বিবেচনা করা উচিত যে, যাঁহাদিগের দ্বারা লোকের উপকার হয়, তাঁহাদিগের উচ্চপদ গ্রহণ বা বিপুল অর্থোপার্জন, কোন ক্রমেই দূষণীয় নহে। লোকের ভাল করিবার ইচ্ছাই যে, তাঁহাকে অর্থোপার্জনে নিয়োজিত করিয়াছিল, যদিও একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় না, কিন্তু তাঁহার অর্থে দেশের বিস্তর উপকার হইয়াছিল।"[১]

ধর্মসভা ও মতিলাল

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুর কর্তৃক রাজা রামমোহন রায়ের অনুরোধ ও প্ররোচনায় সতীদাহ-প্রথা রহিত করিবার জন্য আইন প্রণীত হয়। এ দেশের ধর্মভীত ও গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায় সহগমনের স্বপক্ষে ও বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের বিপক্ষে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলুটোলায় মতিলাল শীলের গৃহের সন্নিকটে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার নাম হয় "ধর্মসভা"। সমাচার-চন্দ্রিকা-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভার সম্পাদক ও বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রথমে এই সভা স্থির করেন যে, সতী-দাহ-প্রথা রহিত করা সম্বন্ধে বিলাতে আপীল করা কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে কিঞ্চিদধিক এগার হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হয়।[২] এই

১। কালীময় ঘটক প্রণীত প্রথম চরিতাষ্টক, পৃঃ ১০৮

২। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫০-১৫২

চাঁদার মধ্যে সুবর্ণবণিক্‌কুলোদ্ভব নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ৫৫৫০৲ টাকা স্বাক্ষর করেন—

রামগোপাল মল্লিক	...	২৫০০৲ টাকা
গোকুলনাথ মল্লিক	...	২০০০৲ „
কাশীনাথ মল্লিক	...	৫০০৲ „
বৈষ্ণবদাস মল্লিক	...	৫০০৲ „
তারিণীচন্দ্র মল্লিক	...	৫০৲ „

আপীল হইল, কিন্তু লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর-প্রবর্তিত আইনই বজায় রহিল। সভার কর্মিগণ মতিলালকে সভায় যোগদান করিবার জন্য বহুবার অনুরোধ করেন। কিন্তু "সভার" গোঁড়ামি, দলাদলি ও জাতিচ্যুতি বিষয়ের আন্দোলনের জন্য মতিলাল ইহাতে যোগদান করিতে স্বীকৃত হন নাই। অবশেষে সভার সম্পাদক ও মতিলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন মতিলালকে বিশেষ করিয়া পীড়াপীড়ি করেন, তখন সভায় যোগদান না করিবার হেতু দেখাইয়া মতিলাল বলেন—"এ সভায় যোগদান না করার প্রধান কারণ ইহা ধর্মসভা নহে, ইহা একটি অধর্ম-সভা। এই সভার মিথ্যা করিয়া ধর্মসভা নামকরণ করা হইয়াছে, ইহা দ্বারা আমাদের সমাজের উন্নতি ও রক্ষার কার্য সংসাধিত হইতেছে না। অপর দিকে এই সভার দ্বারা ধর্ম ও ধর্ম-সংক্রান্ত কর্তব্যসমূহের বিনাশ ও বিচ্যুতিই সাধিত হইতেছে। ধর্মসংক্রান্ত কর্তব্যসমূহের মধ্যে দান একটি বড় জিনিষ। বিপন্নকে বিপদ্‌মুক্ত করা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান করা—এই সমস্ত কার্য ধর্মসভার প্রধান কার্যরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই সভা এ সমস্ত সাধু ও জনহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করে নাই।" তারপর তিনি আরও বলেন,—"ধর্ম-বিষয়ে আলোচনা ও আন্দোলনের সভা অপেক্ষা, ইহাকে একটি সাধারণের হিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা অধিকতর সঙ্গত"। তাঁহার এই প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সি আই ই এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ধর্মসভার পুনর্গঠন ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং নিজ উদ্দেশ্য বিশদ্‌ভাবে ব্যক্ত করিয়া

মতিলাল এই সভায় একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন —"দান ও বদান্যতা সকল দেশ, সকল ধর্ম ও সকল জাতির মধ্যেই ধর্ম-মূলক প্রধান কর্তব্যরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। আপনারা একবার আমাদের দেশের শত শত নিরন্ন ও বস্ত্রহীন লোকেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। দরিদ্রের দারিদ্র্যমোচন, অন্নহীনকে অন্নদান, অশিক্ষিত জনগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা আমাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য কর্ম। এই সমস্ত পবিত্র কর্ম হইতে আমরা দূরে সরিয়া আছি। এইগুলির অনুষ্ঠানেই ধর্মসভার মুখ উজ্জ্বল হইবে।" তারপর সভায় উপস্থিত কয়েকজন ধনী ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলেন—

"I see around me rich men, possessing large funded and landed property. What I ask them is not to deprive themselves of their necessaries and comforts, but spare an infinitesimal portion of their luxuries for the homeless and the foodless. If they have ten carriages and pair, I ask them not to deprive themselves of all their equipages and cattle, but to keep nine carriages and nine pairs, and dedicate the sale proceeds of the remaining carriage and pair to the relief of the poor." *

তাঁহার বক্তৃতার পর স্থির হয় যে, অনাথ ও নিরাশ্রয়া বিধবাদিগের জন্য একটি দাতব্য ভাণ্ডার খোলা হইবে। এই ভাণ্ডারে মতিলাল ত্রিশ হাজার টাকা দান করেন। কিছুদিন পরে অন্যান্য সাহায্যকারীরা সাহায্য-দানে বিরত হইলেন। কালক্রমে ধর্মসভা উঠিয়া গেল। তখন মতিলাল ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে নিজে অনাথ ও বিধবাদিগের জন্য একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপন করেন। ইহার নাম "মতিলাল শীল অনাথ ও বিধবা সাহায্য ভাণ্ডার"। সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত প্রায় ৯০ বৎসর কাল এই ধনভাণ্ডার হইতে বহু অনাথ ও নিরাশ্রয়া বিধবা সাহায্য পাইয়া আসিতেছে।

Life of Mutty Lall Seal, pp. 35 & 36

সমাজ-সংস্কারক মতিলাল

মতিলাল নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু ছিলেন। কিন্তু তিনি দুর্নীতিমূলক গোঁড়ামি ভালবাসিতেন না। ধর্ম ও নীতির যে সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হয়, তিনি সেইগুলিই সর্বতোভাবে সমর্থন করিতেন। তিনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত ও গোস্বামি-শিষ্য ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন চালাইবার বহু পূর্বে তিনি এই প্রথার ও অন্যান্য সমাজ-সংস্কারের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, যিনি সাহস করিয়া প্রথম বিধবা-বিবাহ করিবেন, তাঁহাকে তিনি বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন।* বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন-বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা বিষয়ে "জ্ঞানান্বেষণ" পত্র হইতে উদ্ধৃত ও ১২৪৪ সালের ১৮ই বৈশাখ তারিখের (ইং ২৯ এপ্রিল, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ) 'সমাচার দর্পণে' যাহা প্রকাশিত হয় তাহা এখানে উদ্ধৃত করা হইল :—

"আমরা আহ্লাদপূর্বক পাঠকবর্গকে ও সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি এতদ্দেশীয় কতিপয় সমৃদ্ধ সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরামর্শ করিয়াছেন এক সভা করিবেন তাহার অভিপ্রায় এই যে বহুকালবধি যে সকল কুনিয়মেতে এদেশের নীতি ব্যবহার মন্দ করিয়াছে এবং দেশস্থ লোকেরা যদনুযায়ি কর্ম করিয়া থাকেন অথচ বোধ হয় না তাঁহারদিগের নিমিত্ত সর্বকর্তা পরমেশ্বর সুখের সৃষ্টি করিয়াছেন ঐ সকল নিয়ম পরিবর্তন করিতে হইবেক আমরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোকের স্থানে শুনিলাম সভার প্রধান কার্য এই যে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ চেষ্টা করিবেন এবং ব্রাহ্মণদিগের কুপরামর্শেতে শিশুকালাবধি বিধবার বিবাহ নিষেধ বিষয়ে যে কুসংস্কার হইয়াছে তাহাও বিনষ্ট করিতে হইবেক যদিও শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু হলধর মল্লিক স্বদেশীয় বন্ধুগণের উপকার-করণার্থ হিন্দু কলেজের সুশিক্ষিত সাহসিক যুবগণ যাঁহারা দোষের আকরসুদ্ধ উৎপাটন করিতে চাহেন তাঁহারদিগের ন্যায় নির্ভয়ে অবক্রপথে গমন করিতে পারিবেন না অথবা রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্যগণ যাঁহারা সাহস গোপন রাখিয়া অত্যন্ত সাবধানে চলে তাঁহাদিগের সঙ্গেও তুল্যাস্পর্ধ হইতে

* ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮, পৃঃ ৯৯৬

পারিবেন না তথাপি যদি ঐ বাবুরা জগতের আমূল কোমল স্বভাব সুন্দরীদিগের সুশিক্ষার দ্বারা উপকার করিতে পারেন তবে তাঁহারদিগের নিকট উত্তরকালীন লোকেরদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অনেক উপায় করিবেন আমরা জানি এতদ্দেশীয় ক্ষীণবুদ্ধি অবিবেচক অধিকাংশ লোকেরা এ বিষয়ে অনেক আপত্তি করিবেন কিন্তু এই বাবুদ্বয়ের ইহা স্মরণ করিতে হইবেক যে উপকৃত লোকের নিকট সৎকর্মের পারিতোষিক না পাইলেও মন তাঁহারদিগকে পারিতোষিক দিবেন কেননা যে দেশের লোকেরা মূর্খতা-প্রযুক্ত অন্যকৃত উপকার বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকেন তাঁহারদিগের উপকার কর্তা আপন মনেতেই সন্তুষ্ট হন এবিষয়ে আমরা অনেক লিখিতে পারিতাম স্থানাভাবপ্রযুক্ত তাহা পারিলাম না কিন্তু ইহা অবশ্য কহিতে হইবে যে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত হলধর মল্লিক জাতিনাশের ও ধর্মসভার ভয় ত্যাগ করিবেন ধর্মসভা কেবল এক দলবদ্ধ হইয়া লোকেরদিগকে ভ্রমের কলে চালাইতেছেন এবং অযৌক্তিক মত গ্রহণ করেন অতএব তাঁহারদিগের প্রতি ভয় ত্যাগ করিয়া সাহস পূর্বক আপনারদিগের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন তাহা হইলে এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণকে স্বাধীন করত মূর্খতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। জ্ঞানান্বেষণ।"

রাজনীতি-ক্ষেত্রে মতিলাল

মতিলাল রাজভক্ত ও উদারমতাবলম্বী ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক ভাব-বিলাসিতা বা নিছক্ তত্ত্বালোচনা পছন্দ করিতেন না। বাস্তবনিষ্ঠা তাঁহাকে প্রত্যেক বিষয়েই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত করিত। মন-গড়া অভাব-অভিযোগের দূরীকরণ-প্রার্থনা তিনি কখনও করেন নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, মুসলমান-শাসন অপেক্ষা ইংরেজ-শাসন অনেক উন্নত এবং ইংরেজ-শাসন দেশের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ; কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে, উহার অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে যে সকল হিন্দু ভদ্রলোক মিলিত হইয়া স্বদেশের উন্নতির জন্য চেষ্টিত ছিলেন, তিনি তাঁহাদের সহিত যোগ দেন। সে সময় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক নূতন সনন্দে কতকগুলি সুবিধা গ্রথিত করিবার জন্য এবং ঈর্ষা ও পরস্পরের প্রতি হিংসামূলক অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিবার নিমিত্ত টাউন

হলে যে সভা হয়, তাহাতে মতিলাল নিম্নলিখিত পত্রখানি সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ মহাশয়কে লেখেন*—

"To

Babu Ram Gopal Ghose

My Dear Sir,

I much regret that the nature of the indisposition, under which I am labouring for some days past, prevents my joining you at the meeting this evening. I beg, however, to express through you my cordial acquiescence in the feelings and sentiments of my countrymen in regard to the misstatements which have been made before the Committee of the House of Commons as to the jealousy and ill-feeling of the natives of India towards such of their body as are elevated to any high position in the administration of public duties, either in the Judicial, Revenue, or any other branch of the Government service. I can confidently speak from my own experience of years that our countrymen are not devoid of that national and patriotic feeling which is inherent in human nature; and it is certainly fallacious, and indeed opposed to common sense, to suppose that any man of the world should be blind to the peculiar advantages of any reformed system which would confer an everlasting boon on themselves and their descendants, and hence I consider the assertions made before the Committee referred to as totally groundless and imaginary. I heartily wish and trust that the highly praiseworthy efforts of my fellow-countrymen will prove successful in securing for them those blessings to which they are so justly laying a claim at the hands of the enlightened and benevolent Government under which we are living. I assure you that nothing will afford me a greater pleasure than to co-operate with you at all times in

* Life of Mutty Lall Seal, pp. 37-40.

any proceedings which the meeting shall propose to adopt, with a view to attain an accomplishment of their desire and laudable objects.

I remain, my dear Sir,
yours sincerely,
MUTTY LAL SEAL"

Colootollah,
29th July, 1853.

মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল-স্থাপনে জমিদান

সম্প্রতি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের যে শতবার্ষিকী হইয়া গেল, তাহার কার্য্য-বিবরণ গত ২৮এ জানুয়ারী ১৯৩৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণের ২৫ পৃষ্ঠায় মতিলালের একখানি চিত্র এবং মেডিকেল কলেজ-সংলগ্ন হাসপাতাল-প্রতিষ্ঠায় তাঁহার জমিদান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে :—

"The matter of constructing a large hospital, in connection with the college, which had been mooted and for which subscriptions had been raised for the last two or three years took a tangible form in this year* by the presentation of a large piece of ground in the vicinity of the college, by Baboo Mutty Lal Seal."

সুবলচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত "সরল বাঙ্গালা অভিধানের" ষষ্ঠ সংস্করণে মতিলাল শীলের জীবনীতে ৯৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত নিম্নলিখিত অংশ দ্বারাও এই জমিদানের সমর্থন দেখিতে পাই :—

"কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপন জন্য ইনি (মতিলাল শীল) বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করেন।"

মেডিকেল কলেজে ভারতবর্ষীয়দিগের জন্য তিনটি ওয়ার্ড আছে। ঐ তিনটির মধ্যে একটি "Mutty Lal Seal Ward." এ বিষয়ে উক্ত বিবরণীতে (The Centenary of the Medical College, Bengal) ৩৭ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত অংশ আছে :—

---

* In 1815 A.D.

"1. Pertub Ch. Sing Ward
(Donation Rs. 50,000/-)
2. The Sattya Charan Ghosal
Ward (Donation Rs. 10,000/-)
3. The Mutty Lal Seal Ward
(grant of land for hospital)"

চুণিলাল শীল দাতব্য চিকিৎসালয়

মতিলালের পুত্র চুণিলালশীলের দাতব্য ঔষধালয় ও Out-door Block সম্বন্ধে শতবার্ষিকী বিবরণে নিম্নলিখিত দুইটি অংশ আছে ঃ—

"Plans and Estimates for Choony Lal Seal's Dispensary at a cost of Rs. 12,000/-, were made. This was completed and opened on the 1st of July, 1880." p. 48

"Choony Lal Seal Out-door Block accommodates the Medical, Surgical and Venereal Departments.' p. 89

সংবাদপত্রে মতিলালের কথা

নিম্নলিখিত সংবাদ তিনটি "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" ২য় ভাগ হইতে এখানে উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

এই তিনটি সংবাদ "সমাচার দর্পণ" হইতে গৃহীত।

"এতদ্দেশীয় লোকের বদান্যতা।—আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে ধনাঢ্য দুই মহাশয় শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু মাধব দত্ত চিৎপুরস্থ নূতন রাস্তার নর্দমা কলুটোলার রাস্তা দিয়া মাঝের রাস্তা পর্যন্ত প্রস্তুতকরণের ব্যয় নিজে করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।" পৃঃ ২১৭

…"শুনিলাম যে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল কুষ্ঠ ব্যক্তিদিগের বাস নিমিত্ত মৃজাপুরে একটা স্থান দান করিয়াছেন"……পৃঃ ২৩৩

"বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা।—বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকানামক এক নূতন গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তদ্বিশেষে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ধর্মসভায় যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তদুত্তর যে ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হন তাহা ভাষার্থ সহিত মুদ্রাঙ্কিত

করাইয়া স্বজন সজ্জনগণকে প্রদান করিতেছেন। ঐ গ্রন্থের তাৎপর্য শূদ্র বৈষ্ণবসকল বিপ্রভক্তি বিপ্রসেবাই করিবেন নচেৎ ব্রাহ্মণ যে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন অথবা তাঁহার প্রসাদ ভোজন করিবেন এমত শাস্ত্র নাই এবং যুক্তি সিদ্ধও নহে এই বিষয়ে নানা শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে।" পৃঃ ১০৭

"প্রথমচরিতাষ্টক" গ্রন্থে মতিলালের উল্লেখ

রাণাঘাট বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত কালীময় ঘটক মহাশয় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে "প্রথম চরিতাষ্টক" গ্রন্থে "মতিলাল শীল" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি ১১ পৃষ্ঠা ব্যাপী। উক্ত প্রবন্ধ হইতে নিম্নলিখিত অংশ কয়টি উদ্ধৃত হইলঃ—"তিনি পরিশ্রমজনক এত অধিক কার্যে আসক্ত হইয়াছিলেন এবং তাহা এমন সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতেন যে, শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। সমুদয় কুঠির প্রাত্যহিক উপস্থিত কার্য সম্পন্ন করিয়া নিত্য নিত্য আয় ব্যয়ের হিসাব পরিষ্কার করিতেন। প্রতিদিন ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহিতেন 'নিত্য নিত্য হিসাব পরিষ্কার করিবার কারণ এই যে, কাহার নিকট কত দেনা এবং কাহার কত পাওনা, তাহা নিত্যই জানিতে পারি এবং যদি কেহ প্রাপ্য টাকা চাহে, তৎক্ষণাৎ দিতে পারি'।" পৃঃ ১০৭

* * *

"১২৩৬ সালে (১৮২৯ খৃঃ) যখন লর্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুর এই দেশের সতীদাহের প্রথা রহিত করেন, তখন এ দেশীয় কতকগুলি লোক সহগমনের সপক্ষে ও বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের বিপক্ষে কলুটোলায় একটি 'ধর্মসভা' স্থাপন করেন। সভার সভ্যগণ বহু দিয়া ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের সঙ্কল্প বিফল করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সভায় নিরন্তরই দলাদলি, জাতিচ্যুতি প্রভৃতি বিষয় লইয়া মহা গোলযোগ হইত। যে বৎসর মতি শীল পটলডাঙ্গায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন, সেইবার একদিন ধর্মসভায় উপস্থিত হইয়া, তিনি একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য এই ;– 'হে সভ্যগণ! আপনারা সর্বদা যে সকল আলোচনা ও

অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তদ্দারা কোন প্রকার ধর্ম সাধনই হইতেছে না। অতএব আপনারা এরূপে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে আপনাদের ধর্মসভার নাম সার্থক হয়, এতাদৃশ কার্যের অনুষ্ঠান করুন।' যাহাতে সভার ব্যয় হইতে দেশের অনাথ ও অক্ষমদিগের ভরণপোষণ হয়, সভ্যগণকে তাহার অনুষ্ঠান করিতে পরামর্শ দিলেন, কেবল তাঁহার যত্নে ও বিশিষ্ট সাহায্যে ঐ কার্য সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল।" পৃঃ ১১০

"যাহারা আত্ম ভরণপোষণে অসমর্থ,—যাহাদিগের ভরণপোষণ করিবার লোক নাই, কলিকাতাবাসী এমন শত শত লোক মতি শীলের দয়া ও দাতব্য গুণে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে লাগিল। কালক্রমে অন্যান্য দাতারা দানধ্যান বন্ধ করিলেন; ধর্মসভাও উঠিয়া গেল; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুশীল মতি শীলের দানশীল হস্ত পূর্ববৎ প্রসারিত রহিল। এই ব্যাপার ঘটিলে ১২৫৬ সালে (১৮৪৭ খৃঃ) তিনি আপনার বিষয় হইতে ঐ কার্যের এমন বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন যে, কলিকাতাবাসী অনেক নিরাশ্রয় দরিদ্র লোক অদ্যাবধি প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।" পৃঃ ১১০ ও ১১১

* * *

"মতি শীল এইরূপ সৎবিষয়ের অনুষ্ঠান ও আলোচনায় জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার অনেকগুলি অসাধারণ গুণ ছিল। কোন্ কর্ম কিরূপে করিলে কিরূপ ফল হইবে, তিনি পূর্বেই তাহা বুঝিতে পারিতেন। পূর্বাপর পর্যালোচনা না করিয়া কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। বুঝিবার দোষে কোন বিষয়ে কষ্ট পাইলে আর সেদিকে যাইতেন না। তিনি বিলক্ষণ সদ্ব্যয়ী ছিলেন; একটি পয়সাও অপব্যয় করিতেন না। তাঁহার নিত্য খরচের বাহুল্য হইলেও তাহাতে সামঞ্জস্য ছিল। কোন কারণ বশতঃ যদি কাহার প্রতি একবার বিদ্বেষ জন্মিত, জন্মাবচ্ছিন্নে আর তাহার সহিত কথা কহিতেন না। সম্পর্ক বিরুদ্ধ, বা যত বড় লোকই হউক, কাহাকেও ন্যায্য কথা বলিতে ছাড়িতেন না। যেমনই জটিল বিষয় হউক, আপনার বুদ্ধির দ্বারাই তাহার একরূপ মীমাংসা করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি এমন উত্তম ও অভ্রান্ত ছিল যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণও তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য করিতেন।

আচারভ্রষ্ট স্বধর্মত্যাগী কিম্বা ভাক্ত হিন্দুদিগের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন। জাতীয় ধর্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এবং হিন্দু ধর্মের প্রধান অনুষ্ঠান কর্মকাণ্ড সম্পাদন করিতে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কোন ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া শরণাগত হইলে, তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপনে চেষ্টা করিতেন। দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া কাঁতর হইতেন; পরোপকারে বিমুখ হইতেন না। যাহা বলিতেন কদাপি তাহার অন্যথা করিতেন না।" পৃঃ ১১২ ও ১১৩

"মতি শীল ক্রমে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। যখন কঠিওয়ালা সাহেবের কারবার বন্ধ হইয়া যায়, সেই সময়ে স্মিথসন্ সাহেবের কলিকাতা-স্থিত গঙ্গাতীরবর্তী ময়দার কল ক্রয় করেন। এই কল অতি অদ্ভুত পদার্থ; বাষ্পের বলে ইহার কার্য নির্বাহিত হইয়া থাকে। যে বাড়ীতে এই যন্ত্র স্থাপিত ছিল, গম আনিয়া সেই বাটীর স্থান বিশেষে রাখিয়া দিলেই কিছুকাল পরে রাশীকৃত প্রস্তুত ময়দা পাওয়া যায়,—আর কিছুই করিতে হয় না।" পৃঃ ১০৭ ও ১০৮

* * * *

"তিনি, যে স্মিথসন্ হোল্ডস্য়ার্থ সাহেবের কাছে কর্ম করিয়া উন্নত হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী দুঃখে পড়িয়া অনেক দিন দেশে ছিলেন। মতি শীল, তাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য অনেক পরিশ্রম—অনেক যত্ন ও অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, এমন কি বিবি ইংলণ্ডে গমন করিলে পর তিনি সেখানেও টাকা পাঠাইয়া দিতেন।" পৃঃ ১১৩

মতিলালের মৃত্যুকালীন উক্তি

হঠাৎ একদিন মতিলালের খুব অসুখ হয়। একদিন আকস্মিকভাবে এই অসুখে চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মতিলালের মৃত্যু হয়। ডাক্তার জ্যাকসন যখন জানাইলেন যে, তাঁহার জীবনের আর আশা নাই, তখন তাঁহার নিজের অনুরোধে তাঁহাকে সন্ধ্যাকালে তদীয় প্রতিষ্ঠিত গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২০ মে তারিখে (১২৬১ সালে) বেলা এক ঘটিকার সময় ৬৩ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

মৃত্যুর পাঁচ মিনিটে পূর্বে তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি মরিতে ভয় পাইতেছেন কি না? ইহাতে মতিলাল উত্তর করিলেন,—"ভয় কি, তাহা মতি এই পৃথিবীতে কখনও জানে নাই, এবং বিশ্বাস ও প্রার্থনা করে যে পরবর্তী জীবনেও সে তাহা জানিবে না।" মরিবার সময় তাঁহার সমুদয় মানসিক শক্তি সজাগ ছিল এবং তিনি শান্তভাবেই মৃত্যুকে বরণ করেন।

হীরালাল শীল

মতিলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র হীরালাল শীল মহাশয় একজন তীক্ষ্ণ ব্যবসাবুদ্ধি-সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষীয় বীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় অন্যতম অগ্রণী। নিম্নে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় হইতে তাঁহার বীমা কোম্পানী-প্রতিষ্ঠার বিবরণ উদ্ধৃত হইল।

৯ই কার্তিক মঙ্গলবার ১২৭২ সালের (ইং ২৪ অক্টোবর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ) সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে "ভারতবর্ষীয় লাইফ অ্যাসুরান্স কোম্পানী" স্থাপন-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"আমাদিগের পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে অল্প দিন হইল কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় লাইফ আসুরান্স কোম্পানী নামে এক কোম্পানী হইয়াছেন। কলিকাতায় অনেক ইউরোপীয় আসুরান্স কোম্পানী আছেন, তাঁহারা এ দেশীয়দিগের আয়ু ইন্সুয়র করেন না। এই অভিনব কোম্পানী এ দেশীয় লোকের জীবন ইন্সুয়র করিবেন। সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর, বাবু রামগোপাল ঘোষ এবং বাবু হীরালাল শীল প্রভৃতি ইহার অধ্যক্ষ। ইহারা কতদূর বিশ্বাসী লোক; তাহা এ দেশীয় কাহার অবিদিত নাই। কোম্পানীর মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ইহা ২০০০ অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশের মূল্য ৫০০ টাকা। এখন পর্যন্ত সমুদয় অংশ বিক্রীত হয় নাই। উদ্যোগকারীরা যতদূর জানেন, তাহাতে তাঁহারা বোধ করেন, ভবিষ্যতে ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে না। উদ্যোগকারীগণের উদ্দেশ্য অতি মহৎ তাহার কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণ পর্যন্ত এ দেশীয়েরা আয়ু ইন্সুয়র করার উপকারিতা অনুভব করিতে পারেন নাই। এতকাল এদেশে লাইফ আসুরান্স কোম্পানী

না থাকাই ইহার কারণ। দিন দিনই এ দেশীয় অধিকাংশ লোক রাজকার্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এমন কি এ দেশীয়েরা বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি স্বাধীন কার্য অপেক্ষা রাজকার্যকে অধিকতর গৌরবের বোধ করেন। সেই কারণ এ দেশীয় সুশিক্ষিত মাত্রেই রাজকার্যে লিপ্ত হইতেছেন। এ দেশীয়েরা সচরাচর যে সকল রাজকর্ম করিয়া থাকেন, তৎদ্বারা অধিক অর্থ প্রাপ্ত হন না যে, ভাবি উত্তরাধিকারীগণের ভরণপোষণের সংস্থান উত্তমরূপ রাখিয়া যাইতে পারেন। এ দেশীয় রাজকর্মচারীগণের আয়ানুরূপ ব্যয় করার অভ্যাস নাই। সুতরাং আমরা অনেক প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীর মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তানদিগকে ঋণজালে আচ্ছন্ন ও হাহাকার করিতে দেখিতে পাইয়াছি। অপরিমিতব্যয়িতানিবন্ধন যাহাদিগের নানাপ্রকার ব্যয় চলে, তাঁহারা অনায়াসে মাসে মাসে উক্ত কোম্পানীকে কিছু কিছু করিয়া প্রদান করিতে অক্ষম হইবেন না। আমাদিগের লাইফ আসুরান্স কোম্পানী এই প্রকার বিশৃঙ্খল লোকদিগের মহা উপকারের নিমিত্ত হইবে। এক্ষণ পর্যন্ত এই কোম্পানীর কার্যারম্ভ হয় নাই। সমুদয় অংশও এখন পর্যন্ত বিক্রীত হয় নাই। আমরা ভরসা করি, আমাদিগের সুশিক্ষিত বন্ধুগণ এই কোম্পানীর অংশ ক্রয় করিতে ত্রুটি করিবেন না। এতদ্দ্বারা কোম্পানীর অবশ্য লাভ হওয়ার সম্ভাবনা।"*

হীরালাল শীলের দান

৪ঠা আষাঢ়, সোমবার, ১২৬৩ সাল (ইং ১৬ই জুন ১৮৫৬) তারিখের সমাচার চন্দ্রিকায়, ৪৩৭০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয়-চতুর্থ কলমে পুণ্যশ্লোক মতিলাল শীল

---

* ১৭শ বর্ষ ১৩৪০ শ্রাবণ সংখ্যা সুবর্ণবণিক্ সমাচারে (পৃঃ ৪০১) স্বর্গীয় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ, তত্ত্বনিধি লিখিত "দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ভারতীয় বীমা কারবার" প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বা সমসাময়িককালে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ও কয়েকজন ইংরাজের পরিচালনায় Laudable Societies নামক একটি বীমা কোম্পানী পরিচালিত হয়। দ্বারকানাথ ঐ সময়ের আর একটি বীমা-প্রতিষ্ঠানেরও (Oriental Life Insurance Society) অংশীদার ও পরিচালক ছিলেন। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি অংশীদারী কারবার ছিল। দ্বারকানাথ ও কয়েকজন সওদাগর অংশীদার-সূত্রে ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। অলোচ্য "ভারতবর্ষীয় লাইফ আস্থরান্স কোম্পানীর" বিশেষত্ব—ইহার পরিচালকবর্গ সকলেই বাঙালী এবং ইহা একটি যৌথ কারবার।

মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র বাবু হীরালাল শীল মহাশয়ের বদান্যতা-বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আছে। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল ঃ—

"বাবু হীরালাল শীল

"সম্বাদ পত্র সম্পাদকদিগের অবশ্য কর্তব্য মহল্লোকদিগের সৎকীর্তি প্রকাশ পূর্বক যশোকীর্তন করেন তাহা হইলে তদ্দৃষ্টে অন্যের যশোলাভার্থে সৎকর্মে প্রবৃত্তি হইবেক। স্বর্গপ্রাপ্ত বাবু মতিলাল শীল বর্তমানে কলিকাতার ৺গঙ্গাপার রামকৃষ্ণপুরের মল্লিক বাবুদিগের প্রসিদ্ধ বাগান বাটী বাজার অন্যান্য ভূম্যধিকার আদালত শুদ্ধ সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যান, সেই সময়ে ঐ রামকৃষ্ণপুর নিবাসী মৃত উদয়চাঁদ চক্রবর্ত্তীর বাটী তাহার স্ত্রী স্বত্বে ভ্রাতুষ্পুত্রেরা উত্তরাধিকারী হইয়া বাবু মতিলাল শীলের নিকটে মূল্য লইয়া বিক্রয় করিয়া যায়, তদবধি শীল বাবুরা অধিকারী হইয়াছেন, কিন্তু ঐ মৃত উদয়চাঁদ চক্রবর্তীর বিধবা অনাথা স্ত্রী নিরাশ্রয়ী হইয়া ইতস্ত্যত স্থানাভাবে অবস্থান করে। সম্প্রতি বাবু মতিলাল শীলের উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র দয়াবান শ্রীমান্ হীরালাল শীল মহাশয় ঐ রামকৃষ্ণপুরস্থ উদ্যান ভ্রমণে গমন করাতে প্রাগুক্ত উদয়চাঁদ চক্রবর্তীর বিধবা অনাথিনী কোন আত্মীয় লোক সমভিব্যাহারে আসিয়া বাবু হীরালাল শীলের নিকটে আত্ম্য পরিচয়ে তাবদ্দুঃখ সজল নয়নে জানাইল। ঐ ভদ্রাসনখানি তাহার ভাশুরপুত্রেরা তাহার স্বত্ব গোপন পূর্বক বাবু মতিলাল শীলের নিকটে বিক্রয় করিয়া টাকা লইয়াছে, এইক্ষণে নিরাশ্রয়ী হইয়াছে। এই কথাতে তৎক্ষণাৎ বাবু হীরালাল শীল সেই পিতৃক্রীত ভদ্রাসন ঐ ব্রাহ্মণীকে দান করিলেন। না হবে কেন, বাবু মতিলাল শীলের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু হীরালাল শীল, শীল বাবুর অনাথিনী ব্রাহ্মণীর প্রতি এইরূপ বদান্যতা ভদ্রাসন দানে সংস্থাপণে ঐ গ্রামশুদ্ধ ভদ্রলোকেরা ধন্যবাদ আশীর্বাদ করিতেছেন এবং আমরাও তদধিক করি। বাবু হীরালাল শীল পঞ্চ ভ্রাতৃসহ দীর্ঘজীবী হইয়া পিতার অতুল সম্পত্তি ভোগ করুন।"

গভর্ণমেণ্টের সহিত হীরালাল শীলের মোকদ্দমা

১২৬৩ সলের ২১এ চৈত্র বৃহস্পাতিবার (ইং ২রা এপ্রেল ১৮৬৭ খৃঃ)

তারিখের সমাচার চন্দ্রিকায় (৫০২১ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলমে) হীরালাল শীল মহাশয়ের মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—

"গবর্ণমেণ্ট তথা বাবু হীরালাল শীল

"অত্র মহানগরীয় ধনিবর বাবু হীরালাল শীলের নামে আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ করেন। জকসন ঘাটের উত্তরাংশ ৺বাবু মতিলাল শীল ময়দা কলের সম্মুখে এতৎ পল্লীর বহু লোকের স্নানাদি গঙ্গাযাত্রিদিগের মহোপকারার্থে পাকা ঘাট বন্ধন করিয়াছেন। গঙ্গা ভরাট পতিত ঐ ভূমি শীল বাবু গবর্ণমেণ্ট হইতে জমা করিয়া লন, মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নগর রক্ষক সাহেবেরা ঐ ভূমি ঘাট সহিত কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিয়া ছিলেন। তাহাতে সুবুদ্ধি শীল বাবু সন ১৮৫২ সালের অক্টোবর মাসে গবর্ণমেণ্টকে এক অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দেন। তাহাতে সুপ্রীম কোর্টের মৃত জজ মেষ্টার জে পি গ্রাণ্ট সাহেব তথা তৎকালের এডবকেট জেনারেল বর্তমানাবস্থায় বিচারাপতি স্যর জেমস জাকসন সাহেব প্রভৃতি সাক্ষি ছিলেন। ঐ অঙ্গীকার পত্রের তাৎপর্য গবর্ণমেণ্ট যৎকালীন গঙ্গাতটে নূতন রাজপথ বন্ধন বা সাধারণ উপকারক ইনপুরুব করিবেন, তখন শীলবাবুরা ঐ ভূমি গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিবেন। বিলাতীয় সূক্ষ্ম চাতুর্য কে বুঝিতে পারে? ইহার কিছু দিবস পূর্বে গবর্ণমেণ্টের পোষ্য পুত্র মেষ্টর রো সাহেব নগরী শোভাকারী কমিশ্যনারদিগকে দিয়া বাবু মতিলাল শীলের উত্তরাধিকারি বাবু হীরালাল প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতাকে এক মাসের নিমিত্তে সময় দিলেন, ঐ ঘাট ছাড়িয়া দিবেন, না দিবাতে গবর্ণমেণ্ট এডবকেট জেনারেল এবং উকীল প্রতিনিধির দ্বারা ঐ শীল বাবুদিগের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ করিতে শীল বাবুরা কৌনস্থলি পিটরসন কৌনস্থলি ডাইনি সাহেবদিগকে প্রতিনিধি দিয়া ধর্মাধিকরণ স্থলে কাগজ এবং সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন। ঐ ভূমি অকারণ কেন পরিত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু হলে কি হয় রাজায় প্রজায় দরবার রাজদরবারে রাজার জয়, বৈ প্রজার জয় হয় কি? সহস্র অন্যায় করিলেও রাজা ন্যায় করিয়াছেন, অতএব কোর্টের জজ

সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের জয় জয়কার করিয়াছেন হীরালাল বাবুকে ঐ ঘাট ছাড়িয়া দিতে হইল এবং উভয় পক্ষীয় খরচা দিতে হইবেক, এইক্ষণে শুনিতেছি, শীলবাবুরা ঐ মোকদ্দমা বিলাত আপীল করিবেন, তথায় বা কি বিচার হয় দেখা যাইবেক।"

মতিলাল শীল মহাশয়ের তৃতীয় পুত্রের বিবাহ

২৭শে মাঘ, ১২৫৭ শনিবার (ইং ৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৫১) তারিখের সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে (পৃঃ ৪) নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—

"কলুটোলা নিবাসি বিখ্যাত ধনী শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল মহাশয় তাঁহার তৃতীয় পুত্রের বিবাহ দিলেন তদুপলক্ষে থালে থালে সন্দেশ ও শাড়ী বস্ত্র, বহুগুণা পরিপূর্ণ তৈল, এক এক চাঙ্গারীপূর্ণ অন্যান্য নানাপ্রকার দ্রব্যাদি নগরময় বিতরণ করিতেছেন। ইহাতে সকল লোকে শীল বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন কিন্তু শীল বাবুর এ দান সাধারণ দান, এতদপেক্ষা অসাধারণ দান যাহা প্রতি মাসে নূনাধিক তিন শত ভদ্রপরিবারকে ভরণ-পোষণ উপযুক্ত টাকা দিয়া প্রতিপালন করেন আমরা তাহাতেই পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল মহাশয় দীর্ঘায়ু অক্ষয় ধনাগারের উপর বিরাজমান থাকুন। ভাস্কর ২৫ মাঘ।"

মতিলাল শীলের কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ

১২৬৩ সনের ১০ই অগ্রহায়ণ, সোমবার (ইং ২৪শে নভেম্বর ১৮৬৫ খৃঃ) তরিখের সমাচার চন্দ্রিকায় (৪৭১৬ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে মতিলাল শীল মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ আছে ঃ—

"শুভবিবাহ

"অত্র মহানগর নিবাসী ধনরাশি ৺বাবু মতিলাল শীলের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল শীলের শুভ বিবাহ অত্র নগরীর সিঁন্দিরাপটী নিবাসী যশোরাশি বিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ মল্লিকের কন্যার সহিত অদ্য বাসরীয় রজনীতে হইবেক তদুপলক্ষে যোগ্যবর শ্রীযুক্ত হীরালাল শীল মহাশয়গণ কয়েক ভ্রাতা স্বশ্রেণী ব্রাহ্মণদিগকে এবং অত্র নগরবাসী মান্য

গণ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য ভদ্র ধনাঢ্য এবং স্বজাতিদিগকে এক এক ঘড়া ও শাটি ও থাল পরিপূর্ণ সন্দেশ বিতরণ করিয়াছেন, ইহা ব্যতীত অন্যান্য স্থান নিবাসী যে সকল ভদ্র ধনাঢ্যের সহিত প্রণয় আছে তাঁহাদিগকে ঐরূপে বিতরণ করিয়াছেন, এবং নৃত্যগীত নানাবিধ প্রকার উভয় বাটীতে হইতেছে, কলুটোলা অবধি সিঁন্দিরাপটী পর্যন্ত আলোকময় সুশোভিত হইবেক, এবং বাদ্যভাণ্ডতে মেলা হইতেছে বিবাহের নহবৎ ইত্যাদি বসিয়াছে, মহাসমারোহপূর্বক শুভবিবাহ নির্বাহ হইবেক।"

১২৬৩ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ সোমবার (ইং ১লা ডিসেম্বর ১৮৫৬ খৃঃ) তারিখের "সমাচার চন্দ্রিকায়" (৪৭৩২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলমে এবং ৪৭৩৩ পৃষ্ঠার ১ম কলমে) মতিলাল শীলের কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহের নিম্নলিখিত বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

"মহা সমৃদ্ধিপূর্বক শুভ বিবাহ

"স্বর্গগত বাবু মতিলাল শীল মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কানাইলাল শীলের শুভ বিবাহের দিবসেই আমরা সাঙ্গপাঙ্গ না দেখিয়া উদ্যোগ ব্যাপার সমাচার চন্দ্রিকাতে প্রকাশ করিয়া ক্ষোভ নিবারণ না হওয়াতে পুনর্বার বাহুল্য ব্যাপার লিখিতে হইল।

"সর্ব জ্যেষ্ঠ শ্রীমান্ হীরালাল শীল মহাশয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার শুভবিবাহ যেমন সমৃদ্ধি করিয়াছিলেন তৎকাল এমত দেখা যায় নাই। বিবাহের দশ দিবস থাকিতে সামাজিক এতন্নগর এবং অন্তর্গত নানা নগরস্থ পরিচিত মান্যগণ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের বাটীতে প্রমাণ পিত্তলের কলসী পূরিত তৈল, থাল পূর্ণ সন্দেশ, উত্তম শাটীবস্ত্র মাঙ্গল্য দ্রব্য সহিত ২০০০ দুই সহস্র এইরূপ প্রেরণ করিয়া থাকিবেন, তদ্ভিন্ন মাড়োয়ারী, আরমানী, মোগল, ভিন্ন জাতি সম্ভ্রান্তগণের বাটীতে মাঙ্গলিক দ্রব্য রজত থাল পূর্ণ, বাদাম, দ্রাক্ষা, খর্জুরী, ওল, কন্দক, উত্তম থাল আতোর গোলাপাদি প্রেরণ করেন, বণিক্ ব্রাহ্মণদিগের রজত বহুগুণা, বনাত, গরম বস্ত্র, মুষ্টি মুষ্টি টাকা, সামাজিকতা প্রদান করেন, শীল বাবুদিগের অনুগত আত্মীয় অমাত্য অন্যূন ২০০ দুই শত ব্যক্তিকে শাল রুমাল বিতরণ করেন, ভৃত্যদিগকে উত্তমোত্তম বনাতের পরিচ্ছদ রজত বলয়াদি অনেক দেন, দানের বিষয় আর কত লিখিব সং রং

বাদ্যভাণ্ড নৃত্যগীতামোদ আলোকের কাণ্ড সামান্য নহে। পটলডাঙ্গার চৌমাতা হইতে তূলা বাজারের চৌমাতা অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপিয়া ত্রিরাত্রি রাজপথের উভয় পার্শ্বে বান্ধা আলোকে লোকরঞ্জন করেন, ঐ কয়েক রজনী ব্যাপিয়া বরের বাটীতে নৃত্যগীতামোদের সভা হয় নগরীয় মান্যগণ্য বাঙালী ইংরেজ, মুসলমান, আর্মানী, পারসী, হিন্দুস্থানীয় মহাজনগণ, সিন্ধু দেশীয় আমীর মহামান্য ব্যক্তিদিগের সমাগম হয়। পরন্তু বিবাহের দিবসে বরের বাটী হইতে কন্যা কর্ত্তাদিগের বাটী পর্যন্ত অবিরল সং রং, পাহাড় পর্বত, বাষ্পীয়ার্ণবযান, কৃত্রিম ময়ূরপংক্ষী, ইংরেজী বাদ্য দল দল নানা শ্রেণীর বাদ্যভাণ্ড নানাকাণ্ড হইয়াছিল। সাধারণ লোকে রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ আলোককেই বান্ধা রোসনাই বলিয়া থাকে ; কিন্তু শ্রীযুত বাবু হীরালাল শীল কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহে যেমন বান্ধা আলোক করিয়াছিলেন, এমন আলোক কোন ধনিলোকেই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, এতন্নগর এবং বাহিরের মান্যগণ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ শোভাবাজারীয় শ্রীমন্মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর মহিষাদলাধিপতি রাজা বাহাদুর সিন্ধু দেশীয় মহামান্য আমীরগণ সম্ভ্রান্ত সদাগর ও কৌসুলী প্রভৃতি আত্মীয় সাহেবগণ অন্যূন দুই সহস্র বরযাত্রী সহ বরপতি কন্যাকর্ত্তার বাটী প্রবেশ করেন। এই সকল সম্ভ্রান্তগণের সহিত গাড়ী পাল্কী কত ঐশ্বর্য সমভিব্যাহারে ছিল সাধারণ বিবেচনা করিবেন। কন্যাকর্তা শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক মহাশয় ঐ সকল আগন্ত বরযাত্রীগণকে সম্মান পূর্বক কন্যাদানের তেমনি সভায় শোভায়মানা করেন অদ্য আর লিখিতে স্থান প্রাপ্ত হইলাম না।”

‘বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা’

১২৩৯ সালের ২৪এ বৈশাখ মতিলাল শীল মহাশয় এক পত্র লিখিয়া ধর্মসভার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে নিম্নলিখিত তিনটি প্রশ্ন করেন :—

১। শূদ্র বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নমস্য কি না ?

২। ঐ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলে ঐ ব্রাহ্মণ সেই বৈষ্ণবকে প্রণাম করিবেন কি না ?

বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা কলিকাতা নগরে
সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রেণাঙ্কিতা শকাব্দাঃ ১৭৫৪ ॥

বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকার মলাট

শ্রীশ্রী হরিঃ।

পরম পূজনীয় ধর্ম্মসভা সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।
সংখ্যাতীত প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনমিদং। আমি এক বিষয়ে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তৎসন্দেহ নিবারণার্থ ধর্ম্মসভায় প্রশ্ন করত উত্তর প্রাপ্ত্যাশয়ে এক প্রশ্নপত্র স্বনামাঙ্কিত করণপূর্ব্বক এতৎপত্র সমভিব্যাহারে মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিতেছি মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সমাজের রীত্যনুসারে বৈঠকদিবসে আমার প্রশ্ন তদধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে অবগত করাইবেন এবং এ অকিঞ্চনের প্রশ্নের যদ্যপি উত্তরপ্রদান করেন অথবা অগ্রাহ্যকরেন তাহাও লিপিদ্বারা অবগত করাইলে পরমাপ্যায়িত হইব ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি ২৪ বৈশাখ ১২৩৯ সাল।——

সেবক শ্রী মতিলাল শীলস্য

বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা

যাচক ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি কোপদৃষ্টিতে দেখেন তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ে যম সূচী আরোপণ করেন। এবং ব্রাহ্মণ যে গৃহে ভোজন করেন তদ্গৃহে ঐ ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতা পিতৃগণ এবং দেবর্ষি গণের ভোজন করা সিদ্ধ হয়, অপর কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত তীর্থ আছেন সে সকল তীর্থই ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পদে পাওয়া যায় ইত্যাদি।

পরন্তু নারদ পঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে বৈষ্ণবব্রাহ্মণ হইতে যে ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করেন তিনি কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হন ইহাতে সংশয় নাই। অপর মনু সংহিতাতে ব্যক্ত আছে ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিলে ঐ ব্রাহ্মণ যদি তাঁহাকে নমস্কার না করেন তবে তিনি শূদ্রতুল্য অনমস্য এবং বর্জ্জনীয় যে সকল কর্ম্ম তৎপ্রকরণে মনু কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তির কোন মন্দ অপবাদ আছে তাহার এবং ক্লীব ব্যভিচারিণী স্ত্রী এবং দাম্ভিকের অন্ন ভোজন করিবে না। অপর শুষ্ক এবং পর্য্যুষিত অন্ন ও শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ইহা ভোজ্য নহে।*।*॥ ইতি বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা সমাপ্তা ॥*।*।

বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকার শেষ পৃষ্ঠা

৩। শূদ্র বৈষ্ণবের প্রসাদ ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন কি না ?

শীল মহাশয়ের এই পত্রের উত্তরে ধর্মসভার পণ্ডিতবর্গ যে ব্যবস্থা প্রদান করেন, তাহাই পুথির আকারে ছাপাইয়া মতিলাল এই পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং ইহার নাম দেন "বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা।"

পুস্তিকাখানি ১০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহা তুলোট কাগজে পুথির আকারে পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

ইহার পাঁচশত কাপি ছাপাইয়া মতিলাল বিনামূল্যে সাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। পুস্তিকাখানি ১৭৫৪ শকাব্দে বা ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তিকাখানি প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য।

মতিলাল ও ভবানীচরণের মধ্যে যে পাঁচখানি পত্র-ব্যবহার হয়, সেগুলি পুস্তিকার ১—৩ পৃষ্ঠা মধ্যে স্থান পাইয়াছে। তারপর ৩ হইতে ১০ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রশ্ন তিনটির উত্তর বা তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থার শেষে শ্রীনিমাইচন্দ্র শর্মা, শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্মা, শ্রীজয়গোপাল শর্মা ও শ্রীহরনাথ শর্মা—এই চারিজন পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে। ব্যবস্থার প্রথমাংশ সংস্কৃত, দ্বিতীয়াংশ বঙ্গানুবাদ। মূল্যবান্ বিবেচনায় নিম্নে সমগ্র পুথিখানি উদ্ধৃত হইল—

"বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা কলিকাতা নগরে
সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রেণাঙ্কিতা শকাব্দাঃ ১৭৫৪ ॥
শ্রীশ্রীহরিঃ।

পরমপূজনীয় ধর্মসভা সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

সংখ্যাতীত প্রণতিপূর্বকং নিবেদনমিদং। আমি এক বিষয়ে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তৎসন্দেহ নিবারণার্থ ধর্মসভায় প্রশ্ন করত উত্তর প্রাপ্ত্যাশয়ে এক প্রশ্নপত্র স্বনামাঙ্কিত করণপূর্বক এতৎপত্র সমভিব্যাহারে মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিতেছি মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সমাজের রীত্যনুসারে বৈঠক দিবসে আমার প্রশ্ন তদধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে অবগত করাইবেন এবং এ অকিঞ্চনের প্রশ্নের যদ্যপি উত্তর প্রদান করেন অথবা অগ্রাহ্য করেন তাহাও লিপিদ্বারা

অবগত করাইলে পরমাপ্যায়িত হইব ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি ২৪ বৈশাখ ১২৩৯ সাল।

সেবক শ্রীমতিলাল শীলস্য

শ্রীশ্রীহরিঃ।

পরমকল্যাণভাজন ধার্মিক বিচক্ষণ শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল নিখিলকল্যাণালয়েষু আশীর্বাদপূর্বকং বিজ্ঞাপনীয়মিদং।

গত ২৪ বৈশাখ দিবসীয় লিখিত ভবদীয় প্রশ্নপত্র প্রাপ্ত হইয়া ধর্মসভায় ২৫ বৈশাখ রবিবারের বৈঠকে উক্তপত্র সহিত প্রশ্নত্রয় সভাধ্যক্ষমহাশয়দিগকে অবগত করিবাতে অধ্যক্ষমহাশয়রা যুষ্মৎপ্রশ্ন গ্রাহ্য করত উত্তর প্রদানে পণ্ডিতাধ্যক্ষমহাশয়দিগের প্রতি ভারার্পণ করিলেন তদুত্তর ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত্যনন্তর ভবৎসন্নিধানে প্রেরিত হইবেক ইত্যলং বিস্তরেণ লিপিরিয়ং বৈশাখস্য ষড়্‌বিংশতিদিবসীয়া শকাব্দাঃ ১৭৫৪।—

ধর্মসভাসম্পাদক শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্য

শ্রীশ্রীহরিঃ।

পরমকল্যাণীয় স্বধর্মপ্রতিপালক শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল সকলকুশলালয়েষু। আশীর্বাদপূর্বকং বিজ্ঞাপনমেতৎ বিশেষস্তেতাবান্।
সংপ্রতি গত ৮ শ্রাবণ রবিবার ধর্মসভার নিয়মিত বৈঠক হইয়াছিল ঐ বৈঠকে সমাজের পণ্ডিতাধ্যক্ষমহাশয়রা ভবৎপ্রশ্নের উত্তর ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষরপূর্বক প্রদান করিলে সভাস্থ সমস্ত সভাধ্যক্ষমহাশয়রা যুষ্মৎসন্নিধানে প্রেরণে অনুমতি করেন তদাজ্ঞানুসারে তৎপত্রের প্রতিলিপি রাখিয়া পণ্ডিতাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র নিকট প্রেরিত হইল প্রাপ্তোত্তরদানে বাধিত করিবেন ৯ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৫৪।—

ধর্মসভাসম্পাদক শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্য

শ্রীশ্রীহরিঃ।

পরমারাধ্য সমাচারচন্দ্রিকাযন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু। বহুবিধপ্রণতিপূর্বক নিবেদনমিদং।
আমি এক বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া ধর্মসভায় প্রশ্নকরণানন্তর তদুত্তর যে ব্যবস্থাপত্র পাইয়াছি তাহা আত্মীয় স্বজন সজ্জন বন্ধু বান্ধব গণসমূহ নিকটে

প্রেরণে ইচ্ছু হইয়াছি যেহেতু তাদৃশ সন্দেহ যদ্যপি কাহারো মনে উদয় হয় তবে উক্ত উত্তর দৃষ্টিপাত করিলে সে সন্দেহ নিপাত হইবেক অতএব ব্যবস্থাপত্র মুদ্রিত করণেচ্ছু হইয়া মহাশয়ের মত জানিতে বাঞ্ছা করিয়া ব্যবস্থাপত্র সহিত মদীয় ও সভাসম্পাদকের লিপির প্রতিলিপি নিকটে পাঠাইতেছি যদ্যপি মুদ্রাঙ্কিত করণে মহাশয়ের মত হয় তবে আপনমত এতৎ পত্রের সহিত ব্যবস্থাপত্র বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা নাম দিয়া ৫০০ পাঁচশত গ্রন্থ প্রস্তুত পূর্বক আমার নিকট প্রেরণ করিলে পরমাপ্যায়িতপুরঃসর চিরবাধিত হইব ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি ১৯ শ্রাবণ ১২৩৯ সাল।—

শ্রীমতিলাল শীলস্য

শ্রীশ্রীহরিঃ।

সকলমঙ্গলমন্দির ধার্মিকবর শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল বিচক্ষণাগ্রগণ্যেষু। আশীর্বাদপুরঃসর বিজ্ঞাপনমিদং ধর্মসভাধ্যক্ষ পণ্ডিত কর্তৃক যে ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা মুদ্রাঙ্কিত করণেচ্ছু হইয়া মদীয় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এতদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ মত আছে যেহেতু ঐব্যবস্থা সামান্যত নহে এক প্রকার সংহিতা বলা যায় কারণ অনেক শাস্ত্রের প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে ইহা প্রকাশে লোকোপকার আছে ইহাতে লোকোপকারি রূপে যশস্বী হইয়া বহুতর পুণ্যলব্ধ হইবেন ইতি শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৫৪।

শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্য

অথ প্রশ্নঃ।

অশেষশাস্ত্রাধ্যাপকশ্রীযুক্তধর্মসভাধ্যক্ষপণ্ডিতবর্গমহাশয়সমীপেষু। শূদ্রবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নমস্য কি না ঐ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলে ঐ ব্রাহ্মণ সেই বৈষ্ণবকে প্রণাম করিবেন কি না এবং শূদ্রবৈষ্ণবের প্রসাদ ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন কি না ইহার শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হইবেক।

ব্যবস্থাপত্রেণাস্যোত্তরং।

বৈষ্ণবশাস্ত্রসাত্ত্বিকপুরাণপ্রধানপদ্মপুরাণান্তর্গতক্রিয়াযোগসারে বৈষ্ণবানাং ক্রিয়াযোগধ্যানযোগরূপভগবদারাধনদ্বয়কথনানন্তরং ক্রিয়াযোগস্যাদ্যত্বকথনেন ধ্যানযোগপ্রাপকত্বং তস্যোক্ত্বা ক্রিয়াযোগস্য গঙ্গাশ্রীবিষ্ণুপূজাবিষ্ণুপ্রীত্যর্থদান-

বিপ্রভক্ত্যেকাদশীব্রতাদিস্বরূপত্বমুক্তং এবং বৈষ্ণবলক্ষণমপি বিপ্রভক্তিঘটিত-মুক্তমিত্যুভয়থাপি বিপ্রভক্ত্যা বিষ্ণুপ্রীতির্বৈষ্ণবত্বঞ্চ ভবতীতি ফলিতম্। এবম-ভক্ষ্যভোজনরহিতশূকরাপেক্ষয়া অভক্ষ্যভোজিগবোৎকৃষ্টত্বদৃষ্টান্তেন জিতেন্দ্রিয়-শূদ্রাপেক্ষয়া কুৎসিতাচারবিপ্রস্যোৎকৃষ্টত্বং সর্ববর্ণাপেক্ষয়া দ্বিজস্য পরমগুরুত্বং বিষ্ণুবুদ্ধ্যা নমস্যত্বং বিপ্রাণামেব পরস্পরগুরুত্বঞ্চোক্তম্। এবং বহুশাস্ত্রেষু ব্রাহ্মণস্য বিষ্ণুতনুত্বমুক্তম্। এবং বিপ্রপ্রত্যভিবাদনপরাঙ্মুখব্রাহ্মণস্যানভিবাদ্যত্বেন শূদ্রতুল্যত্বকথনাচ্ছূদ্রস্যানভিবাদ্যত্বং শূদ্রোচ্ছিষ্টভক্ষণমতিগর্হিতঞ্চ মনুনোক্তম্। এবং গুরোরেবোচ্ছিষ্টভক্ষণং শাস্ত্রাভিমতমিতি।

ততশ্চ বৈষ্ণবত্বনির্বাহিকা বিষ্ণুভজনক্রিয়াযোগাঙ্গস্বরূপা চ যা বিপ্রভক্তি-স্তৎপাত্রস্য সর্ববর্ণপরমগুরোর্বেদগ্রহণাদিনানাগৌরবিতস্য চ বিপ্রস্য স্ববৈষ্ণবত্ব-নির্বাহার্থং বিপ্রসেবকং শাস্ত্রোক্তবৈষ্ণবলক্ষণাক্রান্তমপি শূদ্রং প্রতি নমস্কর্তৃত্বং তদুচ্ছিষ্টভোক্তৃত্বঞ্চ যুক্তিশাস্ত্রয়োরত্যন্তাস্পর্শিত্বেন ন সংশয়বিষয়োঽপীতি কিমুত বিষ্ণুমূর্ত্যন্তরশঙ্করদ্বেষকারিশাস্ত্রানভিজ্ঞসম্প্রদায়ানুসারিশাস্ত্রোক্তবৈষ্ণবলক্ষণানা-ক্রান্তশূদ্রং প্রতি নমস্কর্তৃত্বং তদুচ্ছিষ্টভোক্তৃত্বঞ্চেতি বিদুষাম্মতং।

ন চৈবং ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা ইত্যাদিশাস্ত্রবচনেন অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ সাধুরেবেত্যাদিগীতান্তর্গতভগবদ্বচনাদিনা চ ভগবদ্ভক্তিমাত্রেণ শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণো ভবতীতি বাচ্যং সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহন্ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ইতি ভগবদ্গীতাবচনৈকবাক্যতয়া তেষাং বচনানাং নিষ্পাপত্ববোধকত্বাৎ শূদ্রস্য ভগবদ্ভক্তিপ্রযুক্তব্রাহ্মণত্বসাধকশা-স্ত্রাভাবাৎ শূদ্রযোনাবহংজাতো নাতোঽন্যদ্বক্তুমুৎসহে ব্রাহ্মীং হি যোনিমা-পন্নঃ সুগুহ্যমপি যো বদেৎ ন তেন গর্হ্যো বেদাত্মা তস্মাদেতদ্বদামি তে ইত্যাদিকস্য নিজশূদ্রযোন্যুৎপন্নত্বপ্রযুক্তবেদগুহ্যকথাকথনাসামর্থ্যপ্রকাশকস্য ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি পরমভাগবতবিদুরবাক্যরূপস্য মহাভারতোদ্যোগপর্বান্তর্গতস্য ভগবদ্ভক্তিমাত্রপ্রযুক্তব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তিবিরোধিশাস্ত্রস্যাপি সদ্ভাবাৎ এবম্ অস্য ব্রহ্মাসনং দত্তমস্মাভির্যদুনন্দন আয়ুশ্চাত্মা ক্লমং তাবদযাবৎ সত্রং সমাপ্যত ইত্যাদিকস্য বলরামকর্তৃকসূতগোস্বামিবধানন্তরং মুনিগণোক্তস্য পুরাণাদিকথ-নার্থব্রাহ্মণতুল্যত্বসম্পাদকমুনিগণকর্তৃকসূতসম্প্রদানকব্রহ্মাসনদানার্থকস্য ভগ-বদ্ভক্তিমাত্রপ্রযুক্তব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তিবিরোধিশ্রীমদ্ভাগবতদশমস্কন্ধীয়বচনস্য সম্ভবাৎ

এবং যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদযৎপ্রহ্বণাদযৎস্মরণাদপি ক্কচিৎ। শ্বাদোঽপি সত্তঃসবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাদিতি ভক্তিরামৃতসিন্ধুধৃত-শ্রীমদ্ভাগবততৃতীয়স্কন্ধীয়বচনস্য ভগবন্নামশ্রবণকীর্তনভগবন্নমস্কারস্মরণেভ্যঃ শ্বপচস্যাপি ব্রাহ্মণস্যেব যজ্ঞাদিকরণযোগ্যতায়া বোধকস্য শ্রীরূপগোস্বামিনা শ্বপচস্যাপি ভগবন্নামকীর্তনাদিতো দুর্জাত্যারম্ভকং প্রারব্ধমপি গতমেব কিন্তু শিষ্টাচারাভাবাৎ সাবিত্রং জন্ম নাস্তীতি ব্রাহ্মণকুমারাণাং সবনযোগ্যতাব-চ্ছেদকপুণ্যবিশেষময়সাবিত্রজন্মাপেক্ষাবদস্য জন্মান্তরাপেক্ষা বর্তত ইতি ভাবঃ স্যাদিত্যভিপ্রেতমিতি অতঃ প্রমাণবাক্যেঽপি সবনায় কল্পতে সম্ভাবিতো ভবতি নতু তদৈবাধিকারী স্যাদিত্যভিপ্রেতমিতি ব্যাখ্যানাচ্চ।

অত্র প্রমাণানি।—ক্রিয়াযোগসারে তৃতীয়াধ্যায়ে ব্যাস উবাচ। শরীরং মানুষং বিপ্র দুর্লভং চাত্র ভূতলে। ধীরঃ শরীরমাসাদ্য মোক্ষার্থং যোগমভ্যসেৎ। ক্রিয়াযোগধ্যানযোগাবুভৌ যোগৌ প্রকীর্তিতৌ। তয়োরাদ্যঃ ক্রিয়াযোগঃ কুর্বতঃ সর্বকামদঃ। গঙ্গা শ্রীবিষ্ণুপূজা চ দানানি দ্বিজসত্তম। ব্রাহ্মণানান্তথা ভক্তিং স্থিতিরেকাদশী হরেরিত্যাদি। শ্রীভগবানুবাচ। বৈষ্ণবানাং লক্ষণানি কল্পকোটিশতৈরপি। সম্যগ্বক্তুং ন শক্নোমি সংক্ষেপাচ্ছৃণু সত্তম। কামক্রোধ-বিহীনা যে হিংসাদম্ভবিবর্জিতাঃ। লোভদোষবিহীনাশ্চ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ। অমৎসরা দয়াযুক্তাঃ সর্বভূতহিতৈষিণঃ। সত্যোক্তিভাষিণশ্চৈব জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ। পিতৃভক্তা মাতৃভক্তা জ্ঞাতিপোষণতৎপরাঃ। ধর্মোপদেশিনশ্চৈব জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ। সমানং যে চ পশ্যন্তি ত্বাঞ্চ মাঞ্চ মহেশ্বরম্। কুর্বন্তি পূজামতিথেজ্ঞে য়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ। বেদবিদ্যানু-রক্তা যে বিপ্রভক্তিরতাঃ সদা। নপুংসকাঃ পরস্ত্রীষু জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ। একাদশীব্রতং যে চ ভক্তিভাবেন কুর্বতে। গায়ন্তি মম নামানি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ইত্যাদি। তত্রৈব বিংশত্যধ্যায়ে ব্রহ্মোবাচ। সর্বেষামেব বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ পরমো গুরুঃ। তস্মৈ দানানি দেয়ানি ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ। সর্বদেবাশ্রয়ো বিপ্রঃ প্রত্যক্ষত্রিদশো ভুবি। স তারয়তি দাতারং দুস্তরে বিশ্বসাগরে। ব্রাহ্মণ উবাচ। সর্ববর্ণগুরুর্বিপ্রস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সুরোত্তম। তেষাং মধ্যে তু কঃ শ্রেষ্ঠঃ কস্মৈ দানং প্রদীয়তে। ব্রহ্মোবাচ। সর্বেঽপি ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পূজনীয়াঃ সদৈব হি। অবিদ্যা বা সবিদ্যা বা নাত্র কার্য্যা বিচারণা।

স্তেয়াদিদোষলিপ্তা যে ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণোত্তম। আত্মভ্যো দ্বেষিণস্তে চ পরেভ্যো ন কদাচন। অনাচারা দ্বিজাঃ পূজ্যা ন চ শূদ্রা জিতেন্দ্রিয়াঃ। অভক্ষ্যভক্ষকা গাবঃ কোলাঃ সুমতয়োঽপি চ। অন্যোন্যগুরবো বিপ্রাঃ পূজনীয়াশ্চ ভূসুর। ব্রাহ্মণং প্রণমেদযস্তু বিষ্ণুবুদ্ধ্যা নরোত্তম। আয়ুঃ পুত্রাশ্চ কীর্তিশ্চ সম্পত্তিস্তস্য বর্ধতে। ন চ নৌতি দ্বিজং যস্তু মূঢ়ধীর্মানবো ভুবি। সুদর্শনেন তচ্ছীর্ষং হন্তুমিচ্ছতি কেশবঃ। কৃতদোষান্ দ্বিজান্ গাশ্চ ন দ্বিষন্তি বিচক্ষণাঃ। দ্বিষন্তি বাপি মোহেন তেষাং রুষ্টঃ সদা হরিঃ। যাচকান্ ব্রাহ্মণান্ যস্তু কোপদৃষ্ট্যা প্রপশ্যতি। সূচীপ্ররোপণং তস্য নেত্রয়োঃ কুরুতে যমঃ। ব্রাহ্মণো যদগৃহে ভুঙক্তে তদগৃহে কেশবঃ স্বয়ং। দেবতাঃ সকলা এব পিতরশ্চ সুরর্ষয়ঃ। কোটীব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তু সন্তি তীর্থানি যানি বৈ। তীর্থানি তানি সর্বাণি বিপ্রপাদস্য দক্ষিণ ইত্যাদি। নারদপঞ্চরাত্রনবমাধ্যায়ে। বিষ্ণুমন্ত্রং যো লভেচ্চ বৈষ্ণবাচ্চ দ্বিজোত্তমাৎ। কোটিজন্মার্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয় ইতি। মানবশাস্ত্রে—যো ন বেত্ত্যভিবাদস্য বিপ্রঃ প্রত্যভিবাদনম্। নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ। বর্জ্যপ্রকরণে। অভিশস্তস্য ষণ্ডস্য পুংশ্চল্যা দাম্ভিকস্য চ। শুষ্কং পর্য্যুষিতঞ্চৈব শূদ্রস্যোচ্ছিষ্টমেব চেতি চ। ধর্মসভাপণ্ডিতানাং শ্রীনিমাইচন্দ্রশর্মণাম্। শ্রীশম্ভুচন্দ্রশর্মণাম্। শ্রীজয়গোপাল-শর্মণাম্। শ্রীহরনাথশর্মণাম্।

এই ব্যবস্থাপত্রের ও প্রমাণের ভাষার্থ

বৈষ্ণবসম্মতশাস্ত্র সাত্ত্বিকপুরাণপ্রধান যে পদ্মপুরাণ তদন্তর্গত ক্রিয়াযোগ-সারে প্রথমতঃ কহিয়াছেন যে বৈষ্ণবসকল শ্রীশ্রীভগবদারাধনা নিমিত্ত ক্রিয়াযোগ ও ধ্যানযোগ করিবেন। ঐ উভয়যোগের মধ্যে প্রথমোক্ত যে ক্রিয়াযোগ তিনি ধ্যানযোগের প্রাপক। সেই ক্রিয়াযোগের লক্ষণ গঙ্গা ও শ্রীবিষ্ণুপূজা, বিপ্রভক্তি এবং একাদশীব্রতাদি। পরম বৈষ্ণবলক্ষণেও বিপ্র-ভক্তির আবশ্যকতা কহিয়াছেন অতএব ক্রিয়াযোগরূপে বিষ্ণুর আরাধনাতে এবং বৈষ্ণবলক্ষণেতে বৈষ্ণবের বিপ্রভক্তিকর্তব্যতা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। দ্বিতীয়, অভক্ষ্য-ভোজন-রহিত যে শূকর তদপেক্ষা অভক্ষ্যভোজী যে গো তিনি উৎকৃষ্ট এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ শূদ্রবৈষ্ণবাপেক্ষাও কুৎসিতাচারী যে ব্রাহ্মণ তিনি শ্রেষ্ঠ। তৃতীয়, সর্ববর্ণাপেক্ষা ব্রাহ্মণের

পরমগুরুত্ব আছে অতৎবচনতাৎপর্যাধীন বিবেচনার্হ হইতেছে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ বৈষ্ণব হইলেও ব্রাহ্মণের নমস্য কদাচ নহে বর্ণসঙ্করাদি বৈষ্ণবে কা কথা। চতুর্থ, বিষ্ণুস্বরূপ জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিবেক। পঞ্চম, ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের গুরু। ষষ্ঠ, ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশরীরস্বরূপ। সপ্তম, ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিলে ঐ নমস্কৃত ব্রাহ্মণ যদ্যপি তাঁহাকে নমস্কার না করেন তবে তিনি শূদ্র তুল্য অনমস্য হন এবিধায় স্পষ্টবোধ হইতেছে যে শূদ্রবৈষ্ণবও ব্রাহ্মণের নমস্য নহে। অষ্টম, শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন অত্যন্ত গর্হিত ইহা মনু কহিয়াছেন। নবম, কেবল গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজনের শাস্ত্র আছে তদ্ভিন্ন কাহারো উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবেক না। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি বৈষ্ণবেরও উচ্ছিষ্ট ভক্ষ্য নহে।

উক্ত তাবৎ প্রকরণ দ্বারা এই বোধ হইতেছে যে শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণব লক্ষণাক্রান্ত যে শূদ্র বৈষ্ণব তিনি আপন বৈষ্ণবতা রক্ষার্থ বিপ্রসেবাই করিবেন নচেৎ ব্রাহ্মণ যে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন কিম্বা তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবেন এমত যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা কোনপ্রকারেই সম্ভবে না যেহেতু ব্রাহ্মণ সকলবর্ণের পরমগুরু এবং বেদগ্রহণাদি নানা গৌরবযুক্ত অতএব শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণবলক্ষণাক্রান্ত শূদ্রবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নমস্য নন্ ইহা নিশ্চয়, ইহাতে বিষ্ণুর শরীরান্তরধারী যে শঙ্কর তাঁহার দ্বেষী এবং শাস্ত্রানভিজ্ঞ সম্প্রদায়ানুসারী ও শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণবলক্ষণরহিত যে শূদ্রবৈষ্ণব তাহার কথা আর কি কহিব।

যদ্যপি এমত কহ যে শাস্ত্রে কহিয়াছেন, ভগবানের ভক্ত যে ব্যক্তি তিনি শূদ্র নহেন এবং ভগবদ্গীতাতে ভগবানের বাক্য। আমাকে অনন্যভাবে যে ভজনা করে অতিদুরাচার হইলেও সে ব্যক্তি সাধু হয় এই প্রমাণ দ্বারা শূদ্রবৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণ জ্ঞান করা যাউক। উত্তর, তাহা কদাচ হয় না, কেন না, ঐ ভগবদ্গীতাতে অর্জুনের প্রতি ভগবান্ কহিয়াছেন যে তুমি সকলধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব অতএব শোক করিও না, এই প্রমাণ দ্বারা উক্ত ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা ইত্যাদি বচনমর্মার্থ এই যে ভগবানের ভক্ত হইলে নিষ্পাপী হয়, নতুবা শূদ্রত্ব দূর করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় এমত নহে। যদি বল ব্রাহ্মণত্বই

না হয় কেন। উত্তর, শূদ্র ভগবানের ভক্তিতে যে ব্রাহ্মণ হয় এমত শাস্ত্র নাই, বরঞ্চ ব্রাহ্মণত্ব না হয় এমত শাস্ত্র আছে। যথা, মহাভারতে উদ্যোগ-পর্বে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি পরমবৈষ্ণব বিদুর মহাশয় নানাধর্ম কথা কহিয়া পরিশেষে কহেন যে ইহার পর অন্য কথা আমার বক্তব্য নহে, যেহেতু সে সকল বেদবাক্য তাহাতে আমার অধিকার নাই, কারণ আমি শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ তিনিই বেদগুহ্য কথা কহিবার অধিকারী, যেহেতু ব্রাহ্মণই বেদাত্মা অতএব আমি তোমাকে এই পর্যন্ত কহিলাম। বিদুর মহাশয়ের এই কথা দ্বারা বোধ হইতেছে যে পরমভাগবত হইলেও শূদ্র কখন ব্রাহ্মণ হয় না, কেন না, বিদুর মহাশয়ের তুল্য বৈষ্ণব আর সম্ভবেনা, তিনিও ব্রাহ্মণ হন নাই। অপর শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধে কথিত হইয়াছে, সূতকে ব্রহ্মাসনোপবিষ্ট দেখিয়া বলরাম তাঁহাকে বধ করেন, তদ্দৃষ্টে মুনিগণ বলদেবের প্রতি কহিয়াছেন যে আমরা সূতকে ব্রাহ্মণতুল্যত্বসম্পাদক আসন প্রদান করিয়াছিলাম এবং পরমায়ুঃও তত দান করিয়াছিলাম, যাবৎ-কাল পর্যন্ত আমারদিগের এই যাগ সমাপন হয়। মুনিগণের এই বাক্য দ্বারা বোধ হইতেছে যে সূত ব্রাহ্মণ হন নাই। অপরঞ্চ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-ধৃত শ্রীভাগবতীয় তৃতীয় স্কন্ধের বচন, শ্রীভগবানের নাম স্মরণ শ্রবণ কীর্তন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিলে চণ্ডালও ব্রাহ্মণের ন্যায় যজ্ঞকর্তা হয়। শ্রীরূপ গোস্বামি এই বচনের ব্যাখ্যা করেন, যে চণ্ডালাদি ভগবানের নাম কীর্তনাদি করে তাহাতে চণ্ডালত্ব দূর হয়, কিন্তু সে ইহজন্মে ব্রাহ্মণ হইবেক না, যেহেতু শিষ্টাচার নহে, এবং যেমত অনুপনীত ব্রাহ্মণ বালক যজ্ঞকর্তা তাবৎ নহেন যাবৎ সাবিত্র-জন্ম অর্থাৎ উপনয়ন না হয়, তেমনি ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালও ইহজন্মে যজ্ঞকর্তা না হইয়া পরজন্মে ব্রাহ্মণ হইয়া যজ্ঞকর্তা হইবেন, যেহেতু ঐ বচনেই উক্ত চণ্ডালকে যজ্ঞকর্তৃরূপে কল্পনা করিয়া নিষ্পাপরূপে প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রমাণ বচনার্থ

পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসারের তৃতীয়াধ্যায়ে ব্যাসদেব কহিয়াছেন যথা, এই ভূতলে মানবদেহ পাওয়া দুর্লভ, অতএব সেই শরীর প্রাপ্ত হইয়া ধীরবর্গ মোক্ষার্থ যোগাভ্যাস করিবেন। এই যোগ দুই প্রকার ক্রিয়াযোগ

ও ধ্যানযোগ, পরন্তু ক্রিয়াযোগ ধ্যানযোগের অগ্রে কর্তব্য অর্থাৎ ক্রিয়াযোগের পরিপাক হইলে ধ্যানযোগে অধিকার হয়, এবং ঐ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠানে সকল অভিলাষও পূর্ণ হয়। অপর সেই ক্রিয়াযোগের লক্ষণ এই কহিয়াছেন যে গঙ্গা ও শ্রীবিষ্ণু পূজা, দান, ব্রাহ্মণে ভক্তি এবং একাদশীতে উপবাস ইত্যাদি।

অপর ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের উক্তি। যথা, কোটিকল্পশতেও সম্যক্‌প্রকারে বৈষ্ণব-লক্ষণ আমি কহিতে শক্ত নহি অতএব সংক্ষেপে কহি শ্রবণ কর, কাম ক্রোধ হিংসা দম্ভ লোভ ও মোহ বিহীন যে সকল ব্যক্তি তাঁহারা বৈষ্ণব। এবং মাৎসর্যশূন্য দয়ালু সকলপ্রাণির হিতাচরণে রত ও সত্যবাদী ব্যক্তিরা বৈষ্ণব। এবং পিতৃমাতৃভক্ত জ্ঞাতি-পোষণকর্তা ও ধর্মের উপদেশক যিনি তিনি বৈষ্ণব। এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব অভেদজ্ঞানী অতিথিসেবাতে তৎপর বেদবিদ্যাভ্যাসে অনুরক্ত ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্ ও পরদারে নপুংসক ব্যক্তিরা বৈষ্ণব। এবং যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে একাদশী ব্রত করেন তাঁহাকে বৈষ্ণব কহা যায়। এবং যাঁহারা বিষ্ণুনাম গান করেন তিনি বৈষ্ণব ইত্যাদি কহিয়াছেন।

অপর ক্রিয়াযোগসারের বিংশতি অধ্যায়ে কোন ব্রাহ্মণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি। যথা, সকল বর্ণের পরমগুরু ব্রাহ্মণ অতএব শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণে দান করিবে যেহেতু ব্রাহ্মণশরীর সকল দেবতার বাসস্থান এবং ব্রাহ্মণ প্রত্যক্ষদেবতা, তাঁহাতে যেজন দান করে তিনি দুস্তর সংসার পার হইতে পারেন। এই বাক্যে ব্রহ্মার প্রতি ব্রাহ্মণের জিজ্ঞাসা। সকল বর্ণের গুরু যে ব্রাহ্মণ তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে কাহাতেই বা দান করিবেক। তাহাতে ব্রহ্মার উত্তর। ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ বা বিদ্যাশূন্য হইলেও শ্রেষ্ঠ ও সর্বদা পূজনীয়। অপর ব্রাহ্মণ যদি চৌর্যাদি দোষে দোষী হন তথাপিও অন্যের পূজ্য, যেহেতু চৌর্যাদি দ্বারা যে পাপ হয়, তাহা তাঁহাকেই স্বয়ং ভোগ করিতে হইবে, এবং যেমন অভক্ষ্য ভোজন করেন যে শূকর তদপেক্ষা অভক্ষ্য ভক্ষক গোও উৎকৃষ্ট, তেমন জিতেন্দ্রিয় শূদ্রাপেক্ষা কুৎসিতাচারী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। এবং ব্রাহ্মণেরি গুরু ব্রাহ্মণ ও পূজ্য, অপর ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি বিষ্ণুবুদ্ধিতে প্রণাম করেন তাঁহার আয়ুঃ, পুত্র, কীর্তি ও সম্পদের বৃদ্ধি

হয়। আর ব্রাহ্মণকে যে মূঢ় প্রণাম না করে, সুদর্শন চক্র দ্বারা শ্রীহরি তাহার মস্তক ছেদন করিতে ইচ্ছা করেন। এবং ব্রাহ্মণ ও গরু যদ্যপিও অপরাধ করেন তবে তাঁহারদিগের প্রতি পণ্ডিতবর্গ দ্বেষাচারী হন না, যেহেতু মোহপ্রযুক্ত দ্বেষ করিলেও দ্বেষকারির প্রতি হরির ক্রোধ জন্মে। এবং যাচক ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি কোপদৃষ্টিতে দেখেন তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ে যম সূচী আরোপণ করেন। এবং ব্রাহ্মণ যে গৃহে ভোজন করেন, তদ্গৃহে ঐ ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতা পিতৃগণ এবং দেবর্ষিগণের ভোজন করা সিদ্ধ হয়, অপর কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত তীর্থ আছেন, সে সকল তীর্থই ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পদে পাওয়া যায় ইত্যাদি।

পরন্তু নারদ পঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে বৈষ্ণবব্রাহ্মণ হইতে যে ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করেন, তিনি কোটিজন্মার্জিত পাপ হইতে মুক্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই। অপর মনু সংহিতাতে ব্যক্ত আছে, ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিলে ঐ ব্রাহ্মণ যদি তাঁহাকে নমস্কার না করেন তবে তিনি শূদ্রতুল্য অনমস্য। এবং বর্জনীয় যে সকল কর্ম তৎপ্রকরণে মনু কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তির কোন মন্দ অপবাদ আছে তাহার এবং ক্লীব, ব্যভিচারিণী স্ত্রী এবং দাম্ভিকের অন্ন ভোজন করিবে না। অপর শুষ্ক এবং পর্যুষিত অন্ন ও শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ইহা ভোজ্য নহে ।*।*॥ ইতি বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা সমাপ্তা ॥*।*।"

'শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-ভক্তি-কৌমুদী'

এই পুস্তিকা ১৭৫৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার পাষণ্ডদলন যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা পুথির আকারে, দেশী তুলোট কাগজে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮টি করিয়া পংক্তি আছে। গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীভৈর*চন্দ্র দত্ত।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পূর্বে স্বর্গীয় মতিলাল শীল মহাশয় "বিপ্রভক্তি-চন্দ্রিকা" নামে দশ পৃষ্ঠাব্যাপী এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। আলোচ্য পুস্তিকা শীল মহাশয়ের পুস্তিকার প্রতিবাদ।

---

* ভৈর বোধ হয় ভৈরব হইবে; ইহা বোধ হয় ছাপিতে ভুল হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-ভক্তি-কৌমুদী পাঠেও জানা যায়—মতিলাল সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে পাঁচশত কাপি বিপ্রভক্তি-চন্দ্রিকা মুদ্রিত করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। এই পুস্তিকার দশ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রথম তিন পৃষ্ঠা, মতিলালের সহিত ধর্মসভা-সম্পাদক মহাশয়ের বিপ্রভক্তি সম্বন্ধে যে উত্তর-প্রত্যুত্তর হয়, তাহাতেই পূর্ণ; বাকী সাত পৃষ্ঠা "পরম পূজনীয় ধর্মসভাধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাশয়দিগের সংস্কৃত ব্যবস্থা ও তৎপ্রমাণ এবং তদর্থের ভাষা লিখনে পূর্ণ হইয়াছে"। *

১২৩৯ সালের ১৯ এ শ্রাবণ মতিলাল ধর্ম্মসভার সম্পাদক মহাশয়কে তিনটি প্রশ্ন করিয়া একখানি পত্র লিখেন। তাঁহার প্রশ্ন তিনটি এই ঃ—

১। শূদ্রবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নমস্য কি না?

২। ঐ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলে ঐ ব্রাহ্মণ সেই বৈষ্ণবকে প্রণাম করিবেন কি না?

৩। শূদ্রবৈষ্ণবের প্রসাদ ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন কি না?

এই প্রশ্ন তিনটির উত্তরে ধর্মসভার পণ্ডিত মহাশয়েরা লেখেন ঃ—

১। শূদ্রবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নমস্য নহেন।

২। শূদ্রবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নমস্কার করিবেন না।

৩। ব্রাহ্মণ শূদ্রবৈষ্ণবের প্রসাদ ভোজন করিতে পারেন না।

প্রমাণ-স্বরূপে তাঁহারা শাস্ত্র হইতে কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় শীল মহাশয় সঙ্কলিত বিপ্রভক্তি-চন্দ্রিকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ভৈরববাবু (?) পণ্ডিত মহাশয়গণের এই ব্যবস্থায় সন্দিগ্ধ হইয়া আলোচ্য পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাখানি প্রায় একশত তিন বৎসর পূর্বে মুদ্রিত, শীল মহাশয়ের 'বিপ্রভক্তি-চন্দ্রিকা' গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ার পরই ইহা প্রকাশিত হয়।

অনুসন্ধানে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে অনুমিত হয় যে এই ভৈরব বাবুর বাটী কলুটোলা ষ্ট্রীটের উপর, মতিলাল শীল মহাশয়ের

---

* শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-ভক্তি-কৌমুদী, পৃঃ ২

বাটীর কিঞ্চিৎ দক্ষিণে। তিনি স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র দত্ত (কলুটোলা ষ্ট্রীট ও কলেজ ষ্ট্রীটের সংযোগ-স্থলে যাঁহার বাজার ছিল, এখন ঐ স্থান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দখল করিয়াছেন এবং ঐ স্থানের উপর আশুতোষ বিল্ডিং নির্মিত হইয়াছে) মহাশয়ের খুল্লতাত। সুবর্ণবণিক্-গ্রন্থকার রচিত যে সমস্ত মুদ্রিত পুস্তক বা পুস্তিকা অদ্যাবধি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন। মূল্যবান্ বিবেচনায় সমগ্র পুস্তিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-ভক্তি-কৌমুদী

কলিকাতাপাষণ্ডদলনযন্ত্রেণাঙ্কিতা।

শকাব্দাঃ।১৭৫৪।

শ্রীশ্রী৺গুরুজিউ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞান তিমিরে থাকে ঢাকিয়া নয়ন।
জ্ঞানশলা দিয়া যিনি করেন উদ্‌ঘাটন॥
এইরূপে চক্ষু দেন যেই গুণধাম।
অগ্রে করি সেই গুরু চরণে প্রণাম॥

কিয়দ্দিবস হইল এতন্নগরস্থ শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল মহাশয় বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকানামে প্রাচীন পুস্তাকাকৃতি এক পুস্তক চন্দ্রিকা যন্ত্রে প্রায় পাঁচশত মুদ্রাঙ্কিত করিয়া জনগণ সন্নিধানে বিতরণ করিয়াছেন সর্বসুদ্ধা দশ পত্র পরিমিত বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকার প্রথম তিন পত্র পরম পূজনীয় ধর্মসভা সম্পাদক মহাশয়ের সহিত পূর্বোক্ত বাবুর পত্রদ্বারা এতদ্বিষয়ে যে উত্তর প্রত্যুত্তর তাহা-(১) তেই পরিপূর্ণ হয় অপর সপ্তপত্র পরম পূজনীয় ধর্মসভাধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাশয়দিগের সংস্কৃত ব্যবস্থা ও তৎপ্রমাণ এবং তদর্থের ভাষা লিখনে পূর্ণিত হইয়াছে এই পুস্তকাবলোকনে বিজ্ঞ হিন্দু মহাশয়েরা শীল বাবুকে অবশ্য ধন্যবাদ করিবেন যে হেতুক বাবু ঐ পুস্তকের নাম বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা রাখিয়া পরমকারুণিক ব্রাহ্মণগণের শ্রীচরণে স্বীয় নিশ্চলাভক্তির বিজ্ঞাপন করিয়াছেন অতএব তিনি যে বিপ্রভক্ত ইহাতে সন্দেহ নাই। এবং লোকেরা কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইলে যাবৎকাল তাহার সদুত্তর না পান তাবৎ পর্যন্ত

দুঃখিত থাকেন যেহেতু সন্দেহ মাত্রই দুঃখের কারণ ঐ বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকার আদি পত্রে শীল মহাশয় যে তিন প্রশ্ন করিয়াছেন এতদ্বিষয়ে যদ্যাপি আর কেহ সন্দিগ্ধ হন তবে সচরাচর ইহার সদুত্তর না পাওয়াতে দুঃখান্বিত হইবেন অতএব শীল মহাশয় প্রশ্নোত্তর সংগৃহীত ঐ পুস্তক প্রস্তুত করিয়া দেশে বিদেশে প্রেরণ করিয়াছেন এপ্রযুক্ত তাঁহাকে পরম দয়ালু অবশ্য কহিতে হইবেক যেহেতুক পরদুঃখাপহরণেচ্ছার নাম দয়া। এবং ঐ পুস্তক বিতরণ করণ জন্য তাঁহার অগ্রণ্য সৌজন্য প্রকাশ হওয়াতে শীল মহাশয় যে যথো-(২) চিতব্যয়শীল ইহাও প্রতিভাত হইতেছে নতুবা তিনি ব্যয়কুণ্ঠ হইলে স্বীয় ধন ব্যয় করিয়া পুস্তক প্রস্তুত করত কদাপি বিতরণ করিতেন না অতএব সর্বপ্রকারে ঐ সুশীল শীলবাবু বিজ্ঞসমূহের প্রশংসার যোগ্য হন নতুবা ১২৩৯ সালের ১৯ শ্রাবণে পরম পূজনীয় ধর্মসভা সম্পাদক মহাশয়কে বহুতর প্রণতি পূর্বক এমৎ পত্র লিখিতেন না যাহা বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকার দ্বিতীয় পত্রে যন্ত্রিত হইয়াছে। বাবুক্তি যথা। আমি এক বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া ধর্মসভায় প্রশ্ন করণানন্তর তদুত্তর যে ব্যবস্থাপত্র পাইয়াছি তাহা আত্মীয়স্বজন সজ্জন বন্ধুবান্ধবগণ সমূহ নিকটে প্রেরণেচ্ছু হইয়াছি যদিও তাদৃশ সন্দেহ যদ্যাপি কাহারো মনে উদয় হয় তবে উক্ত উত্তর দৃষ্টিপাত করিলে সে সন্দেহ নিপাত হইবেক অতএব ব্যবস্থাপত্র মুদ্রিত করণেচ্ছু হইয়া ইত্যাদি। ধর্মসভার প্রতি বাবুর তিন প্রশ্ন এই যে 'শূদ্রবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নমস্য কি না ঐ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলে ঐ ব্রাহ্মণ সেই বৈষ্ণবকে প্রণাম করিবেন কি না, এবং শূদ্র-বৈষ্ণবের প্রসাদ ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন কি না' ইতি। ইহাতে ব্যবস্থা পত্রের দ্বারা পরম পূজনীয় ধর্মসভাধ্যক্ষ পণ্ডিত (৩) মহাশয়েরা যে প্রত্যুত্তর লেখেন তাহার স্থূল তাৎপর্য এই যে শূদ্রবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নমস্য নহেন, এবং শূদ্রবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নমস্কার করিবেন না, এবং শূদ্রবৈষ্ণবের প্রসাদ ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন না ইতি। ইহার প্রমাণ কয়েক বচনও ঐ পুস্তকে তাঁহারা লিখিয়াছেন ইহাতেও আমার সংশয় দূর না হইবায় অগত্যা ধর্মসভাধ্যক্ষ মহাশয় বর্গের প্রতি আমার কিঞ্চিদ্বক্তব্য হইল ভরসা করি যে পূর্বোক্ত পণ্ডিত মহাশয়েরা কৃপাবলোকন পূর্বক আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যথার্থ সিদ্ধান্ত লিখিয়া আপ্যায়িত করিবেন।

এতদ্বিষয়ে প্রথমত আমার বক্তব্য এই যে প্রাগুক্ত শীল মহাশয় যে প্রশ্ন আদৌ করেন 'শূদ্রবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নমস্য কি না' ইহাতে জিজ্ঞাস্য তিনি শূদ্রবৈষ্ণব কাহাকে কহেন যদ্যপি আমি শূদ্রজাতি এমৎ জ্ঞানবান অথচ বিষ্ণুমন্ত্র জাপক ও গৃহ ধর্মোচিত যাগাদি কর্মে আবৃত এবং শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণব লক্ষণাক্রান্ত মনুষ্যকে শূদ্রবৈষ্ণব কহেন আর ঐ শূদ্রবৈষ্ণব নমস্য কি না ইহাই প্রশ্নকর্তার অভিপ্রায় হয় তবে নিরুক্ত পণ্ডিত মহাশয়েরা ব্যবস্থাপত্রের দ্বারা যে উত্তর লিখিয়াছেন তাহা (৪) সিদ্ধান্তোপযোগী বটে কেন না গৃহাশ্রমের তাবদ্ধর্মাবৃত শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণব ধর্ম রহিত কেবল বিষ্ণুমন্ত্র জাপক ক্ষত্রিয়াদি চণ্ডাল পর্যন্ত বহুজাতীয় মনুষ্য আছেন তাঁহারদিগকে যে ব্রাহ্মণেরা নমস্কার করিবেন যুক্তি ও শাস্ত্রদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় না এবং ব্রহ্মা অবধি এপর্যন্ত ইহাও শ্রুত হয় নাই যে ঐরূপ বৈষ্ণবকে কোন ব্রাহ্মণ প্রণাম করিয়াছেন অতএব ঐ সকল বৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণের নমস্য নহেন ইহা আমারও স্বীকার্য। কিন্তু পূর্বোক্ত বাবুজির অভিপ্রায় যদ্যপি এইরূপ হয় যে জাতি বিহিত তাবদ্ধর্ম পরিত্যাগী অথচ শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণব লক্ষণাক্রান্ত এমৎ শূদ্র-কুলোদ্ভব বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণের নমস্য কি না, তবে ধর্মসভাধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাশয়দিগের ব্যবস্থাপত্র শীল মহাশয় কৃত প্রশ্নের সিদ্ধান্তোপযোগী কি প্রকারে হইতে পারে। কেননা শাস্ত্রে লেখে উপরি উক্ত বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অত্র প্রমাণং যথা—নির্বাণমোক্ষদ্বারে উর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে ভগবতীং প্রতি মহাদেববাক্যম্। সর্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরমিত্যাদি। অর্থাৎ গৃহাশ্রমে সমুদয় বর্ণাপেক্ষা বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ উত্তম কিন্তু তদপেক্ষাও বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। এবং পদ্মপুরাণেও ভগবতীকে কহিয়া (৫) ছেন যথা। আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। ততঃ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্॥ অর্থাৎ সমস্ত আরাধনা হইতে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ কিন্তু তদপেক্ষাও বৈষ্ণবগণের অর্চনা করা অতিশয় শ্রেষ্ঠ। এবং ক্রিয়াযোগসারে ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবান কহিয়াছেন যথা। সংসারো বৈষ্ণবাধীনো দেবা বৈষ্ণবপালিতাঃ। অহঞ্চ বৈষ্ণবাধীনস্তস্মাৎ শ্রেষ্ঠাশ্চ বৈষ্ণবাঃ॥ অর্থাৎ এই সংসার বৈষ্ণবের অধীন এবং দেবতারাও বৈষ্ণব কর্তৃক পালিত হন আর আমিও বৈষ্ণবের অধীন অতএব বৈষ্ণব সর্বাপেক্ষা

প্রধান। অপিচ। শিবলিঙ্গসহস্রাণি শালগ্রামশতানি চ। দ্বাদশকোটি-বিপ্রাণামেকঃ শ্বপচবৈষ্ণবঃ॥ অর্থাৎ একজন চণ্ডালও যদ্যাপি বৈষ্ণব হন তথাপি সহস্র শিবলিঙ্গ ও একশত শালগ্রাম এবং দ্বাদশ-কোটি ব্রাহ্মণের তুল্য হন ইহাতে বিজ্ঞমহাশয়েরা বিবেচনা করিয়া দেখুন একজন চণ্ডাল-কুলোদ্ভব বৈষ্ণবও যদ্যাপি উপরি লিখিত তাবতের প্রধান বা তত্তুল্য হইলেন তবে শূদ্র-কুলোদ্ভব যথার্থ বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের নমস্য কি প্রকারে না হইতে পারেন। এবং সর্বাপেক্ষা বৈষ্ণব-পদ যদ্যাদি উত্তম না হইবে তবে যে ব্রহ্মার কল্পিত বেদ (৬) পাঠ ও ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্ম ইত্যাদি গৌরবে ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়েরা বর্ণমাত্রের গুরু হইয়াছেন সেই ব্রহ্মাকে বৈষ্ণব হইতে শ্রীভগবান্ কদাপি আজ্ঞা করিতেন না। ইহার প্রমাণ যথা পাদ্মে—বৈষ্ণবেষু গুণাঃ সর্বে দোষলেশো ন বিদ্যতে। তস্মাচ্চতুর্মুখ ত্বং হি বৈষ্ণবো ভব সম্প্রতি॥ অর্থাৎ বৈষ্ণবের শরীরে দোষ মাত্রও নাই তাঁহাদের শরীরে যে যে ধর্ম আছে সে সমস্তই গুণ অতএব হে, চতুর্মুখ, এইক্ষণে তুমিও বৈষ্ণব হও। এবং যে বৈষ্ণবকে দেবতারা নমস্কার করিয়াছেন বিপ্রমহাশয়েরা তাঁহাকে নমস্কার করিবেন ইহার আশ্চর্য কি দেবতার নমস্য বস্তু ব্রাহ্মণের নমস্য অবশ্য হইতে পারেন বৈষ্ণব যে দেবতার নমস্য ইহার প্রসিদ্ধ প্রমাণ কাশীখণ্ডের বচন যথা। হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্য মর্ত্যান্ হরিগুরুপরায়ণান্নমস্করোমি। অর্থাৎ বিষ্ণুভজনবিহীন মনুষ্যকে দমন করিয়া বিষ্ণুপরায়ণ মনুষ্যকে আমি প্রণাম করি। অপরঞ্চ হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে শিববাক্যম্—পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃপিতৃবন্মাতৃবদ্ধরিম্। যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥ অর্থাৎ পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা এবং পিতামাতা ইত্যাদির ন্যায় যাহারা নারায়ণকে ভাবনা করেন তাঁহা(৭)রদিগকে নমস্কার ২। এতদ্ভিন্ন বৈষ্ণবকে যে দেবতারা প্রণাম করিয়াছেন বহু গ্রন্থে ইহার ভূরি প্রমাণ আছে তল্লিখনে পুস্তক বাহুল্য ভয়ে তাহাতে ক্ষান্ত থাকিলাম এবং কোন গ্রন্থে এমন লিখিত নাই যে শূদ্রকুলে জন্মিয়া যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণব হইয়াছেন তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা প্রণাম করিবেন না বা প্রণাম করিলে পাপ হয় এবং ঐ বৈষ্ণবের দর্শন স্পর্শনে যে শরীর পবিত্র ও পাপ নাশ হয় ইহার প্রমাণ সচরাচর দেখা যাইতেছে যথা

ত্রয়োদশাধ্যায় গন্ধর্বরাজের প্রতি ভগবান্ কহিয়াছেন। তেষাঞ্চ পাদরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা। পুনাতি সর্বতীর্থানি দূরতো দর্শনাদপি॥ অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত বৈষ্ণবগণের পদধূলি স্পর্শ করিলে পৃথিবী তৎক্ষণাৎ পবিত্র হন এবং অতি দূরেও বৈষ্ণবকে দেখিলে তীর্থ সকল পবিত্র হন। অপরঞ্চ নারদপঞ্চরাত্রে নারদং প্রতি শিববাক্যং যথা। দর্শনং বৈষ্ণবানাঞ্চ দেবা বাঞ্ছন্তি নিত্যশঃ। ন বৈষ্ণবাৎ পরং পূতো বিশ্বেষু নিখিলেষু চ॥ অর্থাৎ বৈষ্ণবকে দর্শন করিতে দেবতারা সর্বদা বাঞ্ছা করেন যেহেতুক তাবৎ পৃথিবীর মধ্যে বৈষ্ণবাতিরিক্ত আর কেহ পবিত্র নাই। অপিচ পাদ্মে— অন্ত্যজাঃ শ্বপচান্তাশ্চ যবনাদ্যাস্তথৈব চ। (৮) যদি তে বিষ্ণুভক্তাশ্চ বিশ্বং পবিত্রয়ন্তি বৈ॥ অর্থাৎ অন্ত্যজ ও চণ্ডাল পর্যন্ত মনুষ্য এবং যবনাদিও যদ্যাপি বিষ্ণুভক্ত অর্থাৎ যথার্থ বৈষ্ণব হন তবে সংসারকে পবিত্র করেন। এস্থলে ধর্মসভাধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাশয়েরা ইহা কহিতে পারিবেন না। যে ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়েরা বিশ্বশব্দের বাচ্য নহেন যেহেতু বাধা না থাকিলে বিশ্বশব্দে তাবৎকেই বুঝায় অতএব ব্রাহ্মণ ঠাকুররা যে বৈষ্ণব কর্তৃক পবিত্র হন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক এমৎ হইলে যাঁহার দর্শনাধীন পবিত্র হইলেন তাঁহাকে যে নমস্কার করিতে পারিবেন না এ উত্তর সর্বথাযুক্তিবিরুদ্ধ, এবং যে যুক্তিতে ব্রাহ্মণগণ সর্বজাতীয়ের নমস্য হন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বিষ্ণুস্বরূপ এজন্য তাঁহারদিগকে সকল জাতীয়ের প্রণাম করিতে হয় এযুক্ত্যনুসারে পরমপূজনীয় বৈষ্ণবগণও ভূদেব মহাশয়দিগের নমস্য অবশ্যই হইতে পারেন যেহেতুক ব্রাহ্মণগণ যেমন বিষ্ণু-শরীর তদ্রূপ বৈষ্ণবসকলও বিষ্ণুস্বরূপ হন ইহার প্রমাণ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় বচন যথা। বিষ্ণুবৈষ্ণবয়োঃ পাপাদ্ যে বৈ ভেদং প্রকুর্বতে। তেন তে নিরয়ং যান্তি যুগানাং সপ্তবিংশতিম্॥ অর্থাৎ আপন আপন পাপহেতু যাঁহারা বিষ্ণু (৯)ও বৈষ্ণবকে পরস্পর বিভিন্ন জ্ঞান করেন তাঁহারা ঐ পাপাধীন বিংশতি যুগ পর্যন্ত নরকে যান। এই বচনাধীন বিস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে বিষ্ণুবুদ্ধি করিয়া বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণের প্রণাম করণের কোন সন্দেহ নাই তবে "সর্বেষামেব বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ পরমো গুরুঃ" এই বচনার্থের বিবরণে ধর্মসভাধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাশয়েরা বিপ্রভক্তিচন্দ্রিকার সপ্তম পত্রের

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ পঙ্‌ক্তি অবধি যাহা লিখিয়াছেন 'সর্ব বর্ণাপেক্ষা ব্রাহ্মণের পরম গুরুত্ব আছে এতৎ বচনের তাৎপর্যাধীন বিবেচনাই হইতেছে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ বৈষ্ণব হইলেও ব্রাহ্মণের নমস্য কদাচ নহে ইত্যাদি' ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে বর্ণাশ্রমাচারি অর্থাৎ স্ব স্ব জাতিবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠানকারি জাত্যাভিমানি ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ ইহা আমিও স্বীকার করি যেহেতুক ঐ বচনে বর্ণ শব্দবাচ্যের গুরু যে ব্রাহ্মণ ইহাই বিস্পষ্ট বোধ হইতেছে কিন্তু ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা যে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ বৈষ্ণব হইলেও ব্রাহ্মণের নমস্য কদাচ নহেন।' ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ হয় যেহেতুক তাৎপর্য ব্যাখ্যাটি কেবল তাঁহারদিগের কণ্ঠে কল্পিত বোধ হইতেছে (১০) কারণ শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাক্রান্ত যে বৈষ্ণবগণ তাঁহারা কোন বর্ণের মধ্যে গণিত নহেন আর ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ বৈষ্ণব হইলেও ব্রাহ্মণের নমস্য নহেন এতদর্থ বোধক কোন শব্দও পূর্বোক্ত বচনের মধ্যে নাই এবং স্পষ্টরূপে যেস্থলে শব্দার্থের উপলব্ধি হয় সেস্থলে তাৎপর্যান্তর ব্যাখ্যাকরণ সম্ভাবনীয় বটে কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়েরা এমৎ কুত্রাপি দেখাইতে পারিবেন না যে বৈষ্ণব শব্দের উল্লেখ করিয়া ক্ষত্রিয়াদি বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণের নমস্কার করিতে কুত্রাপি নিষেধ আছে তবে অনুমান হয় প্রশ্নকারক বাবুর মনোরঞ্জনার্থ স্বার্থপর পণ্ডিত মহাশয়েরা অন্যার্থকে তাৎপর্যার্থ করিয়াছেন নতুবা স্বকল্পিত তাৎপর্যার্থ তাঁহারা কদাপি লিখিতেন না। অপর শাস্ত্র এবং যুক্তিতে এই মাত্র প্রতিপন্ন হইতেছে যাঁহারা স্ব স্ব জাত্যুক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান ও স্ব স্ব জাতীয়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়া আপন আপন জ্ঞাতি কুটুম্বের সহিত আহার ব্যবহারাদি করেন তাঁহারাই বর্ণ শব্দের বাচ্য (১১) এবং ব্রাহ্মণ ঠাকুররাও তাঁহারদিগেরি গুরু কারণ তাহারদিগের জাত্যুক্ত তাবদ্ধর্ম কর্ম ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না অতএব ক্রিয়াযোগসারে ভগবদুক্তি 'দশকর্ম ব্রতং যজ্ঞং বিবাহে শ্রাদ্ধ-তীর্থকম্। ষট্‌স্থানেষু গুরুর্বিপ্রো দীক্ষায়াং বৈষ্ণবো গুরুঃ॥' অর্থাৎ জাতকর্ম প্রভৃতি তত্তৎ জাত্যুক্ত দশ সংস্কার এবং ব্রত ও যাগ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, তীর্থবিহিত কর্ম এই ছয় বিষয়ে ব্রাহ্মণ গুরু কিন্তু দীক্ষা অর্থাৎ মন্ত্রগ্রহণ বিষয়ে গুরু বৈষ্ণব। অতএব যাঁহারা ঐ সকল কর্মের অভিলাষ

রাখেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণকে গুরু স্বীকার করিবেন তদ্ভিন্ন জাতির বাহির হইয়া যাঁহারা ঐ সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন ব্রাহ্মণকে তাঁহারদিগের গুরু স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নাই। বরং দীক্ষা বিষয়ে বৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণের গুরু ইহারই বচন দেখা যাইতেছে যথা। ন যোগী ন চ সন্যাসী বনস্থো ন চ ব্রাহ্মণঃ। সত্যং সত্যং হি মদ্বাক্যং দীক্ষায়াং বৈষ্ণবো গুরুঃ॥ ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবান্‌ বিষ্ণু এই কহিয়াছেন অর্থাৎ দীক্ষাকর্মে কি যোগী সন্ন্যাসী কি বানপ্রস্থ কি ব্রাহ্মণ ইঁহারা গুরু অর্থাৎ মন্ত্রদাতা নহেন আমার এই বাক্য নিতান্ত সত্য জানিবা যে দীক্ষা কর্মে গুরু বৈষ্ণব। অতএব (১২) শাস্ত্রের দ্বারা যে বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণকে মন্ত্র প্রদানে যোগ্য হইলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণের নমস্য নহেন এই ব্যবস্থাপত্র যে ধর্মসভাধ্যক্ষ পণ্ডিত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহাতে আমরা আশ্চর্য মানিলাম। অপর বিপ্রভক্তি-চন্দ্রিকার ঐ পত্রে পণ্ডিত মহাশয়েরা আরো লিখেন যে 'ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিলে ঐ নমস্কৃত ব্রাহ্মণ যদ্যপি তাঁহাকে নমস্কার না করেন তবে তিনি শূদ্র তুল্য এবং অনমস্য হন এ বিধায় স্পষ্টবোধ হইতেছে যে শূদ্রবৈষ্ণবও ব্রাহ্মণের নমস্য নহেন।' উত্তর। নমস্কারক ব্রাহ্মণকে প্রত্যভিবাদন না করিলে যে নমস্কৃত ব্রাহ্মণ শূদ্রতুল্য অনমস্য হন ইহা সত্য বটে কিন্তু ঐ শূদ্রতুল্য ব্রাহ্মণ যেমন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনশ্চ নমস্য হন তদ্রূপ শূদ্রকুলোদ্ভব মনুষ্যও যথাশাস্ত্র বৈষ্ণব হইলে ব্রাহ্মণের নমস্য হইতে পারেন যেহেতুক তাঁহারা জাত্যুক্ত ব্যবহার পরিত্যাগী হইয়া যথার্থ বৈষ্ণব লক্ষণাক্রান্ত হইলে শূদ্রতা নিবন্ধন অনমস্যত্ব দূর হইয়া নমস্যত্ব প্রাপ্ত হন ইহার প্রমাণ মহাভারতের আদি পর্বে লিখিত আছে এক মুনি কোপানলে বকভস্ম করিয়া ধর্মব্যাধের নিকটে জ্ঞানোপদেশ লইয়া ধর্মব্যাধকে পরম ভাগবত বৈষ্ণব (১৩) জানিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছেন ধর্ম-সভাধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাশয়েরা যদ্যপি আদিপর্ব মনোযোগ পূর্বক দৃষ্টিপাত করিতেন তবে পরম জ্ঞানি বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণের অনমস্য ইহা কদাপি লিখিতেন না এক্ষণে পরম পূজনীয় ঐ পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি আমার নিবেদন অনুগ্রহ পূর্বক ঐ আদিপর্বের আদ্যন্তে দৃষ্টিপাত করিবেন। মনুষ্যের যে নমস্যত্ব সে জাতির দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না যে কোন জাত্যুৎপন্ন কেন না

হন যথার্থ জ্ঞানি ও তপস্যার আধিপত্য হইলেই নমস্কারের যোগ্য হন, কারণ ক্ষত্রিয়াদি জাত্যুৎপন্ন ব্যক্তিরাও তপস্যা ও জ্ঞানের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব ও ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব বর্ণের নমস্য হইয়াছেন তাহার প্রমাণ বিশ্বামিত্র মুনি, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে রাজন্য হইতে জন্মিয়াও তিনি স্বীয় তপস্যা ও জ্ঞানের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব ও তাবদ্বর্ণের নমস্কার পাইয়াছেন। এবং শূদ্র স্ত্রীর গর্ভে ভরদ্বাজ মুনির জন্ম অতএব তাঁহাকে বর্ণসঙ্কর অবশ্যই কহিতে হইবেক তথাপি তপস্যা ও জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার ঋষিত্ব হওয়াতে তিনি ব্রাহ্মণাদি সমুদয় বর্ণের নমস্য হইয়াছিলেন। অন্যে পরে কার কথা যে ব্যাস মুনিকে হিন্দু মহাশয়েরা নারায়ণ স্বরূপ জ্ঞান (১৪) করেন অত্যপকৃষ্ট জাতীয় ধীবর কন্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম তথাপি তাঁহার জ্ঞানরূপ সম্পত্তির দ্বারা তিনি কোন বর্ণের শ্রেষ্ঠ না হইয়াছিলেন আর কোন ব্রাহ্মণই বা তাঁহাকে প্রণাম না করিয়াছেন বরঞ্চ পুরাণাদি পাঠের পূর্বে তাঁহাকে প্রণাম করণের আবশ্যকতা বিধায়ক প্রমাণও শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যথা। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ। এস্থলে জয় শব্দে পুরাণাদি অন্যাংশের অর্থ সকলেই জ্ঞাত আছেন অতএব তল্লিখনে প্রয়োজনাভাব। অতএব পূর্বোক্ত তাবৎ প্রমাণ ও যুক্ত্যনুসারে বিবেচনীয় হইতেছে যে সাধু সদাশয় বৈষ্ণব মহাশয়দিগকে ব্রাহ্মণের প্রণামকরণে কোন বাধা নাই তবে বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া যদ্যপি কেহ তাঁহারদিগকে প্রণাম করণে অনঙ্গীকার করেন তাহাতে পরম ভাগবত বৈষ্ণবগণের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না এইক্ষণে অনেক বিশিষ্ট সন্তানেরা তুচ্ছ করিয়া ব্রাহ্মণকেও প্রণামাদি করেন না বরং তাঁহারদিগকে দেখিলে নানারূপ কটাক্ষ করেন ইহাতে ভূদেব মহাশয়দিগের কি ক্ষতি হইতেছে বরং আপনারাই পাপে লিপ্ত হইতেছেন জন্মান্তরে ইহার ফল (১৫) অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি তদ্রূপ জ্ঞানি শ্রেষ্ঠ সাধু বৈষ্ণবগণকে অহঙ্কারপূর্বক যে ব্রাহ্মণ প্রণামাদি না করেন তাঁহারা ঐ অকরণ জন্য প্রত্যবায়াধীন পরকালে ফলভোগ অবশ্যই করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের সর্ববর্ণ গুরুত্ব প্রযুক্ত যে শূদ্র কুলোৎপন্ন জ্ঞানি বৈষ্ণবগণকে তাঁহারা প্রণাম করিবেন না শাস্ত্রানুসারে ইহার উত্তর পূর্বেই লিখিত হইল এক্ষণে

ক্রিয়াযোগে ও বৈষ্ণব লক্ষণে বিপ্রভক্তির বিধান দেখাইয়া বিপ্রভক্তি-চন্দ্রিকাকার ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা শূদ্রবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নমস্য নহেন ইহার জ্ঞাপক যাহা ঐ পুস্তকে লিখিয়াছেন 'অতএব ক্রিয়াযোগরূপে বিষ্ণুর আরাধনাতে এবং বৈষ্ণব লক্ষণেতে বিপ্রভক্তির কর্তব্যতা স্পষ্ট বোধ হইতেছে' ইহার মীমাংসা বিধায় কিঞ্চিৎ লিখিতেছি বিজ্ঞ মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্বক বিবেচনা করিবেন। ক্রিয়াযোগের অঙ্গ এবং বৈষ্ণব লক্ষণের ঘটক বিপ্রভক্তি ব্রাহ্মণ শূদ্র সাধারণ তাবৎ বৈষ্ণবেরই কর্তব্য যেহেতুক বিপ্রভক্তি বিধায়ক বচনদ্বয়ের মধ্যে কেবল শূদ্রকুলোদ্ভব বৈষ্ণবের প্রতি কথিত হয় নাই এমৎ যদ্যপি হইল তবে বৈষ্ণবকেও যদ্যপি ব্রাহ্মণেরা নমস্কার করিতে (১৬) পারেন তবে শূদ্র বৈষ্ণবকেও অবশ্য নমস্কার করিতে পারিবেন ইহাতে ইতর বিশেষ কিছুই নাই বৈষ্ণবের যেমন বিপ্রভক্তি কর্তব্যতা শাস্ত্রানুসারে প্রাপ্ত হইয়াছে তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরা যে বৈষ্ণবকে নমস্কার করিবেন ইহাও পূর্বলিখিত বচনের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে অতএব এস্থলে ইহাই নিষ্কর্ষ জানিবেন যেমন এক ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিতে পারেন অথচ ঐ নমস্কারক ব্রাহ্মণ প্রণম্য ব্রাহ্মণের অনমস্য হন না তদ্রূপ শূদ্রকুলোদ্ভব যথার্থ বৈষ্ণবও ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিলে তিনি ব্রাহ্মণের অনমস্য হন না তবে যে ক্রিয়াযোগের অঙ্গ ও বৈষ্ণব লক্ষণের ঘটকীভূত বিপ্রভক্তি দেখাইয়া বিপ্রভক্তি-চন্দ্রিকাকারক পণ্ডিত মহাশয়েরা শূদ্রকুলোদ্ভব যথার্থ বৈষ্ণবের প্রতি ব্রাহ্মণের অনমস্যত্ব লিখিয়াছেন সে কেবল তাঁহারদিগের পক্ষপাত মাত্র ঐ পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি এইক্ষণে আমার এই জিজ্ঞাস্য যে ভগবদ্গীতাতে স্বয়ং ভগবান্ শারীরিক তপস্যার মধ্যে দণ্ডী কি পরমহংস প্রভৃতি তাবতের প্রতিই দ্বিজপূজার বিধান লিখিয়াছেন ইহাতেই কি দণ্ডী পরমহংস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি পূজনীয় মহোদয়েরা ব্রাহ্মণের অনমস্য হইবেন এবং শ্রীরামচন্দ্র ও (১৭) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইঁহারা মুনিগণকে প্রণাম করিয়াছেন ইহাতে কি মুনিরা ঐ সকল অবতারকে প্রণাম ও ভক্তি পূর্বক স্তব পূজাদি করেন নাই অতএব এস্থলে পক্ষপাত রহিত জ্ঞানি মহাশয়েরা ইহা নিশ্চয় জানিবেন যেমন পরস্পর ব্রাহ্মণের নমস্যত্ব নমস্কারকত্ব সম্বন্ধ তদ্রূপ শাস্ত্রানুযায়ি বৈষ্ণবের সহিতও ব্রাহ্মণঠাকুরগণের নমস্যত্ব

নমস্কারকত্ব সম্বন্ধ আছে ইহাতে সন্দেহ নাই বৈষ্ণবের যে বিপ্রভক্তি করণের প্রমাণ সে তাঁহাদের ব্রাহ্মণের অনমস্য নহে যে হেতুক ইহা তাঁহাদের তপস্যা। অপর বৈষ্ণবের লক্ষণে লেখেন যিনি ধর্মের উপদেশ করিতে পারেন এবং বেদবিদ্যাভ্যাসে রত হন তিনিই বৈষ্ণব, ইহাতে বোধ হয় শূদ্রকুলোদ্ভব ব্যক্তিও বৈষ্ণব হইলে তাঁহার শূদ্রত্ব থাকে না কারণ শাস্ত্রে লেখে যে শূদ্রের নিকটে ধর্মোপদেশ শুনিবেক না যেহেতুক ধর্ম কথনে শূদ্রের অধিকার নাই এবং শূদ্র যদ্যপি বেদার্থের অভ্যাস করেন তবে তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদ করিবে কিন্তু বৈষ্ণবের ইহাতে অধিকার আছে অতএব বৈষ্ণবের যদ্যপি শূদ্রত্ব থাকে ধর্মোপদেশ ও বেদবিদ্যাভ্যাসের বিধান কদাপি লিখিতেন না তথাপি ধর্মসভাধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাশয়েরা (১৮) যে ব্রাহ্মোক্ত বৈষ্ণব লক্ষণের প্রতি প্রণিধান না করিয়া শূদ্রবংশ্য যথার্থ বৈষ্ণবকেও শূদ্রের মধ্যে পরিগণিত করিয়া লোকের ভ্রম জন্মাইতেছে এ তাঁহারদিগের নিতান্ত অবিচার। ধর্মসভাধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাশয়দিগকে বৈষ্ণবদ্বেষী কহিতে আমি সম্ভ্রম করি কিন্তু তাঁহারদিগের পক্ষপাতের লিখনে অর্থায়ত্ত তাহাই বোধ হয় নহিলে 'যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ। শ্বাদোপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শাৎ' শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধীয় এই বচনার্থের বিবরণে বিপ্রভক্তিচন্দ্রিকার অষ্টম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছয় পঙ্‌ক্তি অবধি তাঁহারাই লিখিয়াছেন যে 'শ্রীভগবানের নাম স্মরণ, শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিলে চণ্ডালও ব্রাহ্মণের ন্যায় যজ্ঞকর্তা হয়, রূপ গোস্বামী এই বচনের ব্যাখ্যা করেন যে চণ্ডালাদি ভগবানের নাম কীর্তনাদি করিলে তাহাতে চণ্ডালত্ব দূর হয়,' ইহাতে পক্ষরহিত মহাশয়েরা বিবেচনা করুন ভগবানের নাম কীর্তনাদি করিলে যাহার শূদ্রত্ব দূর হইল এমৎ বিষ্ণুর প্রতিরূপ মনুষ্যেতে ব্রাহ্মণের অনমস্যত্বে প্রশক্তি কি যথার্থ বৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণের অনমস্য ইহার কো(১৯)ন শাস্ত্র নাই এবং শূদ্রতা প্রযুক্ত যে অনমস্য ইহাও সম্ভবে না যেহেতুক ভগবানের নাম কীর্তনাদি দ্বারা শূদ্রতাই দূর হইয়া যায় তথাপি যে ঐ পণ্ডিত মহাশয়েরা বিপ্রভক্তিচন্দ্রিকার সপ্তম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লেখেন যে 'অতএব শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণব লক্ষণাক্রান্ত শূদ্রবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নমস্য নন ইহা নিশ্চয়' তাঁহাদের এলিখন লোকেরদের নিরর্থক ভ্রান্তিজনক

এবং নিতান্ত পক্ষপাত সূচক কি না ইহা বিজ্ঞ লোকের বিবেচনার্হ। উপরিলিখিত প্রকরণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে শূদ্রকুলে জন্মিয়াও যদ্যপি কোন ব্যক্তি যথার্থ বৈষ্ণব হন তবে তিনি ব্রাহ্মণের অবশ্য নমস্য ইহা নিশ্চয় তবে বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকাবলোকনে যাঁহারা ঐ মহাত্মারদিগকে নমস্কার না করিবেন বা অনমস্য কহিবেন তজ্জন্য পাপভোগী তাঁহারাই হইবেন ইহাতে শাস্ত্রকারেরদের কোন অবিচার নাই। অপর শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল মহাশয়ের যে দ্বিতীয় প্রশ্ন 'শূদ্রবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিলে ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নমস্কার করিবেন কি না' ইহার উত্তরে অধিক যুক্তি প্রমাণ দেওনের আবশ্যক নাই প্রথম প্রশ্নের উত্তরই তাহার সদুত্তর জানিবেন অর্থাৎ যে বৈষ্ণবকে দেখিলে অগ্রেই (২০) ব্রাহ্মণের প্রণাম করিতে হয় তিনি নমস্কার করিলে যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নমস্কার করিবেন ইহাতে সন্দেহ কি তবে যদ্যপি আমি ব্রাহ্মণ এই অভিমান বা বিদ্বেষ করিয়া কোন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের নমস্কারের প্রতিনমস্কার না করেন তাহার প্রত্যবায়ী তিনিই হইবেন। বিপ্রমহাশয়দিগকে যদ্যপি কোন কোন নীচ ব্যবসায়ি জবনও নমস্কার অর্থাৎ সেলাম করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রতি সেলাম করিয়া থাকেন ইহাতে তাঁহারদিগের পাতক জন্মে না কিন্তু শাস্ত্রানুভবসিদ্ধ যে বৈষ্ণবের প্রত্যভিবাদন ইহাতে সন্দেহ করেন এই আশ্চর্য। অপর শীলবাবুর তৃতীয় প্রশ্ন এই যে শূদ্র বৈষ্ণবের প্রসাদ ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন কি না। পূর্বলিখিত পণ্ডিত মহাশয়েরা ইহার উত্তর এই লেখেন যে শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন অত্যন্ত গর্হিত ইহা মনু কহিয়াছেন। ইহাতে আমার কথনীয় এই যে ব্রাহ্মণের প্রতি সামান্যতঃ শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভোজনের যে নিষেধ মনু লিখিয়াছেন আমি তাহা অনঙ্গীকার করি না কিন্তু শূদ্রকুলে জন্মিয়া যাঁহারা শাস্ত্রানুযায়ি বৈষ্ণব হইয়াছেন ব্রাহ্মণেরা তাঁহারদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে নিষেধ কি আছে সামান্যতঃ শূদ্রজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষেধ বোধ (২১)ক বচনে ব্রাহ্মণের প্রতি শূদ্রকুলোদ্ভব যথার্থ বৈষ্ণবের প্রসাদ ভোজন নিষেধ হইতে পারে না যেহেতুক পরম পূজনীয় বৈষ্ণবগণ কোন জাতির মধ্যে পরিগণিত নহেন এবং বৈষ্ণবেতে কোন জাতি বুদ্ধি করিলেও পাপ জন্মে ইহার প্রমাণ পদ্যাবলী ধৃত বিষ্ণুপুরাণের বচন যথা। অর্চ্চেদ্‌বিষ্ণৌ

শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেহম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহরে শব্দসামান্য-বুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥ অর্থাৎ অর্চনীয় বিষ্ণুতে শিলাজ্ঞান ও গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান এবং কলিকালের পাপনাশক যে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পাদোদক তাহাতে জল জ্ঞান, আর সকল পাপনষ্টকারী যে হরিনাম ও বিষ্ণুর মন্ত্র ইহাতে সামান্য শব্দবুদ্ধি এবং সকলের ঈশ্বর যে বিষ্ণু তাঁহাতে অন্যান্যের সমতা বোধ এ সকল যাহার হয় সে নরকে যায়। অতএব যে বৈষ্ণবেতে কোন জাতি বুদ্ধি করিলে নরক হয় এবং যাহার পাদোদক ধারণ ভক্ষণে পাপ নাশ করে সেই মহাত্মারদিগকে শূদ্রজাতি কহিয়া যে ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহারদের উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষিদ্ধ কহেন ইহা ধর্মসভাধ্যক্ষ (২২) পণ্ডিত মহাশয়দিগের নিতান্ত অন্যায় এবং বারাহিতন্ত্রে বৈষ্ণব প্রকরণে পরমারাধ্য মহাদেব সমাদর পূর্বক লিখিয়াছেন যে বৈষ্ণবের অধরামৃত সকলেরই ভোক্তব্য ইহাতে বিকার করিবেক না এইক্ষণে ব্যবস্থাপক পণ্ডিত মহাশয়েরা যদ্যপি ঐ গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করেন তবে আমি তাঁহারদিগের নিকটে যথেষ্ট বাধিত হই। অপর ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের অন্ন গ্রহণ করিবেন ইহার বিস্পষ্ট প্রমাণ স্কন্দপুরাণীয় বচন যথা। গৃহ্নীয়াদ্বৈষ্ণবস্যান্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ। সর্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ। অর্থাৎ সর্বপাপ বিমোচনার্থে ব্রাহ্মণ যত্নক্রমে বৈষ্ণবের অন্ন গ্রহণ করিবেন তাহা যদ্যপি না পান তবে বৈষ্ণবের জল অর্থাৎ পূর্বলিখিত বচনপ্রাপ্ত বৈষ্ণবের পাদোদক ভক্ষণ করিবেন। ব্রাহ্মণ যে যথার্থ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে পারেন ইহার অন্য প্রমাণ দেওয়া অত্যধিক ব্যবস্থাপক পণ্ডিত মহাশয়েরা যাহা লিখিয়াছেন 'কেবল গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজনের শাস্ত্র আছে' ইহাতেই বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজনের বিধান প্রাপ্ত হইতেছে কেননা দ্বাদশ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ পঙ্ক্তি অবধি যে বচন লেখা গিয়াছে তাহাতেই নিশ্চয় বোধ (২৩) হয় যে সকলেরি দীক্ষাগুরু বৈষ্ণব অতএব দীক্ষাগুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজনে ব্রাহ্মণের প্রতি কোন বাধা নাই তবে যে নারদপঞ্চরাত্রের 'বিষ্ণুমন্ত্রং যো লভেচ্চ বৈষ্ণবাচ্চ দ্বিজোত্তমাৎ। কোটিজন্মার্জিতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ,' এই বচন লিখিয়া ধর্মাসভাধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাশয়েরা তদর্থ লিখিয়াছেন যে

'বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নিকট যিনি বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করেন তিনি কোটিজন্মার্জিত পাপ হইতে মুক্ত হন' এস্থলে দ্বিজোত্তম শব্দে যে কেবল ব্রাহ্মণকে বোধ করিয়াছেন সে তাঁহারদিগের অপ্রণিধান, কেননা এই পুস্তকের প্রথম লিখিত কয়েক বচন দ্বারা বোধ হইতেছে যে বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ অতএব এস্থলেও দ্বিজোত্তম শব্দে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠকে বোধ করিয়াছে অতএব ঐ বচনের তাৎপর্যার্থ এই কহিতে হইবেক যে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ যে বৈষ্ণব তাঁহার নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিলে কোটিজন্মার্জিত পাপ বিমোচন হয়, পণ্ডিত মহাশয়দিগের উচিৎ নহে যে পক্ষপাত করিয়া লোকের ভ্রম জন্মাইয়া দেন অতএব আমার নিবেদন এইক্ষণে মহামহোপাধ্যায় ধর্মসভাধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাশয়েরা উভয় পুস্তকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিশেষ বিবেচনা করিবেন ইতি। (২৪)"

জন্ম—১৮ই অক্টোবর ১৮৩৩ ডাঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র এম-ডি, আই-এম্-এস্ মৃত্যু—১৪ই ডিসেম্বর ১৮৯৫ (ইংলণ্ডে)

স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র

অনন্যসাধারণ প্রতিভা এবং অধ্যবসায়-বলে যাঁহারা নাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া গিয়াছেন, ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কেবল এ দেশে নয়, বিলাতেও তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকরূপে জনসাধারণের নিকট আদৃত ও সম্মানিত হইয়াছেন। বিলাতে উচ্চ চিকিৎসা-পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তিনি ইংল্যণ্ডের লর্ড চ্যান্সেলর হার্ডিঞ্জ ষ্টানলে গিফার্ড-এর (Hardinge Stanley Giffard) ভগ্নী মেরী লিফেন গিফার্ডকে (Mary Lees Fane Giffard) বিবাহ করেন। লর্ড পরিবারে বিবাহ করা, এ পর্যন্ত এ দেশের অন্য কোন লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তাহা ছাড়া, কোন বাঙালী এতাবৎকাল Brigade Surgeon পদে উন্নীত হন নাই, এ সম্মানে তিনিই সম্মানিত হইয়াছেন।

বংশ-পরিচয়

ডাঃ চন্দ্র সুবর্ণবণিক্-বংশোদ্ভব ছিলেন। তাঁহাদের আদি বাড়ী ছিল কলিকাতার জোড়াসাঁকো পল্লীতে ৺রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখে। তাঁহার পিতার নাম বদনচন্দ্র চন্দ্র ও মাতার নাম ক্ষেত্রমণি দাসী। বদন বাবুর এক কন্যা ও দুই পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম চুনিমণি দাসী এবং দুই পুত্রের নাম—মহেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র ও রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর ডাঃ চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যজীবন

শৈশব হইতেই লেখাপড়ার দিকে ডাঃ চন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। খেলাধূলায় সামান্য সময় দিয়া, তিনি অধিকাংশ সময় লেখাপড়া লইয়া থাকিতেন। বাল্যে তিনি ডাফ্ স্কুলে ভর্তি হন। তাঁহার প্রতিভাব্যঞ্জক মুখ, প্রশস্ত ললাট ও বিনীত ব্যবহার দর্শনে সহপাঠীরা ও শিক্ষকগণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। ডক্টর ডাফ্ রাজেন্দ্রচন্দ্রকে

বিশেষভাবে যত্ন করিতেন এবং তাঁহার ভবিষ্য উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বিশেষ যত্ন লইলে এই বালক ভবিষ্যতে উন্নতির উচ্চশীর্ষে আরোহণ করিবে। প্রকৃত পক্ষে ডক্টর ডাফের চেষ্টা রাজেন্দ্রচন্দ্রের উন্নতির সহায়তা করিয়াছিল।

যথাসময়ে স্কুলের পড়া শেষ করিয়া ও সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু তাঁহার মনে প্রবল বাসনা ছিল যে, বিলাতে যাইতে না পারিলে চিকিৎসা-বিদ্যায় ভাল করিয়া অভিজ্ঞতা-লাভ হইবে না। এই সময় ডক্টর ডাফ্ দ্বারা তিনি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং ডক্টর ডাফ্ চেষ্টা করিয়া, কলিকাতা কেমিষ্ট্রী সোসাইটীর সাহায্যে তাঁহাকে বিলাত পাঠান। তখন তাঁহার বয়স বাইশ কি তেইশ।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব

ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র কুড়ি বৎসর বয়সে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ধাত্রীবিদ্যায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া 'গুডিভ্ মেডাল' পুরস্কার লাভ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাত গমন করেন। সেখানে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এম আর সি এস (Member of Royal College of Surgeons) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটি হইতে প্রাণিবিদ্যায় (Zoology) বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া একখানি রৌপ্যপদক লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত ইউনিভার্সিটি হইতে অনন্যসাধারণ পারদর্শিতার পুরস্কার-স্বরূপ তিনি একখানি সুবর্ণ-পদক প্রাপ্ত হয়েন। এই তিনখানি পদকে উভয় পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নরূপ ঃ—

জুলজি মেডেল

পদকের সম্মুখ ভাগ

University College
Awarded
to
Rajendra
Chandra Chandra

গুডিভ মেডাল
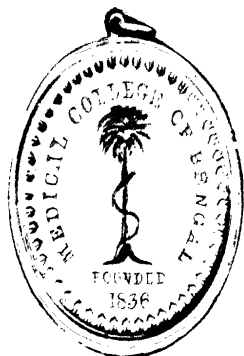
সম্মুখ ভাগ

পশ্চাৎ ভাগ

জুলজি মেডাল

সম্মুখ ভাগ

পশ্চাৎ ভাগ

লণ্ডন ইউনিভার্সিটি মেডাল

সম্মুখ ভাগ
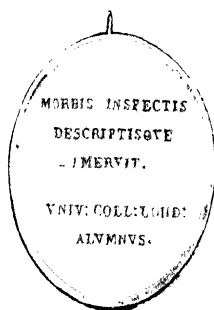
পশ্চাৎ ভাগ

[এই ছবির ব্লকগুলি ডাঃ শ্রীযুক্ত রামদাস দে মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

Zoology
1856-57
পশ্চাদ্ভাগ
Cuncti Adsint
Meritaeque
Expectent Praemia
Palmae
MDCCCXXVII
স্বর্ণপদক
সম্মুখভাগ
Robertus Fellowes L. L. D.
Merenti Proposuit
পশ্চাদ্ভাগ
Morbis Inspectis
Descriptisque
Meruit.
Univ: Coll: Lond:
Alumnus.

পদকের ধারে (edge) লেখা আছে Summer terms, 1856-57 Rajendra Chandra Chandra.

গুডিভ মেডাল
এই পদকের সম্মুখদিকে
Medical College of Bengal
Founded
1836
পশ্চাদ্ভাগে
Goodeve Medal
Awarded
to
Rajendra Chandra Chandra
1853

লেখা আছে, পদকখানি ব্রঞ্জের কিন্তু ইহার ধার ও রিং সোণার।

বিবাহ

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহার বিবাহ হয়। লর্ড হ্যালস্‌বেরীর ভগ্নীর প্রতিজ্ঞা ছিল পরীক্ষায় (ডাক্তারী) যিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবেন তাঁহার সহিত তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন। আনুমানিক ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে।

কর্মক্ষেত্রে রাজেন্দ্রচন্দ্র

বিবাহের পর তিনি বিলাতেই চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরেই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তিনি বাংলা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে চাকুরী পান। উক্ত খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তিনি সস্ত্রীক বাংলায় আসিয়া কার্যে যোগদান করেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জুন পর্যন্ত পাঁচ বৎসর কাল তিনি রাজকীয় সৈনিক বিভাগের ডাক্তার ছিলেন। এই সময় তিনি নিম্নলিখিত স্থানে কাজ করেন :—

1858 Indian Mutiny. Action with Firoge Shah on the banks of the Jummna.

1861—Kooki Expedition
1862-63—Cossiah and Jyanti
Hills (Assam) Expedition.[১]

ইহার পর ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তিনি দেওঘরের সিভিলসার্জন হন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ নির্দিষ্ট (সিভিলসার্জন)[২] কার্য ছাড়া, তাঁহাকে সাঁওতাল পরগণার সাব-এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনারের কাজ করিতে হইত।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তিনি সার্জন মেজরের পদে উন্নীত হন।

১ Bengal Medical Service 1885. Compiled by G. E. A. Harris and published by Messrs. Thacker Spink & Co., Calcutta.

২ History of Services of officers holding Gazetted Appointments under the Government of Bengal.

Hardinge Stanley Giffard
Lord Halsbury

Renowned Physician
Brigade Surgeon Lt. Colonel
R. C. Chandra M.D., I.M.S.
Born—1830
Died in England—14th Dec. 1895
Offg. Principal Medical College
30th May, 1888
Offg. Inspector-General of Civil Hospitals
Bengal, 19th August, 1890

Mary Lees Fane Giffard
Mrs. R. C. Chandra
Died in England 1885

[এই ছবির ব্লকগুলি ডাঃ শ্রীযুক্ত রামদাস দে মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২০এ ফেব্রুয়ারী তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের মেটিরিয়া মেডিকার ও ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক হন। এই সময় হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করেন।

মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ-পদ লাভ ও ছাত্রগণের অভিনন্দন-প্রদান

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তিনি মেডিকেল কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ (Officiating Principal) হন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল (এক বৎসর এগার মাস ১৯ দিনের জন্য) তিনি যখন বিলাত যান, তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলী তাঁহাকে যে অভিনন্দন-পত্র দেন, নিম্নে তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল:—

"To

Surgeon Major Rajendra Chandra Chandra, Professor of Materia Medica and Clinical Medicine, Medical College, Bengal, Second Physician, Medical College Hospital

Dear Sir,

"We, the undersigned graduates in medicine of the Calcutta University and the Students of the Medical College of Bengal, have learnt with deep regret of your coming departure from this country and your approaching separation from us all.

"It is not for us to enter into the details of your eminent and distinguished services to the Government in the Civil and Military Departments; suffice it to say, that from the commencement of your career, you have been placed in positions of trust and responsibility and have by your kind manners and great skill won the highest approbation of your official superiors and fellow workers.

"We cannot let this occasion pass without placing on record our deep sense of esteem and regard for the patient trouble and indefatigable zeal with which you have always striven to discover the secrets of the most intricate diseases,

and to serve with conscientiousness and sincere sympathy those that were placed under your care ; nor can we refrain from expressing our admiration and gratitude for the warm and enthusiastic interest, with which you have always sought to impress upon our minds the heavy and sacred responsibility that devolved upon us, as students and votaries of medicine, while giving your clinical instructions by the bedside of the sick and suffering.

"The kindness and affability which you have always displayed towards those, who have had the good fortune to work under you as House Physicians, class assistants and clinical clerks, and the readiness with which you have rendered every assistance to us as students and colabourers in the field of medicine, have entitled you to our profound respect and sincere gratitude.

"Individually, many of us are highly indebted to you for special acts of kindness, as well as for the warm and continued interest you have always taken in our welfare. We have always been impressed with admiration and delight by the recollection of the fact, that such acts of kindness came spontaneously from your benevolent dispostion.

"In conclusion, we wish you a hearty farewell, a safe and pleasant voyage to England, and beg of your kind acceptance of the accompanying testimonial as a humble but sincere tribute of our respect and gratitude.

We remain
Dear Sir,
Yours Sincerely

Calcutta
The 21st April, 1883

Robin

Onoocool Chandra Chatterjee,
House Physician to 2nd Physician

Gunga Gobind Sarkar, House Physician
1st Physician ward

Amritalall Das, House Physician to 1st Surgeon,
M. C. Hospital
Raj Mohan Banerjee, Assistant Surgeon
Basanta Kumar Sen
Illegible
Rakhal Das Ghose, L. M. S., Secy. to the Student
Committee
Romanath De
Hurrendra N. Sing
Bama Charan Gupta
Surendra Nath Niogi
Upendra Nath Chatterjee, L. M. S.
R. S. Ash
Angus Robertson
Illegible
Kumudnath Bhattacharjya, Asstt. Secretary
Sasi Bhusan Dey
Sasi Mohan Dey
Sasi Nath Banerjee
Surendra Nath Banerjee
Kedar Nath Dutt
Annanda Prasanna Ghatak, etc. etc."

ডাঃ চন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁহার ছাত্রগণের অভিমত

উপরি লিখিত স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে একজনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইনি ডাঃ কেদারনাথ দত্ত। ইনি ডাঃ চন্দ্রের একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে ইঁহার বয়স আশির উপর। ডাঃ চন্দ্র সম্বন্ধে ইনি বলেন—"ডাঃ চন্দ্র মেডিকেল কলেজে মেটিরিয়া মেডিকা ও ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক ছিলেন।* তৎকালে হৃদ্‌রোগ ও ফুসফুসের

* "Dr. R. C. Chunder F. R. C. S. 1874-1893. Professor of Materia Medica & Clinical Medicine." The Centenary Report of the Medical College, Bengal, p. 115

চিকিৎসায় তাঁহার **সমকক্ষ** কেহ ছিল না। কেবল চিকিৎসা নহে, অধ্যাপনা-ব্যাপারেও তাঁহার অসামান্য কৃতিত্ব ছিল। ছাত্রদিগকে তিনি খুবই স্নেহ করিতেন। পড়াইবার পদ্ধতিও তাঁহার সুন্দর ছিল। ছাত্রদের মধ্যে কাহারও কোন অসুখ করিলে, তিনি বিনা ভিজিটে তাহাদের দেখিতেন ও নানারূপ সাহায্য করিতেন। তাঁহার ১৬৲ টাকা ফি ছিল। কিন্তু অসমর্থ রোগীর কাছে অনেক সময় তিনি একটি মাত্র ফি গ্রহণ করিয়া, আমাদের ডাকিয়া বলিতেন,—'তোমরা সামান্য কিছু নিয়ে রোগীকে প্রত্যহ দেখিয়া আসিয়া আমাকে রিপোর্ট দিবে।' এইভাবে ছাত্রদিগকেও তিনি অনেক সময় অর্থ পাওয়াইয়া দিয়াছেন। মেডিকেল কলেজে তিনি প্রায় কুড়ি বৎসরকাল অধ্যাপনা করেন।"

ডাঃ চন্দ্রের আর একজন কৃতী ছাত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত ফকির চন্দ্র সাধু-খাঁ (ইঁহার বর্তমান বয়স প্রায় ৭০ বৎসর) বলেন—"ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃদ্‌রোগের চিকিৎসায় তিনি অসামান্য দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। ছাত্রদিগের প্রতি তাঁহার অপরিসীম প্রীতি ও স্নেহ ছিল। তাঁহার একটি অমূল্য উপদেশ আমি আজীবন পালন করিয়া আসিয়াছি। তিনি বলিতেন—'দেয় ব্যবস্থাপত্র (Prescription) লিখিয়া কখনও তোমরা কাটাকুটি করিবে না। ইহাতে বিপদ্‌ আছে। অনেক সময় কম্পাউণ্ডারেরা ঠিক পড়িতে না পারিয়া, একটার বদলে আর একটা ঔষধ দিয়া বিভ্রাট বাধাইয়া তোলে। ইহার ফলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। আমার জীবনে, এ অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিয়াছি'।" আজকালকার এবং অধুনা পরলোকগত চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

ব্রিগেড সার্জন-পদ লাভ

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৭এ জানুয়ারী ডাঃ চন্দ্র Brigade Surgeon এর পদলাভ করেন এবং এই বৎসরের ১৯এ আগষ্ট তিনি অস্থায়ী Inspector General of Civil Hospitals (Bengal) হন।

মেরী চন্দ্র

কলিকাতায় তিনি ৯৩ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে বাস করিতেন।

এখানে তাঁহার সহিত তাঁহার পত্নী মেরী চন্দ্রও থাকিতেন। মেরী চন্দ্র ডাক্তার চন্দ্রের আত্মীয়স্বজনকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী চুণিমণি দাসীকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন এবং অনেক সময় তিনি তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মেরী চন্দ্র পরলোকগমন করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর বিলাতে ডাঃ চন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল।

ডাঃ চন্দ্রের দান

ভারতবর্ষ ও বিলাতে ডাঃ চন্দ্রের বহু সম্পত্তি ছিল। এই সমস্ত সম্পত্তির মূল্য প্রায় আট লক্ষ টাকা। এই সমস্ত সম্পত্তি, ডাক্তার চন্দ্রের মৃত্যুর পর, দানাদি কার্যে প্রদানান্তর, প্রায় তুল্যাংশে তাঁহার সহোদরা চুণিমণি দাসী ও সহোদর মহেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র পান।

বিলাতে—

১। Brompton Hospital for consumptivesএ £ 2000

২। London Hospitalএ £ 1000

৩। তাঁহার পত্নীর মৃত্যু-শয্যায় যে ধাত্রী সেবা করেন তাঁহাকে যাবজ্জীবন বার্ষিক £ 12 হিসাবে দেওয়া হয়।

কলিকাতায়—

১। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ৯০০০৲ হাজার টাকা—Dr. R. C. Chunder Scholarship in Materia Medica and Therapeutics. ইহার জন্য ভারতীয় ভৈষজ্য সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিতে হয়। (কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বাহাদুর "রঙ্গন ফুল" সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া একবার এই পুরস্কার বাবদ ৭৫০৲ টাকা প্রাপ্ত হন।)

২। ডাক্তার চন্দ্রের পত্নীর নামে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে বৃত্তি প্রতিষ্ঠার্থ—১২০০০৲ বার হাজার টাকা—Mrs. Mary Chandra

Scholarship. ইহার সুদ হইতে ২টি ছাত্রীকে মাসিক ২০৲ হিসাবে দুইটি বৃত্তি মেডিকেল কলেজে প্রদত্ত হয়। (ইহাতে দুইটি মেয়ে "স্বর্ণময়ী হোষ্টেলে" থাকিয়া ডাক্তারি শিক্ষা করিতে পারে।)

৩। Propogation of Christianityর জন্য Duff College এর কর্তৃপক্ষের হাতে ১৮,৭৫০৲ টাকা।

এ সমস্ত ব্যতীত জীবিতকালে ডাক্তার চন্দ্র বহু সৎকার্যে অনেক অর্থ দান করিয়া যান।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র আছে। ইহা কলেজ-হাসপাতালের দ্বিতলে প্রধান সোপানশ্রেণীর পশ্চিম কোণে রক্ষিত।

মাতাপিতৃহীন অবস্থায় মাত্র নিজের প্রতিভা ও অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়-বলে ডাঃ চন্দ্র যে সম্মান ও কৃতিত্ব অর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকের ভাগ্যে দুর্লভ।

ডাক্তার চন্দ্রের অবসর-গ্রহণে ছাত্রবর্গের অভিনন্দন-প্রদান

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার চন্দ্র কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সেই সময়ে কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ তাঁহাকে দুইটি অভিনন্দন প্রদান করেন; তন্মধ্যে একটি রৌপ্যনির্মিত কাস্কেটে, অপরটি হস্তিদন্তনির্মিত একটি সুদৃশ্য বাক্সে প্রদত্ত হয়। অভিনন্দনপত্র দুইখানিই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাস্কেট এবং বাক্সটি তাঁহার অন্যতম ভাগিনেয় ৺গৌরমোহন দের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস দের নিকট আছে। তাহাতে এইরূপ লেখা আছে—

কাস্কেট—

"Presented,
to
Brigade Surgeon R. C. Chandra
By the Pupils of the
Medical College
The Lady Students
The Civil European
And Native Students."

আইভরি বাক্স—
"Presented
by
The Military Students
of the
Calcutta Medical College
to
Brigade Surgeon R. C. Chandra
On Retirement."

ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, ডাক্তার চন্দ্রের অধ্যাপনায় ও সদয় ব্যবহারে তাঁহার ছাত্র ও ছাত্রীগণ তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিল।

মেরী চন্দ্রের মৃত্যু ও ডাঃ চন্দ্রের পূর্ব উইল বাতিল-করণ

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার চন্দ্রের সহধর্মিণী মেরী চন্দ্র পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে ডাক্তার চন্দ্র একখানি দানপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে পূর্বে যে সমস্ত দানের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহা ছাড়া তাঁহার দুইজন শ্যালককে (মেরী চন্দ্রের সহোদর) কিছু নগদ টাকা, তাঁহার মাতাকে মাসিক ১০০৲ টাকা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্রকে মাসিক ১০০৲ টাকা, তাঁহার ভগ্নী চুণিমণি দাসীকে মাসিক ১০০৲ টাকা, তিন ভাগিনেয় গৌরমোহন দে, সাতকড়ি দে ও তিনকড়ি দে প্রত্যেককে পাঁচশত টাকা দিবার ব্যবস্থা ছিল। মেরী চন্দ্রের হীরা-মুক্তা প্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কার লর্ড হ্যাল্‌সবেরীর কন্যাকে দান করেন। মেরী চন্দ্রের মৃত্যুর সময় রাজেন্দ্রচন্দ্র কলিকাতায় ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি বিলাত গমন করেন এবং তাঁহার স্ত্রীর নিকট যে আনুমানিক আট লক্ষ নগদ টাকা ছিল, তাহার কিছুই তিনি পান নাই। এই কারণে তিনি সম্ভবতঃ সন্দিহান ও ক্রোধ-পরবশ হইয়া স্বহস্তে কাঁচি দ্বারা শ্যালকদ্বয়ের নাম কর্তন করিয়া উইলখানি বাতিল করেন।

ডাঃ চন্দ্রের মৃত্যুতে সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্রের মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষীয়

সংবাদপত্রে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হইলে তাঁহার ভ্রাতা মহেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইবার চেষ্টা করেন। তাঁহার জীবিতা ভগ্নী চুণিমণি দাসীও ভ্রাতার বিষয়ের অর্ধাংশ পাইবার আশায় বিলাতে লর্ড হ্যালস্‌বেরির নিকট আবেদন করেন এবং প্রকাশ করেন যে, যদিও ডাক্তার চন্দ্র তাঁহার চরম দানপত্র স্বহস্তে বাতিল করিয়া গিয়াছেন তথাপি তাঁহার ইচ্ছা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার দানপত্রে লিখিত উদ্দেশ্যে তাঁহারা যাবতীয় অর্থ প্রদান করিবেন এবং সেই টাকা বাদ অবশিষ্ট অর্থ তাঁহাদের ভ্রাতাভগ্নী উভয়ের মধ্যে সমভাবে দিবার ব্যবস্থা করা হউক। ইহাতে লর্ড চ্যানসেলার হ্যালসবেরি অতিমাত্র প্রীত হইয়া লণ্ডনের বিখ্যাত সলিসিটর Dulston Elimeus & Sons কে আবশ্যক দলিল সম্পাদনের পরামর্শ দেন। তাহাতে চুণিমণির ভ্রাতা মহেন্দ্রবাবু অসম্মত হওয়ায় কলিকাতা হাইকোর্টে মাননীয় বিচারপতি সেল সাহেবের এজলাসে মামলা হয় এবং বিচারে উভয় ভ্রাতা এবং ভগিনী সমভাবে প্রায় সাত লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়েন।

চুণিমণি দাসীর ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠা

চুণিমণি দাসীর স্বামী বৈদ্যনাথ দে মহাশয় একজন সরল এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর চারি বৎসর পরে চুণিমণি দাসী তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার চন্দ্রের বিষয় প্রাপ্ত হয়েন। তখন তাঁহার তিন পুত্র বর্তমান; জ্যেষ্ঠ নরসিংহচন্দ্র দের ইহার পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। ডাক্তার চন্দ্রের সম্পত্তি লাভ করিয়া চুণিমণি দাসী তাঁহার পুত্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি ঠাকুরবাটী-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। তদনুযায়ী ৪০,০০০৲ হাজার টাকা ব্যয়ে গোবিন্দ সেন লেনে ঠাকুরবাটী নির্মাণ করিয়া অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের নিকট ৭৫,০০০৲ হাজার টাকা জমা দিয়া একটি ট্রাষ্টডিড সম্পাদন করিয়া তাঁহার পুত্রত্রয়কে ট্রাষ্টী এবং সেবায়ত মনোনীত করেন। মাতৃভক্ত সন্তান গৌরমোহন তাঁহার জীবদ্দশায় ঠাকুরবাটীর কার্য, দেবসেবা ও সাময়িক পার্বণাদি যথাযথরূপে কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করেন।

৺গৌরমোহন দে

সেবায়ত গৌরমোহনের দেবসেবার্থ বাটী-দান

গৌরমোহন দে তাঁহার পিতার ন্যায় ধর্মানুরাগী ও দেবদ্বিজে ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় পূজা-আহ্নিকে অতিবাহিত করিতেন। মাতার প্রতিষ্ঠিত দেবায়তন ও শ্রীবিগ্রহের প্রতি তিনি অহর্নিশ ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ ও পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্যয়াদি নির্বাহ করিয়া স্বোপার্জিত সঞ্চিত অর্থে স্বীয় বাসভবনের সন্নিকটে ১৬।১ নং হারকাটা লেনে একখানি বাটী খরিদ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে ঐ বাটীখানির আয় দানপত্র দ্বারা দেবসেবায় অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দানপত্রে লিখিত আছে যে তিন বৎসর অন্তর তাঁহার পুত্রগণের পালার সময় উক্ত বাটীর আয় হইতে সঞ্চিত অর্থের আনুমানিক অর্ধপরিমাণ অর্থ—২৫০০৲ হাজার টাকা—রাসোৎসবে ব্যয়িত হইবে এবং অপরার্ধে জাতিবর্ণনির্বিশেষে দীনদরিদ্রগণের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হইবে। এইরূপে তাঁহার স্বোপার্জিত একমাত্র সম্পত্তি পুত্রগণকে না দিয়া দেবোদ্দেশে অর্পণ করিয়া তিনি নিঃস্বার্থ দানশীলতা এবং ধর্মাত্মতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া জনসমাজে মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণও পিতার এই ব্যবস্থা পরম এবং চরম কর্তব্য জ্ঞানে যথাযথভাবে পালন করিয়া আসিতেছেন। এতদুপলক্ষে তাঁহাদের পালায় রাসোৎসবে মহাসমারোহে অষ্টপ্রহর হরিনাম সঙ্কীর্তন, দরিদ্রনারায়ণের সেবা ও অনাথ-আতুরগণকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই বিষয়টি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য পিতৃপিতামহের ভক্ত ও অনুরক্ত বংশধর গৌরমোহন বাবুর মধ্যমপুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস দে তাঁহার বাসভবনের দ্বারপ্রান্তে মর্মরফলকে নিম্নলিখিত বচন গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন—

"শ্রীপাট অম্বিকা কালনার সিদ্ধ বৈষ্ণব
শ্রীমদ্ ভগবান্‌দাস বাবাজী
মহাশয়ের প্রিয়তম শিষ্য পরম ভাগবত
৺বৈদ্যনাথ দে
মহাশয়ের মধ্যম পুত্র
যিনি ৬।১, গোবিন্দ সেন লেনস্থ

ঠাকুর বাটীর প্রথম ট্রাষ্টী ও সেবায়ৎ
নিযুক্ত হইয়া নিজ পালায়
মহাসমারোহে রাসোৎসব সম্পন্ন
ও দীন জনের সেবা এবং শীতবস্ত্র
বিতরণ করিবার জন্য স্বোপার্জিত অর্থ
দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন
সেই পরম ভাগবত গৌরগতপ্রাণ
৺গৌরমোহন দে
মহাশয়ের স্মরণার্থ
তদীয় মধ্যমাত্মজ ও অন্যতম সেবায়ৎ
বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীকৃষ্ণদাস দে
কর্তৃক এই ফলক স্থাপিত।"

গৌরমোহনের পিতৃভক্তি ও ধর্মজীবন

গৌরমোহন দে ১২৫৯ সালে ২রা আষাঢ় তারিখে গোবিন্দ সেন লেনস্থ পৈত্রিক বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে বিদ্যাশিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি মিলিটারী একাউন্টস অফিসে উচ্চপদে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছু-দিন চাকুরী করিবার পর তাঁহার অফিস রাওলপিণ্ডিতে স্থানান্তরিত হয় এবং কর্তৃপক্ষগণ গৌরমোহন বাবুকেও তথায় যাইবার আদেশ দেন। কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে অনুমতি না দেওয়ায় গৌরমোহন বাধ্য হইয়া সামান্য পেন্সন লইয়া কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার ন্যায় তিনিও সনাতন বৈষ্ণব-ধর্মে নিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে হরিনাম মহামন্ত্র জপ করিতেন। প্রতিদিন তিনি পিতার নিকট শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেন এবং তাঁহার পিতা বৈদ্যনাথ দে মহাশয় আত্মীয়-বন্ধুগণের সমক্ষে বোধগম্য ও সুললিত ভাষায় তাহা ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি কলুটোলানিবাসী স্বর্গীয় তারকনাথ দত্তের দ্বিতীয়া কন্যা অমৃতকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন কন্যা এবং পাঁচ পুত্র;

কানাইলাল, কৃষ্ণদাস, গোপালদাস, চৈতন্যদাস ও নন্দলাল। পুত্রগণ সকলেই পিতৃপিতামহের অনুরূপ গুণসম্পন্ন, ভক্তিমান এবং বিনয়বিনম্র। মধ্যমপুত্র কৃষ্ণদাস সর্বজনপরিচিত। তিনি পরোপকারী এবং স্বজাতির ও সমাজের সর্ব কার্যে অগ্রণী।

গৌরমোহন বাবুর পত্নী অল্পদিন হইল ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। গৌরমোহন বাবু শেষ জীবন কেবল ধর্মালোচনায় যাপন করিতেন। তিনি অল্পভাষী ছিলেন এবং কখনও পরচর্চা করিতেন না ; জীবনে তিনি কখনও আদালতে পদার্পণ করেন নাই। তাঁহার দানপত্রে লিখিত রাসোৎসবের ব্যবস্থা নিজ হস্তে সম্পন্ন করিবার জন্য পুত্রগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, নিজ হস্তে দানাদি করিলে পাছে তাঁহার মনে তমঃ উপস্থিত হয় সেই জন্য তিনি পুত্রগণের উপর তাহার ভার অর্পণ করিয়া যাইতেছেন।

১২৯৮ সালে তাঁহার পিতা ৺বৈদ্যনাথ দের মৃত্যু হইলে গৌরমোহন পিতার নির্দেশানুসারে শ্রীধাম নবদ্বীপে তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সুসম্পন্ন করেন। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক কার্য ধর্মানুমোদিত ছিল এবং প্রতিদিন আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে শাস্ত্রালোচনা ও সঙ্কীর্তন করিতেন। তাঁহার মাতার ঠাকুরবাটীর প্রথম ও প্রধান ট্রাষ্টি এবং সেবায়ত রূপে তিনি দেবালয়ের কার্য প্রাণপাত পরিশ্রমে ও অচ্ছিদ্রভাবে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় দেবালয় হইতে কখনও অতিথি বিমুখ হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তিনি সকলকে শোক করিতে নিষেধ করিয়া হরিনাম শুনাইতে আদেশ করেন। সন ১৩১৩ সালের ২২শে আশ্বিন সজ্ঞানে হরিনাম স্মরণ করিতে করিতে ৫৪ বৎসর বয়সে তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করেন।

৺কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল ও তাঁহার কাব্য-প্রতিভা

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার বড়াল বাংলা দেশের একজন জনপ্রিয় সুকবি। তাঁহার জীবনের কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। কারণ, কবির কীর্তি বুঝিতে হইলে, তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। তাঁহার প্রকৃতি ও ভাবের ছায়া কি ভাবে তাঁহার রচিত কাব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান লওয়া প্রথম কর্তব্য। গুপ্ত-কবি ঈশ্বরচন্দ্রের "জীবন-চরিত" লিখিতে বসিয়া সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র একদিন লিখিয়াছিলেন—"কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে—সন্দেহ নাই; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণমাত্র, তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা কবির কীর্তি, তাহা ত আমাদেরই হাতে আছে, পড়িলেই বুঝিব কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে—কি প্রকারে—এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনা-দত্ত প্রধান শিক্ষা, এবং জীবনী ও সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য।"

জন্ম ও বাল্যজীবন

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার চোরবাগান-পল্লীস্থ শ্রীনাথ রায়ের গলিতে সুবর্ণবণিক্-বংশে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালীচরণ বড়াল। তাঁহাদের আদি নিবাস চন্দন-নগরে।

বাল্যে অক্ষয়কুমার হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা বড় বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই; কিন্তু তাঁহার তীব্র পাঠানুরাগ এ শিক্ষাকে পূর্ণতর করিয়াছিল। তাঁহার এই পাঠানুরাগ পরিণত বয়স পর্যন্ত প্রবল ছিল; কোনও ইংরাজী বা বাংলা ভাল গ্রন্থ পাইলে, তাহা পাঠ করিবার লোভ তিনি সংবরণ করিতে পারিতেন না।

কবিবর ৺অক্ষয়কুমার বড়াল

কবিগুরু বিহারীলালের শিষ্য অক্ষয়কুমার

পঠদ্দশায় তিনি কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর নিকট যাতায়াত করিতেন। এ সময়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও সুকবি প্রিয়নাথ সেন মহাশয়গণও কাব্যরসাস্বাদনের জন্য বিহারীলালের ভবনে সমবেত হইতেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অক্ষয়কুমারও বিহারীলালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে

বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতার 'দিল্লী এণ্ড লণ্ডন ব্যাঙ্কে' হিসাব-বিভাগে কর্মচারিরূপে নিযুক্ত হন। বহুদিন এস্থলে কার্য করিবার পর উক্ত ব্যাঙ্কের কর্মাধ্যক্ষের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় তিনি কর্ম পরিত্যাগ করেন। পরে তিনি North British Life Insurance Co'র অফিসে প্রধান কর্মচারীর পদ পাইয়া তথায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত কার্য করিয়াছিলেন। তিনি হিসাবে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এবং তাঁহার উপরিতন ইংরাজ-কর্মচারিগণও তাঁহার গুণের প্রশংসা করিতেন।

প্রথম কবিতা প্রকাশ

১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "বঙ্গদর্শনে" অক্ষয়কুমারের "রজনীর মৃত্যু" নামক সুদীর্ঘ কবিতাটি প্রকাশিত হয়। তখন সঞ্জীববাবু "বঙ্গদর্শনের" সম্পাদক এবং সুকবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর বঙ্গদর্শনের কবিতা-নির্বাচন ও সেগুলি সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিবার ভার ছিল। সুতরাং অক্ষয়কুমার-রচিত এই "রজনীর মৃত্যু"র স্থানে স্থানে পরিবর্তিত হইয়া "বঙ্গদর্শনে" বাহির হয়। ইহাই বোধ হয়, অক্ষয়কুমারের প্রথম প্রকাশিত কবিতা।

পরবর্ত্তী রচনা

ইহার প্রায় দেড় বৎসর পরে, অর্থাৎ ১২৯০ সালের চৈত্রমাসে, তাঁহার "প্রদীপ" বাহির হইল। বাহির হইবামাত্রই বাংলার শিক্ষিত সমাজ ইহাকে বরণ করিয়া লইলেন। এই ভাবে উৎসাহিত হইয়া ১২৯২ সালের আশ্বিন মাসে, তাঁহার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "কনকাঞ্জলি" প্রকাশিত হইল।

"কনকাঞ্জলি"-প্রকাশের দুই বৎসর পর অর্থাৎ ১২৯৪ সালে, তাঁহার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ "ভুল" প্রকাশিত হইল। এই সময়ে তিনি অনেকগুলি প্রেম-সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন। ১২৯৪ ও ১২৯৫ সালের 'নব্যভারতে' এবং ১২৯৬ সালের "কল্পনা" পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর ১৩০০ সালে "প্রদীপে"র, এবং ১৩০৪ সালে "কনকাঞ্জলি"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৩১৩ সালের ১৯শে মাঘ তাঁহার পত্নীবিরোগ হয়,—পত্নীবিয়োগজনিত শোকে তিনি যে কবিতাবলী রচনা করেন, তাহা "এষা" কাব্যে প্রকাশিত হয়। এই "এষা"ই কবির শেষ প্রকাশিত কাব্য।

১৩১৭ সালে তাঁহার "শঙ্খ" এবং এবং ১৩১৯ সালে "এষা" প্রকাশিত হইয়াছিল। "এষা" জনসমাজে এতদূর আদৃত হয় যে, উহার প্রথম সংস্করণ এক বৎসরেই নিঃশেষিত হয়।

১৩২০ সালে "এষা"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, এবং ১৩১৯ সালে "প্রদীপে"র তৃতীয় সংস্করণ, ১৩২০ সালে "শঙ্খে"র দ্বিতীয় সংস্করণ ও ১৩২৪ সালে "কনকাঞ্জলি"র তৃতীয় সংস্করণ বাহির হয়।

১৩১১ সালের বৈশাখের "সাহিত্যে" তিনি ওমারের অনুকরণে ২৭টি কবিতা-স্তবকে "পান্থ" নামক কবিতা প্রকাশ করেন। ইহার সাত বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩১৮ সালের বৈশাখের "সাহিত্যে" আরও ২৪টি কবিতাস্তবক প্রকাশিত হয়। সর্বশুদ্ধ ৫৩টি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেমিক কবি "চণ্ডীদাসে"র জীবনের ঘটনাবলী লইয়া তিনি একখানি নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহার শেষাঙ্ক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই।

শেষ কবিতা

তাঁহার সর্বশেষ-মুদ্রিত কবিতা "স্বজাতি-সম্ভাষণ", "সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী"র চতুর্থ (চুঁচুড়া) অধিবেশনে চুঁচুড়ায় পঠিত ও "সুবর্ণবণিক্ সমাচারে" প্রকাশিত হয়। এইখানে কবিতাটি উদ্ধৃত করা হইল :—

"আপনারে নিশি দিন
ভাবে যেই নীচ হীন,

অতি কৃপাপাত্র দীন জগতে সেজন।
জীবগর্ব নাহি যার
ঊর্ধ্ব গতি নাহি তার ;
অল্প সুখ, অল্প আশা—ক্ষুদ্রের লক্ষণ।
কাব্যে ইতিহাসে কুত্র,
সংহিতার কোন সূত্র,
দেয় নাই ক্ষুদ্রজনে মহত্ত্ব-আসন।
যাহা শ্রেয়ঃ, যাহা প্রেয়,—
স্বেচ্ছায় না দেয় কেহ ;
সহজে ধরে না কেহ পরের চরণ।
এ জীবন মহাহবে
অক্ষম বিজয়ী কবে ?
কে লভেছে কাব্যধন বিনা প্রাণপণ ?
স্বাস্থ্য জ্ঞান যশ অর্থ
সে-ই লভে যে সমর্থ ;
'শক্তের দু'কূল মুক্ত'—যথার্থ বচন।
বল্লালের হিংসা দ্বেষ
হোক্ অভিমানে শেষ ;
অপমানে লভি জ্ঞান—জ্ঞাতির মিলন।
কুটিলের দম্ভ ক্রোধ,
শ্রীবল্লভে পরিশোধ ;
অতীত গৌরবে কর ভবিষ্যে বরণ !
"কুলজন্ম দৈবায়ত্ত,
মমায়ত্ত পুরুষত্ব"—
কর্ণের এ মহাবাক্য করিয়া স্মরণ—
অবিনয়ী হইও না,
অবিচার সহিও না—
অগ্রসর—অগ্রসর স্মরি নারায়ণ,
হে বণিক্‌গণ !"

মৃত্যু-শয্যায় শুইয়াও তিনি তাঁহার কবি-ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র দাসের মৃত্যু-উপলক্ষে একটি শোক-কবিতা লিখিয়াছিলেন। সেইটি প্রকাশিত হয় নাই।

অক্ষয়কুমার ও কবিবর রবীন্দ্রনাথ

তিনি এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বিহারীলালের শিষ্য। তাঁহারা উভয়ে একত্র বিহারীলালের কাছে কাব্য রচনা শিক্ষা করিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের এই মধুর সম্বন্ধের পরিচয় "ভুলে"র "উপহার"-কবিতার ভিতর পাওয়া যায়—

"রবি!

এই জগতের দূরে—
যেন কোন মেঘ-পুরে,
তুমি আমি দুইজনে বেড়াতাম খেলিয়া;
হাতেতে তুলিছে বাঁশী
ঠোঁটে উছলিছে হাসি,
চারিদিক্ পানে চেয়ে, চারিদিক্ ভুলিয়া
তুমি আমি দুইজনে বেড়াতাম খেলিয়া।
পুঞ্জ পুষ্প তারা ফুল
সৌন্দর্য কিরণাকুল,
চেয়ে র'ত মুখপানে চারিদিকে ছাইয়া;
ইন্দ্রধনু পাখা মেলি,
কত মেঘ খেলি খেলি,
লুটায়ে পড়িত পায়ে ধীরে ধীরে গাইয়া।
চেয়ে র'ত মুখপানে, চারিদিকে ছাইয়া।"

কবি বিহারীলালের মৃত্যুতে অক্ষয়কুমার

১৩০১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয় পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে অক্ষয়কুমার একটি কবিতা রচনা

করেন। ১৩০৪ সালে, "কনকাঞ্জলি"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময়, এই কবিতাটি উৎসর্গ-কবিতারূপে উহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়।

এই কবিতাটি এত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী যে, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল—

"নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর
নহে কোন কর্মী—গর্বোন্নত-শির,
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্তি ছবি ;
তবু কাঁদ কাঁদ—জনম-ভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।
যাও, তবে যাও! বুঝিয়াছি স্থির ;—
মানব-হৃদয় কতই গভীর ;
বুঝেছি কল্পনা কতই মদির,
কি নিষ্কাম প্রেমপথ!
দিলে বাণীপদে লুটাইয়া শির
দলি' পদে পর-মত।
বুঝায়েছ তুমি কত তুচ্ছ যশ ;
কবিতা চিন্ময়ী, চির সুধা-রস ;
প্রেম কত ত্যাগী—কত পরবশ,
নারী কত মহীয়সী!
পূত ভাবোল্লাসে মুগ্ধ দিক্-দশ,
ভাষা কিবা গরীয়সী!
বুঝায়েছ তুমি, কোথা সুখ মিলে—
আপনার হৃদে আপনি মরিলে ;
এমনি আদরে দুঃখেরে বরিলে
নাহি থাকে আত্মপর।
এমনি বিস্ময়ে সৌন্দর্য হেরিলে
পদে লুটে চরাচর।"

অক্ষয়কুমারের বন্ধুপ্রীতি

কবি অক্ষয়কুমারের হৃদয় সমবেদনায় পূর্ণ ছিল। এই সমবেদনার গুণে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। যখন স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় বিশেষ বিপন্ন হইয়া অক্ষয়কুমারকে পত্র লেখেন, তখন তিনি এই দরিদ্র কবি-ভ্রাতার দুঃখে বিগলিত হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তিনি পরিচিত ও অপরিচিত বহু ব্যক্তিকে সাহায্য করিতেন। তাঁহার বন্ধুপ্রীতি ও বন্ধুবাৎসল্য অপূর্ব ; ভূতপূর্ব "কল্পনা"-সম্পাদক সুলেখক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করিলে, তাঁহার শিশুপুত্র ও বিধবা পত্নীকে তিনি যে ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ন্যায় উদার-হৃদয় কবিরই উপযুক্ত।

অক্ষয়কুমারের চরিত্র

তিনি বেশ-ভূষা ও লোক-ব্যবহারে সাদাসিদা ছিলেন। কেহ কোনদিন তাঁহার বেশ-ভূষার কোন প্রকার পারিপাট্য দেখেন নাই।

তিনি দুর্বল-চিত্ত ছিলেন না। যশঃ বা প্রশংসা কোনদিন তাঁহাকে প্রলুব্ধ বা বিচলিত করিতে পারে নাই। সমালোচক বা পাঠকের মুখ চাহিয়া তিনি কোন দিন কবিতা রচনা করেন নাই। তাঁহার প্রথম সংস্করণের "প্রদীপে" প্রকাশিত "সমালোচকের প্রতি" শীর্ষক কবিতার একটি অংশে তিনি ইহার পরিচয় দিয়াছেন !—

"কবি নয় চিত্রকর, ঘুটে ঘুটে নানা রঙ্
ধরিবে তোমার আঁখি 'পরে।
চাবে তব মুখপানে, ভিক্ষার সজল নেত্রে
কি হয়েছে জানিবার তরে।"

তাঁহার গুরু বিহারীলাল যেমন অযথা লোকনিন্দাকে পদতলে দলিত করিয়া বাণীর চরণ-সরোজে শির লুটাইয়া দিতেন, তিনি তেমনি—

"স্নেহময়ী প্রকৃতির দুর্ললিত শিশু কবি,
যখন যা মনে ধরে তার—
খেলিব তাহাই লয়ে, কি হবে খেলার পরে
জানে না, ভাবে না তার ধার।"

উপাধি-লাভ ও মৃত্যু

মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি 'শ্রীশ্রীবঙ্গধর্ম-মণ্ডল' কর্তৃক "কবিতিলক" উপাধিতে ভূষিত হন।

১৩২৫ সালের ফাল্গুন মাস হইতে তাঁহার শরীর অসুস্থ হয়। স্বাস্থ্য-লাভের আশায় তিনি পুরী গমন করেন। কিন্তু সেখানে অবস্থার উন্নতি না হইয়া অবনতি হইতে থাকায় তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিবার চারিদিন পরে, বৃদ্ধা জননী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, দুই পুত্র, তিন কন্যা ও দৌহিত্র প্রভৃতিকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া তিনি ১৩২৬ সালের ৪ঠা আষাঢ় তারিখে পরলোক গমন করেন। ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্বে বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠস্থিত স্বর্ণ-অলিন্দে ভর দিয়া যে বিষাদিনী নারী কাতরনেত্রে ধরিত্রীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছিলেন—আজি তিনিই আসিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার করধারণপূর্বক হাসিমুখে আবার বৈকুণ্ঠ-পথাভিমুখিনী হইলেন। যাও কবি, তোমারই ভাষায় বলি—

"এসেছিলে শুধু গায়িতে প্রভাতী,
না ফুটিতে উষা না পোহাতে রাতি,
আঁধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি
কুহরিল ধীরে ধীরে ;
ঘুম ঘোরে প্রাণী, ভাবি স্বপ্নবাণী
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে।
কাঁদ বঙ্গবাসী, জ্বলিছে শ্মশান
কত মুক্তাছত্র, কত পুণ্য গান,
কত ধ্যান জ্ঞান, আকুল আহ্বান
অবসান চিরতরে।
পুণ্যবতী মার পুত্র পুণ্যবান্
ওই যায় লোকান্তরে।"

অক্ষয়কুমারের গ্রন্থাবলী

অক্ষয়কুমার পাঁচখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন—"প্রদীপ", "কনকাঞ্জলি",

"ভুল", "শঙ্খ" ও "এষা"। বাংলার কাব্য-সাহিত্য, বিশেষতঃ গীতি-কবিতায় তিনি যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার কবিতা আলোচনায় তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

কবির কাব্য দ্বারাই তাঁহার অন্তরের ভাব ও সেই ভাবের বিকাশ অনুভূত হয়। অক্ষয়কুমারের "প্রদীপ", "কনকাঞ্জলি", "ভুল" ও "শঙ্খে" তাঁহার কবি-প্রতিভার অসামান্য পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু 'এষা'তেই তাঁহার রচনা-মাধুর্যের ও কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও পরিণতি লক্ষিত হয়। পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী বা আত্মীয় বিয়োগ-ফলে বঙ্গসাহিত্য যে সমস্ত গদ্য ও পদ্যরচনা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে, "এষা" তাহাদের মধ্যে মুকুটমণি।

প্রকৃতি-বর্ণনা, প্রণয়, শোক-মিশ্রিত প্রণয় ও শোক এই চারি শ্রেণীর কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার "এষা" ব্যতীত অপর চারিখানি কাব্যেও এই চারি শ্রেণীর কবিতা অল্পবিস্তর স্থান পাইয়াছে।

অক্ষয়কুমার ও কবি বিহারীলাল

তাঁহার গুরু বিহারীলাল, প্রণয় ও দুঃখের বর্ণনায় অদ্বিতীয় ছিলেন; গুরু-আশীর্বাদ লাভ করিয়া শিষ্য অক্ষয়কুমারও, প্রণয় ও শোক-বর্ণনায় অপরাজেয় হইয়াছেন। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ কি ভাবে পরস্পরাভিমুখী হইয়াছে, তাহার পরিচয় দিবার জন্য উভয়ের কাব্য হইতে কিছু উদ্ধৃত করা হইল।

একটি কথা এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়—তাঁহারা উভয়েই পত্নী-ভাগ্যে ভাগ্যবান্ ছিলেন। প্রকৃত সহধর্মিণী লাভ করিয়া তাঁহার অনাবিল ও নিষ্কাম স্বামিপ্রেম-সাগরে নিমজ্জিত হইতে পারিলে যে অপরিসীম প্রণয়-সুখের অধিকারী হইতে পারা যায়, তাঁহারা উভয়েই সে সুখের অধিকারী ছিলেন।

বিহারীলাল বলিতেছেন—

"নয়ন-অমৃত রাশি, প্রেয়সী আমার!
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার!

মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব
সম্মুখে সে মুখ-শশী জাগে অনিবার !
কি জানি কি ঘুম-ঘোরে
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর ।”

পত্নীনিষ্ঠ ও পত্নীপ্রেম-মুগ্ধ অক্ষয়কুমার তাঁহার পত্নীর ভিতর বিশ্বের সমগ্র নারীজাতির যে অপূর্ব ও মহান্ ভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার “প্রদীপে”র “নারীবন্দনা” নামক কবিতায় নিম্নলিখিত চারিটি পংক্তিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে—

“তোমারি ও লাবণ্য-ধারায়
কালের মঙ্গল পরকাশ,
অসম্পূর্ণ এ সংসারে, তুমি পূর্ণতার দীপ্তি,
সন্ধ্যা-মেঘে স্বর্গের আভাস ।”

বিশেষের ভিতর দিয়া বাঙালী কবি কিরূপে যে বিশ্বকে উপলব্ধি করিতে পারেন ইহা তাহারই পরিচয়, এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইহা বিশেষ-রূপে প্রণিধানযোগ্য । প্রকৃত প্রেম বা প্রণয় যে উৎস হইতে স্বতঃ উৎসারিত হয় সেই পত্নী-প্রেম অক্ষয়কুমারের হৃদয় কি ভাবে অধিকার করিয়াছিল, তাহার ছবি “এষা”র নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি পাঠে জানিতে পারা যায়—

“কি ছিলে আমার তুমি, প্রেয়সী কি ক্রীতদাসী ?
দুটী হাতে সেবা ভরা, বুকে ভরা প্রেমরাশি ।
একান্ত আশ্রিতপ্রাণা—নাই নিজ সুখ দুখ,
সব আশা—সব সাধ আমাতেই জাগরূক ।”

* * *

“সতী,
মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি !
তুমি যাহে দেছ পদ—
সে যে ফুল্ল কোকনদ !
সে নহে শ্মশান-চুল্লী ভীষণ মূরতি ।”

কবি অক্ষয়কুমারের ভাবুকতা

"প্রদীপ" কবির প্রথম গ্রন্থ। এই প্রথম রচনাতেই তাঁহার কবি-প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার একটি মাত্র কবিতা "হৃদয়-সংগ্রাম" পাঠ করিলেই—এই কথার সার্থকতা বুঝা যাইবে। অন্তরের সহিত বাহিরের এই দুর্বার দ্বন্দ্বকে লক্ষ্য করিয়াই ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়, এই খানেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে Romanticism-এর জন্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির এক স্তরে ইহা আছে। বড়াল কবিতেও ইহা আছে।—

"কি ভীষণ চলেছে সংগ্রাম
প্রিয়জন সনে অবিরাম!
পূজ্য বৃদ্ধ পিতা মাতা, স্নেহের পুত্তলি ভ্রাতা,
সহোদরা—বালিকা সুঠাম,
তাহারাও জনে জনে, উন্মত্ত এ মহারণে!
হা জীবন, হায় ধরাধাম!
সখা সখী আত্মীয় স্বজন—
তারাও যুঝিছে অনুক্ষণ!
প্রাণাধিকা প্রাণেশ্বরী, তারও সনে যুদ্ধ করি,
সে-ও শত্রুসেনা একজন!
শত তপস্যার ফল এই শিশু সুকোমল
এ-ও এক যোদ্ধা বিচক্ষণ!"

Romanticismএর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে, একটা বিদ্রোহের ভাবও আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্তরের কবিতায় ইহা খুব সুপরিস্ফুট। কিন্তু বড়াল-কবির কাব্যের রূপান্তরে যে দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহের ভাব ফুটিয়াছে, তাহা প্রথম হইতেই অধিক পরিমাণে আত্মস্থ। বড়াল কবি কোথাও নিজেকে হারাইয়া ফেলেন নাই। তাঁহার "প্রদীপে"র "আবাহন" কবিতা একনিষ্ঠ ও বিশ্বাসী হিন্দুসাধকের আবাহন,—এ আবাহনের অভিনবত্ব বুঝাইবার জন্য মাঝে মাঝে উদ্ধৃত করা হইল—

"হের এ প্রণবে, সতী
স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড গতি ;
দূর বিষ্ণুলোক হ'তে
আশীর্বাদ আসে স্রোতে,
ঝর ঝর সপ্ত স্বর্গ, ঝরে শির 'পর।
ক্ষুদ্র নয় তুচ্ছ নয় নর !"

ইহা ইহলোক-পরলোকের সম্বন্ধে বিশ্বাসী হিন্দুর কথা। প্রাণের দুর্বার বেগে বড়াল কবি ঘর হইতে বাহির হইয়াছেন। তারপর—

"এস তবে এস ভবে,
সত্যই কৃতার্থ হবে ;
এ বিকচ তনু মন
বিধাতার ধ্যেয় ধন—
দেবাসুর রণক্ষেত্র, সর্বতীর্থ-সার ;
উপযুক্ত আসন তোমার।"

কবির সুর এখানে উচ্চ গ্রামে পৌঁছিয়াছে— "যাহা আমার অভিমান ও আমিত্বের আকর, যাহা পাপাসুর ও পুণ্যদেবতার রণভূমি—এক কথায়, যাহা আমার সর্বতীর্থের সারস্বরূপ—সেই তনুমনকে তোমার উপযুক্ত আসন করিয়া দিতেছি।" তারপর—

"এস, ভেদি' ব্রহ্মরন্ধ্র
হে আনন্দ ভূমানন্দ !
উৎপাটিয়া মর্মস্থল
সদ্যঃ রক্তে ঝল-ঝল—
এস আত্ম-বিনাশিনি, পরার্থ-জীবিতে,
সত্য-শিবে, সৌন্দর্য-সস্মিতে !

ইহা একেবারে একনিষ্ঠ বাঙালী সাধকের কথা। ইহা চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের দেশের বাণী। ইহার পর আর সুর উঠে না।

কাব্যে বৈচিত্র্য ও শোক-কবিতা

বাংলার এই সুর ও রূপ লইয়া বড়াল কবি 'প্রদীপে'র পরে ক্রমে 'কনকাঞ্জলি,' 'ভুল' ও 'শঙ্খে' তাঁহার অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভাকে বিকশিত করিয়া গিয়াছেন। জীবনের বিচিত্র ভাব উল্লিখিত কাব্যত্রয়ে বিচিত্র সুরে ও বিচিত্র-রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির সাদাসিদা জীবনের মধ্যেও কত বিচিত্র ভাবের সমাবেশ ছিল,—তাঁহার কাব্যসৃষ্টিতে কত-বৈচিত্র্য একের পর আর দেখা দিয়াছে।—পত্নীবিয়োগের আঘাত পাইয়া কবি-হৃদয়ে যে ভাবের প্রবল তরঙ্গ উঠিল,—তাহারই ঘাত-প্রতিঘাতে "এষা"র এক একটি কবিতার সৃষ্টি হইল। এই শোক মানব-হৃদয়ে অহরহ আঘাত করিতেছে,—কেহ নীরবে ইহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তুষাগ্নিদাহনে দগ্ধ হইতেছেন কেহ বা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া সে শোকের কতকটা লাঘব করিতেছেন। কিন্তু যিনি কবি, শোকের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার প্রাণে কাব্যস্ফূর্তি হয়; তিনি এই নিদারুণ বিয়োগ-বেদনা ভাষার সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিয়া ইহাকে সাধারণের গোচরীভূত করেন। আবার ফুটাইবার ক্ষমতা যাঁহার যত বেশী, তিনি এই প্রকাশ-ব্যাপারে তত অধিক সিদ্ধকাম হন। বন্ধুবিয়োগ-জনিত শোকে ব্যথিত হইয়া ইংরাজকবি টেনিসন্ যে অপূর্ব In Memoriam কাব্য রচনা করেন, তাহা ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের একখানি অমূল্য গ্রন্থ। আমাদের বাংলায়—

গদ্যে—

চন্দ্রশেখরের—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম
শ্রীমতী মানকুমারীর—প্রিয়-প্রসঙ্গ
স্বর্গীয়া কুসুমকুমারীর—প্রসূনাঞ্জলির প্রথমাংশ
শ্রীমতী সরযুবালার—বসন্ত-প্রয়াণ

পদ্যে—

বিহারীলালের—বন্ধু-বিয়োগ
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের—মিত্র-বিলাপ
রবীন্দ্রনাথের—স্ত্রীবিয়োগের কবিতানিচয়
গোবিন্দদাসের—কবিতানিচয়

গিরিজাকুমারের—পত্রপুষ্প
মুন্সী কায়কোবাদের—অশ্রুমালা
যদুনাথ চক্রবর্তীর—সতীপ্রশস্তি
সুশীলগোপাল বসুর—শোক ও শান্তি এবং ব্যথা
স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর—অশ্রুকণা
শ্রীমতী সরলাবালা দাসীর—প্রবাহের কয়েকটি কবিতা
জনৈক বঙ্গনারী প্রণীত—নির্বাণ,—

শোক-সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। গদ্যে চন্দ্রশেখরের "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" এক অপূর্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি অমর হইয়াছেন। ইহা পত্নীবিয়োগবিধুর শোকাহত স্বামীর হৃদয়ের গভীর অভিব্যক্তি। তারপর সুপ্রসিদ্ধা ও প্রতিভা-শালিনী মহিলাকবি স্বামিহারা গিরীন্দ্র-মোহিনীর "অশ্রুকণা" একদিন অনেকের নয়নে অশ্রুর প্রবাহ বহাইয়াছিল। অক্ষয়কুমার গিরীন্দ্রমোহিনীর "অশ্রুকণা" সম্পাদনের ভার লইয়া বিশেষ যত্ন ও কৃতিত্বের সহিত ঐ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

'অশ্রুকণা' ও 'এষা'

যাহা শোক-সঞ্জাত, যাহা হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে স্বতো-নিঃসৃত, সে কবিতা পাঠ বা আলোচনা করিতে হইলে একটু সহানুভূতি ও সমবেদনা থাকা চাই। ব্যথার ব্যথী না হইলে, হৃদয়ব্যথা বুঝা কঠিন। শোকের তাড়নায় বা পীড়নে যাহার হৃদয় ব্যথিত হয় নাই, "এষা" বা "এষা"-শ্রেণীর কাব্য হৃদয়ঙ্গম করা তাহার পক্ষে দুরূহ। এ উক্তির অনুকূলে ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেহ যে মত দিবেন না তাহা জানি,—তবুও বলা যায় যে পুত্র বা পত্নীশোকের আঘাত যাঁহারা পান নাই—শত কাব্য রচনা করিয়াও তাঁহাদের সে শোকের প্রাণঘাতী ও মর্মবিদারক যাতনা বুঝান যায় না। তবে সহানুভূতি ও সমবেদনা বলিয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এমন দুইটি সুকোমল বৃত্তি আছে, যাহার সাহায্যে আমরা এই শোকের সামান্যাংশ বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারি। আমাদের কবি অক্ষয়কুমারও বহুপূর্বে শোকের কোন প্রাণঘাতী আঘাত না পাইয়াও

স্বামিবিয়োগকাতরা গিরীন্দ্রমোহিনীর "অশ্রুকণা"-গুলি সাজাইয়াছিলেন, কিন্তু "এষা"র কবিতাগুলি যেন তাঁহার বুক ফাটিয়া বাহির হইয়াছে।

বর্তমানে আলোচ্য "এষা" অক্ষয়কুমারের শেষ রচনা। এই "এষা" রচনার পূর্বে তিনি যে সমস্ত শোকের কবিতা লিখিয়াছেন, তদ্দারা জানিতে পারা যায় যে, শোক-কবিতা রচনায় কবি দক্ষ ছিলেন। তাঁহার "শঙ্খে"র "পিতৃহীন", "মাতৃহীন", "বালবিধবা প্রভৃতি কবিতায় ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার যে প্রতিভা এই কবিতাগুলির ভিতর দিয়া ফুটিবার চেষ্টা করিতেছিল, "এষা"য় তাহা একেবারে পূর্ণবিকশিত হইয়াছে।

শোকের নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি কবি-রচিত শোক-কাব্য পাঠ করিলে তাঁহার হৃদয়নিহিত শোকের লাঘব হয়, এ শ্রেণীর লোকের শোক-ক্ষতে "এষা' শান্তি-প্রলেপ প্রদান করিবে। "এষা"র মধ্যে অক্ষয়কুমারের স্বাতন্ত্র্য, কবিত্ব, প্রতিভা, অন্তর্দৃষ্টি, ভাব-বিশ্লেষণ-শক্তি পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। "এষা" রচনা করিতে বসিয়া তিনি কোথাও ভাষা বা ভাবের অপব্যবহার করেন নাই, অতিরঞ্জিত দোষে "এষা"র কোন কবিতা দুষ্ট হয় নাই। বাস্তব জগতের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়াই তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার চরম বক্তব্যের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন।

'এষা'র বিশেষত্ব

"এষা"র কবিতার প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব, যাঁহার শোকে তিনি মুহ্যমান, তাঁহার ছবি ইহার মধ্যে কবি পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহুস্থান হইতে ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। তিনি শোকের প্রাবল্যে এবং কল্পনার আতিশয্যে প্রিয়তমাকে—

> "সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী, সতী—
> চিরোজ্জ্বল দেবী-মূর্তি কবিত্ব-মন্দিরে"

বলিয়া বর্ণনা করেন নাই,—বাঙালী গৃহস্থ-ঘরের সেবাপরায়ণা বধূর ছবিই আঁকিয়াছেন ; তিনি লিখিয়াছেন—

> "লয়ে ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ মমতা ভকতি
> ক্ষুদ্র এক বঙ্গনারী দরিদ্র কুটীরে।"

বাংলার কবি আজ 'বঙ্গনারী' ছাড়িয়া যে 'বিশ্বনারী'র জন্য কাঁদে—

বড়ালকবি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গের কোন দেবী চাহেন নাই। এই পৃথিবীর, এই শ্যামলা বঙ্গভূমির দরিদ্র কুটীরের এক মানবীকেই চাহিয়াছেন।

"মানবীর তরে কাঁদি যাচি না দেবতা।" কল্পনা-সাহায্যে অনেকে "মানবী"র পরিবর্তে অনেক প্রকার উপমা বসাইয়া থাকেন কিন্তু অক্ষয়কুমার তাঁহার মানবী পত্নীর জন্যই কাঁদিতেছেন, তাঁহার পরিবর্তে তিনি কোন দেবী প্রার্থনা করেন নাই। তাঁহার কাব্য বস্তুগত, বস্তুতন্ত্রহীন নহে। তাহা বাস্তব—অথচ সর্বোচ্চ আদর্শের সহিত অনুস্যূত।

বাস্তবতার কবি অক্ষয়কুমার "এষা"র বিভিন্নস্থানে তাঁহার পত্নীর নিখুঁত ও প্রকৃত ছবি দিয়াছেন—

"উপহার" কবিতায়,—

"লয়ে সেই দিব্য দেহ
সে অতৃপ্ত প্রেম স্নেহ,
আসিছ—ভাসিছ কেন সম্মুখে আমার ?
হাসি হাসি মুখখানি,
সরমে সরে না বাণী,
আঁচলে নয়ন, রাণী, মুছি বার বার।
কত যুগ যুগ পরে
এখনো কি মনে পড়ে
তোমার সে হাতে-গড়া সোণার সংসার!
কবিত্ব কল্পনা ভরা
জীবন-মরণ-হরা
ত্রিভুবন আলো করা প্রীতি দু'জনার!"

পতিগতপ্রাণা, প্রেমময়ী, স্নেহময়ী পত্নীর ছবি কেমন সুন্দরভাবে উপরি উদ্ধৃত কবিতা দুইটির প্রথমটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়টিতে পরলোকগতার গার্হস্থ্য জীবনের মধুর স্মৃতি—তাঁহার হাতে-গড়া সোণার-সংসার আর তাঁহার সহিত তাঁহাদের পবিত্র দাম্পত্যপ্রেমের অত্যুজ্জ্বল ছবি দেদীপ্যমান!

শোকদগ্ধ কবি গৃহদেবতাকে সম্বোধন করিতে গিয়া, এই ভাবে দেবভক্তিপরায়ণা পত্নীর ছবি আঁকিয়াছেন—

"সে অতি প্রত্যূষে আসিত হেথায় ছুটি,
করিত এ মন্দির মার্জনা ;
তুলি ফুল গাঁথি মালা, সাজাত নৈবেদ্য ডালা,
সচন্দন তুলসী, অর্চনা।
জানু পাতি কৌষেয়বসনা,
স্থির-নেত্র যুক্তকরে, ঝর ঝর অশ্রু ঝরে,
তোমা পানে চাহি একমনা !
পড়ে—কিনা—পড়ে শ্বাস, সিক্ত মুক্ত কেশ-রাশ
শিথিল-অঞ্চলা স্মিতাননা।
আবার সন্ধ্যায় হেথা আসি,
দীপ দিয়া, ধূপ দিয়া, প্রণমিয়া প্রণমিয়া,
ফুরাত না তার ভক্তি রাশি !
প্রহর বহিয়া যায় ধ্যান তার না ফুরায়,
কতক্ষণে উঠিত নিশ্বাসি !"

কবিপ্রিয়া যে কেবল নিজেই ভক্তিপরায়ণা ছিলেন তাহা নয় ;—ভক্তিমতী গৃহলক্ষ্মী স্বামীকেও ভক্তিমান্ হইতে শিখাইতেন,—হিন্দুগৃহের শোভা-সম্পদ্ ও কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুলসীকে প্রণাম ও পূজা করিবার জন্য বলিতেন—

"বলিত আমায়, নমিতে তোমায়
দুগ্ধ পুষ্প তিল দিয়া ;
তোমার নিশ্বাসে সর্বরোগ নাশে
যায় দুঃখ পলাইয়া।"

"এষা"র "শোক" অধ্যায়ে চতুর্থ কবিতার মধ্যেও অক্ষয়কুমারের সহধর্মিণীর বেশ সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সব চেয়ে যাহা সুন্দর, নারী-

জীবনের যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্, সেই সতীনারী-বাঞ্ছিত 'পরমা গতি' লাভ করিয়াও কবি-প্রিয়তমার—

"সপ্রেম দৃষ্টি, খুঁজিছে জগতী !"

এখানে কবির অন্তর্দৃষ্টি সেই আলো-অন্ধকারময় সুদূর পরলোকের যবনিকা ভেদ করিয়া সতী-স্বর্গের শত সমারোহ ও সৌভাগ্যের মধ্যে অবস্থিতা পত্নীর ছবি কি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে! মর্ত্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী জীবনসঙ্গিনী পরলোকে গিয়াও পরলোকপতির কাছে তাঁহার মর্ত্যস্থিত স্বামি-দেবতার জন্য করুণা, স্নেহ ও শুভাশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন ;—

"এখনো সে যুক্ত করে
মাগিছে আমার তরে
তোমার করুণা-স্নেহ, শুভ আশীর্বাদ।"

এইখানেই কবির সুর চরমে উঠিয়াছে, পরলোকবিশ্বাসী কবি ত্রিকাল-দর্শী ঋষির মত, পরলোকের ঘটনাপরম্পরা দেখিবার দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। পরলোকে অবিশ্বাসী আমরা,—কতটুকু দেখিতে পাই ? যাহা দেখিতে পাই না,—মনে করি তাহা নাই। কিন্তু বাঙালীর বিশ্বাসের সমস্ত রাজ্যটা এখনও অন্ধতমসায় আচ্ছন্ন হয় নাই। বড়াল কবির কাব্য-সৃষ্টিতে আমরা তাহারই পরিচয় পাই।

ঘটনা ও ভাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া "এষা"র কবিতাগুলি পরে পরে সাজান হইয়াছে। অক্ষয়কুমার শোকের উন্মত্ত আবর্তের মধ্যে পড়িয়া, 'কোথাও খে'ই হারান নাই। মৃত্যু, অশৌচ, শোক ও সান্ত্বনা—এই চারি অধ্যায়ে "এষা"র কবিতাগুলি বিভক্ত হইয়াছে। মৃত্যু, অশৌচ ও শোকের সোপানাবলী, একে একে অতিক্রম করিয়া তিনি সান্ত্বনার নিকেতনে পৌছিয়াছেন। এই স্তর-বিন্যাসের পরতে পরতে, পরলোক-বিশ্বাসী হিন্দুর পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে,—আর সঙ্গে সঙ্গে এই শোক-বেষ্টনীর মধ্যে, তাঁহার গৃহের নিষ্ঠা ও ভক্তি-দৃপ্ত ছবিখানি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমেই মৃত্যু অধ্যায়ে, পত্নীর অন্তিম-দশা-দর্শন-ভীতা কন্যার প্রশ্ন ও পিতার উত্তর ; তারপর পুত্রমঙ্গল-সংবাদ-শ্রবণ-তৃপ্তা জননীর

শান্তিপূর্ণ মৃত্যু, মৃত্যু-সন্দেহ ও ব্যাকুলতা; ইহার পরেই একটা কঠিন সমস্যা কবি-হৃদয়কে আলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিল,—

"মরণে কি মরে প্রেম! অনলে কি পুড়ে প্রাণ?
বাতাসে কি মিশে গেল, সে নীরব আত্মদান?"

বহু পরে "সান্ত্বনা"র অধ্যায়ে কবি নিজেই এ সমস্যার সুন্দর সমাধান করিয়াছেন।

"নয়,—এ মরণ নয়, দু'দিন বিরহ!
আলোকে সুবর্ণ ফুটে
আঁধারে সুগন্ধ ছুটে;
মিলনে নিঃশঙ্ক প্রেম, যত্ন, অনাগ্রহ।
* * *
ভাঙ্গিতে গড়নি—প্রেম, ওহে প্রেমময়!
মরণে নহি ত ভিন্ন,
প্রেম-সূত্র নহে ছিন্ন,
স্বর্গে মর্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয়!"

কবির সুর এখানে একেবারে উদাত্তে উঠিয়াছে—ক্রমবিকাশের ফলে পূর্ণপরিণতি লাভ করিয়াছে।

অক্ষয়কুমারের পত্নীপ্রেম

এইবার অক্ষয়কুমারের পত্নীপ্রেম, তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। প্রেমই ক্ষুদ্রকে মহৎ, কুৎসিৎকে সুন্দর, নির্গুণকে সগুণ, এবং নিরাকারকে সাকারে পরিণত করে। প্রেমই মানুষের "আমিত্ব"কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, তাহাকে "তুমিত্বে" লীন করে, আর ক্রমে মানুষকে সেই অখিলপ্রেম-সিন্ধুর অগাধ অপরিমেয় প্রেমনীরে নিমজ্জিত করিয়া দেয়,—অক্ষয়কুমারের ভিতর ইহার সার্থকতা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি তাঁহার—

"সুখে দুখে ছিল সাথী
জগৎ-জুড়ান জ্যোৎস্না রাতি—
* * *

কত শক্তি আপদে বিপদে
কত শোভা গৌরবে সম্পদে,"—

ছিলেন,—তাঁহারি প্রেম-তৃপ্ত অক্ষয়কুমার সদ্যোগতপ্রাণা পত্নীর জন্য ব্যাকুল হইয়া লিখিতেছেন—

"হও নাই গৃহের বাহির ;
আজ তুমি কোথা যাবে ? কার মুখ পানে চাবে
সুখে দুঃখে হইলে অস্থির ?
অচেনা অজানা ঠাঁই, কেহ আপনার নাই—
কে মুছাবে নয়নের নীর ?"

এ গেল পত্নীর জন্য স্বকীয় সহানুভূতির করুণ উচ্ছ্বাস। এইখানেই বিভিন্ন শ্রেণীর ভাবাবেগ কবি-হৃদয়কে আলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিয়া তুলিতেছে—কখন কখন তাঁহার

"বুঝিতে যে চাহে না হৃদয় !
বলিতে সোহাগে রাগে,— মরিবে আমার আগে,
এ যেন তাহার অভিনয় !
এখনো যেতেছে দেখা অধরে হাসির রেখা,
মুখে যেন কথা কয়-কয় !
আশে পাশে কোন্-খানে লুকায়ে রেখেছে প্রাণে !
অভিমান আর নয়—নয় !"

কখন বা তিনি প্রিয়-পত্নীর প্রাণভিক্ষা করিয়া ভগবানের চরণে নিবেদন জানাইতেছেন—

"সহস্র প্রণাম করি, নিও না—নিও না হরি
একমাত্র সান্ত্বনা-আশ্রয়।"

কিছুতেই যখন কিছু হইল না, তখন তিনি নিজের প্রাণদানে প্রিয়তমার প্রাণদান করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিলেন,—

"চেষ্টা করি', প্রাণেশ্বরী, নয়—তবে দয়া করি'
নিশ্বাস ফেল গো একবার !

না পারো, আমার প্রাণ, আমি করিতেছি দান—
শ্বাসে—শ্বাসে অধরে তোমার।"

পত্নী-শোকাহত কবি কখন বা ভাবিতেছেন—

"জন্মেছি ত একা,
না হয় কৈশোর-শেষে তার সনে দেখা!

* * *

"সেই আদি সূত্র ধরি'
আবার জীবন গড়ি —
সে যদি মুছিয়া যায় জীবনের মাঝ।"

কিন্তু তাহার পরেই নিজে তাহার কি সুন্দর উত্তর দিতেছেন!

"কি গড়িব আর?
আমি শুষ্ক ছিন্ন সূত্র—দেব-মালিকার!
কোথা হতে কি যে এলো
গেল—গেল, সব গেলো—
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ—সর্বস্ব আমার!"

এক দিন ব্রজমাধবসঙ্গিনী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের উপর অভিমান করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি আর কালো দেখিব না, কালো নাম আর কাণে শুনিব না, কালো বসন আর অঙ্গে পরিব না, কালো যমুনার জলে আর অবগাহন করিব না।" কিন্তু তাহার পরেই আবার তিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে আত্মহারা হইয়া, কালো তমাল বৃক্ষকে শ্রীকৃষ্ণভ্রমে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। প্রেমের যে এই রীতি ও ধারা,—অক্ষয়কুমারের কথা ত ছার,—ইহার হস্ত হইতে একদিন সাক্ষাৎ প্রেম-স্বরূপিণী শ্রীরাধাই অব্যাহতি পান নাই। তন্ময়তা ও একাগ্রতার সাধনায়, এই পার্থিব প্রেমই একদিন প্রেমিককে অপার্থিব প্রেমের রাজ্যে উপনীত করে,—তখন তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে বিয়োগ বা বিরহের যবনিকা অপসারিত হয়, সে আশে পাশে তাহার প্রেমাস্পদের ছবি দেখিতে পায়, কর্ণে তাহার কণ্ঠস্বর অহরহ ধ্বনিত হইতে থাকে, সর্বাঙ্গে তাহার কোমলস্পর্শ অনুভূত হয়,—"এষা"র "উপহার"

কবিতার প্রথম চরণের কয়েকটি পংক্তিতে এই তত্ত্বটি অক্ষয়কুমারের ভাষায় সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

শ্রাদ্ধবাসরে আবার তিনি পত্নীদর্শন-কামনায় ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন—

"কি অদেয় তারে আজ! তেমনি হাসিয়া
সে কি লবে আর?
সমস্ত জগৎ দিলে যদি তার দেখা মিলে!
সমস্ত জীবন যদি চাহে একবার!"

এ অধ্যায়টার মধ্যে অক্ষয়কুমারের পত্নী-দর্শন-কামনা এবং

"সকল বন্ধন ছিঁড়ে, একাকিনী কোথা ফিরে—
অনলে অনিলে, শূন্যে, কোথায়—কোথায়!"

—এই অন্বেষণ ওতপ্রোতভাবে জড়ান রহিয়াছে। এখানে কবি নিজের সত্তাকে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন—পত্নীবিরহকাতর অক্ষয়কুমার সমস্ত জগৎ দিয়াও তাঁহার প্রিয়তমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী। একদিন তাঁহার গুরু ঠিক এমনই ভাবে পত্নীপ্রেম-সম্পদধিকারী হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক্ গে এ বসুমতী, যার খুসী তার!"

ইহার পরে "শোক।" ইহার মধ্যেও সেই অন্বেষণ—

"কোথা তুমি প্রাণাধিকা! প্রতিধ্বনি ছুটে,
কি তুমুল কোলাহল, শূন্য শতখান—"

কিন্তু এইখান হইতেই তাঁহার অকপট পত্নীপ্রেম তাঁহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে, এইখান হইতেই তাঁহাকে বুঝাইতেছে—

"মরেছে তাহার দেহ
মরেনি ত প্রেম স্নেহ
রেখে যেন গেছে সমুদয়।
সেই ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ আশা তৃষা ভয়।"

এইখানেই কবি প্রেমের অবিনশ্বরত্ব বুঝিলেন, বুঝিয়া তাঁহার প্রেমাস্পদার কার্যভারগুলি একে একে "সুনিপুণভাবে" তুলিয়া লইতেছেন—

"তারি হৃদি হৃদে ধরি।
তারি গৃহকার্য করি ;
প্রতি কার্যে স্মরি অনুক্ষণ
মরমে মরমে কাঁদি মুছি দুনয়ন।"

"সান্ত্বনার" ভিতর কবির পত্নীপ্রেম গণ্ডী ছাড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাঁহাকে বিশ্ব ও বিশ্বপতির প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, এইখানেই তিনি প্রেমের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হইয়া অটল বিশ্বাসের সহিত গাহিয়াছেন—

"ত্যজিয়াছ মর্ত্যভূমি
তবু আছ—আছ তুমি !
তুমি নাই কোথা নাই, হয় না বিশ্বাস !
এতরূপ গুণ ভক্তি
এত প্রীতি আনুরক্তি
সৃজনে যে পূর্ণতার নাহিক বিনাশ !"

ইহাই তাঁহার পত্নীপ্রেমের পূর্ণ পরিণতি।

এই "তবু আছ—আছ তুমি" অতি সত্য, অতি ধ্রুব। ইহাই ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেয়।

এইবার শোক ও সান্ত্বনার কথা। দেখা যাউক কবি কি ভাবে, কোন্ পথ দিয়া, শোকের রাজ্য হইতে সান্ত্বনার চিরস্থির অমরাবতীতে পৌছিয়াছেন। শোকের প্রথম আঘাতে তিনি বলিতেছেন,—

"শূন্য সব শূন্যময়
নিষ্ঠুরতা জগৎ জুড়িয়া !"

তাঁহার মনে হইতেছে—

"অশ্রুরোধ—শ্বাসরোধ, অসহ্য জীবন—বোধ !
ইচ্ছা হয়, মরি আছাড়িয়া।"

কখন বা—

"প্রতি-পল-পরিচিতা! তোমারে বিচ্ছিন্ন করি—
কেমনে এ শূন্য মনে, এ শূন্য জীবন ধরি।"

কখন তিনি জীবনকে "মরণেরি নামান্তর" মনে করিয়া মরিয়া জুড়াইতে চাহিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মরিতে সাহস নাই, কেন না—

"শিথিল শরীর মন বিচ্ছিন্ন ভাবনা।"

শোকের প্রচণ্ড উন্মত্ততা কবিকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। জীবনের উদ্দেশ্যে তিনি সন্দিহান হইতেছেন; ঈশ্বরের উপরও তিনি অভিমান করিতেছেন—

"কোন্ অপরাধে এই কঠোর শাসন?
কোন্ পিতা পুত্র প্রতি
এমন নির্দয় অতি?
আমিও ত করিতেছি সন্তান পালন—
কত রাগি চোখে মুখে,
তখনি ত টানি বুকে,
মুছাতে নয়ন তার—মুছি ত আপন।"

কিন্তু এই অভিমান হইতেই সর্বমঙ্গলময় ঈশ্বরের চিরমঙ্গলময়ত্বে তাঁহার বিশ্বাস আসিবে। এখন এ ঘোর কত দূরব্যাপী হইয়াছে তাহা দেখান প্রয়োজন। এই অবস্থায় নাস্তিকতার ছায়া আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তিনি দেখিতেছেন ধরা—জড় পরমাণু মাত্র; জীবন—সেও বজ্রদগ্ধ স্থাণু; আর সৃষ্টিকর্তা বিধাতার এই সৃষ্টি, এও এক মহা দুর্বোধ্য ব্যাপার। তাঁহার যেন নিজশক্তির সীমাজ্ঞান নাই, সকল প্রকার অনুভব-ক্ষমতা ও আনুরক্তি হারাইয়া তিনি

"উন্মত্ত কবির মত
গড়ে ভাঙ্গে অবিরত
লয়ে এক অন্ধশক্তি—কল্পনা ভীষণ।"

এই নাস্তিকতার ভাব তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, হইতে পারে নাই; কারণ সেখানে তাহার প্রেমভক্তিময়ী পত্নীর

অম্লান প্রেম হিরণ্ময় জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে—ইহাই নাস্তিকতার ভাবকে বিদূরিত করিয়া অল্পে অল্পে তাঁহাকে আস্তিক বা ঈশ্বরবিশ্বাসী করিয়া তুলিতে লাগিল।

ক্রমে তাঁহার মনে হইল—

"মৃত্যু!—প্রতি— দিবস ঘটনা;
তাহে কেন এত শোক?
সবাই মরিবে, সবারি মরেছে
চিরজীবী কোন্ লোক?"

কবি বলিতেছেন—সত্যই ত, ঘরে ঘরে মৃত্যু, ঘরে ঘরে শোক হাহাকার, এত শুধু আমার একার নয়—সকলেই সয়, আমিও সকলের মত সহ্য করিব।

আবার সুর ফিরাইয়া তিনি বলিতেছেন—

"দেব-দয়া নাহি চাহি আর!
ইচ্ছা হয়,—দৈত্য সম লয়ে নিজ তমঃভ্রম
মৃত্যুরে আক্রমি একবার—
গ্রহ উপগ্রহ টানি প্রিয়ারে ফিরায়ে আনি!
দেখি, মৃত্যু কি করে আমার!"

—'নরনারী স্বার্থভরা এবং জগৎ নরকবিশেষ, ইহার মধ্যে মৃত্যুই একা সর্বেশ্বর মাত্র!'

ইহার পরেই তিনি "আত্মজিজ্ঞাসায়" মনোনিবেশ করিলেন—

"কেন বুদ্ধ ত্যজিল আবাস,
কেন নিল নিমাই সন্ন্যাস—
মৃত্যু যদি শেষ?"

কেনই বা ক্রমে আমি মূঢ়ের মতন শোকে আত্মহারা হইয়া সনাতন বিশ্বাস হারাইতেছি। এই দেহ সত্য, প্রাণও সত্য, এই যে সুখ-দুঃখজ্ঞান ইহাও অতীব সত্য। যতদিন কর্মভোগ ছিল, ততদিন সে রোগ-শোক ভোগ করিয়া এই জগতে ছিল। আমিও কর্মশেষে তাহার মত হাসিয়া পলাইব।

এইখানেই তাঁহার মন বিশ্বাসের দিকে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে—এইখান হইতেই বিশ্বাসের আলোকচ্ছটা তাঁহার হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিতেছে,

"সে আমার—নিশ্চয় কোথায়
বসিয়া আমার অপেক্ষায়
গভীর বিশ্বাসে।"

তাই এই বাণী কবির কণ্ঠে উত্থিত হইয়াছে। তাঁহার অন্তর্নিহিত পত্নীপ্রেম অল্পে অল্পে তাঁহার চক্ষে প্রেমাঞ্জন মাখাইয়া দিল—তাহার সাহায্যে তিনি দেখিলেন—মরণ—সে ত সৃষ্টির বাহিরে। সৃষ্টির ভিতর ত বিনাশ নাই; বৃষ্টি ঝরিতেছে, কিন্তু তাহাই ত আবার বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া নব-মেঘের সঞ্চার করিতেছে। সতীর দেহ-ত্যাগে পার্বতীর জন্ম,—একি মৃত্যু? এ ত মাত্র দেহ বা আকার-পরিবর্তন। প্রকৃতিরাজ্যে কিছুরই বিনাশ নাই, কারণ, প্রকৃতি যে জননী। এই প্রকৃতি-জননীর স্তনসুধা পান করিয়া তিনি নবপ্রাণ পাইলেন, তাঁহার নয়নে ধরণী অনন্তশোভা-সম্পদ্‌ময়ীরূপে প্রতিফলিত হইল। এইবার তিনি এই জটিল মৃত্যু-সমস্যার সমাধান করিয়া গাহিয়াছেন—

"কোথা—তুমি বিশ্বস্বামী!
কোথা ক্ষুদ্র তুচ্ছ আমি!
কত তুচ্ছ—সুখ-দুঃখ, জীবন মরণ!"

—তাই তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি।" মরণ-প্রশস্তি গাহিয়া কবি অমর হইলেন—

"হে মরণ, ধন্য তুমি! না বুঝে তোমার
বৃথা নিন্দা করে লোকে;
জগতে-তুমি ত শোকে
অমর করিছ প্রেমে দেব-মহিমায়!
আজি মোর প্রিয়তমা
তব করে বিশ্বরমা—
ভাসিছে ইন্দিরা-সমা সৃষ্টি-নীলিমায়!"

ইহার পরেই তিনি মঙ্গলময় ভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদন জানাইয়া তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। এইখানে তিনি সারসত্যে উপনীত হইয়াছেন—তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী যে ভগবানেরই ছায়া এবং তাঁহার প্রেমের

মায়া, তাহা তাঁহার সম্যক্ উপলব্ধি হইল। এইবার তিনি বেশ বুঝিলেন যে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া সেই অনাদি, অনন্ত ও অসীমের বিচার করিতে বসি—আপন আপন স্থখ-দুঃখ দিয়া সেই বিরাট্-পুরুষের ভালমন্দ যাচাই করি, এই আত্মাভিমান আমাদের সর্বনাশের মূল, আর ইহাই তাঁহার মতে আপনার জনকে দূরে রাখিয়া দেয়। তাই শোকশান্ত প্রেমিক কবি তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়া কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিলেন—

"দাও প্রেম—আরো প্রেম, চির-প্রেমময়!
আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,
আরো আত্মজয়-শক্তি—
তোমারি ইচ্ছায় কর, মোর ইচ্ছা লয়!"

মহাত্মা সাগরলাল দত্ত

উনবিংশ্ শতাব্দীতে সুবর্ণবণিক্ জাতির মধ্যে যে সমস্ত দানবীর জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে সাগরলাল দত্ত মহাশয় একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। সমাজ ও জাতির সেবা ও কল্যাণকল্পে তিনি যে বিরাট্ দান করিয়া যান, তাহাতে তাঁহার নাম দেশ ও দেশবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বিরাট্ দান

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি প্রায় তের লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করিয়া যান। তাঁহার উইল অনুসারে এই টাকা বাংলার অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের কাছে জমা থাকে। উইলের নির্দেশ মত এই সম্পত্তির আয় হইতে কামারহাটিতে অবস্থিত তাঁহার বৃহৎ বাগান-বাড়ীতে একটি হাসপাতাল এবং হাসপাতাল চালাইয়া অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিলে একটি অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উল্লেখ তিনি করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে হাসপাতাল এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর ১৮ বৎসর পরে) একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাঁহার সম্পত্তির যাহা আয় হয়, সেই আয়ের টাকা হইতে অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনারেল মহোদয় এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করিয়া থাকেন।

বিদ্যালয় ও হাসপাতাল

৺মতিলাল শীলের বেলঘরিয়ার অতিথিশালা ও ঠাকুরবাড়ীর প্রায় দুই মাইল উত্তরে কামারহাটীতে এই দুইটি প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। স্বর্গীয় সাগরলাল দত্ত মহাশয়ের কামারহাটীর বিস্তীর্ণ বাগানবাড়ীতে বিদ্যালয় ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের পরিমাণ প্রায় ১১০ বিঘা। বাগানবাড়ীর উত্তরদিকে B. N. Eliasএর আগড়পাড়া জুট মিল। বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাম দিকে দুইটি বড় গেট আছে। প্রথম গেটটি বিদ্যালয়ের, তাহাতে লেখা আছে ঃ—

"Sagore Dutt
Free High English School, Kamarhati
Estd. 1906
Managed by the Administrator of Bengal."

দ্বিতীয় গেটটি হাসপাতালের, তাহাতে ইংরাজী ও বাংলায় নিম্নলিখিত লেখাগুলি আছে :—

"Sagore Dutt
Charitable Dispensary & Hospital
for the poor and indigent
of the Surrounding Districts
or neighbourhood
who may resort thereto.

"সাগর দত্তের
দাতব্য ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়
এই অঞ্চলের ও ইহার চতুষ্পার্শ্বের আগন্তুক
গরীব দুঃখীর জন্য"

হাসপাতাল ও দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠার পরে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। সাগর দত্ত মহাশয়ের উইলে নির্দিষ্ট থাকে যে, হাসপাতাল ও দাতব্য ঔষধালয় চালাইয়া যদি উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের সঙ্কুলান হয় তবে সেই অর্থে একটি অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। ইহাতে সকল জাতির বালকগণই বিনাবেতনে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনারেল অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়া এগার হাজার টাকা ব্যয়ে একটি বাড়ী তৈয়ার করান। কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্বে ঐ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইল না। ঐ তারিখে আলোচ্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা

বিদ্যালয়ের বর্তমান ভবন ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার টাকা
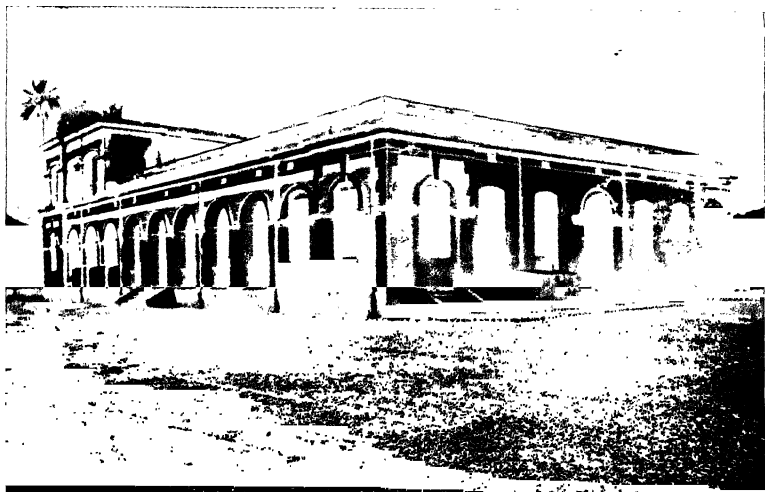
সাগরলাল দত্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, কামারহাটি

সাগরলাল দত্ত দাতব্য চিকিৎসালয়, কামারহাটি

ব্যয়ে নির্মিত হয়। বাড়ীটি সুদৃশ্য বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা; দ্বিতলে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বাসা এবং একতলায় পাঠ্য শ্রেণীসমূহ ও বিদ্যালয়ের অফিস-ঘর বর্তমান। প্রত্যেক শ্রেণীই বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা দ্বারা সজ্জিত।

এইখানে ২৮৫ জন ছাত্র বিনা বেতনে পড়ে। আলো, পাখা বা অন্যান্য কোন খরচা লাগে না। ছাত্রদিগের চরিত্র-গঠন এবং শারীরিক উন্নতি-বিধানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। ছাত্রদিগের উন্নতি ও নানাবিধ কল্যাণের জন্য পাঠের ব্যবস্থার সহিত নিম্নলিখিত বিভাগসমূহও প্রবর্তিত হইয়াছে ঃ—

১। Scouting and Cubbing with First Aid to the injured

২। Debating Society—প্রতি শনিবার নিয়মিতভাবে এই বিভাগের একটি করিয়া সভা হয় এবং এই সভায় সম্মিলিত হইয়া একজন শিক্ষকের উপস্থিতিতে ছাত্রেরা নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকে।

৩। Games and Sports

৪। Gymnastics and other Physical Exercises—এখানে ব্যায়ামের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ভূমি ও সরাঞ্জামাদি আছে। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের ছুটির পর ড্রিল ও জিমনাষ্টিক মাষ্টারের তত্ত্বাবধানে ছেলেরা নানাবিধ ব্যায়াম করে।

৫। Gardening—তরিতরকারী ও ফুলের চাষের জন্য উদ্যানের মধ্যে দুই খণ্ড চতুষ্কোণ জমি আছে। বিদ্যালয়ের দুই তিনজন শিক্ষকের উপদেশ ও সহায়তায় ছাত্রেরা এই দুই খণ্ড জমির একখণ্ডে ফুলের ও অপর খণ্ডে তরিতরকারীর চাষ করিয়া থাকে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনারেল মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে বিদ্যালয়ে এই বিষয়ের প্রবর্তন হয়।

এগুলি ব্যতীত বিদ্যালয়ে ছাত্রদের লইয়া একটি ব্রতচারী দলও গঠন করা হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের পরিচালনা

বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মহাদেব চট্টোপাধ্যায় এম্ এ,

বি এল্ এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র। সুপ্রসিদ্ধ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক ও সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ও এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই এখান হইতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। গত ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে মহাদেব বাবু এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করিতেছেন। বর্তমানে তিনিই স্কুলের সম্পাদক। তাঁহার শিক্ষকতা ও সুপরিচালনাগুণে বিদ্যালয়টির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ, বহু সরকারী ও বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-পদ্ধতি ও সুপরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে অর্থাৎ ১৯২৯ হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যালয় হইতে ১৫৫ জন ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হয়। তন্মধ্যে ৭৫ জন প্রথম বিভাগে, ৫৫ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং আট জন তৃতীয় বিভাগে (মোট ১৩৮ জন) উত্তীর্ণ হয়। গত তিন বৎসরে প্রেরিত ৫৪ জন ছাত্রের মধ্যে ৫১ জন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

খৃষ্টাব্দ	পাঠান হয়	উত্তীর্ণ হয়	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	বিভাগ
১৯৩৬	১৯	১৮	৬	৯	৩
১৯৩৭	১৪	১২	৬	৫	১
১৯৩৮	২১	২১	১৫	৬	...

গত এগার বৎসরের ভিতর তিনটি ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্কলারসিপ পাইয়াছে। কৃতী ছাত্রদিগের জন্য বিদ্যালয়ে পুরস্কার-বিতরণেরও ব্যবস্থা আছে।

এই বিদ্যালয়-পরিচালনার জন্য বৎসরে প্রায় ১২,০০০ হাজার টাকা ব্যয় হয় এবং এই সমগ্র অর্থই সাগরলাল দত্তের ন্যস্ত সম্পত্তির আয় হইতে পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়ে ডিবেটিং ক্লাব প্রতিষ্ঠার ফলে ছাত্রদের মধ্যে ইংরাজী ও বাংলা রচনার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। ইহার ফলে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তাহারা হাতে লিখিয়া একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। পরে সদাশয় অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনারেল মহোদয় মুদ্রণ প্রভৃতির খরচা মঞ্জুর করিলে,

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা মুদ্রিত হইয়া বৎসরে দুইবার বাহির হয়। ছাত্রেরাই এই পত্রিকার লেখক এবং পর্যায়ক্রমে তাহারাই এই পত্রিকা সম্পাদন করিয়া থাকে। পত্রিকাখানির নাম—"The Sagore Dutt Free High English School Magazine"; পত্রিকাখানির অর্ধেক রচনা ইংরাজী এবং অর্ধেক রচনা বাংলায় লিখিত হয়। প্রধান শিক্ষক মহাদেব বাবুই "ম্যাগাজিন-কমিটি"র সভাপতি।

পত্রিকাখানিতে গল্প, কবিতা, ভ্রমণবৃত্তান্ত ব্যতীত অনেক গুরু বিষয়ের প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যায় নিম্নলিখিত ইংরাজী ও বাংলা বিষয়সমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ঃ—

১। সাগর-প্রশস্তি
২। Notes
৩। Vernacular as the Medium of Instruction
৪। Way to Light
৫। The Waves of the Earth
৬। The Weaving Industry of Bengal
৭। Report

৮। সাগর-বন্দনা	১৬। বুদ্ধিবল
৯। ভক্তের ভগবান্	১৭। এরারুট
১০। আবাহন	১৮। কাজ ও ছুটি
১১। পুরীর পথে	১৯। ফেরিওয়ালার কথা
১২। স্কাউটদের গান	২০। জবা গাছ
১৩। চিন্তার চাষ	২১। আমাদের অভাব কি ?
১৪। নির্ঝরিণীর উক্ত	২২। নর ও দুঃখ
১৫। শেয়ানায় শেয়ানায়	২৩। মহাত্মা সাগর দত্তের জীবনী

অনেকগুলি রচনায় ছাত্রদের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজী অংশ ২১ পৃষ্ঠায় এবং বাংলা অংশ ৩০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

ছেলেদের কাগজ, তাই তাহাদের লিখিত ও সম্পাদিত পত্রিকার

মলাটের প্রথম পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত দুই পংক্তি সুন্দর সংস্কৃত কবিতা স্থান পাইয়াছে ঃ—

"ক্ষুদ্রৈঃ ক্ষুদ্রমিদং পত্রং বালৈর্বুধকরেঽর্পিতম্ ।
যূথিকান্তর্গতং ক্ষৌদ্রং গৃহ্যতে কিং ন ষট্পদৈঃ ?"

এই পত্রিকা হইতে এখানে "সাগর-বন্দনা" নামক বাংলা কবিতা উদ্ধৃত হইল।

" 'সাগর'-বন্দনা

সাগরেরই মতন মহান্ চিত্ত তোমার 'সাগর' গো,
বাংলা মায়ের অমর ছেলে দত্ত-কুলের রত্ন গো।
অনাথ দীনের ব্যথার বেদন তোমার বুকে তুল্‌লে সুর,
বিদ্যালয় ও চিকিৎসাতে দুঃখ তাদের করলে দূর।
তোমার দানে মোদের প্রাণের লুপ্ত আশার ফুট্‌ছে ফুল,
সাগর-তীরে কীর্তি ঘিরে' গাইছে গরিব ছাত্রকুল।
তোমার তরে ভারে ভারে অর্ঘ্য দিতে কল্পনা—
মহিমার এই রংমহলে নিত্য করি জল্পনা।
তোমার আলো ধন্য হলো দীনের তরে সবটি দিয়া,
তোমার নামে তোমার গানে জড়িয়ে থাকুক মোদের হিয়া।

শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়
দশম শ্রেণী"

দরিদ্র কিশোর পাঠার্থীর কৃতজ্ঞ হৃদয়ের অভিব্যক্তি এই কবিতার ভিতরে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

Sagore Dutt Free H. E. School Magazineখানি ছাত্রেরা বিনামূল্যে পাইয়া থাকে। ইহা দ্বারা তাহাদের জ্ঞানালোচনা ও সাহিত্য-অনুশীলন উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে।

বিদ্যালয়-পরিদর্শকের মন্তব্য

যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি সাগরলাল দত্তের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক ইহার পরিচালনা-পদ্ধতির প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম পাওয়া যায় ঃ—

১। E. N. Blandy Esqr., C. I. E., I. C. S., Chief Secretary to the Government of Bengal.

২। G. M. Ratcliffe Esqr., I. C. S., S. D. O., Barrackpore.

৩। R. H. Parker Esqr., I. C. S.

৪। Hon'ble Mr. Justice G. D. MacNair, M.A.

৫। H. Carey Morgan Esqr., Solicitor to the Govt. of Bengal.

৬। Hon'ble Mr. Justice Sir W. E. Greaves, (সে সময়ে) Vice-Chancellor, Calcutta University.

৭। J. M. Bottomley Esqr., Director of Public Instruction, Bengal.

৮। Sir Alfred H. Watson, Editor-in-chief, Statesman.

৯। A. J. Dash Esqr., I. C. S., Secretary to the Government of Bengal (Education Department).

১০। M. M. Stuart Esqr., I. C. S., S. D. O., Barrackpore.

১১। W. E. Griffith Esqr., Principal, David Hare Training College.

১২। Hem Chandra Sarkar Esqr., M. A., Additional Inspector of Schools, Presidency Division.

ইহাদের মধ্যে কয়েক জনের অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

E. N. Blandy Esqr.:—"I am extremely impressed by the tone of the instruction."

Hon'ble Mr. Justice MacNair:—"I have been very much impressed by the work exhibited by the boys. They have a fine healthy appearance and their relation with the staff seems singularly happy."

J. M. Bottomley Esqr.:—"After an absence of two years I came again to-day to the Sagore Dutt School and found it as before pleasant, lively and cheerful."

Hon'ble Mr. Justice Greaves:—"I was very much pleased with what I saw of the boys and of the school. The building is an excellent one, lighted and airy and well-planned. The recitations were well-given and I thought the pronunciations of the two boys who recited in English were good and reflected credit on their teachers."

Hem Chandra Sarkar Esqr.:—"The Sagore Dutt High English School established in 1906 is one of the best-housed, best-equipped and best-taught institutions in the Presidency of Bengal."

W. E. Griffith Esqr.:—"The discipline and recitations of the boys gave the visitors a glimpse of the good work which is being done in the school."

Sir Alfred H. Watson:—"The school strikes me as admirably conducted and the boys give evidence in their physique and their manners that education is here regarded as something more than the acquisition of a mere routine-knowledge."

বিদ্যালয়ের প্রদর্শনী ও লাইব্রেরী

এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ হাতের নানাপ্রকার কাজ করে এবং তাহাদের হাতে তৈরী জিনিষের একটি প্রদর্শনী এখানে আছে।

ছাত্রদের শিক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে মাঝে মাঝে তাহাদের নানা স্থানে ও নানা প্রতিষ্ঠানে লইয়া যাওয়া হয়। ১৯৩৮

খৃষ্টাব্দের ২০এ ডিসেম্বর তারিখে তাহারা বেলঘরিয়ার পটারি ওয়ার্কস্ ও কাঁচের কারখানা দেখিতে যায়।

বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের জন্য একটি সুন্দর পুস্তকাগার আছে। এই পুস্তকাগারে ইংরাজী ও বাংলায় সর্বসমেত ৩০৬৫ খানি পুস্তক বিদ্যমান। পুস্তকগুলি দুইভাগে বিভক্ত। একভাগ Text Books বা পাঠ্য পুস্তক—এইভাগে ১৪৪৫ খানি পুস্তক আছে; অপর ভাগ পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত সাধারণ পাঠোপযোগী বই—এই বিভাগে ১৬২০ খানি পুস্তক বর্তমান। ছাত্রদিগকে বিনা চাঁদায় পড়িবার জন্য নিয়মিতভাবে পুস্তক গৃহে লইয়া যাইতে দেওয়া হয়।

. অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনারেল মহোদয় এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য বিশেষ সচেষ্ট। তাঁহার অনুগ্রহে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ে Common Room, Teachers' Room, Geography Room, ও Museum এর ব্যবস্থা হইয়াছে।

দাতব্য ঔষধালয় ও হাসপাতাল

আজ প্রায় একান্ন বৎসর হইল মহাত্মা সাগরলাল দত্তের এই দাতব্য চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অন্তর্বিভাগ (indoor) ও বহির্বিভাগে (outdoor) কত লক্ষ লক্ষ লোক যে এই ৫১ বৎসরের মধ্যে চিকিৎসিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। গরিব ও অভাবগ্রস্ত রোগীর ইহা একটি প্রধান আশ্রয়স্থল। কামারহাটী ও পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের লোকেরা ইহা দ্বারা বহু উপকার পাইতেছে। দূর স্থানের রোগীরাও এখানে আসে। এই স্থানের লোকদের নিকট সাগর দত্ত মহাশয় একজন মহাপুরুষ বিশেষ। বহু আর্ত ও রোগীর কণ্ঠে তাঁহার জয়ধ্বনি তাঁহাকে বাঙালীর কাছে অমর করিয়া রাখিবে। এই প্রতিষ্ঠান যাহাতে চিরস্থায়ী হইয়া দরিদ্র রোগীর রোগ-উপশমে সাহায্য করে তাহার জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে এই চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। ফল, ফুল ও নানাবিধ বৃক্ষের সমাবেশে স্থানটি সজ্জিত। বিদ্যালয় ও

আউটডোর ডিস্‌পেন্সারীর পশ্চিমদিকে দুইটি বৃহৎ ঘাট-বাঁধান পুষ্করিণী। পুষ্করিণী দুইটিকে একটি নালা কাটিয়া সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই নালার উপর একটি সাঁকো। পুষ্করিণী দুইটির পশ্চিম দিকে ঘাটের সম্মুখে দুইটি সুদৃশ্য বসিবার স্থান, এই স্থানের মাথার উপর আচ্ছাদন আছে। এই দুইটি ব্যতীত আরও দুইটি ছোট পুষ্করিণী আছে।

হাসপাতালের গৃহাবলী

উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত গৃহাবলীর তিনটি বাটী দ্বিতল—তাহার একটি বিদ্যালয়।

১। সাধারণ হাসপাতাল (অন্তর্বিভাগ) পুরুষদিগের জন্য (মেয়েদের চক্ষু-চিকিৎসার জন্য এই বাড়ীর দ্বিতলে কয়েকটি স্বতন্ত্র শয্যা আছে।)

২। লেডী ডাক্তারের আবাস-গৃহ

বাকী বাড়ীগুলি সব একতলা। লেডী ডাক্তারের বাড়ীর একতলা পূর্বে বর্তমান ছিল এবং এইটিই সাগরলালের বাগান-বাড়ী ছিল। পরে ইহাকে দ্বিতলে পরিণত করা হয়। উপরিলিখিত তিনটি দ্বিতল বাড়ী ব্যতীত নিম্নলিখিত এগারটি একতলা বাড়ী আছে ঃ—

১। পুরুষদিগের জন্য আউটডোর ডিসপেন্সারী
২। মহিলাদিগের জন্য " "
৩। মহিলাদিগের জন্য প্রসূতিসদন
৪। " হাসপাতাল (অন্তর্বিভাগ)
৫। " সেপ্‌টিক হাসপাতাল
৬। পুরুষদিগের জন্য সেপ্‌টিক হাসপাতাল
৭। রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসারের বাসগৃহ
৮। রেসিডেন্ট সহকারীর বাসভবন
৯। ধাত্রীদের বাসগৃহ
১০। কম্পাউণ্ডারদিগের বাসগৃহ
১১। চাকরদিগের গৃহ

সাগরলাল দত্ত দাতব্য চিকিৎসালয়

(বামদিক্ হইতে)—১। লেডি ডাক্তারের বাসগৃহ
২। প্রসূতি-সদন
৩। মহিলা-হাসপাতাল (অন্তর্বিভাগ

পুরুষদিগের হাসপাতাল (অন্তর্বিভাগ) ও
মহিলাদিগের চক্ষুচিকিৎসার হাসপাতাল (অন্তর্বিভাগ)

হাসপাতালের পরিচালনা

এই হাসপাতালের বর্তমান প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ ঘোষ এল্ এম্ এস্। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষের ভ্রাতা। শম্ভুবাবু আজ প্রায় ১২ বৎসরকাল এই হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক আছেন। ইহার পূর্বে তিনি প্রায় দশ বর্ষকাল এই হাসপাতালের সহকারী চিকিৎসক ছিলেন। শম্ভুবাবু একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। হাসপাতালের উন্নতির জন্য ইনি বিশেষ অবহিত। ইঁহারই তত্ত্বাবধানে হাসপাতালের যাবতীয় কার্য নির্বাহিত হয়।

সমস্ত হাসপাতালটি বৈদ্যুতিক আলোর দ্বারা সজ্জিত। হাসপাতালের ভিতর, বাহির, উদ্যান ও পথ সমস্তই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অস্ত্রোপচার গৃহটি (operation room) প্রশস্ত, আলো ও হাওয়াযুক্ত এবং আধুনিক অনেক প্রকার অস্ত্র-সরঞ্জামাদি দ্বারা সজ্জিত। হাসপাতালে এক্স-রের ব্যবস্থা নাই ; যাহাতে সত্বর এই অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষটির ব্যবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা চলিতেছে।

২৪-পরগণার সিবিল-সার্জন মহোদয় সময়ে সময়ে হাসপাতালের কার্যাদি পরিদর্শন করিয়া থাকেন। হাসপাতালের গৃহাদির সংস্কারের ভার ২৪-পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারের উপর ন্যস্ত আছে। সংস্কারাদির জন্য যাহা ব্যয় হয়, তাহা অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনারেল মহোদয় সাগরলাল দত্ত মহাশয়ের গচ্ছিত তহবিল হইতে প্রদান করেন। এই খরচা ব্যতীত হাসপাতাল পরিচালনার জন্য বার্ষিক ৭৫,০০০৲ হইতে ৮০,০০০৲ টাকা ব্যয় হয়।

ডাক্তার শম্ভু বাবুর একজন সহকারী আছেন। তাঁহার নাম ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায় এম্ বি। মিস্ পি বেল-হার্ট (Miss P. Bell-hart M. B., B. S.) নামে একজন মহিলা ডাক্তার মেয়েদের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত আছেন। ইহা ব্যতীত একজন বিকৃতি-বৈজ্ঞানিক (Pathologist) আছেন, তাঁহার নাম,—ডাক্তার ললিতমোহন সেন এম্ বি। এখানে ১৩ জন দেশীয় পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী আছেন। একজন কেরাণী ও চারিজন অভিজ্ঞ কম্পাউণ্ডার ও ড্রেসার হাসপাতালে বর্তমান।

স্বর্গীয় নীলরতন ধর

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সময় রায় বাহাদুর ডাক্তার নীলরতন ধর এম বি মহাশয় ইহার প্রধান চিকিৎসক ছিলেন এবং একটি বৃহৎ তাঁবুতে হাসপাতালের কাজ চলিত, কারণ সে সময়ে হাসপাতালের গৃহাদি নির্মিত হয় নাই। কিন্তু তিন চারি বৎসরের মধ্যেই হাসপাতালের বহির্বিভাগ, পুরুষদিগের জন্য অন্তর্বিভাগ, চিকিৎসকগণের ও লেডী ডাক্তারের গৃহ নির্মিত হয়। তাহার পর কিছুদিন পর্যন্ত হাসপাতালের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট বাংলার অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেলের অফিসের কার্যভার গ্রহণ করেন। ইহার পর হইতেই ক্রমশ হাসপাতালের উন্নতি হইতে থাকে। এ পর্যন্ত চারি লক্ষ টাকার উপর হাসপাতালের ভবনাদি-নির্মাণে ব্যয় হইয়াছে।

আজ হাসপাতালটি বাংলার প্রথম শ্রেণীর হাসপাতালসমূহের অন্যতম। ইহার মূলে নীলরতন বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও আপ্রাণ চেষ্টা নিহিত রহিয়াছে। দিনের পর দিন তিনি ইহার উন্নতির জন্য কি চেষ্টাই না করিয়াছেন! প্রায় চল্লিশ বর্ষকাল তিনি এই হাসপাতালে কার্য করেন। একাগ্রনিষ্ঠার সহিত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ

হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে সর্বসমেত ১০৮টি বেড আছে। প্রধান বাড়ীটি বৃহৎ ও দ্বিতল। ইহার একতলায় তিনটি সুবৃহৎ হল, মাঝে একটি হল—ইহা যাতায়াতের পথরূপে ব্যবহৃত হয়। রোগীর সংখ্যা বেশী হইলে, এই হলেও ৭।৮ জন রোগী থাকিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এগুলি ব্যতীত অফিস-গৃহ, Chemical Laboratory, Pathological Examination Room, ও Compounding Room আছে। নীচের হলে ২৪টি বেড আছে। এই বেডগুলিতে Medical ও Surgical Case এর রোগীরা থাকে। এই বাড়ীর দ্বিতলে উত্তরদিকে operation

theatre (অস্ত্রোপচার গৃহ), তিনটা বড় হল ও side room ২টা। ইহার একটি সম্পূর্ণ পৃথক (আলাদা করা) হলে (পূর্ব দিকে) স্ত্রীলোকদিগের জন্য Eye Ward,—ইহাতে ১৬টি বেড আছে। Side room ২টার একটা গুদাম ঘর ও একটায় রোগীর থাকিবার স্থান। মাঝের ও পশ্চিম দিকের হলে পুরুষদিগের জন্য চক্ষু-চিকিৎসার গৃহ—এই দুইটিতে ২৮টি বেড আছে। মহিলাদিগের অন্তর্বিভাগের বাড়ীটিতে (একতলা) ১৬টি বেড আছে। প্রসূতিসদনে ৬টি বেড বর্তমান। Septic Ward এর বাড়ীটি দুই ভাগে (পুরুষ ও মহিলা) বিভক্ত। ইহার পুরুষবিভাগে ১২টি এবং মহিলাবিভাগে ৬টি বেড আছে। সমস্ত ঘরগুলি বেশ আলো ও হাওয়া-যুক্ত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাংলার অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনারেল ও অফিসিয়্যাল ট্রাষ্টি ২৪ পরগণার সিভিল সার্জনের পরামর্শানুযায়ী এই হাসপাতালের কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পরিচালনা ও সুব্যবস্থার গুণে, এই হাসপাতাল বাংলা দেশের একটি প্রধান হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে। ইহার জন্য তাঁহারা ও প্রধান চিকিৎসক শম্ভুবাবু সাধারণের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

এই হাসপাতালের বিশেষত্ব এখানে চক্ষু-সংক্রান্ত পীড়ার চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার-কার্য বেশী হয়। গত বৎসরে ৬৫২টি রোগীর চক্ষুর ছানি কাটা হইয়াছে। গত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে এখানকার নবাগত রোগীর তালিকা দেওয়া হইল। অবশ্য ইহার মধ্যে পুরাতন রোগীর তালিকা দেওয়া হয় নাই।

বহির্বিভাগে—২৩৮৯০ (পুরুষ ও স্ত্রী)

অন্তর্বিভাগে—২৭৯৮ ঐ

অস্ত্রোপচার—১১৫২ ঐ

চক্ষুচিকিৎসা—৭০৫০ (বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগে)

প্রসূতিসদনের রোগীর কোন তালিকা পাওয়া যায় নাই।

এই হাসপাতালের যাবতীয় কার্য বিনামূল্যে নির্বাহিত হয়। কি বহির্বিভাগ, কি অন্তর্বিভাগ—কোন বিভাগেই রোগীর নিকট হইতে অর্থ লওয়া হয় না। রক্ত প্রভৃতি পরীক্ষার এবং injection প্রভৃতির জন্যও এখানে অর্থ লাগে না।

জন্ম ও বাল্যজীবন

কেবল বাহুবল বা অস্ত্রবল দ্বারাই যে বীর-আখ্যা লাভ করা যায়, ইহা মনে করা ঠিক নহে। ত্যাগ ও দান দ্বারাও বীর-পদবাচ্য হওয়া যায়। লোক-হিতার্থ বিপুল দান করিয়া সাগরলাল দত্ত মহাশয় পুণ্যশ্লোক ও প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। বহু লোক মনে করেন, প্রাতঃকালে তাঁহার নাম করিলে, সেই দিনটি ভাল যায় এবং তাঁহার নাম-স্মরণে পুণ্য হয়। কামারহাটীতে প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল এবং উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টি এই দানবীরের অক্ষয় কীর্তি।

হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়া নগরীতে সন ১২২৮ সালে (১৮২১ খৃষ্টাব্দে) সুবর্ণবণিক্-কুলোদ্ভব সাগরলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মোহনচাঁদ দত্ত। মোহনচাঁদের তিন পুত্র—পীতাম্বর, সাগরলাল ও দ্বারকানাথ। মোহনচাঁদ দত্ত মহাশয় পিতল, তামা, দস্তা, মোমবাতি, বাসন ও মসলার ব্যবসা করিতেন। ব্যবসায়ে সুবিধা ও বেশী অর্থাগম হইবে বলিয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং কলিকাতায় আসিবার অল্পদিন পরেই তাঁহার ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতিও হয়। এই সময়ে কলুটোলার ফিয়ার লেনে তিনি একটি বাড়ী তৈয়ারী করেন।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সেই সময়ে ইংরেজী আমাদের বাল্যশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এখন আমাদের বালকেরা যেমন ইংরেজী শিক্ষা করে, তখন তেমন প্রথার প্রচলন হয় নাই। শৈশবে সাগরলাল চুঁচুড়ায় প্রাথমিক শিক্ষারম্ভ করেন; কলিকাতায় তাঁহার সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। তখন সুবর্ণবণিক্-সমাজে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব পড়ে নাই। মোহনচাঁদ বাবু কারবারী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ব্যবসা-কার্য শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া মনে করিতেন। এই ধারণানুসারে তিনি যখন দেখিলেন যে, সাগরলাল ব্যবসা-পরিচালনের মত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন, তখন তিনি সাগরলালকে আপনার সহকারী করিয়া কারবারে লইয়া যাইলেন। সে সময়ে সাগরলালের বয়স ১৬।১৭ বৎসর।

ব্যবসাক্ষেত্রে সাগরলাল

সাগরলালের ব্যবসা-বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর ছিল এবং ব্যবসা-সম্বন্ধে তাঁহার দূরদৃষ্টিও ছিল অসাধারণ। ব্যবসায়ে লাভ ও ক্ষতির ব্যাপার তিনি পাকা ব্যবসায়ীর মত অল্পদিনেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ব্যবসায়ে এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য অল্পকালের মধ্যেই ব্যবসা-সম্বন্ধে তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদিগের অপেক্ষা অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সাগরলালের সহকারিতায় এই সময়ে মোহনচাঁদের ব্যবসা সবিশেষ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছিল এবং লাভের অঙ্কও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। এই উন্নতির মুখে সাগরলাল পিতার কারবার ছাড়িয়া দিয়া মেসার্স কারলাইল নেফিউ এণ্ড কোম্পানীর (Messrs. Carlyle Nephew & Co.) মুৎসুদ্দির কর্ম গ্রহণ করেন। সাগরলালের পিতার কারবারও লাভজনক ছিল। পিতাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া তিনি মুৎসুদ্দির কার্য গ্রহণ করেন।

মুৎসুদ্দির কার্য করিয়া তাঁহার দুই প্রকার লাভ হইল—প্রথম, অভিজ্ঞতা; দ্বিতীয়, অর্থ। তিনি যে এই অর্থ উপার্জন করিলেন—ইহা সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়া। এইবার ব্যবসা-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইয়া অবতীর্ণ হইবার তাঁহার নিজস্ব মূলধন ও সুযোগ জুটিল।

নিজস্ব মূলধনে নীলের ব্যবসা

তিনি মুৎসুদ্দির কার্য ত্যাগ করিয়া নীলের ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। তখন এদেশে নীলের চাষ হইত। বড় বড় ইংরেজ ও দেশীয় লোকের নীলের কুঠী ছিল; সেই সকল কুঠীওয়ালারা নীলের চাষ করিতেন। এই নীল হইতেই নীল রং তৈরী হয়। ইয়োরোপে নীল রপ্তানি করিয়া ব্যবসায়ীদের সে সময়ে প্রভূত অর্থ উপার্জিত হইত। ইংরেজ কুঠীওয়ালারা ক্রোড়পতি হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেন। এদেশে নীলের চাষ করিয়া কত ইংরেজ ধনকুবের হইয়াছিলেন—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। বর্তমান সময়ে চায়ের চাষ ও ব্যবসা করিয়া বহু ইংরেজ কোম্পানী যেমন বিপুল অর্থ উপার্জন করিতেছেন, তখন নীলের চাষ ও ব্যবসায়ে তদপেক্ষা বহু অর্থ ইংরেজ কোম্পানীসমূহের হস্তগত হইত।

সাগরলাল যখন নীলের ব্যবসা আরম্ভ করিলেন, তখন ইহা অত্যন্ত লাভজনক ছিল। মাত্র দুই বৎসর কাল তিনি এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। এই দুই বৎসরে তিনি বহু অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু এরূপ লাভজনক ব্যবসাও তিনি হঠাৎ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, রাসায়নিক নীল তৈয়ারী করিবার চেষ্টা একদিন ফলবতী হইবে—তখন ইহার পতন অবশ্যম্ভাবী। এই দূরদৃষ্টিই তাঁহাকে ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। কারণ এই সময়েই জার্মাণীতে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয় এবং যখন ইহার মূল্য কৃষিজাত নীল হইতে বহুগুণে সুলভ হইল, তখন আমাদের দেশ হইতে নীলের চাষ ক্রমে ক্রমে উঠিয়া গেল।

পাটের ব্যবসায় সাগরলাল

নীলের ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সাগরলাল নিশ্চেষ্ট হইয়া কালযাপন করেন নাই। পূর্বোক্ত কারলাইল নেফিউ এণ্ড কোম্পানীতে মুৎসুদ্দির কর্ম করিবার সময়ে পাটের ব্যবসা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান জন্মে। ক্রমে তিনি এই বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ভাল পাট ইয়োরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি করিলে যে প্রভূত অর্থাগমের সম্ভাবনা এই সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হন। অতঃপর তিনি পাটের ব্যবসায়ে ব্রতী হইলেন। এই ব্যবসায়ে তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পীতাম্বর বাবুকে অংশীদার গ্রহণ করেন। তাঁহার পাটের মার্কা ছিল দুইটি ত্রিভুজ এবং উহাদের মধ্যস্থলে একটি ইংরাজী "এম্" (M) অক্ষর। এই "এম" অক্ষরটি তাঁহার পিতৃদেবের নামের আদ্যক্ষর।

সাগরলালের সততা

কিছু দিন পাটের ব্যবসা বেশ ভালভাবেই চলিতেছে, এমন সময় এক দিন তাঁহার পাটের গুদামে আগুন লাগে; ইহার ফলে তিনি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হন। যে সকল মহাজন তাঁহাকে পাট সরবরাহ করিয়াছিলেন এবং তখনও মূল্য পান নাই, তাঁহারা সাগরলালের নিকট

আসিয়া যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"আপনার কাছে আমাদের যাহা পাওনা আছে, তাহার সিকি টাকা দিলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব।" অপর কেহ হইলে এই সর্তে তখনই ঋণ শোধ করিয়া দিতে সম্মত হইতেন; কিন্তু সাগরলাল সে ধাতুতে গড়া ছিলেন না। তিনি বলিলেন—"যতক্ষণ আমার কাছে একটি কপর্দকও থাকিবে, ততক্ষণ আমি কাহাকেও ফাঁকি দিব না।" সে সময়ে তাঁহার খাজাঞ্চী ছিলেন—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভদ্রলোক। তাঁহাকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন—"পাটের কোন্ কোন্ মহাজন আমার কাছে টাকা পাইবে তাহার হিসাব আমাকে দিন।" শশিবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাতে সমস্ত হিসাব তুলিয়া দিলেন। সাগরলাল তখনই তাঁহার কার্যাধক্ষ রাজনারায়ণ বাবুকে বলিলেন—"এই হিসাব মত প্রত্যেক পাওনাদারকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের (Bank of Bengal) নামে চেক্ কাটিয়া দিন।" সাগরলাল কতদূর নির্লোভ ছিলেন, তাঁহার মনুষ্যত্বের আদর্শ কিরূপ উচ্চ ছিল—এই ঘটনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর এই ঘটনা হইতেই তাঁহার পাটের ব্যবসা উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করিল।

তাঁহার এই সাধুতার প্রশংসা লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। ব্যবসায়িসমাজ তাঁহার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন—এরূপ নির্লোভ ও উচ্চ-হৃদয় ব্যক্তি কখনও কোনরূপ প্রতারণা করিতে পারে না। ইহার ফলে তাঁহার দুই ত্রিভুজ-মধ্যবর্তী "এম" মার্কা পাটের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। বড় বড় ইংরেজ বণিক্‌ও সাগরলালের পাট ব্যতীত অন্য পাট ক্রয় করিতেন না। এই জন্য তাঁহার ব্যবসায়ের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি এই ব্যবসায়ে ধনকুবের হইলেন।

সাগরলালের পিতা অর্থশালী ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু সাগরলাল স্বয়ং ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইবার সময়ে পিতার নিকট হইতে মূলধনস্বরূপ একটি পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন যখন তিনি পাটের ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন পিতৃদত্ত মূলধনের সাহায্য লইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। তিনি নীলের ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। প্রথমে পাটের ব্যবসায়ে তিনি সেই টাকা খাটান; পরে

তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে তিনি অংশী করিয়া লন। সাগরলাল আত্ম-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন এবং স্বীয় সাধুতা, শ্রমশক্তি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে ব্যবসা-ক্ষেত্রে বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন।

সাগরলালের চরিত্র

সাগরলাল সকল বিষয়েই নিয়মানুবর্তী ছিলেন। প্রত্যেক কার্য করিবার জন্য তাঁহার নির্দিষ্ট সময় ছিল। প্রত্যহ সকালে ঘোড়ায় বা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইতে যাইতেন। কর্মস্থান হইতে তিনি প্রতিদিন রাত্রি দশটার সময়ে বাড়ী ফিরিতেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তাঁহার গাড়ী যখন পাড়ার ভিতর আসিত, তখন প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকে তাঁহাদের ঘড়ী মিলাইয়া লইতেন।

তিনি মিতাহারী ছিলেন। সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতেন, সেজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে বিলাসী মনে করিত। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে তিনি পরিশ্রম করিতেন। তিনি অলস আমোদ-প্রমোদ একেবারেই পছন্দ করিতেন না। নিজের কাজকর্ম অবহেলা করিয়া কখনও আলস্যে বা বিলাসিতায় তিনি কাল অতিবাহিত করেন নাই। প্রত্যহ তিনি অফিসে ও গোলাবাড়ীর কলে যাইতেন; জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তাঁহার এই অভ্যাস ছিল। তাঁহার ঘোড়ার সখ ছিল। এইজন্য তিনি ১০।১২টি ঘোড়া রাখিতেন।

মনুষ্য-চরিত্র বুঝিবার তাঁহার একটি বিশেষ শক্তি ছিল। অনেকে তাঁহার নিকটে ব্যবসা সম্বন্ধে উপদেশ লইতে যাইতেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন—"সত্যপথে চল্‌বেন আর সাধুপথে থাক্‌বেন। এই দুইটি কর্‌লে ব্যবসায়ে উন্নতি হবেই।" সাগরলালের নিজের জীবনে এই নীতি তাঁহাকে সফলতা আনিয়া দিয়াছিল।

সাগরলালের ধর্মনিষ্ঠা ছিল। ইষ্ট মন্ত্র জপ না করিয়া তিনি কখনও আহারে বসিতেন না। তিনি যখন মন্ত্র জপ করিতেন, তখন সেই ঘরের নিকটে কাহারও যাইবার আদেশ ছিল না। কামারহাটিতে ভাগীরথী-কূলে তাঁহার বড় বাগান-বাড়ী ছিল। এই বাগান-বাড়ীতেই বর্তমানে হাসপাতাল

ও অবৈতনিক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় অবস্থিত। তিনি প্রায়ই সেখানে যাইতেন।

পারিবারিক জীবন

সাগরলাল কলুটোলার অন্তর্গত ১৪নং গোপালচন্দ্র লেনস্থিত বাড়ীতে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না—দুইটি মাত্র কন্যা ছিল। কনিষ্ঠা কন্যার সহিত নবীনচাঁদ বড়াল মহাশয়ের বিবাহ হয়। এই কন্যাই সঙ্গীতাচার্য লালচাঁদ বড়ালের জননী।

জীবনের শেষভাগে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর পীতাম্বর দত্ত মহাশয়ের পরিবার হইতে সাগরলাল পৃথক বাস করিতে থাকেন। পুত্র হয় নাই বলিয়া সাগরলাল বৃদ্ধ বয়সে মাণিকলালকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে মাণিকলালের অনুরাগ ছিল না।

পোষ্য-পুত্র গ্রহণের কিয়ৎকাল পরে সাগরলালের স্ত্রী পরলোক গমন করেন। বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীবিয়োগে সাগরলাল সংসারের উপর বীতরাগ হন ও এই সময়ে তিনি অধিকাংশকালই কামারহাটির বাগান-বাড়ীতে অবস্থান করিতেন।

মৃত্যু

১২৯৩ সালের (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ) ২৫শে কার্তিক বুধবার সাগরলাল দত্ত মহাশয় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বে একদিন তিনি গাড়ীতে চড়িয়া সকালে বেড়াইতে বাহির হন। ফিরিয়া আসিয়া গাড়ী হইতে নামিবার সময়ে গাড়ীর ঘোড়া হঠাৎ ভয় পাইয়া লাফাইয়া উঠে। সাগরলাল পড়িয়া যান। গাড়ীর চাকা তাঁহার পায়ের উপর দিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে তিনি নিদারুণ আঘাত পাইয়া শয্যাশায়ী হন। বৃদ্ধ বয়সে এই আঘাতই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হয়।

সাগরলালের স্মৃতির সম্মানার্থ কলিকাতা কর্পোরেশন, কলুটোলায় তাঁহার বাটির সন্নিকটস্থ একটি রাস্তার নাম—"সাগর ডাট্ লেন" দিয়াছেন।

সাগরলালের অন্যান্য জনহিতকর কার্য

কামারহাটির দাতব্য হাসপাতাল ও অবৈতনিক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকটি জনহিতকর কার্য আছে। চুঁচুড়ার গঙ্গার অপর পারে ভাটপাড়ায় বলরাম দাসের ঘাটটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; সাগরলাল বহু অর্থব্যয়ে পশ্চিম হইতে পাথর আনাইয়া সুদৃঢ়ভাবে সেই ঘাটটির সংস্কার-সাধন করেন। চুঁচুড়ায় তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত মাধব দত্ত মহাশয়ের ঘাটটি (হুগলী কলেজের সন্নিকটে অবস্থিত) ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই ঘাটটিও তিনি নূতন করিয়া তৈয়ারী করিয়া দেন।

চুঁচুড়াতে তাঁহার একটি ঠাকুরবাড়ী আছে। এখানে দোল ও ঝুলনের সময় বহু লোক যাইয়া থাকে। এই ঠাকুরবাড়ী-পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের (সাগরলালের গচ্ছিত সম্পত্তির আয় হইতে) নিকট হইতে ১৫০৲ টাকা পাওয়া যায়।

সাগরলাল দানে মুক্তহস্ত ছিলেন; তাঁহার এমন অনেক দান ছিল যেগুলির কথা তিনি কাহারও কাছে প্রকাশ করিতেন না।

১৯২১ সালের সেন্সাস্

১৩২৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "সুবর্ণবণিক্ সমাচারে" (৩২-৩৫ পৃঃ) স্বর্গীয় দীননাথ দত্ত, এম এ, মহাশয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে, বাংলাদেশের কোথায় কত সুবর্ণবণিকের বাস তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা প্রকাশ করেন। সে সময়ে পাটনা ভাগলপুর, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর,—বাংলাদেশের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু বর্তমান সেন্সাসের সময় (অর্থাৎ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে) এই চারিটি জেলা বাংলাদেশের ভিতরে স্থান পায় নাই—ইহারা স্বতন্ত্র প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। সে কারণ সে স্থানগুলির লোক সংখ্যা বাংলাদেশের মধ্যে ধরা হয় নাই। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস অনুসারে এই চারিটি স্থানে সুবর্ণবণিকের সংখ্যা—

পুরুষ	...	৯৮৯৩
স্ত্রী	...	৯৬৪৭

মোট ১৯৫৪০ ছিল। সে সময়ে বাংলাদেশে সুবর্ণবণিকের সংখ্যা সর্বসমেত ১২৮৯৬৯ ছিল। উহা হইতে পূর্বোক্ত চারিটি স্থানের সমষ্টি বাদ দিলে মোট লোক-সংখ্যা ১০৯৪২৯ দাঁড়ায়।

বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে যে যে বিভাগগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস অনুসারে সেই সমস্ত স্থানের মোট সুবর্ণবণিক্-সংখ্যা ১১৭১২৩। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গত দশ বৎসরে বাংলাদেশে সুবর্ণবণিকের সংখ্যা নিম্নলিখিত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে,—

পুরুষ	...	৪২৩৬
স্ত্রী	...	৩৪৫৮
	মোট	৭৬৯৪

সর্বসাধারণের বোধ-সৌকর্যার্থ এই দশ বৎসরে বাংলার কোন্ কোন্ স্থানে কি হারে স্ত্রী-পুরুষ উভয়বিধ লোক-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার একটি তুলনামূলক তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাসে গৃহীত ১১৭১২৩ লোকের মধ্যে শতকরা ৩৩·৬ জন লিখিতে পড়িতে জানে।

বর্ধমান বিভাগ

	পুরুষ		স্ত্রী		মোট	
	১৯১১	১৯২১	১৯১১	১৯২১	১৯১১	১৯২১
বর্ধমান	২৬৯১	২২৪০	২৭৭২	২৫০৫	৫৪৬৩	৪৭৪৫
বীরভূম	১৭৩১	১৬০০	১৭৯৬	১৭০৪	৩৫২৭	৩৩০৪
বাঁকুড়া	৪৪২০	৪৩৪১	৪৮১২	৪৫৬৫	৯২৩২	৮৯০৬
মেদিনীপুর	৩৭৪৪	৪১৪১	৩৮০৯	৪০৬২	৭৫৫৩	৮২০৩
হুগলী	৩৬৫৪	৩৬২৭	৩৬৮৬	৩৯২৩	৭৩৪০	৭৫৫০
হাওড়া	১৬৩৯	১৭৯০	১৭৮৩	১৬২৭	৩৪২২	৩৪১৭
	১৭৮৭৯	১৭৭৩৯	১৮৬৫৮	১৮৩৮৬	৩৬৫৩৭	৩৬১২৫

প্রেসিডেন্সি বিভাগ

২৪-পরগণা	১৯১১	১৮৭৭	১৮৭৯	১৭৬৩	৩৭৯০	৩৬৪০
কলিকাতা	১৫৫৪১	১৫৭১২	১২৬৬৯	১২৮৮১	২৮২১০	২৮৫৯৩
নদীয়া	২১১৪	২০২০	২২৭৭	২০৮২	৪৩৯১	৪১০২
মুর্শিদাবাদ	১৬৭১	১৫৮২	১৬৬৯	১৭২৪	৩৩৪০	৩৩০৬
যশোহর	১৭৫১	২০১৭	১৭৩৯	২১৬৮	৩৪৯০	৪১৮৫
খুলনা	১৬৬৬	১৯৫২	১৫৭৯	১৮৩১	৩২৪৫	৩৭৮৩
	২৪৬৫৪	২৫১৬০	২১৮১২	২২৪৪৯	৪৬৪৬৬	৪৭৬০৯

রাজসাহী বিভাগ

রাজসাহী	৬০৬	৪৮৩	৩৮৫	৪৭৯	৯৯১	৯৬২
দিনাজপুর	৬১	১৫৩	১৩৬	১৪৫	১৯৭	২৯৮
জলপাইগুড়ি	৭৪	৯৯	২৯	৬৩	১০৩	১৬২

	পুরুষ		স্ত্রী		মোট	
দার্জিলিং	৪	৪৬	...	৪	৪	৫০
রংপুর	৩০	১১৯	৮	৭৪	৩৮	১৯৩
বগুড়া	১৬৭	২১২	১৪৫	১৮২	৩১২	৩৯৪
পাবনা	৫৯৯	৬১২	৬৮৩	৬৫৪	১২৮২	১২৬৬
মালদহ	৭৬	৯৫	৮৮	৬০	১৬৪	১৫৫
	১৬১৭	১৮১৯	১৪৭৪	১৬৬১	৩০৯১	৩৪৮০
ঢাকা বিভাগ						
ঢাকা	২৫৪৮	৩৪৮৪	৩২৫৯	৪০০৪	৫৮০৭	৭৪৮৮
ময়মনসিংহ	৭৯৭	১০৬৩	৬৩২	৯৮৮	১৪২৯	২০৫১
ফরিদপুর	১৬১০	২৬৬১	১৯৯০	২৭৭৩	৩৬০০	৫৪৩৪
বাখরগঞ্জ	২৭৬	৬৬৮	২২৮	২৩৭	৫০৪	৯০৫
	৫২৩১	৭৮৭৬	৬১০৯	৮০০২	১১৩৪০	১৫৮৭৮
চট্টগ্রাম বিভাগ						
টিপারা	১১০৬	১২১২	৬৪১	৯৬০	১৭৪৭	২১৭২
নোয়াখালি	১১০৮	১৪৪৪	১১৪৫	১৪৫৪	২২৫৩	২৮৯৮
চট্টগ্রাম	৩৯৩১	৪৫৩৩	৩৮১৩	৪২১৮	৭৭৪৪	৮৭৫১
চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশ	১৫২	১২৩	...	...	১৫২	১২৩
	৬২৯৭	৭৩১২	৫৫৯৯	৬৬৩২	১১৮৯৬	১৩৯৪৪
বৃটিশ রাজ্য	৫৫৬৭৮	৫৯৯০৬	৫৩৬৫২	৫৭১৩০	১০৯৩৩০	১১৭০৩৬
করদ রাজ্য—						
কুচবিহার	৩১	৭	৩৭	১৫	৬৮	২২
পার্বত্য টিপারা	৩১	৬৩	...	২	৩১	৬৫
	৬২	৭০	৩৭	১৭	৯৯	৮৭
সমগ্র বঙ্গদেশ	৫৫৭৪০	৫৯৯৭৬	৫৩৬৮৯	৫৭১৪৭	১০৯৪২৯	১১৭১২৩

ভক্তকবি বিশ্বম্ভর পানি

'সঙ্গীত-মাধব'

১৭৮২ শকে (১৮৬০ খৃঃ) কবি বিশ্বম্ভর পানি কৃত "সঙ্গীতমাধব" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিশ্বম্ভর বাবু সুবর্ণবণিক্‌বংশোদ্ভব; তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত 'পাইন' বংশের উজ্জ্বল রত্ন। ভক্তকবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিশ্বম্ভর বাবু শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী গ্রন্থে গীতচ্ছন্দে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বম্ভর পানির গ্রন্থাবলী

এই সঙ্গীতমাধব গ্রন্থ ব্যতীত তিনি নিম্নলিখিত পাঁচখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন; ক্রমে সে সকল গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইবে ;—

১। জগন্নাথমঙ্গল

২। বৃন্দাবন-প্রাপ্ত্যুপায়

৩। প্রেম-সম্পুট

৪। ভক্তরত্নমালা

৫। কন্দর্পকৌমুদী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিমত

তাঁহার রচনাবলীর পরিচয় দিবার পূর্বে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন,* তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। এই লেখাটি "শ্রীসঙ্গীতমাধব" গ্রন্থের বিজ্ঞাপন-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে ;—

"সঙ্গীতমাধব সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলিত। বিশ্বম্ভর পানি, জয়দেব প্রণীত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের প্রণালী অবলম্বন পূর্বক, এই পুস্তকে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকর্তার জীবদ্দশায় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া উঠে নাই।

* "বিশ্বম্ভর বাবুর সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক লিখিয়া গিয়াছেন; উহা সঙ্গীতমাধবের বিজ্ঞাপনে মুদ্রিত আছে"—পুরোহিত, ২য় ভাগ, ৩য় সংখ্যা,—ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে তদীয় মধ্যম তনয় শ্রীযুক্ত বাবু যশোদাকুমার পানির যত্নে ও ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

"ইদানীং এতদ্দেশে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন নিতান্ত বিরল হইয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থায় বিশ্বম্ভর বাবু * * * সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা অল্প আশ্চর্যের বিষয় নহে। সুতরাং বিশ্বম্ভর বাবু কীদৃশ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত অনেকের-অন্তঃকরণে কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইতে পারে; এজন্য এস্থলে সংক্ষেপে তদীয় জীবনবৃত্ত উল্লিখিত হইতেছে।

"বিশ্বম্ভর পানি, জিলা হুগলীর অন্তঃপাতী সেনহাট গ্রামে, ১৭০৭ শকে কার্তিক মাসের প্রথম দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে, তিনি বাংলা ভাষা ও অঙ্কবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন; তদ্ভিন্ন ইংরাজী ও পারস্য ভাষাও কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনুমান ২৭।২৮ বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি জগন্নাথদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া পুরুষোত্তমধামে যাত্রা করেন। তথায় সমুদয় অবলোকন করিয়া, জগন্নাথদেবের লীলা বর্ণন করিবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মে। তৎকালে তিনি সংস্কৃত ভাষার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না; কিন্তু জগন্নাথদেবের লীলা সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত, সুতরাং সংস্কৃত পাঠ ব্যতিরেকে অভিলষিত লীলাবর্ণন সম্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য পুরুষোত্তমধাম হইতে প্রত্যাগমন পূর্বক, সবিশেষ যত্ন, উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে, সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

"অল্প দিনেই সংস্কৃত ভাষায় এক প্রকার ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বিশ্বম্ভর বাবু জগন্নাথদেবের লীলা-সংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইবার অভিলাষে উৎকলখণ্ড অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দিন পরে (১৭৩৭ শকে) ঐ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় পয়ার প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে অনুবাদ পূর্বক, 'জগন্নাথ-মঙ্গল' নামে পুস্তক প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত ও সর্বসাধারণকে বিতরণ করেন। অনন্তর তিনি জগন্নাথমঙ্গল গান করাইবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়া, কালাবতী পদ্ধতিক্রমে খেয়াল ধ্রুপদ প্রভৃতি বিবিধ সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়া বহু সংখ্যক পদাবলী সঙ্কলন করিলেন এবং উপযুক্ত বেতন দান পূর্বক কতিপয় ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। জগন্নাথ-

মঙ্গল সঙ্গীত সর্বসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে ও সঙ্গীত কার্য সমাধানে বিশ্বম্ভর বাবু অন্যূন চল্লিশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

"অতঃপর তাঁহার সংস্কৃত ও বাংলা কবিতা রচনায় অত্যন্ত উৎসাহ ও অনুরাগ জন্মে। ক্রমে ক্রমে তিনি 'বৃন্দাবন-প্রাপ্ত্যুপায়', 'প্রেমসম্পুট', 'ভক্ত-রত্নমালা' ও 'কন্দর্পকৌমুদী' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। বৃন্দাবন প্রাপ্ত্যুপায় পদ্মপুরাণের অন্তর্গত পাতালখণ্ডের অনুবাদ, ভক্তরত্নমালা নানা গ্রন্থ হইতে ভক্তগণের চরিত্র আহরণ পূর্বক সঙ্কলিত, কন্দর্পকৌমুদী আদিরসময় কাব্য। এই সকল গ্রন্থ বাংলা ভাষায় সঙ্কলিত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত রচনাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। বোধ হয় বিশ্বম্ভর বাবু সর্বশেষে সঙ্গীতমাধব রচনা করিয়াছিলেন।

"বিশ্বম্ভর বাবু অত্যন্ত পরিশ্রমশালী মনুষ্য ছিলেন ; কেহ কখন এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহাকে আলস্যে কালহরণ করিতে দেখেন নাই। তিনি বিলক্ষণ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং স্বীয় সম্পত্তি রক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ নিমিত্ত, বিষয়কার্যে বহু সময় ব্যাপৃত থাকিতে হইত। বিষয়কার্য নির্বাহ করিয়া যে অবকাশ পাইতেন, তাহাতেই সংস্কৃত অধ্যয়ন ও সঙ্কলন করেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও অতিশয় সৎস্বভাবশালী ছিলেন। তাঁহার দয়া ও ন্যায়পরতা গুণও বিলক্ষণ ছিল। তাঁহার ভূম্যধিকারে প্রজারা পরম সুখে কালযাপন করিত। তাহাদিগকে কখন ভূম্যধিকারীর অবিচার বা অত্যাচার-নিবন্ধন কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। যাহাতে প্রজারা সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে, তিনি তদ্বিষয়ে সর্বদা অবহিত থাকিতেন।

"এই সমস্ত অনুধাবন করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে পারে, বিশ্বম্ভর বাবু সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না। এদেশে বিষয়কর্ম, বিদ্যাভ্যাস ও গ্রন্থরচনা এ তিনের সমবায় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্বম্ভর বাবু এই তিন বিষয়ে আসক্ত থাকিয়া জীবন ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রীতি-চরিত্র সর্বাংশে দোষস্পর্শশূন্য ছিল। যাঁহারা বিশ্বম্ভর বাবুকে জানেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। ফলতঃ এদেশে ঈদৃশ ব্যক্তি সচরাচর নয়নগোচর হয় না।

"বিশ্বম্ভর বাবু ১৭৭৬ শকের আষাঢ় মাসের সপ্তবিংশ দিবসে কলিকাতা নগরে দেহযাত্রা সংবরণ করিয়াছেন।

কলিকাতা, সংস্কৃত যন্ত্র

৭ই ভাদ্র। শকাব্দাঃ ১৭৮২।"

কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের অভিমত

কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ও "বান্ধব" পত্রে (স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত) ৫ম বর্ষের অষ্টম সংখ্যা, ৩৬৬ পৃষ্ঠা "বিশ্বম্ভর পানি" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশ্বম্ভর বাবুর জীবনী ও তাঁহার রচিত সঙ্গীতমাধব গ্রন্থের একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বিশ্বম্ভর বাবুর উপর কবিবর রাজকৃষ্ণ বাবুর কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

"অনেকেই মহাত্মা বিশ্বম্ভর পানির নাম শ্রবণ করেন নাই। যদি এ দেশে পূর্বের ন্যায় এক্ষণে সংস্কৃত ভাষার তাদৃশ আদর থাকিত, তাহা হইলে এই উজ্জ্বল রত্নটি কি আজিও খনিগর্ভে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিত? বাস্তবিক, এক সংস্কৃত ভাষার অনাদর হেতু ভারতবর্ষের এবং এই বঙ্গদেশের কত কত গুণী ব্যক্তিও অনাদৃত হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ হইবার দুইটি কারণ দেখা যায়। প্রথম কারণ ইংরেজী ভাষার প্রভাব এবং দ্বিতীয় কারণ দেশীয়দিগের সেই অর্থকারী ইংরেজী ভাষার প্রতি সর্বতোভাবে আসক্তি প্রকাশ। এক সামান্য অর্থের লোভে মহার্থ সংস্কৃত ভাষা আজ নিরর্থক হইয়া গেল। হায়, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি? এই জন্যই কবি বিশ্বম্ভর পানি সাধারণের অপরিচিত।"

রাজকৃষ্ণ রায় কর্তৃক সঙ্গীত-মাধবের সমালোচনা

"সঙ্গীত-মাধব আট ভাগে বিভক্ত। নিম্নে সেই আট ভাগের তালিকা প্রদত্ত হইল।

"প্রথম বিভাগে দৈনন্দিন লীলাবর্ণনে রাত্র্যন্তলীলা-কথন
দ্বিতীয় " " " প্রাতর্লীলা কথন
তৃতীয় " " " পূর্বাহ্ণলীলা কথন

চতুর্থ বিভাগে দৈনন্দিন লীলাবর্ণনে মধ্যাহ্নলীলা কথন
পঞ্চম " " " অপরাহ্নলীলা কথন
ষষ্ঠ " " " সায়াহ্নলীলা কথন
সপ্তম " " " প্রথমরাত্রিলীলা কথন
অষ্টম " " " মহানিশালীলা কথন

"কবিবর জয়দেব যে প্রণালীতে রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণন করিয়া গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছেন, সঙ্গীত-মাধবেও তাহাই দৃষ্ট হয়। সঙ্গীত-মাধবের কবি যে জয়দেবের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি প্রথম বিভাগের একস্থলে জয়দেবের স্মরণ করিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

'ব্রজপতিসুতলীলা যা হি রম্যাতিরম্যা
প্রতিপদললিতা যা যাষ্টকালৈর্বিভক্তা।
প্রথয়িতুমধুনা তাং গীতবন্ধৈশ্চ পদ্যৈঃ
কবিনৃপজয়দেবাদীনহং সংস্মরামি॥'*

"গীতগোবিন্দে যেরূপ কিয়দংশ শ্লোক ও কিয়দংশ গীত পর্যায়ক্রমে নিবদ্ধ হইয়াছে, ইহাতেও সেইরূপ পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়।

"আমরা প্রথমে এতন্নিবিষ্ট শ্লোকগুলির বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া, পরে গীতের বিষয় বলিব। এই গ্রন্থের মধ্যে অনুষ্টুপ, মন্দাক্রান্তা, স্রগ্ধরা, বসন্ততিলক, উপজাতি, উপেন্দ্রবজ্রা, বংশস্থবিল, মণিমালা, তূণক, তোটক, মালিনী, ছায়া, শোভা, শিখরিণী, চিত্রলেখা, শার্দূলবিক্রীড়িত, পজ্ঝটিকা প্রভৃতি নানাবিধ ছন্দে শ্লোকসমূহ গ্রথিত হইয়াছে। সেই শ্লোকে শব্দবিন্যাস, ভাব ও মাধুর্য্য একত্র সমাবেশিত হইয়াছে; কিন্তু উচ্চদরের কবিত্ব বিষয়ে অনেক ন্যূন।

"সঙ্গীত-মাধবের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোনিবদ্ধ যে কএক প্রকার শ্লোক আছে, নিম্নে তাহাদের মধ্য হইতে কএক প্রকারের উদাহরণ উদ্ধার করিয়া

* অর্থাৎ শ্রীব্রজরাজনন্দনের যে লীলা মধুর হইতেও সুমধুর যাহা প্রতিপদে নিত্যনূতন এবং যাহা অষ্ট সেবাকালে বিভক্ত হইয়াছে, অধুনা সেই অষ্টকালীন লীলাগুলি গীত ও পদ্যাকারে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আমি কবিনৃপ শ্রীজয়দেবাদিকে স্মরণ করিতেছি।

দিলাম। ইহাতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, বিশ্বম্ভর বাবু সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে কিরূপ পারদর্শী ছিলেন।

শ্রীগুরুং করুণাসিন্ধুং সর্বশক্তিপ্রদং বিভুম।
তত্ত্বাতীতং সর্বতত্ত্বস্বরূপং প্রণমাম্যহম্॥ ১।১

জয়তি নিভৃতকুঞ্জে রাধয়া মাধবস্য
শ্রুতিপরনরলীলা শ্রীযশোদাসুতস্য।
ঘনরসময়মূর্তের্ভক্তবাঞ্ছাপ্রদস্য
সততমবতু বো নো বল্লবীবল্লভস্য॥ ১।১৬

শ্রীবৃন্দাবিপিনং পরাৎপরপদং গুহ্যাতিগুহ্যং মহৎ
প্রেমানন্দরসাপ্লুতং সুখময়ং সম্মোদদং শাশ্বতম্।
সন্তানদ্রুলতাবলীসুকুসুমৈঃ সৌরভ্যযুক্তং পরং
বায়ূদ্ধূতপতঙ্গজাজলকণৈঃ সিক্তাতিশীতং ভজে॥ ১।১৮

রাত্র্যন্তে কীরশারীমধুপকলরবৈর্বোধিতৌ তৌ সখীভী
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবলসিতবপুষৌ প্রেমমাধুর্যপূরৌ।
দৃষ্ট্বান্যোন্যাঙ্গচিহ্নং রতিরণজনিতং জাতহাসৌ যুবানৌ
তদ্ভাবাবিষ্টচিত্তৌ সমুদিতপুলকৌ তল্পগৌ সংস্মরামি॥ ১।২০

অথালিবর্গা বৃষভানুপুত্র্যাঃ
সংশোধ্য গেহাদিকমম্বুজাক্ষ্যাঃ।
বেশোপযুক্তানি চ যানি তানি
তদ্বেশগেহে স্ম নিবেশয়ন্তি॥ ২।৭

বৃষভানুসুতা ব্রজভূমিপতেঃ
প্রিয়নন্দনভোজনশেষমতঃ।
স্বসখীনিচয়েন সমং সুমুখী
পরিভুজ্য পরং সুখমাপ বহু॥ ২।১২৪

স্বকং প্রিয়াকুণ্ডমুভে হরিস্তদা
বিলোক্য রাধাবিরহাকুলো ভৃশম্।
দ্বিজং পশুং বৃক্ষলতাগৃহাদিকং
রাধাময়ং সর্বময়ং প্রপশ্যতি॥ ৩।৮৭

প্রিয়সখি কুত্রাস্তে স সুধন্যে
শ্রীরাধে তব কুণ্ডারণ্যে।
হে সখি তত্রাসৌ কিং কুরুতে
নৃত্যং শিক্ষতি মাধবদয়িতে॥ ৪।১৬

অতঃ স্বপত্নীভিরয়ং বিধুর্মুদা
সংক্রীড়তে মৎপুরতঃ স্বয়ং যদি।
তদা সুতৃপ্তাতিভবামি নিশ্চিতং
শ্রীরাধিকেদং পরিহাসতোঽব্রবীৎ॥ ৪।৬৪

পিকালিশারীশুকনাদসেবিতং
প্রসূনসদগন্ধযুতং মনোরমম্।
পূর্ণেন্দুকান্ত্যুজ্জ্বলকাননং হরিঃ
সমীক্ষ্য রাসায় চকার মানসম্॥ ৮।৪

"এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার ছন্দঃ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তবে কথা এই যে, গীতগোবিন্দের অন্তর্গত ছন্দঃসমূহে যতদূর গুণপণা সহকারে উচ্চদরের চমৎকারিত্ব রক্ষিত হইয়াছে, ইহাতে ততদূর হয় নাই। তা না হউক, কিন্তু এ সমস্ত ছন্দের সৌন্দর্য অবশ্য পাঠককে পরিতুষ্ট করিতে পারে। যদিও স্থলে স্থলে দীর্ঘ দীর্ঘ সন্ধি-সমাস একত্র হইয়া কোমলতা নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু বেশীর ভাগে তাহা না হওয়াতে পাঠকের পাঠ কষ্ট সমুৎপন্ন হয় না

"এইবার আমরা সঙ্গীত-মাধবের গীত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব।

"জয়দেবের গীতগোবিন্দের ধরণে ইহাতে অনেকগুলি গীত নিবদ্ধ হইয়াছে। উহাদের সংখ্যা সর্বসমেত পঞ্চাশটী। ভাষায় মিত্রাক্ষর ছন্দঃ লেখা যত সহজ, সংস্কৃতে তত নহে। যে সে ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষায় মিত্রাক্ষর ছন্দঃ রচনা করিতে পারে না। বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথমে কবিবর জয়দেব সংস্কৃত মিত্রাক্ষর ছন্দের পথ প্রদর্শন করেন। তাহার পর আমরা আরও দুই চারিজন সংস্কৃত কবিকে অত্যল্প ভাগে ঐরূপ ছন্দঃ রচনা করিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা জয়দেবের অনুকরণে রচিত হইয়াও আশা মত

হয় নাই। এক্ষণে আমরা দেখিতেছি বিশ্বম্ভর বাবু এ বিষয়ে জয়দেব ব্যতীত বঙ্গদেশীয় অপরাপর সংস্কৃত মিত্রাক্ষর ছন্দঃলেখকের অপেক্ষা অনেক গুণে কৃতকার্য হইয়াছেন। তবে যে, ইঁহারও গ্রন্থে সে বিষয়ে কোন দোষ নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না। সংস্কৃত মিত্রাক্ষরের ভাষা যত কোমল অথচ ভরাট হইবে, ততই পাঠককে মোহিত করিতে পারিবে। তাহা না হইয়া শব্দকাঠিন্য ও মিলদোষ থাকিলে, নানাবিধ প্রস্ফুটিত ও সৌরভযুক্ত কুসুমাকীর্ণ শয্যাতলে কতকগুলি গুপ্ত কণ্টকের ন্যায় এক একবার সুখভঙ্গ করিয়া ফেলিবে। সঙ্গীত-মাধবের কতকগুলি গীতের স্থানে স্থানে, সেইরূপ দোষ-কণ্টক রহিয়া গিয়াছে। যাই হউক, যদি বিশ্বম্ভর বাবু জীবিত থাকিতেন, বোধ হয়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এই দোষগুলি সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেন।

"পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কবি রাধাকৃষ্ণের দৈনন্দিন লীলাবর্ণনে রাত্র্যন্ত লীলা, প্রাতর্লীলা প্রভৃতি আট প্রকার লীলা বর্ণন করিয়াছেন। সেই লীলাবর্ণনাবলীর অন্তর্গত গীতসমূহে, সঙ্গীত-শাস্ত্রানুসারে যথাক্রমে ভৈরবাদি রাগরাগিণী সংযোগ করিয়াছেন। এরূপ করাতে কে না তাঁহাকে সঙ্গীতশাস্ত্রেও দক্ষ বলিবেন? তিনি যে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তাহা তাঁহার এই প্রস্তাবোক্ত জীবনীতেও উল্লিখিত হইয়াছে। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা বেহাগে প্রভাত বর্ণন, ললিতে মধ্যাহ্ন বর্ণন, সারঙ্গে সন্ধ্যা বর্ণন এবং পূরবী বা গৌরীতে মধ্যরাত্রি বর্ণন গাহিয়া বসে। বিশ্বম্ভর বাবু তাহা করেন নাই, কেন না তিনি সঙ্গীতানভিজ্ঞ ছিলেন না।

"নিম্নে সঙ্গীত-মাধব হইতে কএকটি গীতের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নমুনা তুলিয়া দিলাম।

বিকসিতকুসুমচয়ৈ রমণীয়ং
প্রেমরসাপ্লুতমতিকমনীয়ম্।
বৃন্দাবনবনমজভবসেব্যং
পরমসুখাস্পদমনিশং নব্যম্ ধ্রু॥ ১।১৭

অতিকারুণ্যৌ নবতারুণ্যৌ ললিতাদিকপরিবারৌ।
ত্রিভুবনসারৌ লোচনতারৌ বিশ্বম্ভরহৃদ্ধারৌ। ১।১৯

রাগরঞ্জিতলোচনঘনমাধুরীময়মূর্তিম।
ভাবিনীভরভাবভাবিতমাশ্রিতাশয়পূর্তিম্॥
রক্তলক্তককজ্জলাঞ্চিতবক্ষসাতিসুশোভম্।
হীরমৌক্তিককৌস্তুভাচিতকণ্ঠকং জনলোভম্॥ ২।৩৬

কিং ত্রপসে নিজপরিজনগণতঃ কথয় সহৃদয়বাণীম্।
সুমুখি হরিপ্রিয়মনুকৃতবত্যসি ননু মন্যেঽহমিদানীম্॥ ২।৫২

লোলিতমুক্তাফলযুতসুনসং জিতশশিশকলললাটনিদেশম্।
শ্রীবৎসাঙ্কিতকৌস্তুভমণিযুতবক্ষসমতনুমনোহরবেশম্॥ ২।৭৪

জয়তি জয়তি ভুবি গিরিবরধরণঃ
শতদলজলরুহরুচিজিতচরণঃ।
অঘবকশকটবিকটভয়হরণঃ
কৃপয়তু মাং চরণাশ্রিতশরণঃ॥ ৪।২২১

প্রস্তাববাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধার করিতে পারিলাম না। সঙ্গীত-মাধবের কোন গীতে এক এক স্থলে ছন্দঃদোষও পরিলক্ষিত হয়। তা যাই হউক, সমুদয়ে ধরিতে গেলে গীতগুলি মনোহর ও সুন্দর হইয়াছে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদিও আমরা বিশ্বম্ভর বাবুকে কবিবর জয়দেবের সমকক্ষ বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার প্রথম শ্রেণীর একজন কৃতকার্য শিষ্য বলিতে কুণ্ঠিত নহি।"

১৭৮২ শকাব্দে বা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সঙ্গীতমাধব গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৭৭৬ শকে বিশ্বম্ভর বাবু পরলোক গমন করেন, সুতরাং তিনি এ গ্রন্থের প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পরলোক গমনের ছয় বৎসর পরে তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত তৃতীয় পুত্র যশোদাকুমার পানি মহাশয়ের যত্ন, চেষ্টা ও ব্যয়ে ইহা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশ-কার্যে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যশোদা বাবুকে বিশেষ সাহায্য করেন। প্রথম সংস্করণের গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"সঙ্গীত মাধব

—❋—

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র

———

শকাব্দা ১৭৮২"

প্রথম সংস্করণের গ্রন্থখানি ডিমাই আট পেজী আকারে ১৩৭ পৃষ্ঠায় (বিজ্ঞাপন তিন পৃষ্ঠা) সমাপ্ত। এই সংস্করণের গ্রন্থের মধ্যে মূল্যের কোন উল্লেখ নাই।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ৪১ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৩৩ শকাব্দে (বা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে) বিশ্বম্ভর বাবুর পৌত্র শ্রীযুক্ত অমৃতলাল পানি বি এল, মহাশয় কর্তৃক এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইনি বিশ্বম্ভর বাবুর প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র তারাকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিতেছেন ঃ—

"শ্রীসঙ্গীতমাধবের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই উপাদেয় গ্রন্থে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা নানা সুললিত ছন্দে অতি বিশদ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা যে বৈষ্ণবমণ্ডলীর অতি আদরের সামগ্রী ও আমাদের বংশের কীর্তিস্তম্ভ তাহা বলা বাহুল্য। কতিপয় ভক্ত বৈষ্ণবের আগ্রহাতিশয্যে ও গোলোকগত পূজ্যপাদ পিতামহ-দেবের এই কীর্তি স্থায়ী রাখিবার জন্য এই গ্রন্থ পুনরায় মুদ্রিত করা হইল। আমার পরমাত্মীয় ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ মল্লিক ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মল্লিক মহাশয়গণ এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন ও উৎসাহ বর্ধন করিয়াছেন। পরিশেষে নিবেদন রসজ্ঞ ভক্তবৃন্দ এই গ্রন্থ পাঠে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও আনন্দ উপলব্ধি করেন, তাহা হইলে আমার সকল শ্রম ও ব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব।"

প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণেও মূল্যের কোন উল্লেখ নাই। ইহা ডিমাই আট পেজী আকারে ১২৫ পৃষ্ঠায় (বিজ্ঞাপন তিন পৃষ্ঠা) সমাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদ-পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

"সঙ্গীত মাধব

দ্বিতীয় সংস্করণ

৺বিশ্বম্ভর পানি প্রণীত

ও

শ্রীঅমৃতলাল পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

———*———

কলিকাতা,

৮নং জ্যাকসন্ লেন, ক্রাইটিরিয়ান প্রিন্টিং ওয়ার্কসে

শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

—*—

শকাব্দা ১৮৩৩"

শ্রীসঙ্গীতমাধব গ্রন্থের ১৩৬ ও ১৩৭ পৃষ্ঠার (১ম সংস্করণ) নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি পাঠে বুঝা যায় যে, কবিচূড়ামণি কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত গোবিন্দ-লীলামৃত নামক পুস্তক অবলম্বনে বর্তমান গ্রন্থের উদ্ভব হইয়াছে :—

শ্রীকৃষ্ণদাসাখ্যকবীন্দ্রসূরিণা
গোবিন্দলীলামৃতরম্যপুস্তকে।
যদ্বর্ণিতং তত্তু ময়া সমাসতঃ
প্রকাশিতং ভক্তসুখায় কেবলম্॥ ৮৬
গোবিন্দলীলামৃতনামপুস্তকাৎ
সমুদ্ধৃতো গীতপদৈর্বিবর্ণিতঃ।

অর্থাৎ গোবিন্দলীলামৃত নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া লীলাগুলি গীতচ্ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে।

পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠার কয়েকটি শ্লোক হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারা যায় ;—

১। শ্রীলশ্রীব্রজনাথচট্টনৃপতেঃ পাদাব্জরেণ্বাশ্রয়াৎ
সংক্ষেপাদ্বিবৃতং হি পুস্তককরে লীলাষ্টকং শ্রীহরেঃ।

অর্থাৎ শ্রীল ব্রজনাথ চট্ট-নৃপতির পদরেণুকে আশ্রয় করিয়া এই পুস্তকে শ্রীহরির অষ্টকালীন লীলাবিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

এই "ব্রজনাথ চট্টনৃপতি" যে কে, তাহার পরিচয় আমরা বিশ্বম্ভর বাবুর কৃত 'জগন্নাথ-মঙ্গল' গ্রন্থ হইতে পাই।

"শ্রীলশ্রীশ্রীনিবাসন্তু আচার্যখ্যাতিমাশ্রিতম্।
যৎসুতাবংশসম্ভূতং তমীশ্বরং প্রভুং ভজে॥"

গুরুবন্দনার নবম শ্লোক (জগন্নাথ-মঙ্গল ১ম পৃষ্ঠা)

অন্যত্র, জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থারম্ভের প্রথম চারিটি পদে—

"জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য গোঁসাই।
তাঁর পাদপদ্ম বিনা গতি মোর নাই॥ ১
যাঁর সুতাবংশোদ্ভব মম প্রাণেশ্বর।
শ্রীব্রজনাথ প্রভু ভুবন মঙ্গল॥ ২
হরির স্বরূপ মূর্তি আনন্দে বিহরে।
পতিত অধম দীন করুণায় তারে॥ ৩"

(জগন্নাথমঙ্গল, সূত্রখণ্ড, ১০ম পৃষ্ঠা)

বিশ্বম্ভর বাবুর রচিত অপর একখানি গ্রন্থ "বৃন্দাবন প্রাপ্ত্যুপায়" হইতেও জানিতে পারি ;—

"শ্রীআচার্য শ্রীনিবাস পাদপদ্ম আগে।
অবনি লোটায়্যা বন্দি অতি অনুরাগে॥
যাঁর সুতা-বংশোদ্ভব মম প্রাণেশ্বর।
শ্রীল ব্রজনাথ প্রভু প্রেম-রসাকর॥
শ্রীপাট বসন্তপুর যাঁর লীলাধাম।
বিপ্রসমূহের বাস হয় যেই গ্রাম॥
চট্টরাজ ঠাকুরের শ্রীপাদ সেবিলে।
প্রেমময় হয়্যা রাধাকৃষ্ণ পদ মিলে॥"

(বৃন্দাবন প্রাপ্ত্যুপায়, প্রথম সোপান, ৩য় পৃষ্ঠা)

শ্রীসঙ্গীতমাধবে চট্টনৃপতি শব্দ "চট্টরাজ" শব্দের পরিবর্তে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই ব্রজনাথ চট্টরাজ মহাশয় বিশ্বম্ভর পানির গুরু ছিলেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর "সুতাবংশোদ্ভব" অর্থাৎ দৌহিত্রবংশোদ্ভব। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর তিন পুত্র ও তিন কন্যা। প্রথমা কন্যা হেমলতা

দেবী, দ্বিতীয়া কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী এবং কনিষ্ঠা কন্যার নাম কাঞ্চনলতা দেবী। এই ব্রজনাথ চট্টরাজ মহাশয় তাঁহার কোন্ কন্যার বংশধর তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তবে তাঁহার নিবাস যে বসন্তপুর নামক গ্রামে, তাহা উপরি উদ্ধৃত পয়ার হইতে জানিতে পারি।

"মুক্তাদিরামেশ্বরভূসুরাভ্যাং
সংশোধিতো যত্নত আত্মবিদ্ভ্যাম্ ॥৮৯॥"

মুক্তারাম ও ঈশ্বর অর্থাৎ ৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই দুই জন আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা এই গ্রন্থ সংশোধিত হইল।

"শাকে গ্রহর্ত্বর্ণবরোহিণীশে
শ্রীরাধিকাজন্মদিনেঽতিপুণ্যে।
হীনেন বিশ্বম্ভরদাসকেন
সংবর্ণিতোঽভূদতিযত্নতো বৈ ॥ ৯০ ॥"

অর্থাৎ দীনহীন বিশ্বম্ভর দাস অতীব যত্নে ১৭৬৯ শকাব্দে ভাদ্রপদীয় শুক্লাষ্টমীর অতি পবিত্র শ্রীরাধিকার জন্মদিনে ইহা সমাপ্ত করিলেন।

এই শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ১৭৬৯ শকে রাধাষ্টমীর দিন অর্থাৎ ১২৫৪ সালের ৩রা আশ্বিন (ইং ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ) বিশ্বম্ভর বাবু এই সঙ্গীতমাধব গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।

রেভারেণ্ড লঙের গ্রন্থে বিশ্বম্ভর পানির উল্লেখ

পূর্বে উক্ত হইয়াছে 'সঙ্গীতমাধব' ব্যতীত বিশ্বম্ভর পানি মহাশয় আরও পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু এই গ্রন্থ কয়খানি ছাড়া তিনি "রজনীকান্ত" নামক একখানি গল্পের বইও লিখিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থের সন্ধান আমরা Rev. J. Long সাহেবের Register of Bengali Authors, Editors, Translators &c. which have issued from the press from the year 1818 to 1855 নামক তালিকা হইতে পাই। তাঁহার কৃত এই তালিকামালার ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

"Bishambhar Das—
(1) Jaggannath Mangal
(2) Rajanikanta, a tale"

বিশ্বম্ভর বাবুর 'পানি' উপাধি অনেক স্থলে "দাস" দ্বারা সূচিত হইয়াছে—লং সাহেবও তাই তাঁহার নামের শেষে এই "দাস" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বিশ্বম্ভর বাবু বৈষ্ণব ছিলেন,—বৈষ্ণবেরা প্রায়ই নিজেদের নামের শেষে বিনয়বশত "দাস" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন,—বিশ্বম্ভর বাবুও সে পন্থা পরিত্যাগ করেন নাই।

লং সাহেবের এই তালিকা ইংরাজী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, ইহার এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, বিশ্বম্ভর বাবু পরলোক গমন করেন। তাই লং সাহেব তারকা চিহ্ন (*) দ্বারা বিশ্বম্ভর বাবুকে মৃত গ্রন্থকার'রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন।

পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে, সঙ্গীতমাধব গ্রন্থের কোন মূল্যের উল্লেখ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উপস্থিত Rev. Long সাহেব কৃত Descriptive Catalogue of Vernacular Books and Pamphlets forwarded by the Government of India to the Paris Exhibition of 1867 (Published by Messrs. Thacker Spink & Co. in 1867) এর Bengali Books and Pamphlets etc. etc. published before 1865 on special subjects of interest শীর্ষক অধ্যায়ের মধ্যে দেখিতে পাই—

"Sangit Madhab—Sanskrit Songs on Krishna,
800, pages 136, 1 rupi, 1860 (5)."

এই বিবরণ হইতে জানিতে পারি যে, প্রথম সংস্করণের সঙ্গীতমাধবের মূল্য এক টাকা ধার্য হইয়াছিল।

সঙ্গীতমাধবে রাগরাগিণীর উল্লেখ

সঙ্গীতমাধবের মুখবন্ধের ১৭টি শ্লোক ব্যতীত বাকী সমস্ত শ্লোকেই সুর-সংযোগ করা হইয়াছে। এই সুর-সংযোগকল্পে বিশ্বম্ভর বাবু নিম্নলিখিত রাগরাগিণীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন :—

রাগ	রাগিণী
বসন্ত	রামকিরি
ভৈরব	দেশকারী
ললিত	টোড়ী
গান্ধার	বেলাবলী
শারঙ্গনট	পটমঞ্জরী
শ্যাম	আশাবরী
নট	শারঙ্গী
ইমন	দেশকলী
কল্যাণ	জয়েত
মল্লার	মালশ্রী
কেদার	মুলতানী
হামির	পূরবী
	গৌরী
	সিন্ধুড়া
	সুহিনী
	জয়ৎ

তাঁহার গ্রন্থে এই ১২টি রাগ ও ১৬টি রাগিণীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই রাগরাগিণীর বিভাগে ও নামকরণে মতভেদ আছে। "ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী"র কথাই আমরা সাধারণত শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু বিশ্বম্ভর বাবুর গ্রন্থে আমরা বারটি রাগের দর্শন পাই। নামের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও মূল রাগ যে ছয়টি তাহা সঙ্গীতশাস্ত্রবেত্তাগণের সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ছয়টি রাগ কি কি এখানে তাহার নামোল্লেখ করা হইল :—

ব্রহ্মার মতে—শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব, মেঘ ও বৃহন্নট বা নটনারায়ণ।

ভরতের ও হনুমন্তের মতে—শ্রী, ভৈরব, মেঘ, মালকোষ, দীপক ও হিন্দোল।

সোমেশ্বরের মতে—শ্রী, ভৈরব, মেঘ, মালব, দীপক ও হিন্দোল।

মতান্তরে বসন্ত, বৃহন্নট, মল্লার, মালব, প্রদীপ ও কৌশিক এই ছয়টিও রাগরূপে গৃহীত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণের এই বিভাগ মানিয়া লইলে, বিশ্বম্ভর বাবুর লিখিত ১২টি রাগের মধ্যে মাত্র তিনটি (বসন্ত, ভৈরব ও মল্লার) রাগকে রাগ নামে আখ্যাত করা যায়। নট সম্ভবতঃ বৃহন্নট বা নটনারায়ণ হইবে। বাকী আটটি রাগিণী (রাগের ভার্যা), রাগের পুত্র ও পুত্রবধূ-পর্যায়ভুক্ত। তাঁহার গ্রন্থ মধ্যেও দেখিতে পাই, কখন লেখা হইয়াছে—"কেদাররাগেণ" (১২৬ পৃষ্ঠা), কখন লেখা আছে—"কেদার-রাগিণ্যা" (১৩১ পৃষ্ঠা) ; তাঁহার লিখিত রাগিণীগুলির সব কয়টি রাগিণী নহে, ইহার মধ্যে রাগের পুত্র ও পুত্রবধূ-পর্যায়ভুক্ত সুরও আছে।

পুস্তকের বিভাগ

পুস্তকখানি আট ভাগে বিভক্ত, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। প্রথম ভাগের প্রথম ১৭টি শ্লোকে গুরুবন্দনা, গ্রন্থকারের উক্তি প্রভৃতি আছে। কোন্ ভাগ কত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং কোন্ ভাগে কতগুলি গান এবং কত শ্লোক আছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল ঃ—

	কত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত	গানের সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
প্রথম বিভাগ	৭	৪	৩৫
দ্বিতীয় বিভাগ	২৩	৮	১৪০
তৃতীয় বিভাগ	১৮	৬	৯৯
চতুর্থ বিভাগ	৪৬	১৩	২৮৭
পঞ্চম বিভাগ	৮	৩	৪৮
ষষ্ঠ বিভাগ	৬	২	৩৬
সপ্তম বিভাগ	১০	৪	৫২
অষ্টম বিভাগ	১৯	১০	৯১

সমগ্র গ্রন্থ ১৩৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং ৫০ খানি গানে ও ৭৮৮ শ্লোকে গ্রথিত।

সঙ্গীতমাধব গ্রন্থের প্রত্যেক বিভাগ সমাপ্তির শেষে সেই সেই বিভাগে বর্ণিত লীলার কাল-জ্ঞাপক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে ঃ—

প্রথম বিভাগের শেষে—ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে দৈনন্দিনলীলাবর্ণনে রাত্র্যন্তলীলাকথনং নাম প্রথমো বিভাগঃ।

দ্বিতীয় বিভাগের শেষে—ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে দৈনন্দিনলীলাবর্ণনে প্রাতর্লীলাকথনং নাম দ্বিতীয়ো বিভাগঃ।

তৃতীয় বিভাগের শেষে—ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে দৈনন্দিনলীলাবর্ণনে পূর্বাহ্নলীলাকথনং নাম তৃতীয়ো বিভাগঃ।

চতুর্থ বিভাগের শেষে—ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে দৈনন্দিনলীলাবর্ণনে মধ্যাহ্নলীলাকথনং নাম চতুর্থো বিভাগঃ।

পঞ্চম বিভাগের শেষে—ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে দৈনন্দিনলীলাবর্ণনে অপরাহ্নলীলাকথনং নাম পঞ্চমো বিভাগঃ।

ষষ্ঠ বিভাগের শেষে—শ্রীসঙ্গীতমাধবে দৈনন্দিনলীলাবর্ণনে সায়াহ্নলীলা-কথনং নাম ষষ্ঠো বিভাগঃ।

সপ্তম বিভাগের শেষে—ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে দৈনন্দিনলীলাবর্ণনে প্রথমরাত্রিলীলাকথনং নাম সপ্তমো বিভাগঃ।

অষ্টম বিভাগের শেষে—ইতি শ্রীসঙ্গীতমাধবে দৈনন্দিনলীলাবর্ণনে মহানিশালীলাকথনং নাম অষ্টমো বিভাগঃ।

ইহাই আটটি বিভাগে বর্ণিত বিষয়ের সূচী।

'জগন্নাথমঙ্গল'

ভক্তকবি বিশ্বম্ভর পানি কৃত "জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থখানি সাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে আদৃত হয়। ইহার বহু সংস্করণ বহু স্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অন্য কোন গ্রন্থের এত সংস্করণ হয় নাই। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন স্থানের প্রকাশক কর্তৃক এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনার পদ্ধতি ও পারিপাট্য দেখিয়া প্রত্যেক প্রকাশকই তাঁহাকে প্রাচীন ভক্তকবির পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

"জগন্নাথমঙ্গল"ই বিশ্বম্ভর বাবুর প্রথম রচনা। এই গ্রন্থ-রচনার ইতিহাস বড় অপূর্ব। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিত সঙ্গীতমাধব গ্রন্থের ভূমিকা হইতে জানিতে পারা যায় যে, আনুমানিক ২৭।২৮ বৎসর বয়সের সময়

বিশ্বম্ভর বাবু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিবার জন্য পুরুষোত্তমধামে গমন করেন। সেখানে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার অপূর্ব লীলাকাহিনী শ্রবণ করিয়া সেই লীলা ভাষার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ হয়। সে সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষায় একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন, অথচ জগন্নাথদেবের লীলাগ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত। কাজেই বাধ্য হইয়া সেই পরিণত বয়সে তিনি সংস্কৃত পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভের পর, বিশ্বম্ভর বাবু উৎকলখণ্ড পাঠে নিযুক্ত হইলেন। পাঠ সমাপন করিয়া কিছুদিন পরে তিনি বাংলা ভাষায় পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি নানা ছন্দে ও সুললিত ভাষায়, উৎকলখণ্ড গ্রন্থখানিকে অনূদিত করিলেন। এই অনুদিত গ্রন্থের নাম হইল—'জগন্নাথমঙ্গল'।

'জগন্নাথমঙ্গল'-রচনার কাল

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৭৩৭ শকে এই গ্রন্থ রচিত হয়; কিন্তু স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিত "পুরোহিত ও অনুশীলন" পত্রের ৪৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "ভরদ্বাজ গোত্র" নামক প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি ১৭৩৮ শকে বা ১২২৩ সালে (১৮১৬ খৃষ্টাব্দ) এই গ্রন্থ রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উক্ত বিবরণ হইতেই জানা যায়—"বিশ্বম্ভর বাবু এই গ্রন্থ রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ইহা মুদ্রিত করিয়া সর্বসাধারণে বিতরণ করেন। কেবল তাহাই নহে, এই জগন্নাথমঙ্গল কীর্তনীয়াদিগের দ্বারা গান করাইবার জন্য তিনি একান্ত অভিলাষী হইয়া, কালাবতী পদ্ধতিক্রমে খেয়াল, ধ্রুপদ প্রভৃতি বিবিধ সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়া বহু সংখ্যক পদাবলী সঙ্কলন করিলেন এবং উপযুক্ত বেতন দান পূর্বক কতিপয় ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করাইতে লাগিলেন।" কথিত আছে এই গ্রন্থের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে এবং ইহার সঙ্গীতকার্য-সমাধানের জন্য বিশ্বম্ভর বাবু কিছু কম চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

"জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থ রচনার ছয় বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৪৪ শকে (১৮২২ খৃষ্টাব্দ) "সমাচার চন্দ্রিকা" যন্ত্রে ইহা প্রথম মুদ্রিত হয়। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৫৫ সালের (১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ)

২০শে ভাদ্র সুধাসিন্ধু যন্ত্র হইতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।* বিশ্বম্ভর বাবুর জীবিত কালেই অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে এই দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়।

"জগন্নাথমঙ্গলে"র প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত চারিখানি সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে ঃ—

১। কেশবলাল মল্লিক কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত সংস্করণ। ইহা ১২৯৪ সালে প্রকাশিত।

২। শ্রীযুক্ত কানাইলাল শীল দ্বারা প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ। ইহা ১৩০১ সালে প্রকাশিত।

৩। "বঙ্গবাসী" অফিস হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত সংস্করণ। ইহা ১৩১২ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত।

৪। শ্রীশরচ্চন্দ্র শীল কর্তৃক "নূতন সংস্করণ"। ইহা ১৩২৪ সালে প্রকাশিত।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বিশ্বম্ভর বাবুর জীবদ্দশাতেই "জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থের প্রথম দুই সংস্করণ বাহির হয়। উক্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের কোন বিশিষ্ট বিবরণ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থের আকার ও মূল্য সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন— "পুস্তকের পত্র-সংখ্যা ২৮৪। মূল্য ২৲ দুই টাকা।" রেভারেণ্ড্ লং সাহেবের Register of Bengali Authors, Editors, Translators etc. তালিকার (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) ১২৪ পৃষ্ঠায় আমরা "জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থের নামটিই পাই। কিন্তু ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের মহামেলায় গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লং সাহেব সম্পাদিত যে Descriptive Catalogue of Vernacular Books, Pamphlets &c. পাঠান তাহাতে "জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থের নিম্নলিখিত বিবরণ আছে ঃ—

"*Jagannath Mongal*—Jagannath: its history and the various ceremonies performed at the shrine, *12 mo. Pages 243, Re 1/8/-*"

---

* "পুরোহিত ও অনুশীলন" পত্রে প্রকাশিত "ভরদ্বাজ গোত্র" প্রবন্ধের পাদটিকা, পৃঃ ৪৭

দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত, ইহার পত্রসংখ্যা ২৮৪ এবং মূল্য দুই টাকা—ইহা আমরা বিদ্যানিধি-প্রদত্ত বিবরণ হইতে পাইতেছি। কিন্তু লং সাহেব বর্ণিত তালিকায় যে সংস্করণের বিবরণে "১২ পেজী আকারে ২৪৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ও মূল্য দেড় টাকা মাত্র" জানিতে পারি,—সেটি "জগন্নাথমঙ্গলে"র কোন্ সংস্করণ তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

যে কয়টি সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে সেইগুলিরই আলোচনা করা যাইতেছে।

ভক্তকবি বিশ্বম্ভর-রচিত "জগন্নাথমঙ্গল"-রচনার সময়নির্দেশজ্ঞাপক দুইটি পংক্তি জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থের শেষে আছে। গ্রন্থ সমাপন করিয়া বিশ্বম্ভর বাবু যেখানে নিজ দৈন্য প্রকাশ করিতেছেন, সেই দৈন্য-প্রকাশের মধ্যে এমন দুইটি পংক্তি আছে, যাহাতে এই গ্রন্থ রচনার কালনির্দেশের সহায়তা করিবে। এই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আমি যোগ্য নহি অতি পাপের ভাজন।
আমা সম পামর না হয় অন্যজন॥
পুরীষের কীট কভু যোগ্য হইতে পারে।
ততোধিক নীচ আমি অযোগ্য পামরে॥
জয় জয় শ্রোতাগণ করহ করুণা।
শ্রবণ করিয়া সবে পুরাহ বাসনা॥
এ দীনে সকলে যদি দয়া না করিবে।
অদোষদরশি নামে কলঙ্ক হইবে॥
মনের আনন্দে হরি বল বন্ধুজন।
সম্পূর্ণ হইল এই জগন্নাথ-কীর্তন॥
জীবেরে সংহতি করি অক্ষয়ার দিনে।
প্রতিষ্ঠা হইলা সুখে মঙ্গল বিধানে॥
কীর্তন রূপেতে গূঢ় দারুদেহধারী।
প্রকাশিলা বিশ্বম্ভর দাসে কৃপা করি॥"

[১১৫ পৃষ্ঠা, কেশবলাল মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ।]

উপরি-উদ্ধৃত অংশের একাদশ পংক্তি গ্রন্থরচনার কালনির্দেশের ইঙ্গিত করিতেছে। এই একাদশ পংক্তির অর্থ করিলে জানিতে পারি যে বৃহস্পতিবারে (জীব অর্থে বৃহস্পতি) অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে এই গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, ১৭৩৭ বা ১৭৩৮ শকাব্দ বা নিকটবর্তী অন্য কোন শকাব্দে বৃহস্পতিবারে অক্ষয়তৃতীয়ার যোগ হইয়াছে।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে ১৭৩৭ শকে, এবং স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে ১৭৩৮ শকে বিশ্বম্ভর বাবু "জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে এই উভয় শকাব্দের মধ্যে কোন শকে বৃহস্পতিবার অক্ষয়তৃতীয়ার যোগ হইয়াছে কি না। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে জ্যোতিষগণনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষশাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় ১৭৩৭ ও ১৭৩৮ এই উভয় শকাব্দের অক্ষয়-তৃতীয়ার যোগ গণনা করিয়া কোন্ শকের অক্ষয়তৃতীয়া বৃহস্পতিবারে তাহা বিবৃত করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার গণনার ফল যথাযথ উদ্ধৃত হইল—

"দিনচন্দ্রিকামতে—

১৭৩৭ শকে—৩০শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার অক্ষয়তৃতীয়া—

তিথি-বারাদি	২।৪।১১।১৯
তিথি-কেন্দ্র	৯।২৩।৭।৩৩
ফলদণ্ডাদি	৫৯।৪৩।৩০
বাস্তব তিথি-বারাদি	২।৫।১১।২।৩০

দ্বিতীয়া তিথি বৃহস্পতিবার ১১।২।৩০ বিপল সময়ে শেষ হইয়া শুক্লা তৃতীয়া (অক্ষয়তৃতীয়ার তিথি) আরম্ভ হইয়াছে।

৩১শে বৈশাখ শুক্রবার (১৭৩৭ শক)

তিথি-বারাদি	৩।৫।১১।২৪।৫২
তিথি-কেন্দ্র	১০।২৩।১১।৪১
ফলদণ্ডাদি	৫৫।১০।২
বাস্তব তিথি-বারাদি	৩।৬।৬।৩৪।৫৪

তৃতীয়া তিথি শুক্রবার দং ৬।৩৪।৫৬ বিপল সময়ে শেষ হইয়াছে।

এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ১৭৩৭ শকাব্দের ৩০শে বৈশাখ বৃহস্পতিবারে অক্ষয়তৃতীয়ার যোগ হইয়াছে। ইহার নিকটবর্তী কোন বৎসরে বৃহস্পতিবারে অক্ষয়তৃতীয়া হয় নাই।"

১৭৩৮ শকে অক্ষয়তৃতীয়া মঙ্গলবারে হইয়াছে ; ইহাও তিনি নিম্নপ্রকারে গণনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ;—

"১৭৩৮ শকে

বিষুব দিন হইতে—

১৯শে বৈশাখ মঙ্গলবার অক্ষয়তৃতীয়া

তিথি-বারাদি	২।২।২৯।৫৬।২
তিথি-কেন্দ্র	৬।২৯।২০।৫৯
ফলদণ্ডাদি	৬৭।২৬।৩৯
বাস্তব তিথি-বারাদি	২।৩।৩৭।২২।৪১

অর্থাৎ দ্বিতীয়া তিথি মঙ্গলবার দং ৩৭।২২।৪১ বিপল সময়ে শেষ হইয়া অক্ষয়তৃতীয়া আরম্ভ হইয়াছে।

২০শে বৈশাখ বুধবার (১৭৩৮ শক)

তিথি-বারাদি	৩।৩।৩০।৪।২
তিথি-কেন্দ্র	৭।২৯।২৬।৫৯
ফলদণ্ডাদি	৬৫।৪৯।৩৯
বাস্তব তিথি-বারাদি	৩।৪।৩৫।৫৩।৪১

অর্থাৎ অক্ষয়তৃতীয়া তিথি বুধবার দং ৩৫।৫৩।৪০ বিপল সময়ে শেষ হইয়াছে।"

উপরি লিখিত জ্যোতিষগণনার দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ১৭৩৭ শকে বৃহস্পতিবারে অক্ষয়তৃতীয়ার যোগ হইয়াছে এবং ১৭৩৮ শকে ঐ যোগ হয় নাই। সুতরাং এই ১৭৩৭ শকের ৩০শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার (ইং ১১ই মে, ১৮১৫ খৃঃ) বিশ্বম্ভর বাবু "জগন্নাথমঙ্গল" রচনা শেষ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

কেশবলাল মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ

"জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। এই তিন খণ্ডের নাম—সূত্রখণ্ড, লীলাখণ্ড ও ক্ষেত্রখণ্ড। সর্বাপেক্ষা যে পুরাতন ছাপা জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছে, সেখানি ১২৯৪ সালে মুদ্রিত কেশবলাল মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত।

এই কেশবলাল মল্লিক মহাশয় "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়"-সম্পাদক অদ্বৈত চরণ আঢ্য ও "বঙ্গবিদ্যা-প্রকাশিকা-পত্রিকা"-সম্পাদক নবীনচন্দ্র আঢ্য মহাশয়দ্বয়ের জ্যেষ্ঠা পিতৃস্বসা সূর্যমণি দাসীর (আমড়াতলা নিবাসী বৃন্দাবনচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের কন্যা) পুত্র; কেশববাবুর পিতার নাম রাজকিশোর মল্লিক। ইনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ইঁহারই চেষ্টা, যত্ন ও উৎসাহে রাধাবল্লভ দাস মহাশয় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম Phrenology সম্বন্ধীয় পুস্তক (মনস্তত্ত্ব-সার-সংগ্রহ) বাহির করেন।

এই কেশববাবুর উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র কুঞ্জলাল মল্লিক (ভূতি) মহাশয় "সুবর্ণবণিক্" (১ম ও ২য় খণ্ড), দুর্গাসপ্তমী চণ্ডী, রুদ্রচণ্ডী, জাতিমালাচক্র প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

কেশব বাবু পূর্বপ্রকাশিত দুইখানি মুদ্রিত জগন্নাথমঙ্গলের কাপি দেখিয়া এই বর্তমান সংস্করণ প্রকাশে যত্নবান হন। কিন্তু পুস্তকের মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হইবার পূর্বেই তিনি ১২৯৩ সালের ১১ই ফাল্গুন পরলোক-গমন করেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর কুঞ্জবাবু পুস্তকের মুদ্রণকার্য সমাপ্ত করাইয়া সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি তাঁহার পূজনীয় পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ-দিনে বিতরণ করেন। নিম্নে জগন্নাথমঙ্গলের এই সংস্করণের প্রচ্ছদ-পত্র ও ভূমিকার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

প্রচ্ছদপত্র ও ভূমিকা

"জগন্নাথমঙ্গল

আদি ও ক্ষেত্রখণ্ড।

বিশ্বম্ভর পাইন বিরচিত

কলিকাতা
৯০ নং চূনাগলি
কেশবলাল মল্লিক কর্তৃক
পুনঃ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১২৯৪ সাল।

কলিকাতা
৩৭৪নং অপার চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো,
আর্টিষ্ট প্রেসে
শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯৪৫"

"ভূমিকা।

বঙ্গভাষায় জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থ একখানি পুরাতন কাব্য। ইহাতে ৺জগন্নাথ দেবের বিষয় বর্ণিত আছে। এই পুস্তক এক্ষণে লুপ্তপ্রায় দেখিয়া, আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺কেশবলাল মল্লিক মহাশয় আজ এক বৎসর ধরিয়া আমাদিগের গৃহস্থিত একখানি পুরাতন ও জীর্ণ পুস্তক এবং পরিশেষে অপর একখানি প্রাপ্ত পুস্তক দেখিয়া উক্ত 'জগন্নাথমঙ্গল' গ্রন্থখানি প্রকাশ করণেচ্ছায় পুনর্মুদ্রিত করিতেছিলেন। দৈবদুর্বিপাক বশতঃ আরব্ধ কার্য সমাপ্তির পূর্বেই বিগত ৮ই ফাল্গুন হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া, তিন দিবসের মধ্যেই তিনি পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। এই শোচনীয় অবস্থায় পিতৃদেবের সেই চিরাভিলাষ পূর্ণ এবং তদীয় নাম চিরস্মরণীয় করণার্থ তাঁহার একখানি প্রতিমূর্তি সহিত উক্ত গ্রন্থখানি তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ দিবসে বিতরণ জন্য আমি তাহার অবশিষ্টাংশ পুনঃ মুদ্রিত করিলাম। মহাশয়গণ এক্ষণে পুস্তকখানি একবার পাঠ করিয়া, আমাকে কৃতার্থ করিবেন।

১১ই চৈত্র, ১২৯৪ সাল।
কলিকাতা, ৯০নং চূনাগলি। } কুঞ্জলাল মল্লিক।"

এই সংস্করণের পুস্তকখানি ডিমাই আটপেজী আকারে ২৯৮ (১৮৩+১১৫) পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহা পাইকা হরপে ছাপা। পুস্তকখানি কবিতায় রচিত হইলেও টানা কম্পোজ করা হইয়াছে। পুস্তকে কেশব বাবুর একখানি প্রতিকৃতি আছে এবং সেই প্রতিকৃতির নিম্নে লিখিত আছে—

"জন্ম ১২৩১ সাল, ২২শে বৈশাখ
মৃত্যু ১২৯৩ সাল, ১১ই ফাল্গুন।"

বর্তমান সংস্করণে কোন সূচীপত্র নাই।

গ্রন্থের বিষয়-বিভাগ

এই গ্রন্থখানি আদি ও ক্ষেত্রখণ্ড নামক দুইটি খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। আদিখণ্ডের মধ্যে আবার দুইটি খণ্ড আছে—সূত্র ও লীলাখণ্ড। এই আদিখণ্ড ১৮৩ পৃষ্ঠায় ও ক্ষেত্রখণ্ড ১১৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

বটতলার সংস্করণ

এই সংস্করণের গ্রন্থখানির পরেই বটতলা হইতে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণের "জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থের প্রকাশক—কানাইলাল শীল। পুস্তকের মলাটের উপর লেখা আছে—চতুর্থ সংস্করণ। এই চতুর্থ সংস্করণ ১৩০১ সালে প্রকাশিত। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহার পূর্বে এই গ্রন্থের আরও তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। কেশব বাবুর প্রকাশিত সংস্করণে "বিশ্বম্ভর পাইন বিরচিত" লেখা ছিল; কিন্তু বর্তমান সংস্করণের গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রে "শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর দাস কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া" মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের অন্তর্নিহিত প্রায় সমস্ত পদাবলীর শেষেই "বিশ্বম্ভর দাস" এই ভণিতা* আছে; খুব সম্ভবত

---

* দীন বিশ্বম্ভর দাস ডাকয়ে কাতরে।
শ্রীগুরু করুণা করি তারহ পামরে॥

* * * *

জানি বা না জানি, শুনি বা না শুনি
তথাপি লিখিতে আশ।
ব্রজনাথ পদ আমার সম্পদ
কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

দৈন্যজ্ঞাপক এই "দাস" উপাধি দেখিয়াই প্রকাশক মহাশয় "পাইন" বংশীয় বিশ্বম্ভর বাবুর নামের শেষে "দাস" শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন।

বটতলা-সংস্করণের প্রচ্ছদপত্র

নিম্নে কানাইলাল বাবুর প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণের জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের অবিকল প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল ;—

"শ্রীশ্রীউৎকল খণ্ডস্য ব্যাখ্যারূপ
জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থ

—০—

নীলাদ্রেঃ শঙ্খমধ্যে শতদলকমলে রত্নসিংহাসনস্থং
নানালঙ্কারযুক্তং নবঘনরুচিরং সংযুতং সাগ্রজেন।
ভদ্রায়া বামপার্শ্বে রথচরণপুগং ব্রহ্মরুদ্রাদিবন্দ্যং
বেদানাং সারমীশং নিজজনসহিতং ব্রহ্মদারুং স্মরামি।

শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর দাস কর্তৃক
সংগৃহীত হইয়া
শ্রীযুক্ত কানাইলাল শীল দ্বারা প্রকাশিত।
চতুর্থ সংস্করণ।
কলিকাতা।
১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট 'হরি-যন্ত্রে'
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০১ সাল।
মূল্য ১।০ পাঁচসিকা"

বর্তমান সংস্করণটি ২২২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাও ডিমাই আটপেজী আকারে পাইকা অক্ষরে (টানা কম্পোজ) মুদ্রিত। এই সংস্করণে প্রকাশক মহাশয় একটি গ্রন্থসূচী প্রদান করিয়া প্রত্যেক খণ্ডের বিষয়-বিভাগে সহায়তা করিয়াছেন।

বটতলা-সংস্করণে বিষয়-বিভাগ

গ্রন্থের সূত্রখণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে ঃ—

গুর্বাদি বন্দনা

গ্রন্থের ও অবতারের প্রয়োজন

গ্রন্থারম্ভ

ব্রহ্মাস্তব

ক্ষেত্রদর্শনাদি

যম-লক্ষ্মী সংবাদ

পুণ্ডরীক অম্বরীষ-প্রসঙ্গ

এই সূত্রখণ্ড ২৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। লীলাখণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থান পাইয়াছে ;—

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রসঙ্গ

শ্রীজগন্নাথ দেবের জটিলরূপে রাজার নিকট গমন

ক্ষেত্র-মহিমা কথন

বিদ্যাপতির ক্ষেত্রগমন ও নীলমাধব অন্তর্ধানাদি পুনরাগমন ও ক্ষেত্র-বৃত্তান্ত কথন

নারদ আগমন ও ক্ষেত্র যাত্রাদি

একাম্রকানন প্রবেশ, পার্বতীর জন্ম, তপস্যা ও শিবের বিবাহ, কাশী গমনাদি

ভুবনেশ্বর দর্শনাদি

ব্রহ্মতত্ত্ব বিচারাদি

কপোতেশ্বর বিল্বেশ্বর প্রসঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বাল্যাদি লীলা

গোষ্ঠলীলা ব্রহ্মমোহনাদি

গোবর্ধন ধারণাদি

রূপবর্ণন রাসলীলা

শঙ্খচূড়াদি বধ, মথুরাগমন

কংসবধাদি

নন্দবিদায়াদি

দ্বারকা গমন ও রুক্মিণ্যাদি বিবাহ

ঊষা, অনিরুদ্ধ প্রসঙ্গাদি

২৭ হইতে ১৩৬ পর্যন্ত ১১০ পৃষ্ঠায় লীলাখণ্ড সমাপ্ত।

ক্ষেত্রখণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে ;—

মাধবান্তর্ধান শ্রবণ

খেদ বর্ণনাদি

অশ্বমেধ যজ্ঞ ও স্বপ্নে শ্বেতদ্বীপে হরি দর্শন

দারুব্রহ্মাদি গমন

নির্মাণ-প্রসঙ্গ

গণেশ মূর্তি ধারণাদি

দেউল নির্মাণাদি

ইন্দ্রদ্যুম্নের ব্রহ্মলোকে গমন ও ব্রহ্মার সহিত কথোপকথন

পুনরাগমনাদি

রথ নির্মাণ ও মহাবেদী হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে রথে স্থাপন

ব্রহ্মার গমন ও মূর্তিপ্রতিষ্ঠা

ইন্দ্রদ্যুম্নকে বরপ্রদান

মহাপ্রভুর ভোগের প্রকরণ

মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য ও শিব ও নারদের নৃত্য

শাণ্ডিল্য মুনির উপাখ্যান, মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য

দ্বাদশযাত্রা, দোলযাত্রাদি মহিমা কথন

সুদান্ত সুমন্ত উপাখ্যান

ক্ষেত্রগমন মহিমা

ফলশ্রুতি অষ্টমঙ্গাদি

১৩৭ হইতে ২২২ পর্যন্ত ৮৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ক্ষেত্রখণ্ডের বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শরচ্চন্দ্র শীল কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ

১৩০১ সালে বটতলার সংস্করণ প্রকাশিত হইবার ২৪ বৎসর পরে জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থের একটি নূতন সংস্করণ বাহির হয়। শ্রীযুক্ত

শরচ্চন্দ্র শীল এই "নূতন সংস্করণের" প্রকাশক এবং ৯৮।৩ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীটস্থ বিজলী প্রেসে তাঁহারই দ্বারা এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়।

এই নূতন সংস্করণ প্রকাশ বিষয়ে শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুর নিকট হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ঃ—

কানাইলাল শীল মহাশয় শরৎ বাবুর জ্ঞাতি এবং সম্পর্কে খুল্লতাত। বটতলায় তাঁহার একখানি পুস্তকের দোকান ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সে দোকান উঠিয়া যায়। এই ঘটনার কিছু পরে স্বর্গীয় কানাইবাবুর পুত্রের অনুরোধে গত ১৩২৪ সালে শরৎ বাবু জগন্নাথ-মঙ্গলের "নূতন সংস্করণ" বাহির করেন। কানাইবাবুর প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণের (১৩০১ সাল) পুস্তক হইতেই শরৎবাবু বর্তমান সংস্করণ মুদ্রিত করেন। বর্তমান গ্রন্থ ডিমাই আটপেজী আকারে ২৩৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পূর্ববর্তী সংস্করণদ্বয়ের মত ইহাও পাইকা অক্ষরে ছাপা (টানা কম্পোজ) হইয়াছে। এই সংস্করণে সূচীর আকার পরিবর্ধিত করিয়া গ্রন্থনিহিত বিষয়গুলির পরিচয় পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া হইয়াছে; আর গ্রন্থসমাপ্তির পর দুইটি নূতন বিষয়—"জয়দেবকৃত দশ অবতারের স্তব" ও "জগন্নাথের স্তব" সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। জগন্নাথের স্তবটি সেই সর্বজনপরিচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রমুখপদ্মবিনির্গত শ্রীজগন্নাথাষ্টক।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শীল মহাশয়ের প্রকাশিত সংস্করণ "জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থের মূল্য বার (৷৷৹) আনা মাত্র। ইহার পরে এ গ্রন্থের আর কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। নিম্নে এই সংস্করণের গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল ;—

"শ্রীশ্রীউৎকলখণ্ডস্য ব্যাখ্যা

শ্রীজগন্নাথমঙ্গল।

জগন্নাথ মাহাত্ম্য।

নীলাদ্রেঃ শঙ্খমধ্যে শতদলকমলে রত্নসিংহাসনস্থং
নানালঙ্কারযুক্তং নবঘনরুচিরং সংযুতং সাগ্রজেন।
ভদ্রায়া বামপার্শ্বে রথচরণযুগং ব্রহ্মরুদ্রাদিবন্দ্যং
বেদানাং সারমীশং নিজজনসহিতং ব্রহ্মদারু স্মরামি॥

শ্রীবিশ্বম্ভর দাস কর্তৃক
পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত।
কলিকাতা, ৩১৯ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে
শ্রীশরচ্চন্দ্র শীল কর্তৃক প্রকাশিত।
নূতন সংস্করণ।
কলিকাতা।
৯৮।৩ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট, বিজলী প্রেসে
শ্রীশরচ্চন্দ্র শীল দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩২৪।"

শরৎবাবুর প্রকাশিত সংস্করণ প্রকাশের বার বৎসর পূর্বে এবং কানাই-বাবুর প্রকাশিত সংস্করণ প্রচারের বার বৎসর পরে জগন্নাথমঙ্গলের আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ

এই সংস্করণটি প্রকাশিত সমস্ত সংস্করণ হইতে সুন্দর ও সুসম্পাদিত। ইহার ছাপা কাগজ প্রভৃতিও সুন্দর। পুস্তকের গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত প্রতি অধ্যায়ের পদগুলিতে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়* কর্তৃক প্রকাশিত। হুগলী জেলার সেনেট গ্রাম নিবাসী সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কাব্যতীর্থ ধন্বন্তরি মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করেন।

"বঙ্গবাসী" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ('বঙ্গভাষার লেখক' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা ও প্রাচীন সাহিত্যিক) মহাশয়ের কাছে এই সংস্করণ প্রকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ জানা যায়— বহুবাজার পঞ্চাননতলা গলিতে প্রাণকৃষ্ণ নন্দী নামক এক ধনাঢ্য সুবর্ণবণিক্ বাস করিতেন। চীনাবাজারে ইঁহার মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতির কারবার ছিল। ইঁহার বাড়ীর কাছে শ্রীযুক্ত হরিমোহন বাবুর বাসা ছিল। ১৩১২ সালের

* অধুনা পরলোকগত। ইনি "নির্মলা প্রেস" নামক ছাপাখানার স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

কিছু পূর্বে প্রাণকৃষ্ণ বাবু হরিমোহন বাবুকে বলেন,—"কোন বাংলা বৈষ্ণব-গ্রন্থ নির্বাচন করিয়া কোন সুযোগ্য পণ্ডিত দ্বারা সম্পাদন করাইয়া দিলে, আমি তাহার প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছি।" এস্থলে বলা বাহুল্য যে, প্রাণকৃষ্ণ বাবু নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠে তাঁহার যথেষ্ট আনুরক্তি ছিল। তাঁহার এই অভিলাষের কথা জানিতে পারিয়া হরিমোহন বাবু পুরাতন বৈষ্ণবগ্রন্থ সংগ্রহ ও নির্বাচনে ব্যাপৃত হন। এবং ইহার ফলে তিনি পুরাতন ছাপা কবি বিশ্বম্ভর দাস প্রণীত "জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থের একখণ্ড প্রাপ্ত হন এবং গ্রন্থখানিকে প্রকাশযোগ্য বলিয়া নির্বাচন করেন। শ্রীযুক্ত হরিমোহন বাবুর বাড়ীও পূর্বোক্ত সেনেট গ্রামে। তাই তিনি স্বগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয়কে এই গ্রন্থ নির্বাচনের ভার অর্পণ করেন। হরিমোহন বাবুর এক বিশেষ বন্ধু ও আত্মীয়কল্প পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। পূর্ব কথা-মত প্রাণকৃষ্ণ বাবু পুস্তক প্রকাশের যাবতীয় খরচ প্রদান করিলে ১৩১২ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণটি প্রধানতঃ প্রাণকৃষ্ণ বাবুর অর্থসাহায্যে ও শ্রীযুক্ত হরিমোহন বাবুর চেষ্টা ও যত্নে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকা

প্রকাশক পাঁচকড়ি বাবু এই গ্রন্থের একটি "ভূমিকা" লেখেন ; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ;—

"ভূমিকা

"শ্রীধাম জগন্নাথ-ক্ষেত্রের তথা শ্রীভগবান জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য বিষয়ে 'জগন্নাথ-মঙ্গলের' ন্যায় সুসম্পূর্ণ সুপরিপাটী গ্রন্থ একান্ত বিরল। এই গ্রন্থ সরল মধুর কবিতায় লিখিত। ইহা উৎকল-খণ্ড, পদ্মপুরাণ এবং ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের সুবিশদ সার-সংগ্রহ। এ গ্রন্থ বৈষ্ণব-ভক্তের নিত্যপূজ্য,—জগন্নাথযাত্রীর অপরিহার্য অবলম্বন। ইহা বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন কাব্য,—সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্য-সেবীর নিকটও এ গ্রন্থ পরম আদরের সামগ্রী।

"ভক্ত কবি বিশ্বম্ভর দাস এই গ্রন্থের রচয়িতা। 'কৃষ্ণনগর দক্ষিণে' ইহাঁর জন্মস্থান। পিতার নাম কানাই দাস,—মাতার নাম রত্নমণি। এ কবিবংশে ভক্তি-স্রোতের চির-প্রাবল্য; এ গ্রন্থেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পরিস্ফুট। ভক্ত-কবি বিশ্বম্ভর এই এক গ্রন্থে জগন্নাথলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা, এবং বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য প্রভৃতি নিপুণতার সহিত গ্রথিত করিয়াছেন। কবি-গ্রন্থকার গ্রন্থ-শেষে লিখিয়াছেন, এই জগন্নাথমঙ্গল সংস্কৃত উৎকলখণ্ডের ভাষা-রূপ। যাঁহারা উৎকলখণ্ড পড়িয়াছেন, তাঁহারা জগন্নাথমঙ্গলও পাঠ করুন, একাধারে যাবতীয় বৈষ্ণব-গ্রন্থ-পাঠের ফল পাইবেন। এ গ্রন্থ এতদিন বড়ই দুর্লভ ছিল। আমরা বহু আয়াসে ইহার পুনঃ প্রচার করিলাম। এক্ষণে প্রত্যেক রসিকভক্ত ত্বরান্বিত হইয়া, এই জগন্নাথমঙ্গলরূপ গ্রন্থের সুধাস্বাদনে কৃতার্থ হউন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

"কলিকাতা ১২৪ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত প্রখ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কাব্যতীর্থ ধন্বন্তরি মহাশয় কৃপাপূর্বক এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই এ গ্রন্থের সম্পাদক। এজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রাবণ—১৩১২ প্রকাশক"

ভূমিকায় পাঁচকড়ি বাবু এই গ্রন্থকে—"বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন কাব্য," আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। কানাই বাবুর ন্যায় ইনিও "পানি বা পাইন"-বংশোদ্ভূত বিশ্বম্ভর বাবুর নামের শেষে "দাস" উপাধিটি রাখিয়াছেন—এই 'দীনতাজ্ঞাপক' উপাধি দ্বারা বা ভূমিকাপাঠে * কবির বংশপরিচয় বা তাঁহার জাতি-পরিচয়ের কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। এই 'দাস'-উপাধিই তাঁহার বংশ-পরিচয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। কিন্তু "বিশ্বম্ভর পানি" নামের পরিবর্তে "বিশ্বম্ভর দাস" কিরূপে হইল? ১২৯৪ সালে প্রকাশিত সংস্করণে (কেশবলাল মল্লিক প্রকাশিত) "বিশ্বম্ভর পাইন বিরচিত" বলিয়া লিখিত থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী সংস্করণগুলিতে (কানাইবাবু, শরৎবাবু ও পাঁচকড়ি বাবুর প্রকাশিত) কেন যে "বিশ্বম্ভর দাস" লিখিত হইল, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তবে বোধ হয়, পূর্ববর্তী দুইটি

* ভূমিকায় এ বিষয়ে মাত্র এইটুকু আছে—"এ কবিবংশে ভক্তিস্রোতের চিরপ্রাবল্য।"

সংস্করণের (১৮২২ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে উভয় বা কোনখানিতে "বিশ্বম্ভর দাস" মুদ্রিত হইয়া থাকিবে; এবং ইহা দেখিয়াই কানাইবাবু প্রভৃতি দাস উপাধিই রাখিয়া দিয়াছেন। তবে কেশববাবু সম্ভবত অনুসন্ধান কিম্বা পূর্বে প্রকাশিত দুইখানির মধ্যে কোনখানির সাহায্যে এই "পাইন" উপাধির কথা জ্ঞাত হইয়া পুস্তক-প্রকাশ-কালে "পাইন" উপাধি রাখিয়া দেন।

পুস্তক প্রকাশের পর ইহার প্রচারকার্য সুবিধাজনক হইতেছে না দেখিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাবু শ্রীযুক্ত হরিমোহন বাবুর সাহায্যে অবিক্রীত গ্রন্থগুলি "বঙ্গবাসী"র স্বত্বাধিকারিগণকে বিক্রয় করেন।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রকাশিত সংস্করণের প্রচ্ছদপত্র

নিম্নে এই সংস্করণের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল;—

"জগন্নাথ-মঙ্গল।

—০—

শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রের এবং শ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য-
বিষয়ক গ্রন্থ—বিবিধ বিচিত্র
উপাখ্যান-সম্বলিত।

—:—

শ্রীবিশ্বম্ভর দাস কর্তৃক বিবিধ পদ্যছন্দে
রচিত।

———

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত।

—০—

গুপ্তপ্রেস
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত।
২২১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩১২ শ্রাবণ।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।"

এই সংস্করণের পুস্তকখানি রয়েল আটপেজী আকারে ১৫৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। বিষয়গুলি দুইকলমে কবিতার আকারে ছাপাইয়া প্রকাশক গ্রন্থ-পাঠের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থের সূত্রখণ্ড ১ হইতে ২০ পৃষ্ঠায়, লীলাখণ্ড ২১ হইতে ৯৫ পৃষ্ঠায় এবং ক্ষেত্রখণ্ড ৯৬ হইতে ১৫৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রকাশিত সংস্করণের সূচী

গ্রন্থপাঠের সুবিধার জন্য গ্রন্থনিহিত বিষয়গুলিকে সুন্দররূপে সাজাইয়া তাহাদের একটি বিস্তৃত সূচী দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের "সূত্রখণ্ডে" নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে—

গুরুবন্দনা
গণেশাদি বন্দনা
শ্রীচৈতন্যদেব বন্দনা
শ্রীজগন্নাথাদি বন্দনা
শ্রীসুরধুনী বন্দনা
কুলদেবতা বন্দনা
গ্রন্থারম্ভ
জগন্নাথের রূপমাহাত্ম্য
শ্রীভগবদ্বাক্য
নৈমিষারণ্যে মুনিগণের প্রশ্ন
শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের উৎপত্তি
যম-লক্ষ্মী সংবাদ
পুণ্ডরীক-অম্বরীষ প্রসঙ্গ

"জগন্নাথমঙ্গলে"র লীলাখণ্ডটিই সর্বাপেক্ষা বড়। এই খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থান পাইয়াছে—

ইন্দ্রদ্যুম্ন বিবরণ
বিদ্যাপতি রাজার বৃত্তান্ত
বিদ্যাপতির মাল্য প্রাপ্তি ও ক্ষেত্রবিবরণ কথন

বিদ্যাপতির মুখে ক্ষেত্রতত্ত্ব শুনিয়া রাজার উক্তি
নীলাচল গমনার্থ রাজার অভিষেক
রাজার একাম্রকাননে উপস্থিতি
শিববিবাহ বর্ণন
হরগৌরীর বারাণসী গমন
কাশীরাজের শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ
হরিনাম মাহাত্ম্য
রাজার কপোতেশ্বরে বিশ্রাম
বিশ্বেশ্বর মাহাত্ম্য
শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বর্ণন
যোগমায়া কর্তৃক গর্ভধারণ ও কৃষ্ণবলরামের আবির্ভাব
বসুদেবের নন্দগৃহে শ্রীকৃষ্ণ স্থাপন
নন্দগৃহে উৎসব
শ্রীকৃষ্ণের পুতনাদি বধ
কৃষ্ণবলরামের নামকরণ
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণন
কৃষ্ণবলরামের গোধনচারণ
শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ
বৎসাসুর, বকাসুর ও বঘাসুর বধ
কালীয় দমন
শ্রীকৃষ্ণের দাবানল ভক্ষণ
বস্ত্রহরণ লীলা
কৃষ্ণের যজ্ঞান্ন ভোজন
গোবর্ধন গিরিধারণ
বরুণালয় হইতে নন্দের প্রত্যাগমন
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা
শ্রীকৃষ্ণের রাসকেলি
অক্রুর সংবাদ

চানুরমুষ্টিক বধ

কংসবধ

শ্রীকৃষ্ণ অদর্শনে বৃন্দাবনবাসীর বিলাপ

জরাসন্ধদলন

রুক্মিণীবিবাহ

উষাবতীর বিবাহ

অনিরুদ্ধের সহিত বাণরাজার যুদ্ধ

উষাবতীর বিলাপ

শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেবের যুদ্ধ

শিবের শ্রীকৃষ্ণ স্তব

বিবিধ লীলাবর্ণন

লীলাখণ্ডের উপসংহার

জগন্নাথমঙ্গলের শেষভাগ "ক্ষেত্রখণ্ডে" নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে—

ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্রীক্ষেত্র গমনান্তর কার্য

রাজার নীলাদ্রিতে গমন

ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরুষোত্তম-স্তুতি

রাজার নৃসিংহ মূর্তি প্রতিষ্ঠা

রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ

রাজার ভগবদ্দর্শন

দারুব্রহ্ম প্রতিমা নির্মাণ

মূর্তিচতুষ্টয়রূপে ভগবানের আবির্ভাব

প্রিয়ম্বদের গণেশরূপে জগন্নাথ দর্শন

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের উৎপত্তি

রাজার দেউল প্রতিষ্ঠা

রাজার ব্রহ্মালোক গমন

ব্রহ্মার উক্তি

ব্রহ্মালোক হইতে রাজার প্রত্যাগমন

১৩১২ সালে প্রকাশিত এই সংস্করণের জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থের অদ্যাবধি আর কোন সংস্করণ হয় নাই।

সমগ্র গ্রন্থখানি বাংলা কবিতায় রচিত। গ্রন্থারম্ভে গুরুবন্দনা প্রভৃতি নয়টি পদ সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে। এগুলি ব্যতীত পুস্তকের মধ্যে সংস্কৃত কবিতাও আছে।

এই গ্রন্থই বিশ্বম্ভর বাবুর প্রথম রচনা—এই প্রথম রচনাতেই বিশ্বম্ভর বাবু যথেষ্ট কৃতিত্ব ও কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভের সংস্কৃত শ্লোক কয়টি পাঠ করিলেই পাঠক বিশ্বম্ভরবাবুর প্রথম বয়সের রচিত সংস্কৃত শ্লোকের রসমাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন ;—

গুরুং বন্দে রসানন্দং পূর্ণানন্দং সুবিগ্রহম্।
আনন্দচিন্ময়ং রূপং সর্বদেবময়ং বিভুম্ ॥১॥
বন্দে নন্দাত্মজং কৃষ্ণং রাধিকাপ্রাণবল্লভম্।
রাধাদামোদরাখ্যানং মৎকুলত্রাণকারণম্ ॥২॥
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দসমাবৃতম্।
অদ্বৈতং শ্রীনিবাসঞ্চ পণ্ডিতশ্রীগদাধরম্ ॥৩॥
কৃষ্ণপাদাশ্রিতং ভক্তং কৃষ্ণৈকান্তর্গতপ্রভুম।
প্রণম্য ভূমিপাতিতো বর্ণয়ামি যথামতি ॥৪॥
অপারমহিমা-গৌর-ভক্তানাঞ্চ প্রসাদতঃ।
বর্ণয়ামি জগন্নাথ-ভদ্রারামপ্রকাশকম্ ॥৫॥
জগন্নাথমহং বন্দে পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
সুভদ্রাং বলভদ্রঞ্চ তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥৬॥
যস্যারবিন্দমুখনেত্রযুগঞ্চ দৃষ্ট্বা তরন্তি তে
যে কিল পাপিনোঽপি।
পুটাঞ্জলিস্তিষ্ঠতি বৈনতেয়ঃ স ব্রহ্মদাসঃ
সততং হি পাতু বঃ ॥৭॥
নৈবেদ্যপাদাম্বুনিবেদনীয়-লেশৈস্তবা-
লোকনসম্প্রণামৈঃ।
পূজোপহারৈশ্চ বিমুক্তিদাতা ক্ষেত্রোত্তমে
শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যঃ ॥৮॥
শ্রীলশ্রীশ্রীনিবাসস্ত আচার্যখ্যাতিমাশ্রিতম্।
যৎসুতাবংশসম্ভূতং তমীশ্বরপ্রভুং ভজে ॥৯॥

বাংলা কবিতাগুলির অধিকাংশই পয়ারে রচিত, মধ্যে মধ্যে লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে রচিত কবিতাও আছে। কবিতাগুলির রচনা বেশ সুন্দর ও প্রাঞ্জল। পড়িতে বা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। পড়িতে পড়িতে অনেক সময় কাশীদাস কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবিগণের রচিত কাব্যাবলী পাঠের মত মনে হয়। বিশ্বম্ভর বাবুর রচনা-শক্তির পরিচয় প্রদানের জন্য "জগন্নাথমঙ্গলের" একটি মাত্র কবিতা—"জগন্নাথের রূপমাহাত্ম্য" উদ্ধৃত হইল ;—

"জগন্নাথের রূপমাহাত্ম্য

জগন্নাথ রূপসিন্ধু, বদন পূর্ণিমা-ইন্দু,
উদয় হয়েছে মনোহর।
মৃদুহাস্য ঝরে সুধা ভকত চকোর ক্ষুধা,
তৃপ্ত করে পানে নিরন্তর ॥১॥
সেই সুধা বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,
সুশীতল করয়ে তাপিত।
দেব ঋষি মুনিচয়, কুমুদ সমান হয়,
প্রফুল্লিত সদা পুলকিত ॥২॥
সে মুখ-তুলনা ঠাঁই, ভুবনে কোথাও নাই,
অনুপম তাহার মাধুরী।
যদি দিয়ে পথচাঁদে, তাহে হয় বিসম্বাদে,
সবে ইহা দেখহ বিচারি ॥৩॥
বিধু ম্লান দিবাভাগে, ম্লান পদ্ম নিশিযোগে,
সমভাবে না থাকে সদায়।
শ্রীবদন জ্যোৎস্নাকর, প্রফুল্লিত নিরন্তর,
অতএব তুলনা কোথায় ॥৪॥
করে শোভে তার বালা, দশ দিক্ করে আলা,
চন্দনে চর্চিত কলেবর।
বনমালা গলে দোলে, হেরিয়া নয়ন ভুলে,
বিশাল নয়ন মনোহর ॥৫॥
ভালে মণি অতি দীপ্ত, তেজে দশদিক্ ব্যাপ্ত,
শ্রবণে কুণ্ডল ঝলমল।
গণ্ডস্থল সুচিকণ, জিনি মণি সুদর্শন,
নাশাতটে দোলে মুক্তাফল ॥৬॥
সুবর্ণ মুকুট মাথে, মালতী জড়িত তাতে,
কটিতটে কিঙ্কিনীর দাম।

রূপ নব জলধর, পরিধান পীতাম্বর,
অঙ্গ হেরি অঙ্গহীন কাম ॥৭॥
লাবণ্য-তরঙ্গ-বন্যা, জলে ডুবি গোপকন্যা,
ব্রজে সবে তেজি কুলমান।
ও মধুর মধু আশে তেজি তারা গৃহবাসে,
চরণে সঁপিল মন প্রাণ ॥৮॥
গোপ গোপিনীগণে, হর্ষদাতা সর্বক্ষণে,
জগন্নাথ যশোদানন্দন !
রমণী মণির বন্ধু, দীননাথ দয়াসিন্ধু,
নীলাচলে হৈলা প্রকটন ॥৯॥
মৎস্য কূর্ম শ্রীবরাহ, নৃসিংহ বামন ইহ,
ভৃগুবংশে রাম দাশরথি।
এই হরি হলধর, বুদ্ধ কল্কি কলেবর,
ইহ কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পতি ॥১০॥
এক ব্রহ্ম চারি ভাগে, প্রকটিয়া এক যোগে
প্রসাদ করয়ে বিতরণ।
ভুঞ্জি নর পশু আদি, অশেষ পাপের নিধি
শ্রীবৈকুণ্ঠে করয়ে গমন ॥১১॥"

বিশ্বম্ভর বাবু নীলাচলে গমন করিয়া তথায় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা-দেবীকে দর্শন করিয়া কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের ভাষায় প্রদত্ত হইল—

"যবে শ্রীপুরুষোত্তম করিনু দর্শন,
নীলাদ্রিতে শঙ্খোপরি রত্ন-সিংহাসনে।
শ্রীরাম, সুভদ্রা আর সুদর্শন সনে ॥
বিরাজয়ে জগন্নাথ সংসারের সার।
রূপ হেরি হৃদয়ের নাশে অন্ধকার ॥

* * *

জগন্নাথ-লীলা দেখি অতি চমৎকার।
ভুলিল নয়ন মন নাহি ফিরে আর॥"

আর এই ভুবনমোহনরূপ ও অপরূপ জগন্নাথ-লীলা-কাহিনী, তাঁহার সাধ হইল, ভাষায় বর্ণনা করেন—

"সেই সব কথা শুনি উৎকল খণ্ডেতে।
ভাষা করি ইচ্ছা মোর হইল বর্ণিতে।"

এই ইচ্ছাকে—এই সাধু সঙ্কল্পকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে ফিরিয়া তাঁহার অহরহ মনে হইতে লাগিল, কেমন করিয়া তাঁহার সুমধুর ও প্রাণারাম লীলা ভাষার সাহায্যে তিনি ফুটাইয়া তুলিবেন। তাঁহার অন্য সমস্ত ভাবনা ও চিন্তা দূরে গেল—কেবল এক ভাবনা ও এক চিন্তায় তাঁহার হৃদয়-মন আচ্ছন্ন হইয়া রহিল—কেমন করিয়া তিনি সেই অনন্ত-রূপময় ও গুণময়ের রূপগুণের পরিচয় দিবেন—

"গৃহে আসি লীলা বর্ণিবারে হইল মতি।
কিরূপে বর্ণিব তাহা ভাবি নিতি নিতি॥"

ভক্তের মনে যখন এই বাঞ্ছা জাগিয়া উঠিল,—তখন সেই বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার উপায় করিয়া দিলেন। বিশ্বম্ভর বাবুর মনের ঠিক এই অবস্থার সময়ে তাঁহার গুরুদেব, শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুরের দৌহিত্রবংশাবতংস ব্রজনাথ চট্টরাজ মহাশয় শুভাগমন করিলেন। তখন তিনি গুরুদেবের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাকে মনের কথা খুলিয়া জানাইলেন। তাঁহার কাছে নিবেদন করিলেন—"আমার এই মানসিক সাধ পূর্ণ করিয়া দিবার উপায় করিয়া দিন প্রভু।" চট্টরাজ মহাশয়—

"ঈষৎ হাসিয়া আজ্ঞা করিল তুরিত,
পঠহ উৎকলখণ্ড পণ্ডিতের স্থানে।
শ্লোকার্থ জানিলে পদ আসিবেক মনে॥"

তখন বিশ্বম্ভর বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"নিবেদন কৈনু অর্থ কেমনে বুঝিব ?"

তাঁহার এ প্রশ্নের উত্তরে—

"আজ্ঞা হৈল পঠিলেই উদয় হইবে।"

গুরু-আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া তিনি শীঘ্রই উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাইলেন।

"আজ্ঞা অনুসারে আমি গিয়া গঙ্গাতীরে।
পুথি কোথা পঠিব ভ্রমিয়ে নিরন্তরে॥
শ্রীজগমোহন খ্যাত বিদ্যালঙ্কার।
শান্তমতি হরিভক্তি বিপ্রের কুমার॥
আচম্বিতে তাঁর সহ হইল মিলন।
পুরাণ পাঠের হেতু কৈনু নিবেদন॥"

গঙ্গাতীরে জগমোহন বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দর্শন পাইয়া এবং তাঁহার শান্তভাব ও ভক্তি-লক্ষণ দেখিয়া বিশ্বম্ভর বাবু তাঁহারই শরণাগত হইলেন এবং তিনিই করুণা করিয়া বিশ্বম্ভর বাবুর শরণাগতি গ্রহণপূর্বক—

"জানাইলা শ্লোক-অর্থ সদয়-হৃদয়।"

এবং এইরূপে বিশ্বম্ভর বাবুর

"শ্লোকার্থ জানিতে হৈল অক্ষর যোটন।"

আর তাহারই ফলে এই অভিনব "জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থের উদ্ভব হইল।

জগন্নাথমঙ্গলে বিশ্বম্ভর পানির আত্ম-পরিচয়

ভক্তকবি বিশ্বম্ভর রচিত "সঙ্গীত-মাধব" গ্রন্থ পাঠে তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তদ্রচিত এই "জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থ হইতে তাঁহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন পদকর্তাগণ বা বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের পদ-রচনার শেষে বা গ্রন্থ-সমাপ্তি-কালে যেমন নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করিতেন, কবি বিশ্বম্ভরও তেমনি তাঁহার "জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থ-সমাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়াংশ উদ্ধৃত হইল,—

"মম জন্মভূমি কৃষ্ণনগর দক্ষিণে।
গোপীনাথ রাধাদামোদর সেইখানে॥৪১
গোপীনাথ হইতে অর্ধ যোজন প্রমাণ।
তথায় নিবাস মোর জানিবে বিধান॥৪২

মাতা সতী শুদ্ধমতি রত্নমণি নাম।
তাঁহার উদরে জন্ম করি কৃষ্ণনাম ॥ ৪৩
কানাইচরণ দাস জনক আমার।
বৈষ্ণব সমাজে সদা প্রশংসা যাঁহার ॥ ৪৪
মহাদাতা ছিল তিঁহো সর্বত্র বিদিত।
সত্যবাদী সদাচার ধর্মে নিয়মিত ॥ ৪৫
পিতৃব্যগণের মধ্যে শ্রীরামসুন্দর।
রাধাদামোদর অনুরক্ত নিরন্তর ॥ ৪৬
শিশুকালে পিতৃহীন আমি দুরাচার।
লালন পালন তিঁহ করিল আমার ॥ ৪৭
তাহাতে দুর্দৈব আর শুন সর্বজন।
হইনু পিতৃব্যহীন বিধির লিখন ॥ ৪৮"

(ক্ষেত্রখণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত সংস্করণ)

উপরি উদ্ধৃত কবিতা পাঠে জানিতে পারা যায় যে, কবির জন্মভূমি "কৃষ্ণনগর দক্ষিণে" অর্থাৎ কৃষ্ণনগরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কোন গ্রামে। বাংলাদেশে দুইটি কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধি আছে। একটি নদীয়া জেলার অন্তর্গত, উহা গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর নামে প্রসিদ্ধ; অপরটি হুগলী জেলার অন্তর্গত ইহা খানাকুল ও কৃষ্ণনগর দুইটি বিভিন্ন গ্রাম। খানাকুল গ্রামখানি জাহানাবাদ সাব-ডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত, খানাকুল* গ্রামের উত্তরেই কৃষ্ণনগর অবস্থিত; গ্রামখানি খানাকুল অপেক্ষা বৃহত্তর। এই কৃষ্ণনগরের দক্ষিণদিকে, ৪।৫ খানি গ্রামের পরে কবি বিশ্বম্ভরের জন্মভূমি অবস্থিত। আর তাঁহার এই জন্মভূমির নাম সেনহাট। উপরে যে দুই দেবতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে "গোপীনাথ" বা শ্রীগোপীনাথ জীউ অভিরাম গোস্বামী (গোপাল) কর্তৃক কৃষ্ণনগরে প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ

* " 'খানাকুল' এই নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকগুলি কৌতুকাবহ ও বিস্ময়কর কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। কোন কোন লোকের মতে নদীর বক্রগতিতে যে কোন স্থান বিশিষ্ট হয়, তাহাকে 'কুল' বলে। 'খানা' শব্দের অর্থ 'খাল' 'গর্ত'। এই উভয় শব্দের যোগে 'খানাকুল' নাম হইয়াছে। 'খানাকুল' গ্রামটিও নদীর এইরূপ বক্রগতির উপর অবস্থিত বটে।"—এই অংশ স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিত "খানাকুল কৃষ্ণনগর-সমাজ" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত (১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ও প্রাচীন বিগ্রহ ; আর "রাধাদামোদর" বিগ্রহ পাইন মহাশয়দিগের গৃহ-দেবতা ; তাঁহাদের সেনহাটের পল্লীভবনে এখনও বিরাজিত এবং সেখানে এখনও তাঁহার নিত্যসেবা চলিতেছে। "জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থের সূত্রখণ্ডের গুরুবন্দনার ভিতরেও কবি তাঁহার এই গৃহদেবতার উল্লেখ করিয়াছেন ;—

বন্দে নন্দাত্মজং কৃষ্ণং রাধিকা-প্রাণবল্লভম্।
রাধাদামোদরাখ্যানং মৎকুলত্রাণকারণম্॥

উদ্ধৃত শ্লোকটির দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ এই যে, যিনি মৎকুলত্রাণকারণ সেই রাধাদামোদর নামে আখ্যাত দেবতার আমি বন্দনা করি। এই গ্রন্থের অন্যত্র, "কুলদেবতা গ্রাম্যদেবতা বন্দনা" অধ্যায়েও ভাবুক ভক্ত তাঁহার ভক্ত-প্রাণ কবি-হৃদয়ের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি, তাঁহার এই কুলদেবতার উদ্দেশে অর্পণ করিয়াছেন ;—

"কুলের দেবতা বন্দ রাধাদামোদর।
শ্রীরাধামাধব আর মম প্রাণেশ্বর॥ ১
নন্দের নন্দন নবঘন জিনি দ্যুতি।
ইহলোক পরলোকে যেঁই প্রাণপতি॥ ২
শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু শ্যামলসুন্দর।
গোপবেশ বেণুকর সেই নটবর॥ ৩"

(সূত্রখণ্ড, ৫ পৃষ্ঠা, ঐ সংস্করণ)

উপরি উদ্ধৃত তৃতীয় চরণের পরে তিনি কৃষ্ণনগরাধিষ্ঠিত গোপীনাথজীর কথাও বলিয়াছেন ;—

"শ্রীকৃষ্ণনগরে বন্দ প্রভু গোপীনাথ।
বলরাম অভিরাম মালিনীর সাথ॥"

শ্রীগোপীনাথজীর মন্দিরে গোপীনাথ-বলরাম এই যুগল বিগ্রহের সহিত অভিরামগোস্বামী ও তৎপত্নী মালিনী দেবীর মূর্তিও অবস্থিত আছে। এই অভিরাম গোপাল দ্বাদশ গোপলের অন্যতম গোপাল। দ্বাপরে যিনি শ্রীকৃষ্ণ-সখা শ্রীদাম ছিলেন, তিনিই কলিতে 'অভিরাম'রূপে অবতীর্ণ বলিয়া খ্যাত।

কবির গ্রাম-পরিচয় সম্বন্ধে প্রথমোদ্ধৃত কবিতার তৃতীয় পংক্তির ভিতরে আর একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

"গোপীনাথ হইতে অর্ধ যোজন প্রমাণ।"

অর্থাৎ গোপীনাথের মন্দির হইতে কবির জন্মভূমি বা গ্রাম অর্ধযোজন।

ঐ কবিতার উদ্ধৃত ভাগের বাকী অংশ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, কবির জননীর নাম রত্নমণি, তিনি সতী-সাধ্বী ও শুদ্ধমতি ছিলেন। কানাই-চরণ দাস কবির জনক, বৈষ্ণব-সমাজে ইঁহার খ্যাতি ছিল এবং সকলে ইঁহার প্রশংসা করিতেন। তাঁহার দানশীলতায় মুগ্ধ হইয়া লোকে তাঁহাকে "মহাদাতা" বলিত; তিনি সত্যবাদী, সদাচারী ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে ধর্মানুষ্ঠানে রত থাকিতেন। কবির খুল্লতাত রামসুন্দর রাধাদামোদরের অনুরাগী ভক্ত ও সেবক ছিলেন। কবি শৈশবে পিতৃহীন হইলে, ইনিই কবিকে পিতৃস্নেহে পালন করেন। জগন্নাথমঙ্গল-রচনার পূর্বেই কবি বিশ্বম্ভরকে অকালে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া রামসুন্দর পরলোক গমন করেন।

বিশ্বম্ভর পানির বংশ-পরিচয়

বিশ্বম্ভরের অতিবৃদ্ধ পিতামহের নাম মথুরামোহন, মথুরামোহনের পুত্র হরিচরণ। হরিচরণের পুত্র নীলাম্বর, ইনি বিশ্বম্ভরবাবুর পিতামহ। শৈশবে পিতৃহীন ও পিতৃপরিত্যক্ত বিশাল জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইয়া ইনি খুব গরিব হইয়া পড়েন। আপনার মানসিক তেজ ও ধর্মকে সহায় করিয়া তিনি অবস্থার পরিবর্তন করিয়া লন। তাঁহার ছয় পুত্র—কিশোরীমোহন, গোপী-মোহন, রামচরণ, কানাইচরণ, মোহনলাল ও রামসুন্দর। কিশোরীমোহনের চতুর্থ পুত্র কানাইচরণই বিশ্বম্ভরবাবুর পিতা এবং কনিষ্ঠপুত্র রামসুন্দর তাঁহার কনিষ্ঠ পিতৃব্য। এই রামসুন্দর একজন মহাপুরুষ ছিলেন।

বিশ্বম্ভরবাবুর অন্যান্য বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

জন্ম—১৮৫২ খৃষ্টাব্দ রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মৃত্যু—২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ

পরলোকগত দানবীর রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক

গত ৭০।৭৫ বৎসরের মধ্যে সুবর্ণবণিক্‌গণের ভিতর যাঁহারা জনসাধারণের হিতার্থে বহু অর্থ দান করিয়া ধন্য ও স্মরণীয় হইয়াছেন, রাজা দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম।

রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক-বংশের সুপ্রসিদ্ধ নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের প্রপৌত্র। রাজা বাহাদুরের পিতামহের নাম রামগোপাল মল্লিক। ইঁহারই চতুর্থ পুত্র অদ্বৈতচরণ। অদ্বৈতচরণের দুই পুত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ। জ্যেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনাথ বিখ্যাত এটর্ণি ছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন ; ইঁহারই কনিষ্ঠ সহোদর রাজা দেবেন্দ্রনাথ।

অদ্বৈতচরণ প্রাতঃস্মরণীয় মতিলাল শীল মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। মাতামহ মতিলালের ভবনেই ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। জন্মস্থান-মাহাত্ম্যে মাতামহের পরোপকার প্রবৃত্তি ও দানশীলতার একটি বিশিষ্ট ধারা ভবিষ্যকালে দৌহিত্র দেবেন্দ্রনাথের জীবনে অনুসৃত হইয়াছিল। আর্ত, দুঃখী ও রোগীর জন্য অকাতরে তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছেন এবং সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহার আরব্ধ কার্য যাহাতে অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া না যায়, তাহারও যথোচিত ব্যবস্থা তিনি করিয়া গিয়াছেন। দেশের জনগণের কল্যাণকল্পে তাঁহার এই দান, দেশবাসীর নিকট তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

দেবেন্দ্রনাথের বংশ-পরিচয়

যে বংশে দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বংশের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। পরমহংসদেব বলিতেন—"বোম্বাই আমের গাছে টকো আম হয় না।" গীতায় আছে—"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।" শ্রীমান্ ও পূতচরিত্র ব্যক্তিদিগের গৃহেই যোগভ্রষ্ট সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন মানুষের মহত্ত্বের বিচার করিতে হইলে তাঁহার বংশপরম্পরাগত কৃষ্টির একটু পরিচয় পাইলে

মানুষটিকে বুঝিবার ও জানিবার একটু সুবিধা হয়। যে বদান্যতার গুণে রাজা দেবেন্দ্রনাথ দেশবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছেন, সে বদান্যতার বীজ তাঁহার হৃদয়ে বোধ হয়, সহজাত সংস্কাররূপেই নিহিত ছিল। তাঁহার প্রপিতামহ নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয় ১২১৪ সালের ৯ই কার্তিক পরলোক গমন করেন। পরলোকগমনের কিছু পূর্বে তিনি যে উইল করেন, তাহাতে ধর্ম ও দানাদি কর্মের জন্য ৩২০০০০০৲ বত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ দিয়া যান। পরবর্তী যুগে দেশে ও বিদেশে বহু দানবীর মহাত্মা অজস্র দানে জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন, কিন্তু বাংলাদেশে এই মহাত্মার ঐ বিরাট্ দান সত্যসত্যই তুলনা-রহিত ছিল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এখানে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কথা বলা হইতেছে। তখনকার দিনের বত্রিশ লক্ষ টাকা বর্তমান সময়ের প্রায় কোটি টাকার সমান। অর্ধশতাব্দী কাল ইংরাজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তৎকালে যে সকল বাঙালী স্বীয় প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার বলে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেকের বদান্যতার প্রসিদ্ধি এখনও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এককালীন এরূপ বিরাট্ দানের প্রামাণিক উদাহরণ বিরল। বিগত শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত বঙ্গের কৃতী সুবর্ণবণিক্ সন্তানগণ সাধারণের হিতার্থে যে দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, তাহার উৎসমূল, প্রেরণা ও আদর্শ এই নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়। উত্তরকালে ইঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, ইঁহারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া দানবীর মতিলাল শীল, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক ও অপরাপর বহু ধনী সুবর্ণবণিক্ বাংলা দেশকে দানে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং নিজেরাও চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথের পিতৃবংশের কিছু পরিচয় দেওয়া হইল, এখন তাঁহার মাতামহ-বংশের দিকে দৃক্‌পাত করিলে, সেখানেও মহত্ত্বের ধারার পরিচয় পাওয়া যাইবে। দেবেন্দ্রনাথের মাতামহ দানবীর মতিলাল শীল মহাশয়ের পরিচয় আজ আর নূতন করিয়া বাংলা দেশকে দেওয়া আবশ্যক করে না। দেশের ও দশের হিতকল্পে তিনি প্রায় বার লক্ষ টাকা দান করেন। স্বীয় নামে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান—বিদ্যালয়, অতিথিশালা প্রভৃতি

পরিচালনার জন্য দূরদর্শী ও তীক্ষ্ণধী মতিলাল এমন সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন যে, যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কোনদিনই বিলোপ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পিতৃ ও মাতৃবংশের পরিচয়ে দেখা যায়, দেবেন্দ্রনাথের দানের প্রবৃত্তি, তিনি প্রবল সংস্কাররূপেই লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্যই দীনদুঃখী, অনাথ, অন্ধ-খঞ্জ ও কুষ্ঠরোগীদের দুঃখে ও যাতনায় বালক দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার এই হৃদয়বত্তা আরও বিকশিত এবং আরও পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথ বাল্যে হিন্দু স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেন। ১৯ বৎসর বয়সে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে চিৎপুরের হরনাথ মল্লিকের পৌত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

ব্যবসাক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ

বৈশ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি—ব্যবসায়ের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে তিনি ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে সঙ্কল্প করেন। তিনি বুঝিয়া ছিলেন হাতে-কলমে কাজ না শিখিলে ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করা যায় না। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত চা-ব্যবসায়ী মেসার্স জে টমাস কোম্পানীর অফিসে শিক্ষানবিসরূপে ভর্তি হইলেন। এইখানে কাজ করিতে করিতে যখন তিনি বুঝিলেন যে, নিজেই স্বাধীনভাবে ব্যবসা-পরিচালনা করিতে সমর্থ—তখন তিনি উক্ত অফিস পরিত্যাগ করিয়া "ডি এন্ মল্লিক এণ্ড কোং" নাম দিয়া চায়ের ব্যবসা খুলিলেন।

কর্মক্ষেত্রেও মেধাবী দেবেন্দ্রনাথকে আমরা পাওনিয়ার বা পথপ্রদর্শকরূপে দেখিতে পাই। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় শুধু বিলাতে কেন, ভারতেও চীন দেশের চায়ের প্রাদুর্ভাব ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, দেবেন্দ্রনাথই প্রথম বিলাতে ও বোম্বাই নগরের প্রধান হাসপাতালসমূহে ঐকান্তিকী চেষ্টায় চীনা চায়ের পরিবর্তে ভারতীয় চায়ের প্রচলন করেন। তাঁহার চেষ্টায় এদেশীয় লোকও ভারতীয় চায়ের অনুরাগী হইয়া উঠিল। এই চায়ের ব্যবসায়েই ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হন।

কয়েক বৎসর পরে চায়ের বাজারে মন্দা পড়ে এবং এই ব্যবসায়ে বহু লোক অবতীর্ণ হন। তারপর চাহিদা অপেক্ষা উৎপন্ন মালের পরিমাণ বেশী হওয়ায়—দেবেন্দ্রনাথ এই ব্যবসা পরিত্যাগ করেন।

চায়ের যাহাতে বহুল প্রচলন হয়, তাহার জন্য তিনি তৈয়ারী চা প্রতি কাপ এক পয়সা হিসাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতৎসত্ত্বেও তাঁহার চেষ্টা সফল ও লাভপ্রসূ না হওয়ায় তিনি বাধ্য হইয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চায়ের ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

চায়ের ব্যবসায় হইতে অবসরগ্রহণপূর্বক তিনি জমি ও বাসগৃহের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাসের জন্য একটি বড় বাড়ীকে ছোট ছোট বিভিন্ন অংশে (flat system) বিভক্ত করিয়া তিনি ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করেন। এই প্রথার প্রবর্তনে তিনি বিশেষ লাভবান হন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ও অতিথিশালা স্থাপন

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার দমদমার বাগানবাড়ীতে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ও অতিথিশালা স্থাপন করেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান চারি বৎসরকাল চলিয়াছিল। এখানকার অতিথিশালায় প্রতিদিন ১২০।১২৫ জন লোক অন্ন পাইত। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অবহেলা ও অমনোযোগিতায় বিরক্ত হইয়া তিনি এই দুইটি প্রতিষ্ঠান উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন।

সুবর্ণবণিক্ দাতব্যসভার সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ

কর্মক্ষেত্রে সাফল্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকেই শুধু দৃষ্টি রাখিলেন না, সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। প্রভূত পরিশ্রম, অপূর্ব স্বার্থত্যাগ এবং ঐকান্তিক অধ্যবসায় এপথে তাঁহাকে সিদ্ধি দান করে। পিতার মৃত্যুর কিছু পূর্ব হইতে তিনি সুবর্ণবণিক্ দাতব্যসভার সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেন। সুবর্ণবণিক্ দাতব্যসভার সম্পাদক ও পরে সহকারী সভাপতিরূপে তিনি প্রথমেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, উক্ত সভাকে চিরস্থায়ী ও আত্মপ্রতিষ্ঠ করা

প্রয়োজন। এই সভার ভাণ্ডার হইতে সুবর্ণবণিক্ বিধবা ও অনাথগণকে নিয়মিতভাবে মাসিক সাহায্য দান করা হয়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সভার কোন স্থায়ী ভাণ্ডার সৃষ্ট হয় নাই। সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে অচিরকালমধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার সংস্থান হইল।

জাতিবর্ণনির্বিশেষে দান

দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় উদার ছিল। তাঁহার দৃষ্টি স্বসমাজের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে নাই। তাই তাহার হৃদয়বত্তা ও বদান্যতা জাতিনির্বিশেষে সকল সমাজকেই স্পর্শ করিয়াছে। সহরের বহু বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান সে সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়াছে। City ও Metropolitan কলেজের বহু অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ছাত্র তাঁহারই কৃপায় একদিকে যেমন উচ্চশিক্ষালাভে ধন্য হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই উচ্চশিক্ষার ফলে জীবন-সংগ্রামের পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছে। দায়গ্রস্ত কোন ব্যক্তি কোন দিন তাঁহার নিকট চাহিয়া বিফল হয় নাই। কত কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি যে তাঁহার কৃপায় দায়মুক্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে দান

রোগার্তের ব্যথায় তিনি কতদূর ব্যথিত হইতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—তাঁহার হাসপাতালসমূহে বিরাট্ দানে। বস্তুতঃ তাঁহার দানশক্তি এই বিভাগেই বিশেষভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ—এখন দেশপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এই হাসপাতাল সংলগ্ন ভূমিতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি আউটডোর হাসপাতাল নির্মাণ করাইয়া দেবেন্দ্রনাথ অতুল কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। এই দাতব্য ঔষধালয়ের বার্ষিক ব্যয় বাবদে তিনি বার শত টাকা আয়ের একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হাসপাতালের আভ্যন্তরীণ (indoor) বিভাগে ১৮টি রোগীর চিকিৎসা ও সেবার নিমিত্ত মাসিক ২২৫৲ টাকার চিরস্থায়ী দানের ব্যবস্থা করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রেল বঙ্গের রাজপ্রতিনিধি লর্ড রোণাল্ডসে দেবেন্দ্র-

নাথের এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এতদুপলক্ষে যে মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে কলেজ-হাসপাতালের সভাপতি স্বর্গীয় কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় ইংরাজীতে বলেন—

"The institution has just been enriched by the gift of a large and handsome building facing Belgachia Road which is the generous gift of one of the most charitable citizens of Calcutta, Babu Debendra Nath Mullick."

গভর্ণর রোণাল্ডসে বাহাদুরও বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়া বলেন—

"It was my privilege after laying the foundation-stone of the new hospital-block a few minutes ago to perform another ceremony, namely, that of opening the Devendra Nath Mullick Charitable Dispensary. By his splendid gift which includes not merely the building which I have opened, but what is even more important, an endowment which will provide for carrying on the work of the Dispensary, Babu Debendra Nath Mullick has added one more to the many philanthropic works for which the people of Bengal are indebted to him, and has earned for himself an honoured place in the rôle of benefactors of the institution. We thank him for the gift itself, and thank him even more for the example which he has thus set."

আজ বেসরকারী কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ কলিকাতার সরকারী মেডিকেল কলেজের সমকক্ষ। এই সম্মানের আসনে বেলগাছিয়ার উক্ত কলেজেকে স্থাপিত করিতে যে মহাত্মা সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনি আমাদের দেবেন্দ্রনাথ। এ ইতিহাস হয়ত অনেকেই জানেন না। পূর্বে এই চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান আর জি কর মেডিকেল স্কুল নামে অভিহিত হইত। ইহাকে মেডিকেল কলেজে পরিণত করিবার প্রস্তাবে সরকার হইতে আদেশ হয় যে, এক বৎসর কালের মধ্যে একটি একশত রোগীর উপযুক্ত হাসপাতাল ও আউটডোর ডিস্পেন্সারী যদি এই চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থিত হয়, তবেই উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সমশ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। সরকার এ কার্যের আনুমানিক ব্যয় নয় লক্ষ
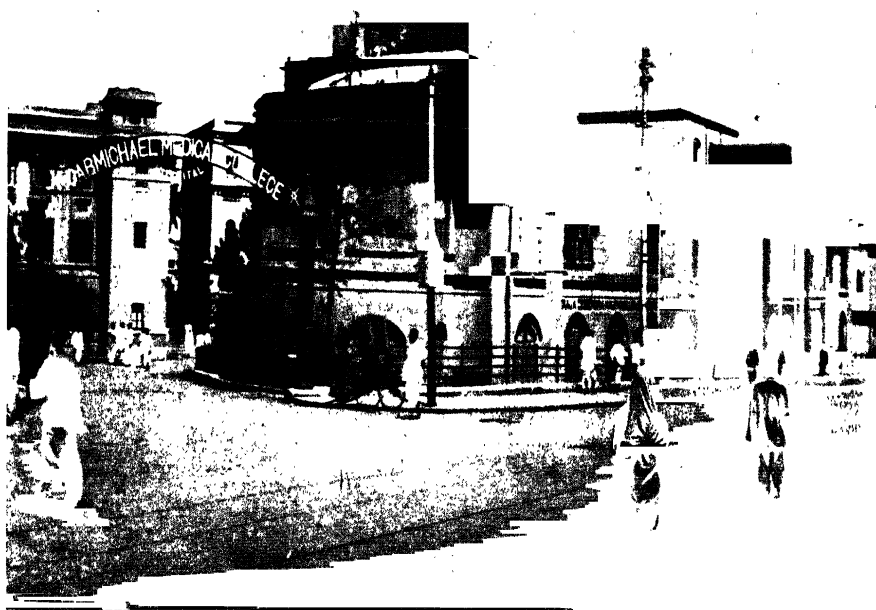
রাজা দেবেন্দ্র মল্লিক দাতব্য চিকিৎসালয়, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা

টাকা নির্ধারণ করেন,—তন্মধ্যে ছয় লক্ষ টাকা সরকার দিবেন। অবশিষ্ট তিন লক্ষ টাকার ব্যবস্থা কলেজকে করিতে হইবে। কলেজের কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গণিলেন, কিন্তু নিরাশ হইলেন না। তাঁহারা অচিরে দেবেন্দ্রনাথের সমীপস্থ হইয়া সরকার-পক্ষের সকল কথা তাঁহাকে জানাইলেন। আর্তসেবায় চির-উন্মুক্তহৃদয় দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া এক বৎসর কালের মধ্যে একটি Trust Deed গঠন করিয়া কলেজের জন্য ঐ তিন লক্ষ টাকা দান করিলেন। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-কেন্দ্রে দেবেন্দ্রনাথের এই অনুপম দান তাঁহার স্মৃতিকে চির-উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসার্থ দান

অতঃপর তিনি বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড-পত্নীর আবেদনক্রমে রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্ক ওল্ডরিভ (Secretary for the India Mission for Lepers) মহোদয়ের মারফতে আশিটি কুষ্ঠরোগীর জন্য মাসিক দুইশত টাকা সাহায্য দানের স্থায়ী ব্যবস্থা করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখে মহামান্যা লেডী চেমস্‌ফোর্ড কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলেন—

"A generous citizen Mr. D. N. Mullick has settled property worth a lac of rupees on the Calcutta branch-work among lepers."

দাতব্য-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার্থ স্থায়ী ব্যবস্থা

রাজা দেবেন্দ্রনাথ দূরদর্শী ছিলেন। ভবিষ্যতে যাহাতে তাঁহার দাতব্য অনুষ্ঠানসমূহ অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া না যায়, তাহার ব্যবস্থা তিনি জীবদ্দশাতেই করিয়া যান। এই জন্য তিনি বাংলার অফিসিয়াল ট্রাষ্টির (Official Trustee for Bengal) হস্তে ১,৪০,০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ ও তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিয়া দেন।

বিভিন্ন স্থানের কুষ্ঠাশ্রমে দান

সহৃদয় ও পরদুঃখকাতর দেবেন্দ্রনাথ বাঁকুড়া ও রাণীগঞ্জের কুষ্ঠাশ্রমের জন্য বহু অর্থ দান করেন এবং এই দুইটি কুষ্ঠাশ্রম পরিচালনার জন্য চিরস্থায়ী

অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া যান; বাঁকুড়ায় যে কুষ্ঠাশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার জন্য রাজা দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে বার্ষিক ৬০০৲ টাকা সাহায্য দেন। ঐ আশ্রমের প্রাচীর-গাত্রে উৎকীর্ণ নিম্নলিখিত প্রস্তর-লিপি পাঠে এ বিষয় জানা যায়—

"Babu Debendra Nath Mullick,
of Colootollah, Calcutta,
is the contributor of Rs. 600/- per annum
towards the support of Lepers in this asylum
in memory of his late mother,
Sreematty Radharanee Dassie."*

রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্ক ওল্ডরিভ (Secretary for the India Mission for Lepers) সাহেবের মারফতে রাজা দেবেন্দ্রনাথ এই সমস্ত মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার হাতে, মাদ্রাজের ভেদাথোরা-সেলুর নামক স্থানে একটি কুষ্ঠাশ্রম নির্মাণের জন্য ৬০০০৲ টাকা দান করেন। রেভারেণ্ড ওল্ডরিভ মহোদয় মিশনের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে নিম্নলিখিতভাবে এ বিষয়ের উল্লেখ করেন—

"GENEROUS GIVERS

The finest help rendered last year was that given by Baboo Debendra Nath Mullick of Calcutta who generously offered to put some Calcutta property in the hands of the Bengal Official Trustee and, from this fund, the Mission is to receive in perpetuity a sum of Rs. 2400/- per annum and Reserve Fund is also being built up from which the sum given to the Mission can be increased every ten years. This very splendid action is worthy of great praise and the receipt of a stated amount each year is of great help to the Mission. In addition to this, Mr. Mullick gave a donation of Rs. 6000/- in order that the Mission might, in co-operation with Madras Government, open a new home for

* ইনি স্বর্গীয় দানবীর মতিলাল শীল মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা এবং ৺অদ্বৈতচরণ মল্লিক মহাশয়ের সহধর্মিণী।

রাজা দেবেন্দ্রমল্লিক চেরিটেব্‌ল্ ওয়ার্ড, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ
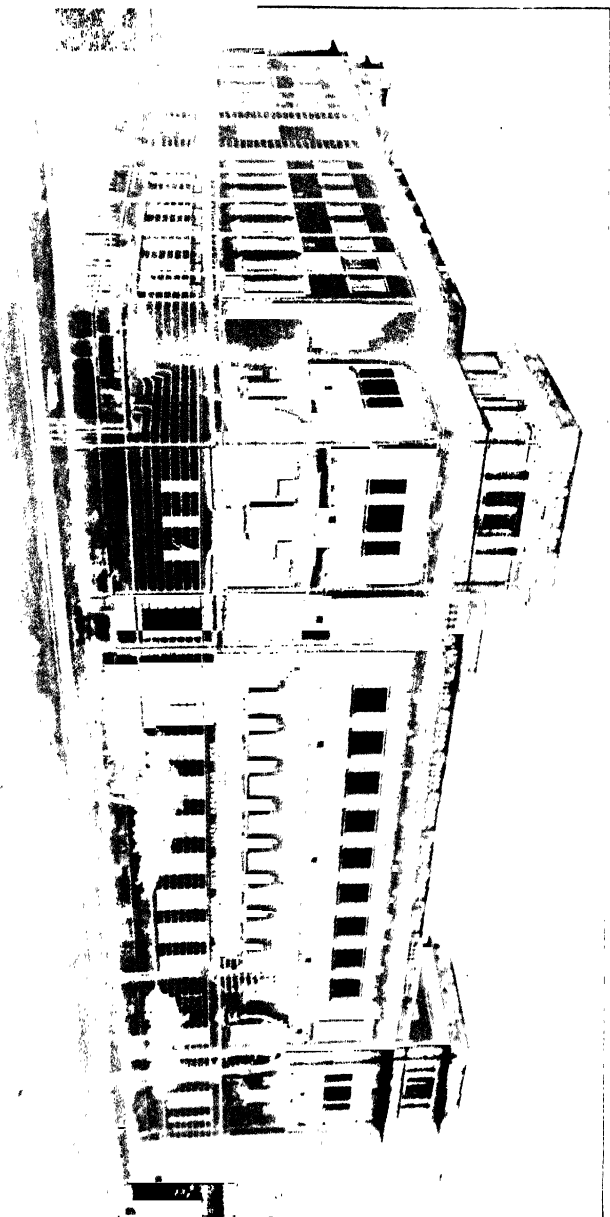
lepers at Vadathorasalur in S. Arcot and to be named 'Devendra Nath Mullick Home' for Lepers."

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠা

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পশ্চাদ্ভাগে, সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ রাস্তার উপরে যে চোখের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে, উহার নাম "Raja Devendra Nath Mullick Charitable Ward." এই ওয়ার্ডে অন্তর ও বাহির—তুইটি বিভাগ বর্তমান। অন্তর্বিভাগে ৪৮টি শয্যার (Bed) জন্য রাজা দেবেন্দ্রনাথ বাৎসরিক ৫২০০৲ পাঁচ হাজার তুই শত টাকা দানের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

উপাধি-লাভ

তাঁহার এই দান ও জনহিতকর কার্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে "রায় বাহাতুর" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তিনি "রাজা" উপাধি পান। এইরূপে গভর্ণমেণ্ট একজন প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য মর্যাদা দান করেন। কিন্তু অতীব তুঃখের বিষয় যে, ইহার অত্যল্পকাল পরেই—১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেন।

অভিনব ন্যাস-পত্র

মেডিকেল কলেজ-সংলগ্ন চোখের হাসপাতাল, নানাস্থানের কুষ্ঠাশ্রম ও বেলগাছিয়ার কারমাইকেল কলেজেই তাঁহার প্রধান দানের পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহাদি নির্মাণ ব্যতীত, পরিচালনার জন্য তিনি সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে অভিনব ভাবে ন্যাস-পত্র (Trust Deed) সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকিবে। এই ন্যাস-পত্র সম্পাদনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তীক্ষ্ণধী কুমার কার্তিকচরণ তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাজা দেবেন্দ্রনাথ বাংলার অফিসিয়্যাল ট্রাষ্টির হাতে ১,৪০,০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ ও তিন লক্ষ টাকা

মূল্যের সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিয়াছেন। তাহাতে একটি সর্ত এই যে, এগুলির বার্ষিক আয় ১৫০০০৲ পনের হাজার টাকার এক তৃতীয়াংশ দ্বারা স্বতন্ত্র আর একটি Reserve Fund সৃষ্টি হইবে। প্রতি বৎসরে এইরূপে যে টাকা উক্ত Reserve Fund ভুক্ত হইবে, সুদ সমেত সেই টাকা জমিয়া যখন এক লক্ষ টাকায় পরিণত হইবে, তখন উক্ত লক্ষ টাকা পূর্ব প্রদত্ত মূলধনের সহিত যুক্ত হইবে। তাহারও আয় বা সুদ হইতে অতিরিক্ত দাতব্য কার্যাদির অনুষ্ঠান করা হইবে।

উপরে যে সমস্ত দানের কথা বলা হইল, তাহার আনুমানিক পরিমাণ দশলক্ষ টাকা হইবে। ইহা ব্যতীত তাঁহার ব্যক্তিগত দান অনেক ছিল।

মৃত্যু ও বংশধরগণ

মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র (কার্তিকচরণ, গণেশচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, গেরচরণ ও হরিচরণ) ও সাত কন্যা রাখিয়া যান। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার পরলোক গমনের ছয় বৎসর পরে, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তৃতীয় পুত্র কুমার মহেশচন্দ্র অকালে কালকবলিত হন।

রাজা দেবেন্দ্রনাথের সুযোগ্যা সহধর্মিণী সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাটে সমাগত যাত্রিগণের পানীয় জলের অভাব দূরীকরণ জন্য ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা ব্যয়ে একটি সুন্দর নলকূপ প্রস্তুত করাইয়া দেন।

তাঁহার নামে রাস্তার নামকরণ

কলুটোলায় যে রাস্তার উপর রাজা দেবেন্দ্রনাথের ভবন অবস্থিত, পূর্বে তাহার নাম ছিল শোভারাম বসাকের ষ্ট্রীট, বর্তমানে উহার নাম হইয়াছে—দেবেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট।

রামবাগানেও রাজা দেবেন্দ্রনাথের পিতা ৺অদ্বৈতচরণ মল্লিকের নামে একটি রাস্তা আছে, উহার নাম অদ্বৈত মল্লিক লেন। ঐ রাস্তার সমস্ত জমিটা কলিকাতা কর্পোরেশনকে রাজা দেবেন্দ্রনাথ দান করিয়াছেন।

কুমার শ্রীযুক্ত কার্তিকচরণ মল্লিক

কবিবর প্রিয়নাথ সেন

"প্রদীপ" নামক মাসিক পত্রের চতুর্থ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮) "উপহার" নামক একটি কবিতা বাহির হয়। কবিতাটির রচয়িতা সন্তোষের জমিদার সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী এবং ইহা কবিবর প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের উদ্দেশে লিখিত। কবিতাটির সহিত এই যুগল কবির একখানি চিত্রও "প্রদীপে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

উক্ত "উপহার" কবিতাটি এই—

"শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন

সুহৃদ্বরেষু

বাণীর চরণ-তলে　　বসে আছ কুতূহলে
সাধক সুন্দর!
ভাবে ভরা ভোলা প্রাণ　　নাহি ভাণ অভিমান,
উদার অন্তর।
অমিয়-সাগরে নামি,　　তৃপ্তিহীন দিবাযামী
কি করিছ পান?
গীতিময় বক্ষপুটে　　ভূমানন্দে বাজি উঠে,
কাব্য জয় গান।
থাক্ বা না থাক মধু,　　নহে এ মানসী বধূ
নহে প্রেমভীতা;
খোল হৃদি কুঞ্জ-দ্বার,　　ধর ধর উপহার
আমার কবিতা।"

প্রদীপ, পৃঃ ২২৪

প্রিয়নাথ সেন মহাশয় সুবর্ণবণিক্-বংশোদ্ভূত। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার মথুরামোহন সেনের বংশধর। ১৩২৩ সালের ৮ই কার্তিক তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে প্রিয়নাথের উল্লেখ

প্রিয়নাথ বাবু কিরূপ উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যিক ও সমালোচক ছিলেন তাহার পরিচয় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "জীবন-স্মৃতি"তে পাওয়া যায়।

নিম্নে প্রিয়নাথ বাবুর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখাটি "জীবন-স্মৃতি" হইতে উদ্ধৃত করা হইল—

"এই 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম, যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত আমাকে কাব্যরচনার বিকাশ-চেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্বে 'ভগ্ন-হৃদয়' পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে' তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড় রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদা সর্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূরদিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পূরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন—তাঁহার ভাল লাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।"

জীবন-স্মৃতি, পৃঃ ১৫৩

কবি বিহারীলাল ব্যতীত বাংলার আর কোন সাহিত্যিকের নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ এরূপ অনুপ্রেরণা পান নাই।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির শ্রদ্ধাঞ্জলি

মনস্বী লেখক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় প্রিয়নাথবাবুর পরলোক-গমনের অব্যবহিত পরে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেও এই কবি ও মনীষীর একটি সুন্দর পরিচয় লাভ করা যায়।

"৮নং মথুর সেনের গার্ডেন লেনে বাংলা সাহিত্যের একটি তীর্থ ছিল। বাংলায় সে তীর্থের কথা সকলে জানিত না। এককালে রবীন্দ্রনাথ সে তীর্থের নিত্য যাত্রী ছিলেন। স্বনামধন্য মথুরচন্দ্র সেন মহাশয়ের বংশে একজন সাহিত্য-সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি প্রিয়নাথ সেন। গত ২৫শে অক্টোবর প্রত্যূষে চারিটার সময় প্রিয়বাবু পরপারে চলিয়া গিয়াছেন!

"ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর পূর্বে আমরা প্রিয়বাবুর সহিত প্রথম পরিচিত হই—তাঁহার স্নেহে, প্রেমে ধন্য হইবার অবকাশ লাভ করি। তখন প্রিয়বাবুকে যেমন দেখিয়াছিলাম, জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে তেমনিই দেখিয়াছি। সাহিত্য—শাখা-পল্লব-ফল-পুষ্পসমন্বিত সমগ্র সাহিত্য—জ্ঞান-রস-আনন্দই তাঁহার জীবনের অবলম্বন ছিল। অধ্যয়ন ও আলোচনা, নিত্য নব নব রসের অন্বেষণ ও উপভোগ, বিশ্ব-সাহিত্যের সন্ধান, পরিচয় ও অনুশীলন, নানা ভাষার অসংখ্য গ্রন্থের সংগ্রহ ও সে সকলের প্রসাধন, রক্ষণ ও অধিকারের আনন্দে প্রিয়বাবুকে তখন যেরূপ মগ্ন, তন্ময় দেখিয়াছিলাম, জীবনের শেষ মুহূর্তেও তাঁহাকে সেই আনন্দে বিভোর দেখিয়াছি। সাংঘাতিক ব্যাধির ভীষণ আক্রমণে জীবনী-শক্তির প্রবাহ শুকাইয়া আসিতেছে, প্রিয়নাথ গ্রন্থরাশি-বেষ্টিত হইয়া রোগের যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছেন, আনন্দরসে ডুবিয়াছেন। দেখিয়া বিস্মিত হইতাম—মুগ্ধ-নেত্রে চাহিয়া থাকিতাম ;—আজ তার শেষ! এই চিরপরিচিত নিত্য দৃশ্য আর দেখিতে পাইব না ; সাহিত্য-পূজকের প্রাণের পূজা দেখিবার আর অবসর ঘটিবে না। সাহিত্যরসের সে প্রস্রবণ শুষ্ক হইল!

"প্রিয়বাবু অনেকদিন রোগ ভোগ করিতেছিলেন। রোগ-শয্যায় গ্রন্থই তাঁহার সঙ্গী ছিল। সেই সঙ্গীদের ফেলিয়া, পরিবারবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, আমাদের মত ভক্ত স্নেহভাজনদিগকে কাঁদাইয়া প্রিয়বাবু ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ব্যাধি-যন্ত্রণার অবসান হইল, তিনি

সংসারের সুখ-দুঃখের অতীত হইলেন। কর্মাবসানে ভোগের উপরতি—বিধির বিধান। নিয়তির এই কঠোর শাসন শিরোধার্য করিতেই হয়। কিন্তু মন ত বুঝে না। প্রিয়বাবুর বৃদ্ধ পিতা বর্তমান। তিনি এমন পুত্রের মরণ দেখিলেন। প্রিয়বাবুর পিতা, বিধবা বনিতা ও পিতৃহীন পুত্রদিগকে আমরা কি বলিয়া প্রবোধ দিব, তাহার ভাষা ত খুঁজিয়া পাই না। আমাদের শোকাচ্ছন্ন মনের সমগ্র সমবেদনা তাঁহাদের শোকের অনলে 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম' কর্তব্যবোধে ভক্তিনম্রচিত্তে নিবেদন করিলাম।

"প্রিয়বাবু অসামান্য মনীষার অধিকারী ছিলেন। সংস্কৃত, বাংলা, পার্শী, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষায় ও সাহিত্যে তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি রসজ্ঞ, ভাবুক ও সাহিত্য-রসিক সমালোচক ছিলেন। সাহিত্যের সকল বিভাগে তাঁহার দৃষ্টি ছিল।

"তাঁহার রচনায় প্রতিভার পরিচয় আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি অধিক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি মধুকরের মত বিশ্ব-সাহিত্যের মধুসঞ্চয় করিতেন; মধুচক্র-রচনায় তাঁহার অনুরাগ ছিল না। তিনি যে স্বল্প রচনা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কবি, ভাবুক, সন্দর্ভকার ও সমালোচক, এই রূপ-চতুষ্টয় দেদীপ্যমান হইয়া থাকিবে। বাংলা ও ইংরেজী রচনায় তিনি সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রচনা-রীতি বিশুদ্ধ, পুষ্পিত ও প্রাঞ্জল ছিল। সে রীতি নব্য লেখকগণের আদর্শ হইলে, বাংলা সাহিত্য উপকৃত হইতে পারে।"

(নায়ক, ১১ই কার্তিক শনিবার, ১৩২৩ সাল)

প্রিয়নাথবাবুর গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনা 'সাধনা', 'প্রদীপ', 'সাহিত্য', 'মানসী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সমস্ত রচনার মধ্যে তাঁহার কাব্য-প্রতিভা, সূক্ষ্ম সমালোচনা-শক্তি, চিন্তাশীলতা প্রভৃতির পরিচয় আধুনিক সাহিত্য-সমাজ পাইতে পারে।

প্রিয়নাথ ও কবিবর রবীন্দ্রনাথ

প্রিয়নাথের সহিত রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের রচনা (জীবন-স্মৃতি, পৃঃ ১৫৩) হইতেই বেশ বোঝা যায়।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে "গোড়ায় গলদ" প্রহসন
পড়িয়া শুনাইতেছেন।

প্রিয়নাথ রবীন্দ্রনাথকে যে সোদরাধিক ভালবাসিতেন, কেবল তাহাই নয়; তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনার একজন রসজ্ঞ পাঠক ও সমালোচক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনা প্রিয়নাথবাবুকে অনেক সময় শুনাইতেন।

১৩০৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রদীপে" (পৃঃ ১৮৫) পাশাপাশি দুইটি কবিতা বাহির হয়। প্রথমটির লেখক প্রিয়নাথ, আর দ্বিতীয়টির লেখক রবীন্দ্রনাথ। পরস্পরকে উদ্দেশ করিয়া লেখা। কবিতা দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"বসন্ত অন্তে

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রিয়বরেষু

অচির বসন্ত হায়, এল—গেল চলে—
নিবে গেল কোকিলের দীপক-পঞ্চম,
ভঙ্গুর কুসুম-শোভা ভেঙ্গে পড়ে ঢলে,
প্রভঞ্জনে পরিণত—উৎপাতে বিষম—
অলস—পরশ-মধু মলয়ার বায়!
যায় যদি যাক্ চলে ক্ষণিকের স্নেহ।
অফুরাণ ফুলবীথি কোথা তাহা হায়!
এ যে শুধু ছলনার মরীচিকা গেহ।
যে মদিরা পান তরে প্রাণ তৃষাতুর
কোথা তাহা?—কোথা জ্বলন্ত যৌবনা তব
শোভনা প্রতিভা কবি? বিশাল চিকুর
আবরে প্রকাশে যার তনুর বিভব—
নগ্ন দেহ—কম্প্র বক্ষ—মদির নয়ন—
ঢালুক অশেষ নেশা—পুলক-দহন।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন"

প্রিয়নাথের কবিতার প্রথম পংক্তিটি লইয়া রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করেন—

"প্রত্যুপহার

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের করকমলে উপহৃত

অচির বসন্ত হায় এল, গেল' চলে,'—
এবার কিছু কি কবি করেছ সঞ্চয় ?
ভরেছ কি কল্পনার কনক-অঞ্চলে
চঞ্চল-পবন-ক্লিষ্ট শ্যাম কিশলয়,
ক্লান্ত করবীর গুচ্ছ ? তপ্ত রৌদ্র হ'তে
নিয়েছ কি গলাইয়া যৌবনের সুরা
ঢেলেছ কি উচ্ছলিত তব ছন্দঃস্রোতে,
রেখেছ কি করি তারে অনন্ত মধুরা !
এ বসন্তে প্রিয়া তব পূর্ণিমা-নিশীথে
নব মল্লিকার মালা জড়াইয়া কেশে,
তোমার আকাঙ্ক্ষা-দীপ্ত অতৃপ্ত আঁখিতে
যে দৃষ্টি হানিয়াছিল একটি নিমেষে,
সে কি রাখ নাই গেঁথে অক্ষয় সঙ্গীতে ?
সে কি গেছে পুষ্পচ্যুত সৌরভের দেশে ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

রবীন্দ্রনাথের "কড়ি ও কোমল" কাব্যে "পত্র" নামে একটি সুদীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রখানি প্রিয়নাথকে লেখা। নিম্নে কবিতাটি উদ্ধৃত হইল—

"ওঁ

যোড়াসাঁকো।
পৌষ।
১৮৮৫

ভাই,

জলে বাসা বেঁধেছিলেম,
ডাঙ্গায় বড় কিচিমিচি।
সবাই গলা জাহির করে,
চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।

সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে,
ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়—
ভদ্রলোকের গায়ে প'ড়ে
কলম নিয়ে কালি ছিটোয়।
এখেনে ত বাস করা দায়
ভন্‌ভনানির বাজারে,
প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে ওঠে
হট্টগোলের মাঝারে।
কানে যখন তালা ধরে
উঠি যখন হাঁপিয়ে
কোথায় পালাই কোথায় পালাই
জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে।
গঙ্গাপ্রাপ্তির আশা ক'রে
গঙ্গাযাত্রা করেছিলেম।
তোমাদের না ব'লে ক'য়ে
আস্তে আস্তে সরেছিলেম।
ত্থনিয়ার এ মজ্‌লিষেতে
এসেছিলেম গান শুন্‌তে ;
আপন মনে গুন্‌গুনিয়ে
রাগরাগিণীর জাল বুন্‌তে।
গান শোনে সে কাহার সাধ্যি,
ছোঁড়াগুলো বাজায় বাগ্যি,
বিষ্ঠেখানা ফাটিয়ে ফেলে
থাকে তারা তূলো ধুন্‌তে।
ডেকে বলে, হেঁকে বলে,
ভঙ্গী করে বেঁকে বলে—
'আমার কথা শোন সবাই
গান শোন আর নাই শোন।

গান যে কাকে বলে সেইটে
বুঝিয়ে দেব—তাই শোন।'
টীকে করেন, ব্যাখ্যা করেন,
জেঁকে উঠে বক্তিমে,
কে দেখে তাঁর হাত-পা নাড়া,
চক্ষু দুটোর রক্তিমে।
চন্দ্রসূর্য জ্বল্‌ছে মিছে
আকাশখানার চালাতে—
তিনি বলেন 'আমিই আছি
জ্বল্‌তে এবং জ্বালাতে।'
কুঞ্জবনের তানপুরোতে
সুর বেঁধেছে বসন্ত,
সেটা শুনে নাড়েন কর্ণ
হয় নাকো তাঁর পছন্দ।
তাঁরি সুরে গাক্ না সবাই
টপ্পা খেয়াল ধুর্‌বোদ্,
গায় না যে কেউ—আসল কথা
নাইক কারো সুরবোধ!
কাগজওয়ালা সারি সারি
নাড়চে কাগজ হাতে নিয়ে—
বাংলা থেকে শান্তি বিদায়
তিনশো কুলোর বাতাস দিয়ে।
কাগজ দিয়ে নৌকা বানায়
বেকার যত ছেলে পিলে।
কর্ণ ধ'রে পার করবেন
দু-এক পয়সা খেয়া দিলে।
সস্তা শুনে ছুটে আসে
যত দীর্ঘকর্ণগুলো—

বঙ্গদেশের চতুর্দিকে
তাই উড়েছে এত ধূলো।
ক্ষুদে ক্ষুদে 'আর্য'গুলো
ঘাসের মত গজিয়ে ওঠে,
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা
কাঁটার মত পায়ে ফোটে।
তাঁরা ভাবেন 'আমিই কল্কি'
গাঁজার কল্কি হবেন বুঝি !
অবতারে ভরে গেল
যত রাজ্যের গলিঘুঁজি।
পাড়ায় এমন কত আছে
কত কব তা'র,
বঙ্গদেশে মেলাই এল
বরা'-অবতার !
দাঁতের জোরে হিন্দুশাস্ত্র
তুল্‌বে তারা পাঁকের থেকে,
দাঁত-কপাটি লাগে, তাদের
দাঁত-খিঁচুনীর ভঙ্গী দেখে।
আগাগোড়াই মিথ্যে কথা
মিথ্যেবাদীর কোলাহল,
জিব্‌ নাচিয়ে বেড়ায় যত
জিহ্বা-ওয়ালা সঙের দল।
বাক্য-বন্যা ফেনিয়ে আসে
ভাসিয়ে নে যায় তোড়ে,
কোন মতে রক্ষে পেলেম
মা গঙ্গারি ক্রোড়ে।
হেথায় কিবা শান্তি-ঢালা
কুলু কুলু তান।

সাগর পানে ব'হে নে যায়
গিরিরাজের গান।
ধীরি ধীরি বাতাসটি দেয়
জলের গায়ে কাঁটা।
আকাশেতে আলো আঁধার
খেলে জোয়ার ভাঁটা।
তীরে তীরে স্তরে স্তরে
পল্লবেরি ঢেউ।
সারাদিবস হেলে দোলে
দেখে না ত কেউ।
পূর্বতীরে তরুশিরে
অরুণ হেসে চায়—
পশ্চিমেতে কুঞ্জমাঝে
সন্ধ্যা নেমে যায়।
দ্বাদশ মন্দিরে দূরে
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,
সন্ধ্যাতারা চেয়ে থাকে
আকাশের মাঝে।
ঝাউ বনের আড়ালেতে
চাঁদ ওঠে ধীরে,
ফোটে সন্ধ্যাদীপগুলি
অন্ধকার তীরে।
এই শান্তি-সলিলেতে
দিয়েছিলেম ডুব,
হট্টগোলটা ভুলেছিলেম
সুখে ছিলেম খুব।
জান ত ভাই আমি হচ্চি
জলচরের জাত,

আপন মনে সাঁৎরে বেড়াই—
ভাসি যে দিনরাত।
রোদ্ পোহাতে ডাঙ্গায় উঠি,
হাওয়াটি খাই চোখ্ বুজে,
ভয়ে ভয়ে কাছে এগোই
তেমন তেমন লোক বুঝে।
গতিক মন্দ দেখ্‌লে আবার
ডুবি অগাধ জলে,
এম্‌নি করে দিন্‌টা কাটাই
লুকোচুরির ছলে।
তুমি কেন ছিপ ফেলেছ
শুক্‌নো ডাঙ্গায় ব'সে ?
বুকের কাছে বিদ্ধ করে
টান মেরেছ ক'সে।
আমি তোমায় জলে টানি
তুমি ডাঙ্গায় টান',
অটল হয়ে বসে আছ
হার ত নাহি মান।
মর্‌ব কত ধড়ফড়িয়ে
তোমারি শেষ জিৎ
খাবি খাচ্চি ডাঙ্গায় প'ড়ে
হয়ে পড়েছি চিৎ।
আর কেন ভাই, ঘরে চল,
ছিপ গুটিয়ে নাও,—
রবীন্দ্রনাথ ধরা পড়েছে
ঢাক পিটিয়ে দাও।"

শেষ অংশের চতুর্থ পংক্তির "অটল হয়ে বসে আছ"—এই কথার প্রতিধ্বনি, রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রে পাওয়া যায়। পত্রখানি "২রা

বৈশাখ" (সাল নাই) তারিখে গাজিপুর হইতে তিনি প্রিয়নাথ বাবুকে লেখেন। পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত হইল—

"ওঁ

গাজিপুর
২ বৈশাখ

ভাই,

নব বর্ষের কোলাকুলি গ্রহণ কর। বর্ষারম্ভে বিদেশের বন্ধুকে স্মরণ কোরো। যদি কোন সুযোগে একবার এদিকে আস্‌তে পার তা হলে দিন কতক সম্মিলনরস সম্ভোগ করা যায়। কিন্তু তোমাকে মথুর সেনের* কুঞ্জপথ থেকে নড়ান কোন্ শক্তির দ্বারা সাধিত হতে পারে তা ত জানিনে। সুদূরস্থ সখ্যশক্তির দ্বারা ত নয়ই—নিতান্ত বাহুবলের দ্বারা হতে পারে। সংসারে বোধ করি যৌগিক অথবা চুম্বকাকর্ষণের অপেক্ষা মাধ্যাকর্ষণ বা কৈশিকাকর্ষণের বল বেশী। কিন্তু তুমি শেষোক্ত দুই আকর্ষণের বাহিরে চমৎকার নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ। অতএব ডাকযোগে কেবল ডাক দিয়ে অপেক্ষা করে রইলুম—দেখি কোন রকম ফল হয় কি না। এখানে বই, বিজনতা এবং বন্ধু আছে—এর মধ্যে কোনটা যদি লোভনীয় জ্ঞান কর ত বিলম্ব করবার আবশ্যক নেই। আমাদের বাসস্থানটি গঙ্গাতীর, বৃহৎ কানন এবং ক্ষুদ্র কুটীর। গাছে পাখী ডাক্‌ছে এবং পাশে Civil Surgeonএর বাড়ি। তোমার অবস্থা কি রকম আমাকে লিখো—হয়ত এমন অলস অবস্থায় আছো যে লেখবার সুবিধা হবে না। তোমার চিঠিপত্র না পেলে আমি এই রকম একটা-কিছু কল্পনা করে নেব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

"কবি ও মধুকর" শীর্ষক কবিতায় প্রিয়নাথ বাবু রবীন্দ্রনাথকে যে প্রীতির অঞ্জলি দান করেন তাহা নিম্নরূপ—

"কবি ও মধুকর

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোদরপ্রতিমেষু

---

* ৮নং মথুর সেনের গার্ডেন লেনে প্রিয়নাথবাবুর গৃহ অবস্থিত।

ভিখারী বৈরাগী সম খঞ্জনী বাজায়ে
স্বভাব-দরিদ্র মক্ষি বন-লক্ষ্মী-দ্বারে,
ঊষার উদয় হ'তে সন্ধ্যার বিদায়ে
ফুলে ফুলে ভিক্ষা মাগি, যে মধু আহরে
প্রসন্ন হলেও তাহে দেবতার মন,—
দেব-অর্ঘ্য সে কি তবু তেমন মধুর,
সৌন্দর্যের মহাপীঠ বাণীর আসন
কবি-হৃদি শতদল যাহে ভরপূর !
মধুর সমস্ত বিশ্ব—কবির হৃদয়-
জাত মধুর মিশ্রণে ; প্রতিভা কবির
নিত্য যাত্রী সেই পথে আনন্দ-অধীর
চির জ্যোস্নায়িত যেথা সৌন্দর্য লক্ষ্মীর
সে সৌন্দর্যে প্রেমাকুল উদার বচনে
মধুময় কর কবি, মানব-জীবনে।"

প্রিয়নাথের গদ্য রচনা

প্রিয়নাথ সেন সুকবি, তাঁহার কাব্য-প্রতিভার পরিচয় পরে প্রদত্ত হইবে। প্রথমে তাঁহার গদ্য রচনার কিছু পরিচয় প্রদত্ত হইল। ইহাতেও তাঁহার প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছে। ১২৯২ সালের "ভারতী" পত্রিকার আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় তাঁহার প্রথম গদ্য রচনা "সুলোচনা" প্রকাশিত হয়। ইহা একটি গল্প। তাহার পর ১৩২২ সাল পর্যন্ত তাঁহার নয়টি গদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিম্নে তাঁহার সেই নয়টি প্রবন্ধের নাম, তাহাদের প্রকাশের সময় এবং কোন্ কোন্ পত্রিকায় সেইগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা প্রদত্ত হইল—

গী দে মোপাসা	সাহিত্য	ভাদ্র	১৩০০ সাল
মানসী	ঐ	পৌষ	ঐ
অলীকবাবু	ঐ	চৈত্র	১৩০৬ „
রাস্কিন	প্রদীপ		১৩০৬-৭ „

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	প্রদীপ		১৩০৬ সাল
চিত্রাঙ্গদা	সাহিত্য		১৩১৬ „
সনেটপঞ্চাশৎ	ঐ		১৩২০ „
কাব্য-কথা	মানসী	ভাদ্র	১৩২২ „
ফলিত জ্যোতিষ	মানসী ও মর্ম্মবাণী	ফাল্গুন	ঐ

সমস্ত প্রবন্ধেই প্রিয়নাথ বাবুর সূক্ষ্ম সমালোচন-শক্তি, চিন্তাশীল-রস-গ্রাহিতা ও সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রকাশিত দশটি রচনা ব্যতীত ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত "স্বপ্নপ্রয়াণ" কাব্যের একটি সমালোচনা বর্তমান। ইহা প্রিয়নাথ বাবুর একটি অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত রচনা। "স্বপ্ন-প্রয়াণের" এই সমালোচনা সম্পর্কে ৺দ্বিজেন্দ্র বাবুর কয়েকখানি মূল্যবান্ পত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল। সকল পত্রই প্রিয়নাথ বাবুকে লেখা।

"ওঁ

জোড়াসাঁকো
২৯শে আষাঢ়

প্রিয় বন্ধু

আমার স্বপ্নপ্রয়াণখানি সমালোচনার অভাবে বেঘোরে পড়ে অকূল পাথারে হাবুডুবু খাইতেছে। এ বিপদে তোমা ভিন্ন তাহার গতি নাই। আমাকে যদি একবার অত্রভবনে চিরাভিলষিত দর্শন দান কর, তবে পরম-সুখী হইব। আশা করি তুমি পূর্ববৎ স্বচ্ছন্দ শরীরে সাহিত্য-কাননে বিরাজ করিতেছ।

তোমার সৌহার্দ্যে বাঁধা
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
alias old বড়দাদা"

"ওঁ

পরম প্রীতিভাজন বন্ধুবর শ্রীপ্রিয়নাথ সেন করকমলেষু

প্রিয়বন্ধু

আমি শনিবার বেলা দ্বিপ্রহরে বোলপুর রওনা হব। তাহার আগে

একবার তোমার দেখা পেলে সমালোচনার সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইব মনে করিয়া সেই আশায় বসিয়া আছি।

তোমার
old Bordada"

"ওঁ

প্রিয়বন্ধু

আমার সাধের স্বপ্নপ্রয়াণটিকে তোমার ক্রোড়ে সঁপিয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত। সমালোচনার কিরূপে গোড়া ফাঁদিয়াছ—আমার বড্ড দেখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। ধীরে সুস্থে যেমন চল্‌চে—চলুক; তুমি যখন আমার মানস পুত্রটিকে সভারঞ্জন বেশে সাজাইয়া গুজাইয়া আসরে নাবাইবে—তখন দর্শকমণ্ডলীর আনন্দ করতালি আমার শ্রবণে সুধাবর্ষণ করিবে—এই আশায় আমি কৌতূহলের বেগ সম্বরণ করিয়া দিন গুণিতেছি—green-room-এ উঁকি দিয়া তোমাকে অপ্রস্তুত করিব না।

প্রিয়বন্ধু তোমার চিরানুরক্ত
প্রিয়নাথ সেন চাতক-দ্বিজ
অভিন্নহৃদয়েষু

"ওঁ

প্রিয়বন্ধু

তুমি স্বপ্নপ্রয়াণের সমালোচনা-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ ইহা আমার পরম সৌভাগ্য এবং আনন্দের বিষয়। বঙ্গের সাহিত্য-মধুপেরা droneএর জাতি—তাহারা রসও বোঝে না আর ভাল জিনিষের মর্যাদাও বোঝে না। তোমার এবং আমার সাধের স্বপ্নপ্রয়াণটি তাই এ দীর্ঘকাল ধরিয়া বাজে দপ্তরের (waste basket) আবর্জনারাশির মধ্যে মরণাপন্নভাবে পড়িয়া রহিয়াছে—কেহ তাহাকে পোছে না। কোনো কবি গর্ভবাসকালে বিধাতা-পুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল—

'ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর—তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥'

ইহার একটা অনুবাদ—

শত তাপ বিতর সহিব তাহা হে চতুরানন।
লিখোনা লিখোনা শিরে অরসিকে রসনিবেদন।

ব্রহ্মার আশ্বাসবাণী

হইবে তোমার বন্ধু সুরসিক প্রিয়।
কবিত্ব রসের ডালি তারে সঁপি দিও॥"

প্রিয়নাথ বাবু স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্যের যা অসম্পূর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত ইহল—

'স্বপ্ন-প্রয়াণ'

"স্বপ্ন-প্রয়াণ নূতন কাব্য নয়—নিত্য নূতন, যাহা কখনও পুরাতন হয় না। 'A thing of beauty is a joy for ever!' ইহার ১ম সর্গ ১২৮০ সালে ২য় বৎসরের বঙ্গদর্শনে রচয়িতার নাম বিনা বাহির হয়। কাব্যামোদী পাঠকমাত্রই, বোধ হয়, অভিনব কাব্যের অপূর্ব সৌন্দর্য এবং সর্বাঙ্গীন মৌলিকতা দেখিয়া নূতন কবির পরিচয় পাইবার জন্য আমার মত উৎসুক হইয়াছিল। পরে ১৭৯৭ শকে—অর্থাৎ আজ ৪০ বৎসর হইল সম্পূর্ণ কাব্য পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এইখানে পাঠকের বিরক্তিকর এবং ধৈর্যচ্যুতির কারণ হইলেও, সমালোচনার মুখবন্ধস্বরূপ ঐ নব-প্রকাশিত কাব্য সম্বন্ধে আমার নিজের একটি স্মৃতির উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যখনই স্বপ্ন-প্রয়াণের কথা উঠে, তখন অবিচ্ছেদ্যবন্ধনে সেই স্মৃতি জাগ্রত হয়! প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পরেই আমার বিশেষ সৌভাগ্য-বলে একখানি পুস্তক নিতান্ত অসম্ভাবিত স্থানে আমার বিস্মিত লোলুপ নয়নকে আকৃষ্ট করে। মানস-সরোবরের তীরে নয়—বটতলার একটি সঙ্কীর্ণগৃহ দোকানে। অসম্ভাবিত কেনই বা বলি?' সে দিনকার সময়ে

কলিকাতার সারস্বত মন্দির বটতলায়ই ছিল। বাংলা সাহিত্যের অক্ষয়-কীর্তি গোত্রপতিগণের সাক্ষাৎ তখন এই বটবৃক্ষের ছায়াতলেই লাভ করা যাইত! গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়—সুলভ মূল্যে পুরাণাদি শাস্ত্রের বহুল প্রচারের জন্য পরলোকগত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে ভক্তি-প্রণোদিতচিত্তে এই যুগের বেদব্যাসের আসনে বসাইয়াছেন। বটতলার একজন খ্যাতনামা প্রধান পুস্তক-প্রকাশক এবং বিক্রেতা ৺নৃত্যলাল শীল বঙ্গসাহিত্যে বেদব্যাসানুরূপ যশের পাত্র না হউক, তাঁহার কিঞ্চিৎ নিম্নের আসন পাইতে পারেন। তাঁহার কল্যাণে আমরা কাশীরাম দাস—কীর্তিবাস—মুকুন্দরাম—ভারতচন্দ্র—বৈষ্ণব কবিগণ প্রভৃতির পুস্তক সকল সেকালে দেখিতে পাইতাম। সেই সকল বঙ্গীয় সাহিত্য-গুরুদের অমূল্য-গ্রন্থসমূহ, দেশী বিবর্ণকাগজে ভাঙ্গা অক্ষরে—অনির্দেশ্য চিত্রসম্পদে রঞ্জিত তৎকর্তৃক সংস্করণে—(স্পষ্টবাদী দুষ্টলোকে বলিবেন, ভ্রমসঙ্কুল সংস্করণে)—রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। বটতলা বঙ্গসাহিত্যের পীঠস্থান এবং পরলোকগত নৃত্যলাল শীল মহোদয় সেখানকার মন্দিরের একজন প্রধান পূজারী। উভয়েই বঙ্গীয় পাঠকের নমস্য। সে যাহা হউক, পুস্তকখানির সন্ধান পাইয়া তন্মুহূর্তে তাহা আত্মসাৎ করি এবং বাড়ী ফিরিয়াই অতিশয় উৎসাহের সহিত পড়িতে বসি! এতদিন পরেও সেদিনকার সে উৎসাহ—সে আনন্দ তদানীন্তন গভীর রেখায় এবং উজ্জ্বল বর্ণে আজিও চিত্রের ন্যায় স্মৃতিপটে অঙ্কিত! মনে পড়ে, মানসিক উপভোগে এত মগ্ন ও মত্ত হইয়াছিলাম যে, স্নানাহারের সময় অতীত হইলেও—দ্বিপ্রহরের পরেও—এক স্রোতে পুস্তকের অর্ধাংশ না পড়িয়া ছাড়িতে পারি নাই—বা পুস্তক আমাকে ছাড়ে নাই! আহারের সময় উপস্থিত হইলে দময়ন্তী তাঁহার বার্তা নলরাজের নিকট উত্থাপিত করিতে হংসদূতকে নিষেধ করিয়াছিলেন—জঠরাগ্নির নিকট প্রেমের আগুনকেও খাট হইতে হয়—কিন্তু কাব্যামোদীর "পিত্তেন দূনে" এ আশঙ্কা নাই।

আজ ৪০ বৎসর পরে স্বপ্ন-প্রয়াণের নবম সংস্করণ বাহির হইয়াছে। আমিও এই শুভ সুযোগে কাব্যের সমালোচনা করিবার চিরপোষিত আশা এবং ইচ্ছা সম্পাদন করিব। তাহাতে কতদূর কৃতকার্য হইব বলিতে পারি

না। তবে যদি একাধিকবার পাঠ এবং তজ্জনিত আনন্দ উপভোগে কোন পাঠককে কাব্যের মর্ম এবং গুণগ্রহণে সক্ষম করে, তবে সে দাবী আমি করিতে পারি—এবং জানি না কাব্যপাঠজনিত আনন্দ ও সে আনন্দে অপরকে আনন্দিত করিবার ইচ্ছা অপেক্ষা কাব্য-সমালোচনার আর কোন বলবত্তর প্রণোদনা আছে কিনা।

স্বপ্ন-প্রয়াণ একখানি রূপক। ইহার সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় লিখিত জগতের দুইখানি উৎকৃষ্ট বা সর্বোৎকৃষ্ট রূপকের সৌসাদৃশ্য আছে। একখানি কবি Spenser কর্তৃক পদ্যে লিখিত Faerie Queene--দ্বিতীয়খানি Bunyan কর্তৃক গদ্যে লিখিত জগৎ-বিখ্যাত Pilgrim's Progress। তিনখানিই সম-শ্রেণীর—এবং সাহিত্য হিসাবে তাহাদের মূল্য এক না হইলেও পরস্পরের নিকটবর্তী। তাহাদের অন্তর্গত ভাব একই। আধ্যাত্মিক বাঞ্ছিত লাভের জন্য তিনখানি কাব্যেরই নায়কের চেষ্টা এবং উদ্যম। তাহার দরুণ তাহাদের যে মানসিক সংগ্রাম তাহা স্থূল সংগ্রাম রূপে বর্ণিত এবং তাহাই কাব্যের আখ্যান-বস্তু। হৃদয়ের প্রবৃত্তি সকলও, গল্পের পাত্রপাত্রীরূপে ব্যক্তিগতভাবে রঙ্গমঞ্চে আনীত। কুপ্রবৃত্তি বা প্রতিকূল প্রভাবসকল শত্রুরূপে এবং সুপ্রবৃত্তি বা অনুকূল প্রভাব ও অবস্থাসকল মিত্ররূপে বর্ণিত! বলা আবশ্যক যে তিনখানি রূপকের মধ্যে Faerie Queene অসম্পূর্ণ—ইহা ১২ পর্বে সম্পূর্ণ করিবার কল্পনায় হইয়াছিল এবং কাহারও কাহারও মতে ১২ পর্বই রচিতও হইয়াছিল—শেষ ছয় পর্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক পর্বে এক একটি নৈতিক গুণ—(যেমন Holiness=পবিত্রতা, Temperance=মিতাচার, Friendship=মৈত্রী প্রভৃতি) যোদ্ধারূপে চিত্রিত এবং তাহাদের কার্যকলাপে তাহাদের নামানুরূপ ধর্ম পরিস্ফুট! ১ম পর্ব আপনাতেই সম্পূর্ণ—গল্প উপভোগের জন্য কাব্যের অপরাপর অংশ পাঠের আবশ্যক নাই। সুতরাং ১ম পর্বকে একটি সম্পূর্ণ রূপক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়—ইহার নায়ক Knight of the red cross—পবিত্রতার এবং বিশুদ্ধতার উপাসক—নায়িকা Una (সত্য) কে বিপন্মুক্ত করিয়া স্ত্রীরূপে লাভ করিবার জন্য অভিলাষী এবং তাহাতে (Duessa) মিথ্যা, (Archimago) কাপট্য

প্রভৃতির চক্রান্তে নানা বিপদ্ আপদে পড়িয়া ভ্রান্তির অরণ্যে (wood of errors) পথ হারাইয়া নিরাশার গহ্বরে (cave of despair) পতিত হইয়া পরে অভিলষিত লাভ করেন।

Bunyan এর রূপকের (Pilgrim's Progress) নায়কও Christian মুক্তিলাভের জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কাপট্য, মিথ্যা এবং নিরাশা প্রভৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বিশ্বাস (Faithful), আশ্বাস (Hopeful), জ্ঞান (Knowledge), সতর্কতা (Watchful) প্রভৃতির সাহায্যে পথের নানা বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া দিব্যধামে (Celestial City) প্রবেশ করে। পাঠক দেখিবেন, তাহার পূর্ববর্তী রূপক Faerie Queeneএর ভাবের সঙ্গে যেমন Pilgrim's Progress এর আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য আছে—সেইরূপ, অন্য দিকে নায়কের অভিযান এবং তৎসংক্রান্ত ঘটনাসকল স্বপ্নাবেশে ঘটিয়াছিল বলিয়া কল্পিত হওয়ার দরুণ, তাহার পরবর্তী রূপক আমাদের সমালোচ্য স্বপ্নপ্রয়াণের সহিত, তাহার বাহ্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ দ্বিজেন্দ্রবাবু এই দুই রূপক হইতে, জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক,—ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছেন। করুন বা না করুন—তাঁহার কাব্য আগাগোড়া এমন অসাধারণ মৌলিক ভাবসংগঠিত এবং সৌন্দর্যসম্পদে মণ্ডিত যে, ঐ সামান্য বাহ্য সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্যই নয়।

Spenser এর Faerie Queene এবং Bunyan এর Pilgrim's Progress এর নায়কের ন্যায় স্বপ্ন-প্রয়াণেরও নায়ক (একজন কবি বা কবি-প্রকৃতি লোক) তাহার নায়িকা কল্পনাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টিত। Faerie Queene এ যেমন Duessa নায়িকা Unaকে নায়কের হাত হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছিল, স্বপ্ন-প্রয়াণে তেমনই লালসাও ফাঁদ পাতিয়াছিল এবং নায়ক অশেষবিধ বিঘ্ন-বিপদে পড়িয়া সর্বশেষে দীক্ষা, বীররস, সখ্যরস প্রভৃতির সাহায্যে 'কল্পনা'কে আয়ত্ত করিয়া শান্তি-নিকেতনে তাহার সহিত মিলিত হইয়া এক জীবন হইয়াছিল—ইহাই স্বপ্ন-প্রয়াণের রূপকের সহজ আখ্যানবস্তু।

আমার মতে এবং যতদূর জানি, সাধারণ পাঠকের মধ্যে—স্বপ্ন-প্রয়াণ রূপক, গ্রন্থকারও ১ম সংস্করণে উহাকে রূপক বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছিলেন

—পরবর্তী সংস্করণে তাহা করেন নাই। তাহাতে কিন্তু ইহার রূপকত্ব ঘুচিবে না। তবে যখন রূপকের পাত্র-পাত্রী অশরীরী মনোভাব এবং হৃদয়বৃত্তি হইলেও তাহাদের ভিতর গল্পের সাধারণ পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত ভাব ও প্রকৃতি বেশ পরিস্ফুট—অর্থাৎ যখন সেই-সকল সূক্ষ্ম ভাব ও হৃদয়বৃত্তি প্রকৃত মানুষের ন্যায় কার্য করে—তখন তাহার রূপকত্ব চলিয়া যায়। যেমন স্বপ্ন-প্রয়াণে সখ্যরস বাস্তবজীবনের একজন প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় কথা-বার্তা কহিয়াছে এবং কার্য ও ব্যবহার করিয়াছে। সুতরাং তাহাকে সখ্যরস নামে আখ্যাত না করিয়া.........বলিতে পার—এবং লালসা না বলিয়া দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র কাঞ্চন নামে ডাকিতে পার।

রূপক হিসাবে Pilgrim's Progress এবং স্বপ্ন-প্রয়াণ Faerie Queene অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রথমোক্ত দুইখানি রূপকের আখ্যান-বস্তু সহজ এবং সুনির্দিষ্ট, গল্পটি বেশ যথাযথ বলা হইয়াছে। 'তারপর কি হইল?' জানিতে পাঠকের ঔৎসুক্য জন্মায়—কিন্তু Faerie Queene এর রূপক সর্বথা সহজ ও পরিষ্কার নয়। তাহা একাধিক সূত্রে গ্রথিত ও জটিল এবং তাহার ভিতর একাধিক উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। কখনও নৈতিক—আবার কখনও ধর্মসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে জড়িত। কবির সমসাময়িকদিগের প্রতি কোথাও বা স্পষ্ট লক্ষ্য—কোথাও বা অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। তাহাও সব সময়ে পূর্বাপর এক ব্যক্তিরই প্রতি নয়। যদিও Gloriana আর কেহ নয়—সম্রাজ্ঞী Elizabeth—কিন্তু King Arthur কখনও Earl of Leicester, কখনও Sir Phillip Sydney, কখনও বা অপর কেহ।

গল্পের হিসাবে তিনখানি রূপকের মধ্যে লোকরঞ্জনে Pilgrim's Progress এর প্রাধান্য—এবং গদ্যে লিখিত বলিয়া আবালবৃদ্ধ সকলেরই সুখপাঠ্য এবং উপভোগ্য। যদিও পদ্যে লিখিত নয়, Bunyan গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ কবিদিগের কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন এবং Lord Macaulayর উচ্চ প্রশংসা সর্বতোভাবে যোগ্য।

আর এক হিসাবেও Pilgrim's Progressএর অপর দুইখানি রূপকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব। Pilgrim's Progressএ মানব-জীবনের সমস্ত পরিসর

ব্যাপিয়া আছে। অসম্পূর্ণ Faerie Queeneএর বাকী অংশ রচিত হইলে বা থাকিলে তাহাতে জীবনের আরও বিস্তৃত চিত্র দেখা যাইত ; কিন্তু যে পদ্ধতিতে Faerie Queene রচিত তাহাতে একখানি সমগ্র পটে বা একদৃষ্টিতে জীবনের বিশাল ক্ষেত্র দর্শিত হইত না—পৃথক পৃথক আখ্যানের দ্বারা—ভিন্ন ভিন্ন চিত্রে তাহা খণ্ডশঃ প্রকাশ পাইয়া সমগ্রের বিশালতায় পাঠককে অভিভূত করিত না। যেমন নানা উপাখ্যানে গ্রথিত Victor Hugoর La légende des sièclesএ আমরা রামায়ণ বা Iliadএর, Divina Comedia বা Paradise Lostএর অখণ্ড বিশালতা অনুভব করি না। স্বপ্ন-প্রয়াণের পরিসর Pilgrim's Progress হইতে সঙ্কীর্ণ—ইহাতে কেবল কলা-বিত্থার ক্ষেত্রই মুখ্যতররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কবি বা কাব্যরসগ্রাহী ব্যক্তিকে ইহা যেমন স্পর্শ করিবে, অপরকে তেমন করিবে না—কিন্তু পরমার্থের সঙ্গে সৌন্দর্যকে গ্রথিত করিয়া হিন্দু কবি কাব্যকে অশেষ এবং অসীমের দিকে প্রসারিত করিয়াছেন। কল্পনাকে জীবন-সঙ্গিনী-রূপে লাভ করিতে নায়ক-কবির হৃদয় নির্মল এবং পবিত্র করিতে হইয়াছে এবং প্রতিকূল প্রবৃত্তি ও অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। তাহার বর্ণনায় শ্রেয়ঃ পথের যে সকল অনিবার্য বিঘ্ন ও বাধা, তাহা আনুপূর্বিক যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। পথের একটিও দিক্ ছাড়া হয় নাই—যেমন করিয়া পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—কোথাও 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'—কোথায় দুরারোহ পর্বত—কোথায় অতল গহ্বর—কোথাও জীবনশূন্য আতপদগ্ধ বালুময় মরু—কোথায় শান্তিরসে সিঞ্চিত ছায়া-বহুল কান্তার—সকলই মানচিত্রের ন্যায় কাব্যে সুস্পষ্ট দর্শিত হইয়াছে। এক কথায় কবি সুনিপুণ চারণ বৈজ্ঞানিকের মত মানব-হৃদয়কে বিশ্লেষণ করিয়া মানব-জীবনের ক্ষেত্রের জটিলতা এবং উচ্চতার গভীরতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে কলাচর্চার নিজক্ষেত্র অনেকদূর অতিক্রম করা বা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর এক অসাধারণ গুণ—ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা বা শ্রেণীগত সঙ্কীর্ণতা নাই। বাস্তব জীবনের উপর—উদার অ-সীমাবদ্ধ সত্যের উপর কাব্যের ভিত্তি স্থাপিত। জীবনে যেমন ঘটে তাহাই ঠিক বর্ণিত হইয়াছে—এবং সকলের উপর উজ্জ্বল কল্পনার

উন্মাদিনী জ্যোৎস্না বর্ষিত। সেই কল্পনা তুলনারহিত ভাষায় অপ্সরা-চরণের নূপুর-নিক্কণবৎ শ্রুতিমধুর ছন্দে এবং ইন্দ্রধনুর ন্যায় বহুবিধবর্ণে বিচিত্র শব্দ যোজনায় প্রকাশ পাইয়াছে। বাস্তবিক কল্পনার ঔজ্জ্বল্য এবং ছটায়—শব্দ ও ছন্দের মধুর ঝঙ্কারে স্বপ্ন-প্রয়াণ—বাংলা সাহিতে একা—ইহার দ্বিতীয় নাই। বাংলা সাহিত্যে শুধু কেন, ভাষা ও ছন্দ সম্পদে, জগতের সাহিত্যে ইহার আসন—সিংহাসন! অনেকে ইহাকে বাড়াবাড়ি মনে করিতে পারেন—কিন্তু যে কেহ কাব্যখানি পাঠ করিয়াছেন তিনিই আমার মন্তব্যকে কবির যথাপ্রাপ্য প্রশংসা বিবেচনা করিবেন। মুক্তকণ্ঠে এই যথাপ্রাপ্য প্রশংসা না করিলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়।

সমালোচনার মুখবন্ধে আমরা অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি—এখন পাঠককে সঙ্গে লইয়া কাব্যের প্রতি সর্গে বিচরণ করিব—এবং যতদূর পারি অসংখ্য সৌন্দর্যের মধ্যে কতক চয়ন করিয়া আমার উপরোক্ত উচ্চ প্রশংসার প্রমাণস্বরূপ দলিল দাখিল করিব।

কাব্যের ১ম সর্গে নায়কের মনোরাজ্যে অভিযান। ইহা আগাগোড়া কল্পনায়—কথায়—ছন্দে পাঠককে অভিভূত করে—ইহার ছন্দ কবির (নিজের) মৌলিক সৃষ্টি—এ বিষয়েও Spenserএর Faerie Queeneএর সঙ্গে ইহার সমান সৌভাগ্য—Spenserian Stanza, Spenser দ্বারাই গঠিত—কিন্তু তাহার অনেকটা উপাদান Spenser ইতালীয় কবি Ariosto এবং Tasso হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার পরবর্তী অনেক কবি, যেমন Thompson, Byron, Shelley প্রভৃতি, ঐ ছন্দে লিখিয়াছেন। কিন্তু স্বপ্ন-প্রয়াণের ছন্দ পূর্বেকার কোন কবি গড়ে নাই এবং পরবর্তী কোন কবিই এই ছন্দে লিখিতে বা ইহার অনুসরণ করিতে সাহস করে নাই। এমন কি বাংলায় যিনি অসংখ্য বিভিন্ন নব নব সুন্দর ছন্দ রচনা করিয়াছেন—যিনি অসাধারণ নিপুণতার সহিত বাংলা শব্দে নূতন নূতন স্বর যোজনায় ছন্দে নূতন নূতন ধ্বনি এবং ঝঙ্কার আবিষ্কার করিয়াছেন সেই রবীন্দ্রনাথও করেন নাই। কিন্তু ছন্দ নূতন হইলেও উৎকট কিছুই কাণে ঠেকে না—স্রোতঃপুষ্ট প্রফুল্ল প্রবাহিণীর ন্যায় মধুর কল্লোলে প্রবাহিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে 'স্বপ্ন 'রমণী' বর্ণিত কিন্তু

তৎপূর্বে ১ম দুই পংক্তিতে কবিতার সৌন্দর্য উচ্ছ্বসিত হইয়া চিত্তকে আপ্লুত করে।

'সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ
সাগর সীমায় যথা অস্ত যায় জ্বলন্ত তপন'!

সৌন্দর্যে ইহা উপমা-প্রয়োগের রাজচক্রবর্তী কালিদাসের উপমার তুল্য। পর পর দুই শ্লোকে সুপ্তির আনুষঙ্গিক (উপাদান) সকল এমন সুন্দর সরঞ্জামে সাজান হইয়াছে যে পাঠকালে ঘুমের আবেশ আসিয়া পড়ে। Rossettiর—

'Master of the murmuring Court
When the shapes of sleep convene.'

চক্ষের সম্মুখে উদয় হয়।

তৎপরে কল্পনা-চালিত মনোরথ উপস্থিত এবং স্বপনের আদেশে কবি তাহাতে আরোহণ করিলেন। Shelley রচিত Queen Mab নামক কাব্যে এমন একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।"

এই স্থানে অসম্পূর্ণ সমালোচনা শেষ হইয়াছে।

'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি'

১৩৪০ সালে "প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি" নাম দিয়া প্রিয়নাথের গদ্য রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। ইহাতে কবির নিম্নলিখিত রচনাসমূহ স্থান পাইয়াছে ঃ—

১। কাব্যকথা (কাব্য ও কাব্যের আদর্শ লইয়া আলোচনা)

২। মানসী (রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের আলোচনা)

৩। চিত্রাঙ্গদা (রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের রস-বিশ্লেষণ)

৪। সনেট-পঞ্চাশৎ (কবি প্রমথনাথ চৌধুরীর 'সনেট-পঞ্চাশৎ' গ্রন্থের সমালোচনা)

৫। অলীক বাবু (৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাস্যরসাত্মক প্রহসনের সমালোচনা)

৬। রস্কিন্ (জন্ রস্কিনের ললিত কলা ও রচনাশিল্পের পরিচয়)

৭। গী দে মোপাসাঁ (ফরাসী সাহিত্যের ছোট গল্পরচনার প্রতিভাশালী শিল্পী গী দে মোপাসাঁর প্রতিভা-পরিচয়)

৮। স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুলেখক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা-পরিচয়)

৯। ফলিত জ্যোতিষ (ফলিত জ্যোতিষের কথা ও রবীন্দ্রনাথের জন্মকালীন রাশিচক্রের বিচার)

১০। সুলোচনা (ছোট গল্প, ১২৯২ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত)

১১। স্বপ্ন-প্রয়াণ (৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্যের সমালোচনা)

প্রিয়নাথের কবি-বন্ধু রবীন্দ্রনাথ এই 'পুষ্পাঞ্জলি'র একটি 'মুখবন্ধ' লিখিয়া দিয়া বন্ধুর স্মৃতি-তর্পণ করিয়াছেন। এই মুখবন্ধে তিনি তাঁহার স্মৃতি-ভাণ্ডারের অনেক কথাই অপকটে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"বাংলা সাহিত্যে যখন আমি তরুণ লেখক, আমার লেখনী নূতন নূতন কাব্যরূপের সন্ধানে আপন পথ রচনায় প্রবৃত্ত, তখন তীব্র এবং নিরন্তর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাকে চল্‌তে হয়েছে। সেই সময়ে প্রিয়নাথ সেন অকৃত্রিম অনুরাগের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক অধ্যবসায়কে নিত্যই অভিনন্দিত করেছেন। তিনি বয়সে এবং সাহিত্যের অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ ছিলেন। নানা ভাষায় ছিল তাঁর অধিকার, নানা দেশের নানা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবারিত আতিথ্যে তাঁর সাহিত্য-রসসম্ভোগ প্রতিদিনই প্রচুরভাবে পরিতৃপ্ত হোতো। সেদিন আমার লেখা তাঁর নিত্য আলোচনার বিষয় ছিল। তাঁর সেই ঔৎসুক্য, আমার কাছে যে কত মূল্যবান ছিল সে কথা বলা বাহুল্য।

"তারপর অনেকদিন গেল কেটে, বাংলা সাহিত্যের অনেক পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটল,—পাঠকদের মানসিক আবহাওয়ারও অনেক বদল হয়েছে। বোধ করি, আমার রচনাও সেদিনকার ঘাট পেরিয়ে আজ এসেছে অনেক দূরে। প্রিয়নাথ সেনের এই প্রবন্ধগুলিকে সেই দূরের থেকে আজ দেখচি। সেদিনকার অপেক্ষাকৃত নির্জন সাহিত্যসমাজে শুধু আমার নয়, সমস্ত দেশের কিশোর-বয়স্ক মনের বিকাশস্মৃতি এই বইয়ের মধ্যে উপলব্ধি করছি।······

"......বহুকালের বহু দেশের জ্ঞান ও ভাবের ভাণ্ডারে প্রিয়নাথ সেনের চিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, তবু তিনি যেকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, এখনকার পাঠকদের কাছে সে দূরবর্তী। সেই কালকে বঙ্কিমের যুগ বলা যেতে পারে। সেই বঙ্কিমের যুগ এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগারম্ভকালীন বৈদগ্ধ্যের আদর্শ এই বই থেকে পাওয়া যাবে এই আমার বিশ্বাস।"

'কাব্য-কথা'

কবি প্রিয়নাথ তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ 'কাব্য-কথা'য় কাব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও রসবিবৃতি লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা; কিন্তু নীতি নির্বাচনের দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। ... ...

... ...

"এই সৌন্দর্য লইয়াই কবির ধ্যান, ধারণা—কবির জীবন। কোনকালে কোন কবি তৎকর্তৃক উদ্ভাবিত সৌন্দর্যে চির-পরিতৃপ্ত নয়। যাহা এখন চরম সৌন্দর্যরূপে প্রতিভাত, পরক্ষণেই অভিনব সৌন্দর্যের মদির স্বপ্নে কবির হৃদয় চঞ্চল,—অনিবার্য ঔৎসুক্যে দোদুল্যমান,—'পাইলেও নাহি পাই মেটেনা পিয়াস।' সৌন্দর্যের দিগ্‌বলয়ের পরিধি নাই—সীমা নাই,—তাহার অনন্ত বিকাশ কাহারও দ্বারা কখনও সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় না।"

প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি—পৃঃ ১৩-১৪

সৌন্দর্যের রস-বিশ্লেষণে ও সৌন্দর্যের রহস্য-বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিতেছেন—"সৌন্দর্যকে সংজ্ঞার (definition) মধ্যে আনা অসম্ভব—যদিও ইহাকে অনুভব করিতে সময় লাগে না। পার্থিব হইয়াও ইহা অপার্থিব। মানুষের চির আনন্দের সামগ্রী হইলেও ইহা দ্বারা মানুষের কোন অভাবই পূরণ হয় না—জীবনের কোন কাজেই লাগে না। হিত-

বাদীদের (utilitarians) গাত্রে কালী ছিটাইবার জন্য লিখিত হইলেও, Theophile Gautier সৌন্দর্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনুধাবন-যোগ্য এবং আমার বিবেচনায় অভ্রান্ত সত্যের বনিয়াদের উপর সংস্থাপিত। যাহা প্রকৃত সুন্দর, তাহার দ্বারা কোন প্রয়োজনই সাধিত হয় না—যাহা কিছু মানুষের ব্যবহারে আসে, তাহাই অসুন্দর—কুৎসিত, কারণ উহা কোন না কোন অভাবের পরিচায়ক এবং মানুষের সকল অভাবই নীচ এবং তাহা দীন দুর্বল প্রকৃতির ন্যায় হেয়।...

"তথাপি আমরা কিছুতেই তত মুগ্ধ নহি—কিছুতেই আমরা তত তীব্র ও অসীম আনন্দ উপভোগ করি না, যেমন সৌন্দর্য। ইহার মধ্যে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর একটি রহস্য আছে বলিয়া বোধ হয়।"

প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি—পৃঃ ১৫

'মানসী'-কাব্যের সমালোচনা

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "মানসী" কাব্যের সমালোচনার গোড়ায় কবি প্রিয়নাথ কয়েকটি সুন্দর ও খাঁটি কথা বলিয়াছেন। সে কথাগুলি সৌন্দর্য-রসে নিমজ্জমান তাঁহার ন্যায় একজন সহৃদয় কবির মুখেই শোভা পায়—"সৌন্দর্য উপভোগে আমরা যে আনন্দ লাভ করি, তাহা একদিকে যেমন বিশুদ্ধ, অপর দিকে তেমনি প্রখর। প্রখরতা-নিবন্ধন সে আনন্দ আমরা নিজের ভিতর বদ্ধ রাখিতে না পারিয়া জগৎ-সংসারকে তাহার ভাগ লইতে আহ্বান করি; এবং বিশুদ্ধ বলিয়া পরের সহিত উপভোগে সে আনন্দ কমিয়া না গিয়া বাড়িতেই থাকে। * * *

"সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া সকলে মিলিয়া আনন্দ ভাগ করিয়া লইলে আনন্দ যে বাড়ে বই কমে না, তাহা আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি। সৌন্দর্য-উপভোগ-প্রবৃত্তির মূলে যে পরার্থপরতা আছে, ইহা তাহার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং তাহা হইলেই আমরা বলিতে পারি যে, এই বৃত্তি মঙ্গলময়ী এবং ইহার পরিচালনা শুভোদ্দিষ্টা।" উক্ত পুস্তক পৃঃ ১৮

মানুষের সৌন্দর্য-স্পৃহা যে সমস্ত উপায়ে চরিতার্থ হয়, সে সমস্তের বিশ্লেষণ করিয়া কবি বলিতেছেন— * * * "কাব্যে যেমন বাহ্য ও

অন্তর্জগতের সৌন্দর্য স্থায়ী এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশপ্রাপ্ত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না।" (ঐ পৃঃ ১৮-১৯) কবির একথা ধ্রুব সত্য। তারপর শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য-সমালোচনায় কবি-সমালোচক প্রিয়নাথ যে ভূয়োজ্ঞান ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা "মানসী" ও "চিত্রাঙ্গদা" পুস্তক দুইখানির সমালোচনা পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে।

সনেট সম্বন্ধে অভিমত

কবি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের "সনেট-পঞ্চাশৎ" নামক কবিতা-গ্রন্থের সমালোচনা-ব্যপদেশে প্রিয়নাথবাবু 'সনেটে'র একটি মনোজ্ঞ বিবৃতি দিয়াছেন। তাঁহার মতে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি Rossetti সনেট রচনায় সিদ্ধহস্ত এবং এই বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। সনেট রচনার আদর্শ স্বরূপ তিনি সনেট সম্বন্ধে রসেটির 'সনেট' নামক কবিতার নিম্নলিখিত তিনটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, এই সুন্দর কবিতাটি একাধারে সনেটের বিজ্ঞান ও আদর্শ :—

"A sonnet is a moment's monument
Memorial from the soul's eternity
To one deathless hour." ঐ পৃঃ ১০১

তাঁহার বিবৃতিতে প্রিয়নাথ বলিতেছেন :—"যখন কোনও মুহূর্তে প্রবল ভাবের আবেশে সমাচ্ছন্ন কবি-হৃদয় সৌন্দর্যের দৈব আবির্ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে, সনেট ভাষায় ও ছন্দে সেই দুর্লভ মুহূর্তের চিত্র।...

"ভাব ও রসের একাগ্রতা ও সমগ্রতাই সনেটের জীবন। তৎপক্ষে ভাষা ও ছন্দের যুগপৎ সংযম ও স্ফূর্তি আবশ্যক।" ঐ পৃঃ ১০১

'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের সমালোচনা

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" নাট্য-কাব্য লইয়া প্রায় আটাশ বৎসর পূর্বে সাহিত্য-ক্ষেত্রে আলোচনা হয়। পরলোকগত পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত "সাহিত্য" পত্রিকায় (১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ) কবিবর দ্বিজেন্দ্র লাল রায় মহাশয়ের "কাব্যে নীতি" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যের সমালোচনা করেন। এই সমালোচনায় তিনি বলেন—"রবীন্দ্রবাবু অর্জুনকে কিরূপ জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেখুন। একজন যে কোনও ভদ্র সন্তান এরূপ করিলে তাহাকে আমরা একাসনে বসিতে দিতে চাহিতাম না। * * * 'অশ্লীলতা' ঘৃণার্হ বটে কিন্তু 'অধর্ম' ভয়ানক। ঘরে ঘরে 'বিদ্যা'* হইলে সংসার আঁস্তাকুড় হয়! কিন্তু ঘরে ঘরে এই চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়। সুরুচি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সুনীতি অপরিহার্য। আর রবীন্দ্রবাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তেমন বঙ্গদেশে আর কোনও কবি অদ্যাবধি পারেন নাই। সেই জন্য এ কুনীতি আরও ভয়ানক।" (সাহিত্য—পৃঃ ১১৬ ও ১১৭)

এই সমালোচনা প্রকাশের পর অন্যান্য পত্রিকায়ও এই সম্বন্ধে দু'একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। অধিকাংশই দ্বিজেন্দ্রলালের উক্তির প্রতিধ্বনি। দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনা-প্রকাশের চারি মাস পরে (১৩১৬ কার্তিক মাসের 'সাহিত্যে') প্রিয়নাথ সেন মহাশয় "চিত্রাঙ্গদা" নামক একটি সুদীর্ঘ (৩২ পৃষ্ঠা ব্যাপী) প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের উক্তির উত্তর দেন এবং আলোচ্য কাব্যের সৌন্দর্য ও বিশেষত্ব উদ্ঘাটন করেন। 'সাহিত্যে' এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর 'চিত্রাঙ্গদা'-সম্পর্কিত আলোচনা ও আন্দোলন স্থগিত হইয়া যায়।

প্রিয়নাথবাবু প্রবন্ধটিতে যুক্তি, বিচারশক্তি ও রসবিশ্লেষণের সম্যক পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইল।

প্রবন্ধের ভূমিকায় তিনি সুপ্রতিষ্ঠ ইংরেজ সাহিত্যসেবী ও প্রথম শ্রেণীর সমালোচক জর্জ সেন্টস্‌বেরীর "Revised Impressions" (পুনরালোচিত বা সংশোধিত ধারণা) নামক গ্রন্থের পোষকতায় বলিতেছেন—"সাহিত্য-সেবী মাত্রই জানেন, কোন কোন গ্রন্থ প্রথম পাঠ কালেই একেবারে চিত্তকে জয় করিয়া ফেলে, কিন্তু পরে তাহাদের প্রভাব ক্রমশই মন্দীভূত হইয়া আসে। আবার কোন কোন গ্রন্থ প্রথম পরিচয়ে রসহীন বলিয়া বোধ

* 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের 'বিদ্যা'-চরিত্র।

হইলেও উত্তরোত্তর পাঠে তাহাদের সৌন্দর্য অনুভূত হইতে থাকে এবং ক্রমশ তাহারা চিত্তের উপর স্থায়ী আধিপত্য স্থাপন করে।"

প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি—পৃঃ ৪৮

ইহার উদাহরণ স্বরূপে তিনি বলিতেছেন—"Byron এর প্রথম 'চটক' ইংরাজী সাহিত্যে প্রবাদ-বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; Wordsworth এর সহিত আলাপ যতই বাড়িতে থাকে, ততই তাঁহার কবিতাসমূহের গভীর এবং মর্মগত সৌন্দর্য উপলব্ধ হয়।" ঐ পৃঃ ৪৮

কথাগুলি খাঁটি সত্য। যে কোন কাব্য বা গদ্যগ্রন্থ পাঠে, একটু স্থির-চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই, ইহা সহজে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

'চিত্রাঙ্গদা'-কাব্য সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিতেছেন—"প্রকাশ হইবার কালেই আমরা 'চিত্রাঙ্গদা' পাঠ করি! সেই প্রথম পাঠে এবং তাহার পরও কয়েকবার পাঠকালে ইহা আমাদের একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রথম শ্রেণীর খণ্ডকাব্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। রচনার উৎকর্ষে, ভাষা-ভঙ্গীর মৌলিকতায়, শব্দরচনার নৈপুণ্যে, ছন্দের লীলাময়ী গতিতে, মানব-প্রকৃতির অভিজ্ঞতায়, নাট্যগুণে এবং সর্বশেষে নিছক্ কবিত্বরসে সাহিত্য-সংসারে ইহাকে অনন্যসাধারণ সৌন্দর্যে মণ্ডিত একটি তুর্লভ রত্ন বলিয়াই জানিয়াছিলাম।" (ঐ, পৃঃ ৪৯) কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধ পাঠে তিনি 'বাস্তবিক বিস্মিত' হন এবং তাঁহার 'পূর্ব ধারণা আকস্মিক তীব্র আঘাত' পায়। ইহার ফলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"যে 'তুর্নীতি' এবং 'অস্বাভাবিকতা' দ্বিজেন্দ্রবাবু এই কাব্যে এমন সুস্পষ্ট দেখিয়াছেন, তাহা আমাদের চক্ষে পড়ে নাই কেন? সম্ভবতঃ প্রথম পাঠকালে আমাদের নীতি-জ্ঞান তত জাগ্রত ছিল না, এবং কবির রচনার মোহন মন্ত্রে আমাদের বিচার-শক্তি অভিভূত বা একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল।" (ঐ পৃঃ ৪৯) তাই তিনি তাঁহার পূর্বধারণার সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের মতের আলোচনা করিয়াছেন।

তাঁহার মতে "রবিবাবুর উদ্ভাবনী অথচ সঙ্গত কল্পনা আখ্যান-বস্তুটিকে (অর্জুন-চিত্রাঙ্গদা উপাখ্যান) বিচিত্র সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছে।"

ঐ পৃঃ ৫০

বেদব্যাস রচিত মূল মহাভারতে অর্জুন-চিত্রাঙ্গদা-কাহিনী সামান্য

আখ্যান মাত্র। রং ফলাইয়া রবীন্দ্রনাথ অপূর্বভাবে তাহাকে পরিবর্ধিত ও চিত্রিত করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মতে রবীন্দ্রনাথ অর্জুন-চরিত্রকে জঘন্য পশুর আকারে চিত্রিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্রিয়নাথ বলিতেছেন,—
* * * "অর্জুন মহাভারতকারের অপূর্ব সৃষ্টি। তাহার উপর রং ফলাইতে পারেন, এমন কবি বিরল। অর্জুন-চরিত্রকে যদি কোন পরবর্তী কবি স্পর্শ করিতে সাহস পান, তাহা হইলে তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, যে চরিত্র কবি-সৃষ্টির তুঙ্গ-শৃঙ্গে অবস্থিত তিনি যেন সেই উজ্জ্বল চিত্রকে কোনরূপে মলিন না করেন। সুতরাং অর্জুন-চরিত্র অঙ্কনে বেদ-ব্যাসের উপর কিছু নূতনত্ব আনিতে হইলে তাহা অতি সন্তর্পণে করিতে হইবে,—ইহাতে বলা হইল না অর্জুন-চরিত্র নির্দোষ বা আদর্শ মানব-চরিত্র, অথবা বেদব্যাস অর্জুনকে আদর্শ মানুষ করিয়া গড়িয়াছেন। আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, অর্জুনের প্রকৃতি এমন বিচিত্র এবং বহুমুখী—তাঁহার হৃদয়ের প্রবৃত্তিসকল এমন সবল ও জাগ্রত,—তাঁহার চরিত্র এমন সঙ্কীর্ণতার সংস্পর্শশূন্য—ভাঁড়ামি ও ভিরুতা হইতে মুক্ত যে, তাঁহার পরিচয় পাইবামাত্র পাঠক তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা না করিয়া, না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে না। এই কাব্যে রবীবাবু অর্জুনকে সৌন্দর্যমুগ্ধ প্রেমিক করিয়া সাজাইয়াছেন, অথচ বেদব্যাস-সৃষ্ট অর্জুনের মনুষ্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।" ঐ পৃঃ ৫১-৫২

প্রিয়বাবুর মতে "চিত্রাঙ্গদা সর্বতোভাবে রবিবাবুর নূতন সৃষ্টি"। তারপর তিনি বলিতেছেন—"মহাভারতে চিত্রাঙ্গদার কোন সুস্পষ্ট মূর্তি নাই। কোথাও কোন বিষয়ে তাহার কর্তৃত্ব বা বিশেষত্ব দেখি না, এবং পরবর্তী ঘটনাবলীর মধ্যেও যখন পুনর্বার তাহার সাক্ষাৎ পাই, তখনও তাহার এইরূপই নির্বিশেষত্ব। মহাভারতকার যেন একতাল মাটির উপর 'চিত্রাঙ্গদা' এই কথা কয়টি লিখিয়া গিয়াছেন। রবিবাবু সেই মাটি লইয়া একটি জীবন্ত অপূর্ব রমণী-মূর্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। "A perfect woman nobly planned." ঐ পৃঃ ৫২

ইহার পর প্রিয়নাথবাবু রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের বহুস্থান উদ্ধৃত করিয়া সুন্দরভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, "রবিবাবুর এ চিত্রে

অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত কিছুই নাই।" (ঐ পৃঃ ৬২) চিত্রাঙ্গদা নাটকের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কবি-সমালোচক প্রিয়নাথ প্রভূত আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। এই সমালোচনা-ব্যপদেশে তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধারপূর্বক দেখাইয়াছেন,—"চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের মিলন বিবাহ-নিষ্পন্ন দাম্পত্য মিলন।" ঐ, পৃঃ ৮৬

রস্কিন্

প্রিয়নাথবাবু প্রথিতযশা ললিতকলাবিদ্ ও রচনা-শিল্পী "রস্কিনের" একখানি মনোজ্ঞ আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রবন্ধটির ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন—"জন্ রস্কিন্ যে ইংরেজ সাধারণকে সৌন্দর্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন এবং ললিত কলার চর্চায় নবজীবন আনিয়াছেন, তাহাতে মতভেদ নাই। জীবনের শত তর্ক ও পাকের ভিতর, সহস্র জটিলতা ও জঞ্জালের মধ্যে সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—জীবনের অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্য প্রয়োজনীয়—এ শিক্ষা আমরা রস্কিনের নিকট পাই।" ঐ পৃঃ ১৩৮

রস্কিনের চরিত্রের গৌরব—তিনি কেবল সৌন্দর্যের একজন শ্রেষ্ঠ উপাসক ছিলেন না, একজন প্রকৃত ধার্মিক ও আদর্শ নীতিজ্ঞরূপে জনসাধারণের কাছে পূজা পাইয়াছেন। তাঁহার গদ্য-রচনা পাঠে প্রতিভার অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্রগৌরবেও তিনি একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার রচনা ও জীবন উভয়েরই মধ্যে একটা সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইত। রস্কিনের জীবন ও তাঁহার রচনা একেবারে অভিন্ন ছিল—"As was the man, so were his works ; his works are an index to his character."* রস্কিনের চরিত্র-মাহাত্ম্যের কথা বলিতে গিয়া প্রিয়নাথ বাবু, তাঁহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তুলনা করিয়াছেন।

যে উৎস হইতে নদী উৎসারিত হয়, তাঁহার গুণ সেই নদী লাভ করে। তেমনি পিতামাতার আদর্শ ও গুণাবলী তাঁহাদের শিক্ষা ও সাহচর্যের ফলে সন্তানকে গুণান্বিত করিয়া আদর্শ পথে পরিচালিত করে। অনেক স্থানে এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রস্কিনের অসাধারণ প্রকৃতি তাঁহার পিতা

---

* প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মিঃ এইচ্ আর জেমস্ সাহেবের "মিল্টন" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ।

বিশেষত তাঁহার মাতার আদর্শ ও শিক্ষায় গঠিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন—"তাঁহার মাতা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, সত্যনিষ্ঠ এবং কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিও খুব সরল ছিল। তিনিই শৈশব ও কৈশোরে রস্কিনের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার পদ্ধতি সহজ ও যুক্তিযুক্ত। ফাঁকি না দিয়া সহজ অথচ প্রকৃত চেষ্টায় যাহা শিশু-ক্ষমতার আয়ত্তাধীন তাহার অতিরিক্ত পাঠ তিনি কখনও দিতেন না; কিন্তু কড়ায় গণ্ডায়, অক্ষরে, অক্ষরে, তাহার হিসাব লইতেন।" ঐ পৃঃ ১৩৯

রস্কিনের ধর্মজীবন গঠন ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, একমাত্র তাঁহার জননীরই প্রচেষ্টায়। প্রিয়নাথ বাবুর রচনা হইতে জানিতে পারা যায়—চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত মাতার নিকট নিয়মিতরূপে প্রতিদিন বাইবেল পাঠ ও অধ্যয়নের ফলে রস্কিন্ জীবনে যে বহু শুভফল পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বহুবার স্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম ও নীতিশিক্ষা মানুষের শৈশব জীবনকে কিরূপে সুগঠিত ও সুসংযত করে, রস্কিনের জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রিয়নাথ বাবু বলিতেছেন—"শুধু যে ইহার দ্বারা (অর্থাৎ বাইবেল পাঠের দ্বারা) তাঁহার ধর্মজীবন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নয়। তাঁহার চিন্তাশক্তি উদ্বোধিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহার অপূর্ব রচনাশক্তিও বিশেষ আনুকূল্য পাইয়াছিল।" ঐ, পৃঃ ১৪০

রস্কিনের জননীই রস্কিনের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করিয়া দিতেন। তিনি নিজে পুত্রকে কোন খেলনা দেন নাই এবং অপর কেহ কোন খেলনা দিতে গেলে তিনি বাধা দিতেন, তাঁহার মত শিশু নিজেই নিজের খেলা বা খেলনা নির্বাচন করিয়া লইবে। রস্কিনের "কোন সমবয়স্ক মানব-সঙ্গী বা পশুপক্ষী ছিল না, পালিত পশু-পক্ষীও ছিল না।" (ঐ, পৃঃ ১৪১) ইহার ফলে বাহ্য প্রকৃতির নানা মাধুর্যময়ী ও বিচিত্র রূপরসভরা চিত্র সন্দর্শনে তিনি ভাবরাজ্যের পথিক হইয়াছিলেন।

শৈশবে রস্কিন্ কাহাকেও ভালবাসিতে শিখেন নাই বা কেহ তাঁহার ভালবাসার পাত্র ছিল না। "পিতা-মাতাকে তিনি নৈসর্গিক শক্তিপুঞ্জের ন্যায় দেখিতেন—যেমন চন্দ্র সূর্য। তাঁহাদের বিরহে অবশ্য কাতর

হইতেন। কিন্তু শৈশবে তাঁহাদের প্রতি স্নেহাকর্ষণ অনুভব করেন নাই” (ঐ, পৃঃ ১৪৩)। এই ভালবাসা বা স্নেহের অভাব তাঁহাকে অপরের স্নেহ বা ভালবাসা বুঝিতে দেয় নাই। এবং জাগতিক বিধানের এই দুইটি শ্রেষ্ঠ বন্ধন তিনি স্বীকার করেন নাই। যদিও তাঁহার গুরু কার্লাইল, যাঁহাকে “অনেকেই মানবদ্বেষী বলিয়া জানে······বলিয়াছিলেন—যতক্ষণ আমি এমন ভাবিতে না পারি যে আমার বিষয়ে অপর কেহ ভাবিতেছে—আমাকে অপর কেহ ভালবাসিতেছে—ততক্ষণ পৃথিবীকে মরু বলিয়াই বোধ হয়, লোক-নিবাস উদ্যান বলিয়া মনে হয় না।” (ঐ, পৃঃ ১৪৪) কিন্তু রস্কিন্ ইহার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া গুরুর ঐ উক্তির সমালোচনাকল্পে বলিতেছেন—“আমার যেরূপ শিক্ষা—তাহাতে আমার হৃদয়ে ঠিক বিপরীত ভাবই উদয় হয়। আমার প্রকৃত সুখ সেই মুহূর্তে যখন আমার জন্য কেহ ভাবিতেছে না। পিপীলিকা বা প্রজাপতি—আমার বিষয় ভাবিতেছে না জানিয়া আমার সেই বাস্তু-লগ্ন উদ্যান মরু বলিয়া ত বোধ হয় নাই; বরং আমার সান্ধ্যবিহারের সুখ আমি পূর্ণ-মাত্রায় উপভোগ করিতে পারিতাম না, এই ভাবনায় যে, পিতামাতা আমার জন্য ভাবিতেছেন এবং গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইলে চিন্তিত হইবেন। আমাকে স্নেহ-প্রীতি করে এমন লোকের অভাবে পৃথিবীকে শূন্য মনে করা সুস্থ-হৃদয়ের পরিচয় নয়।” (ঐ, পৃঃ ১৪৪) রস্কিনের এই উক্তি হইতে বেশ বুঝা যায় যে, সাধারণ মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি হইতে তাঁহার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি ভিন্নরূপ ছিল।

প্রিয়নাথ বাবু তাঁহার এই নিবন্ধে রস্কিনের শৈশব-জীবন লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাহার কারণ দর্শাইতে গিয়া তিনি বলিতেছেন—* * * “সে জীবন (অর্থাৎ রস্কিনের শৈশব জীবন) সাধারণ শিশু-জীবন হইতে অনেক পরিমাণে পৃথক্ ছিল। শিশুর উপর সাধারণত পিতামাতার ও গৃহের প্রভাবই বলবত্তর। রস্কিনের সম্বন্ধেও তাহাই হইয়া-ছিল। কিন্তু তাঁহার পিতামাতার প্রকৃতি সাধারণ প্রকৃতি হইতে খুবই স্বতন্ত্র ছিল—তাঁহাদের রচিত গৃহস্থালীও স্বতন্ত্র হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহাদের প্রভাবও স্বতন্ত্র।” ঐ, পৃঃ ১৪৫

নিজ উক্তির পরিপোষকতায় প্রিয়নাথ বাবু রস্কিনের রচনা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

"আমি গৃহে কখন অশান্তি ও কলহ দেখি নাই—পিতামাতাকে কখন পরস্পরের প্রতি বিরক্তি-রুক্ষ ভাষা বা রোষদীপ্ত কটাক্ষ প্রয়োগ করিতে দেখি নাই। কোন ভৃত্যকে কখন কঠোরভাবে ভৎর্সিত হইতে শুনি নাই। সংসারে কখন ভয়-ভাবনার অন্ধকার বা তাড়াতাড়ির বিশৃঙ্খলা দেখি নাই। সর্বত্রই শান্তি এবং সংযম। আমার পিতামাতার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল—কারণ এমন কোন কিছুই আমাকে অঙ্গীকৃত হইত না যাহা আমি পাইতাম না; এমন কোন শাসনের ভয় আমাকে প্রদর্শিত হইত না যাহা প্রযুক্ত হইত না; এমন কোন কথা বলা হইত না—যাহা বাস্তব নয়। সুতরাং আমি তাঁহাদের আদেশ ও বিধান, আমার জীবনের পক্ষে প্রকৃতির নিয়মের ন্যায় হিতকর ও অবশ্য প্রয়োজনীয় বোধে পালন করিতাম।"

ঐ, পৃঃ ১৪৫

এইরূপ পিতামাতা ও এইরূপ কঠোর কর্তব্য-পরিচালিত শৃঙ্খলা-পরিপূর্ণ সাংসারিক আবেষ্টন লাভ করিয়াই রস্কিনের আদর্শ জীবন গঠিত হইয়াছিল।

রস্কিন্ যে ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ কলাবিদ্ ও চিত্রশিল্পী হইবেন, শৈশবেই তাহার পূর্বাভাস্ পাওয়া যায়। কোন খেলা বা খেলনায় তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত না, কোন মানব-সঙ্গী বা পালিত পশুপক্ষী তাঁহার ক্রীড়া-সহচর ছিল না; প্রাকৃতিক দৃশ্য ও নৈসর্গিক চিত্রাবলী দর্শনে তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল থাকিত। তাহাদের বিভিন্ন বিকাশ ও পরিবর্তন-দৃশ্য অবলোকনে তিনি বিভোর হইতেন। প্রিয়নাথবাবু লিখিতেছেন—"শিশু রস্কিন্ ঘোটক-যানের উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে বসিয়া কৌতূহল-বিস্ফারিতনেত্রে চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে যাইতেন। এইরূপে তিনি ইংল্যণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের অনেক পথঘাট দেখিয়াছিলেন এবং গ্রাম্য কুটীর হইতে বিশাল উন্নত রাজ-প্রাসাদ-সকলের সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিখ্যাত কোন প্রাচীন অট্টালিকা দেখিলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ শোভা ও পূর্বতন

ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করিতেন এবং কোন গৃহে সুন্দর চিত্রাবলী থাকিলে তাহাও দেখিতে যাইতেন। যে শিশু ভবিষ্যতে অমৃতময়ী ভাষায় চিত্রবিদ্যা ও স্থাপত্য-সৌন্দর্যের গুণকীর্তনে জীবন অতিবাহিত করিবেন তাঁহার পক্ষে এ শিক্ষা অমূল্য।" ঐ, পৃঃ ১৪৬

কলা-বিদ্যার চর্চা ও অনুশীলনে রস্কিন্ তাঁহার পিতার সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছিলেন। "তিনি সুশিক্ষিত, কাব্যরসজ্ঞ ও কলাকুশলী ছিলেন। অনেক প্রথিতনামা সাহিত্য-সেবক ও চিত্রকরের সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল। তিনি কাব্যগ্রন্থাদি অতি সুন্দর পড়িতে পারিতেন, এবং পুত্রকে পড়িয়া শুনাইতেন। চিত্রবিদ্যায় তিনি একজন অভিজ্ঞ সমজদার ছিলেন, এবং নিজেও কিছু কিছু আঁকিতে পারিতেন। টেল্‌ফোর্ড (Telford) নামে তাঁহার একজন অংশীদার, রস্কিনের জন্মোৎসবে প্রসিদ্ধ চিত্রকর টার্ণারের (Turner) দ্বারা চিত্রিত কবি রজর্স (Rogers) রচিত 'ইটালী' নামক কাব্যগ্রন্থ রস্কিনকে উপহার দেন। পুস্তকের মধ্যে সেই সকল চিত্র দেখিয়া রস্কিনের সম্মুখে যেন এক নূতন জগৎ খুলিয়া গেল। তিনি টার্ণারের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইলেন, এবং তাঁহার একজন উপাসক হইয়া পড়িলেন।" (ঐ, পৃঃ ১৪৬-১৪৭) এই অংশ পাঠে বেশ বোঝা যায় যে, পিতার ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাহায্যের ফলে তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকলাবিদ্ ও কাব্যরসজ্ঞ হইতে পারিয়াছিলেন।

ইহার পরে রস্কিন্ যে পুস্তকখানি পান, তাহা তাঁহার জীবনে অপরিমিত আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার করে। প্রকৃতপক্ষে এই পুস্তক অবলোকন ও পাঠ করিয়া তিনি মনে করেন, যেন তাঁহার জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হইল। পুস্তকখানির নাম—Prout's Sketches in Flanders and Italy. গ্রন্থনিহিত চিত্রগুলি দর্শন করিয়া পিতাপুত্র উভয়েরই অপরিসীম আনন্দ হইল। তাঁহাদের আনন্দোজ্জ্বল মুখ অবলোকন করিয়া রস্কিনের জননী বলিলেন—ছবি দেখিয়া যখন তোমাদের এত আনন্দ হইতেছে, তখন স্থানগুলি দেখিলে তোমাদের আনন্দ আরও বাড়িবে। তাঁহার কথায় সানন্দে সম্মতি জানাইয়া পিতাপুত্র দু'জনেই রস্কিনের জননীর সহিত ইয়োরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। সমালোচক প্রিয়নাথ

বাবু বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—"সে মুগ্ধ ভ্রমণের সুখ এবং তীব্র উপভোগ বর্ণনায় খর্ব হইয়া পড়ে—তাহার মাধুর্য অনুভবের বিষয়। স্বদেশ-ভ্রমণকালের ন্যায় রস্কিন এখন আর শিশু নয়। এখন তাঁহার রসাস্বাদন শক্তি বাড়িয়াছে। কলা-সৌন্দর্যে চক্ষু ফুটিয়াছে এবং প্রতিভার নিত্য নবোন্মেষে হৃদয়ে অভূতপূর্ব উৎসাহ, নববল এবং অমর আশা সঞ্চারিত হইয়াছে।" ঐ, পৃঃ ১৪৭

এই ভ্রমণে পিতাপুত্র প্রকৃতির যে সমস্ত নয়নমনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী দেখিলেন, চিত্রে সেগুলি চিত্রিত করিলেন। আল্পস গিরিশ্রেণী দেখিয়া রস্কিনের কি আনন্দ! 'অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের আলোকে আরক্তিম' আল্পস্ গিরিশ্রেণীর অপূর্ব শোভা, তদূর্ধ্বে নানা বর্ণের মেঘরাজির দৃষ্টিমুগ্ধকরী খেলা দেখিয়া রস্কিনের জীবনে এক নবীন প্রেরণা জাগিয়া উঠিল। কবি প্রিয়নাথ, সমালোচক প্রিয়নাথ রস্কিনের এই আল্প্স্ দর্শনের কথা কি সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন!—"সেইদিন রস্কিনের দ্বিতীয় জন্ম—এতকাল ধরিয়া, এত যত্নে শিক্ষিত হইয়া —দীক্ষা-উন্মুখ পবিত্রহৃদয় বালক প্রকৃতির বিশাল অচল মন্দিরে জীবন-ব্রতের সন্ধান পাইয়া মন্ত্র-জীবনে সেই দিন দীক্ষিত হইলেন—আজ তাঁহার উপনয়ন-ক্রিয়া সমাধা হইল। সত্য, সৌন্দর্য ও শান্তির সাম-গান-মুখরিত আনন্দ-গ্রন্থি—আজ তাঁহার জীবনে তাঁহার চিন্তা, কথা এবং কার্যে আবদ্ধ হইল। সেই সন্ধ্যায় বাগ্দেবী তাঁহার কুসুমাঞ্জলির আলোকময়ী ইঙ্গিতে, সেই সুস্থ-দেহ প্রতিভার উষালোকে অরুণিতহৃদয় বালককে তাঁহার জীবনে যাহা কিছু উন্নত, পবিত্র, যাহা কিছু কার্যকরী তাহা দেখাইয়াছিলেন। আল্প্স্ দর্শনে শুধু যে তাঁহার নয়ন-পথে সৌন্দর্যের দ্বার উন্মুক্ত হইল তাহা নয়—তিনি বুঝিলেন সেই অসীম অনন্ত স্বর্গরাজ্যের প্রথম সোপানে মাত্র আরোহণ করিয়াছেন। বহু বর্ষ পরে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি নিজেই বলিয়াছেন—'যখনই কোন আনন্দ-উচ্ছ্বাসের কল-তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হয়—বা কোন শান্তিপ্রদ—বলপ্রদ শুভচিন্তা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে, তখনই সেই দিন, সেই দৃশ্য, তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হয়'।" (ঐ, পৃঃ ১৪৯) নীরব প্রকৃতি, কঠিন পর্বতমালা ভাবুকের হৃদয়ে ভাবের যে

উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত করে, রস্কিনের শেষোক্ত কথা হইতে তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। আর এই ভাবের উক্তি মহাকবি লর্ড বায়রণের লেখার মধ্যে পাওয়া যায়—

"To me
High mountains are a feeling."

পুত্রের চিত্রাঙ্কনী শক্তির উন্মেষ দেখিয়া পিতা খুবই আনন্দলাভ করিতেন। রস্কিন্‌কে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য পূর্ব হইতেই একজন শিক্ষক নিযুক্ত ছিল, এখন তিনি রস্কিনের বাৎসরিক ৩০০০৲ (£200) টাকা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন। এইরূপে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া, ভাল ভাল চিত্রকরদিগের প্রসিদ্ধ আলেখ্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া এবং বাৎসরিক বৃত্তির ব্যবস্থা দ্বারা কলা-রসজ্ঞ পিতা পুত্রের কলা-জ্ঞান বিকাশের সহায়তা করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে লেখক প্রিয়নাথ বাবু একটি সুন্দর গল্প উদ্ধৃত করিয়াছেন।—"কলা-বিদ্যায় পিতা-পুত্রের একপ্রাণতা সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে—একদিন কোন নীলামে রস্কিন্ ছবি কিনিতে গিয়া দেখিলেন, সেখানে যে একখানি মাত্র ক্রয়োপযোগী চিত্র ছিল, তাহা বিকাইয়া গিয়াছে, ম্রিয়মাণ হৃদয়ে তিনি গৃহে ফিরিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি দেখিলেন যে সে চিত্র তাঁহারই ঘরে রহিয়াছে। পুত্রের ভাল লাগিবে বলিয়া পিতা ইতিপূর্বেই তাহা কিনিয়া আনিয়াছিলেন।" ঐ, পৃঃ ১৫০

রস্কিন্ অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ে যখন অধ্যয়ন করেন, তখন সেখানকার ছাত্রেরা মদ্য পান করিতেন। রস্কিন্ সকলের সহিত সমানভাবে মিশিতেন, তাঁহাদের আমোদপ্রমোদে যোগ দিতেন, কিন্তু মদ্যপান তিনি কোনদিন করেন নাই। "তিনি সকলের সঙ্গে বসিয়া পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষ করিতেন—গলায় ঢালিয়া নয় ভিতরকার জামার মধ্যে।" (ঐ, পৃঃ ১৫১) প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া রস্কিন্ কিরূপে মদ্যপান হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। রস্কিনের এই অবস্থার সহিত প্রিয়বাবু সুবিখ্যাত ফরাসী উপন্যাসলেখক ব্যালজাকের (Balzac) তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"ব্যালজাক

একজন অসাধারণ প্রতিভা বা প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় এবং উদ্যম বিস্ময়কর—অমানুষিক। তিনিও মাদকসেবী ছিলেন না। যখন তাঁহার নিতান্ত প্রিয় বন্ধুবান্ধবেরা (Haschich) মাদক-জনিত নেশার তীব্র সুখ উপভোগে মত্ত এবং তাঁহাকে তাহার রসাস্বাদন করাইবার জন্য ব্যস্ত, তিনি তাঁহাদের নিকট জানিতে চাহিলেন, উক্ত নেশার প্রভাবে মনের কিরূপ অবস্থা হয়। বর্ণনায় যাঁহারা সিদ্ধহস্ত—কথার উপর যাঁহাদের অলৌকিক ক্ষমতা—যাঁহারা কবি—ব্যালজাককে তাঁহারা সেই মাদকতার মোহিনী শক্তি চিত্রময়ী ভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন। কৌতূহলী শিশুর ন্যায় তিনি মুগ্ধ হইয়া শুনিলেন যে, এই মাদকের প্রভাবে ইন্দ্রিয়-সকলের ক্ষমতা কল্পনাতীত মাত্রায় বর্ধিত হয়—তুমি শুনিতে পাইবে বর্ণ সকল হইতে স্বরলহরী উত্থিত হইতে। বিভিন্ন বর্ণের বিচিত্র কলরোল। তোমার অন্তরে বাহিরে চারিদিকে অনন্ত প্রসারিত—তুমি এক অপূর্ব স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছ—তোমার কর্তৃত্ব নাই—অহংজ্ঞান তিরোহিত, নিজের ইচ্ছা নিজের অধীন নয়। তুমি যেন সাগরমধ্যস্থ স্পঞ্জ—আনন্দস্রোত সহস্র রন্ধ্রে একবার তোমার ভিতর প্রবেশ করিতেছে আবার চলিয়া যাইতেছে। এই অপূর্ব অবস্থা উপভোগ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেও, ব্যালজাক হস্তস্থিত মাদক দ্রব্য রাখিয়া দিয়া বলিলেন—'যে অবস্থায় আমার নিজের উপর প্রভুত্ব চলিয়া যায়, আমার ইচ্ছাবৃত্তি আমার আয়ত্তে নহে, তাহা অপেক্ষা জগতে ভয়াবহ কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না' !" ঐ, পৃঃ ১৫২-১৫৩

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রস্কিনের Modern Painters নামক প্রথম পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রিয়নাথবাবু এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিতেছেন—"প্রথম পুস্তকে তিনি সাধারণ রুচি ও মতের বিপক্ষে তাঁহার নিজের অভিপ্রায় স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করেন। যৌবনের একটি নিঃসঙ্কোচ বিশ্বাস আছে। সে বিশ্বাস সে সকলের সম্মুখে সহজে ব্যক্ত করে। রসোপভোগের একটি অকপট তীব্র আনন্দ আছে, সে আনন্দ বিশ্বসংসারকে মগ্ন করিতে চায়। প্রতিভার একটি স্বাভাবিক বিকাশ এবং অপ্রতিহত প্রভাব আছে, সূর্যালোকের ন্যায় তাহা আপনা আপনি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। রস্কিনের প্রথম পুস্তকে আমরা এই তিনটিই দেখিতে পাই। কি সুন্দর ভাষা—কি দেবোপম

নির্ভীকতা—কি বিশ্ববিজয়ী বিশ্বাস! আবার এই সকলের উপর গৈরিক-প্রস্রবণের ন্যায় কি আনন্দ-স্রোত!

Modern Painters পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ—প্রকাণ্ড পুস্তক। সাহিত্য ও কলা-জগতে ইহা বিষম বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। ইহার ভিতর কলা-সৌন্দর্য সম্বন্ধে রস্কিন্ অনেক মূল-তত্ত্ব এবং মৌলিক নিয়মের আলোচনা এবং অবতারণা করিয়াছেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে Modern Painters সম্পূর্ণ হয়।" ঐ, পৃঃ ১৫৪-৫৫

লেখক প্রিয়নাথ বাবু কলাবিদ্যায় রস্কিনের পারদর্শিতা লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—"কলা সম্বন্ধে রস্কিনের মত খুব প্রশস্ত ও উদার। তাহাতে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই। কলা-সম্ভোগ হইতে তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করিতে চাহেন না। কেবল তাহাই নহে, পরম ভক্ত ভাগবত-কার যেমন বলেন, 'ধর্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইয়াও, যদি ভগবানে ভক্তি উৎপাদন না করে, তবে তাহা—শ্রম এব হি কেবলম্' রস্কিন্‌ও সেইরূপ বলেন, 'যে জীবনে পরিশ্রম নাই, সে জীবন যেন একটি গুরুতর অপরাধ এবং যেখানে কলা-সম্পর্ক নাই, তাহা পশুত্ব।' তাঁহার সমুদয় শিক্ষার মধ্যে এই একটি কথা নিরন্তর প্রতিধ্বনিত—মানব-চরিত্রের উন্নতি সাধনে কলাবিদ্যা শ্রেষ্ঠ সহায়। তাই, তিনি জীবনের সকল কার্যে সকল বিষয়েই ললিত-কলার বিকাশ দেখিতে পান।" ঐ, পৃঃ ১৫৭-৫৮

কলাবিদ্যা কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে রস্কিন্ বলিতেছেন—"কলা মাত্রই একটি উন্নত এবং প্রশস্ত ভাষা—ভাব প্রকাশের পক্ষে অমূল্য।" ঐ, পৃঃ ১৫৮

ললিত কলা সম্বন্ধে রস্কিনের মত উদার, কিন্তু প্রিয়নাথ বাবুর মতে—"সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁহার মত ঠিক বিপরীত। তাহা অনুদার, সাম্প্রদায়িক, সঙ্কীর্ণ—সুতরাং ভ্রমাত্মক।" ঐ, পৃঃ ১৫৯

তারপর তিনি বলিতেছেন—"রস্কিন্ কোথাও ললিত কলার লক্ষণ বা সংজ্ঞা নিরূপণ করেন নাই। উচ্চ কলা (great art) বলিলে তিনি কি বুঝেন তাহা বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি বলেন—'উচ্চ কলা আমি তাহাকেই বলি, যাহা মানবের মনে সর্বাপেক্ষা উচ্চতম ভাব সকল

সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় উদিত করে।' এবং সেই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়া, ললিত কলাপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রকেই আশ্চর্য ও স্তম্ভিত করিয়াছেন ;—'এমনও কলা আছে যাহার কার্য আনন্দ দান করা নয়, পরন্তু শিক্ষা দান করা' (There is some art whose end is to teach and not to please.)" (ঐ, পৃঃ ১৫৯) প্রিয়নাথ বাবুর মতে ইহা ভয়ানক কথা! ইহারই পোষকতায় রস্কিন্ তাঁহার Lectures of Art নামক গ্রন্থের একস্থলে খুব দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন—"আমি আজি পর্যন্ত যে শিক্ষা দিতে চেষ্টা পাইয়াছি তাহার অধিকাংশ সম্বন্ধে এই আপত্তি উপস্থিত করা হয় যে, কলাবিদ্যাকে প্রাকৃতিক ঘটনার বা তথ্যের প্রকটন বলিয়াই আমি তাহার অত্যধিক আদর করিয়াছি, তাহার চিত্তরঞ্জিনী প্রকৃতির অত্যল্প আদর করিয়াছি। আমি এক্ষণে নিঃসংশয়ে বলিতে চাই এবং তোমাদিগকে বুঝাইতে চাই যে, কলাবিদ্যার সমস্ত জীবন সত্তা—তাহার সত্যপূর্ণতার উপর বা ব্যবহার্যতার উপর নির্ভর করে, এবং উহা নিজে যতই কেন চিত্তরঞ্জক, বিস্ময়কর বা গভীর ভাবব্যঞ্জক হউক, যদি ইহার উদ্দেশ্য কোন প্রকৃত তথ্যের প্রকাশ বা কোন ব্যবহার্য পদার্থের অলঙ্করণ না হয়, তাহা হইলে ইহা নিকৃষ্ট কলা এবং ক্রমে আরও নিকৃষ্ট হইতে চলিবে।"

ঐ, পৃঃ ১৬০

রস্কিনের মতে সত্য আগে, তারপর সৌন্দর্য। প্রকৃতপক্ষে তিনি সত্যকে মুখ্য স্থান দিয়া সৌন্দর্যকে গৌণ স্থান প্রদান করিয়াছেন। প্রিয়নাথবাবু বলিতেছেন—"তিনি (অর্থাৎ রস্কিন্) বলেন, সত্য এবং সৌন্দর্য পরস্পর স্বাধীন এবং তাহাদের যোগ্যতা বা মূল্য অনুসারে তাহাদিগকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে—অর্থাৎ সর্বাগ্রে সত্য—সৌন্দর্য তাহার পর। ইহা ছাড়া, রস্কিন্ সৌন্দর্যকে নীতি ও ধর্মের অধীন করিয়াছেন। তিনি সোন্দর্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক উপাদান (the highest moral element) বলেন এবং তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তকে তিনি সৌন্দর্যের যে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে, সৌন্দর্যের অন্তর্ভূত বিভিন্ন ভাবসকল ঐশীগুণের ছায়ামাত্র!" ঐ, পৃঃ ১৬২

লেখক প্রিয়নাথ বাবু ইহাকে রস্কিনের "ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় কুসংস্কার" বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। তাঁহার মতে,—"সত্যেরও মর্যাদা আছে; কর্তব্যেরও মর্যাদা আছে; সৌন্দর্যের মর্যাদা তাহাদের অপেক্ষা কোনরূপে ন্যূন নহে। কলাশাস্ত্রে সৌন্দর্যের স্থান সকলের উপর।" ঐ, পৃঃ ১৬৩

সৌন্দর্য দুই প্রকার, আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিক। আধ্যাত্মিক অপেক্ষা বাহ্যিক সৌন্দর্য-সন্দর্শনে অধিক লোক মুগ্ধ। বাহ্যিক রমণী-সৌন্দর্য যে শ্রেষ্ঠ তাহা তিনি ফরাসী কবি আর্মা সিলভেষ্টর (Armand Sylvestre) উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন—

"রমণী-সৌন্দর্য—একা সৌন্দর্য প্রকৃত।"

ঐ, পৃঃ ১৬৪

আমাদের দেশেও কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয় এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"রমণি রে, সৌন্দর্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য আছে বাঁধা।
সৌন্দর্য জগৎ হ'তে তোমারে রাখিলে দূরে,
সে জগৎ থাকে নাও আধা॥"

এই প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ বাবু নানাভাবে নীতি ও সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং শ্রেণী নির্দেশপূর্বক তাহাদের পার্থক্যও দেখাইয়াছেন। পরিশেষে কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়া তিনি এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিয়াছেন ঃ—

"ললিত কলায় সুনীতি কুনীতি নাই; যদি থাকে, তবে তাহাই সুনীতি যাহা সুন্দর, যাহা অসুন্দর তাহাই কুনীতি।......

কলাবিদ্যার কার্য চিত্তরঞ্জন; সে চিত্তরঞ্জন সৌন্দর্যসৃষ্টির দ্বারা সাধ্য। সৌন্দর্য বলিলে আমরা সকল প্রকার সৌন্দর্যই বুঝিব—কেবল রস্কিনের ন্যায় নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য বুঝিব না।......

ললিত কলার অধিকারের সীমা নাই। সমস্ত মানবজীবনই ইহার ক্ষেত্র।

বিশ্বসংসারে যাহা কিছু আছে, সকলই ললিত কলার বিষয়ীভূত হইতে পারে।···
সৌন্দর্যের জন্যই ললিত কলা—ইহাই Art for Art কথার প্রকৃত অর্থ।"

ঐ, পৃঃ ১৬৯-১৭০

রস্কিনের কলাবিজ্ঞান ভ্রান্তিমূলক হইলেও, প্রিয়নাথ বাবুর মতে, তাঁহার "রসগ্রাহিণী শক্তি অনিন্দ্য ও অসাধারণ।" ঐ, পৃঃ ১৭১

রস্কিন্ একাধারে জ্ঞানবীর ও কর্মবীর ছিলেন। তারপর নীতি-শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে সংস্কার-কার্যে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। রস্কিন্ কি ভাবে এই সংস্কার-কার্যের জন্য তাঁহার জীবন ও সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন, প্রিয়নাথ বাবু বিশদভাবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তাঁহার অপরিমিত দান, তাঁহাকে কলারসিকদিগের নিকট চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তাঁহার দানশীলতা সম্বন্ধে প্রিয়নাথ বাবু আরও বলিতেছেন—"তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট জর্জ-মণ্ডলী (St. George's Guild) সংশ্লিষ্ট যে প্রদর্শনীশালা আছে, তাহার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য তিনি যেরূপ ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহা কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য উভয় জগতেই বিরল। তাঁহার দানশীলতার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা ইহা হইতেই পাই যে, কেবলমাত্র অক্সফোর্ড (Oxford) এবং সেণ্ট জর্জ (St. George) প্রদর্শনীশালাতে তিনি যে সকল চিত্রাদি দান করিয়াছেন, তাহার মূল্য আড়াই লক্ষ টাকার কম হইবে না।" ঐ, পৃঃ ১৭৫

রস্কিনের জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল আনন্দ দান। এই সম্পর্কে প্রিয়নাথ বাবু তৎকর্তৃক (রস্কিন্) প্রবর্তিত মাধবী বা May Queen নামক উৎসবের উল্লেখ করিয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের সহর-পল্লী সর্বত্র এমন কি আয়ার্ল্যাণ্ডেও এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবন্ধ-শেষে প্রিয়নাথ বাবু রস্কিনের অপূর্ব 'পিতৃমাতৃভক্তি, প্রদীপ্ত বস্তুনিষ্ঠা ও কল্পনাকম্প দানশীলতা'র কথা সবিস্তারে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

রস্কিনের লিখন-ভঙ্গী বা style সম্বন্ধে প্রিয়নাথ বাবু বলিতেছেন—

"রস্কিনের প্রতিপত্তি এই style লইয়া। ইহাতেই তাঁহার গৌরব এবং সাহিত্যকলার শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা। রস্কিনের styleই কলাবিশেষ।"

ঐ, পৃঃ ১৯৩

সমালোচক প্রিয়নাথ বাবু রস্কিনের ভাষার বর্ণনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি একজন প্রকৃত কবি, কবির ভাষায় রস্কিনের ভাষার পরিচয় দিয়াছেন—"বাস্তবিক সে ভাষা—সে গদ্যের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা অসাধ্য। যেমন কোন সুদূর সাগর-সঙ্গম-বাহিনী স্রোতস্বিনী তুষারমণ্ডিত স্বীয় পর্বত-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া লীলাঞ্চিত গতিতে, ছায়ালোকবিচিত্র ধরণী-পৃষ্ঠ অলঙ্কৃত করিয়া, উদ্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়—সে নদী যেমন কখন গিরি-সঙ্কট-মধ্যগতা—প্রখর—ফেনিল—আয়সবর্ণা—কখন বীচি-বিক্ষোভ-সংক্ষুব্ধা—কখন বা অসীম কান্তার-মধ্যগতা—নিঃশব্দবাহিনী—কখন উপল-আস্তরণ মধ্যে বিস্তীর্ণ-দেহা—কখন ছায়া-বহুল পত্রমর্মরসঙ্কুল বিটপিশ্রেণী-পাদদেশে কলনাদিনী—আবার কখন তরঙ্গভঙ্গভীষণা—সেইরূপ রস্কিনের গদ্য রচনা বিচিত্র কলাসৌষ্ঠবে প্রস্ফুটশ্রী, বিবিধ রসে আপ্লুতা। সে রচনা কোথাও সৌন্দর্যোপভোগ-পুলকে রোমাঞ্চিতদেহা, কোথাও ঘৃণায় কুঞ্চিতাননা, কখন বা আশীর্বাদে কুসুমিতকলেবরা, কখন বা অভিশাপে অনলময়ী, কোথাও বা হর্ষে গদ্‌গদ্-ভাষিণী, কোথাও ক্রোধে মেঘ-মন্দ্রিতা—ফলতঃ সর্বত্র প্রতিভার জ্বালাময় ফুৎকারে উদ্দীপ্ত-চেতনা, জীবনের হিল্লোল ও কল্লোলে স্পন্দমানা, এবং মানব-হৃদয়ের শোণিমায় রক্তিমবর্ণা।" ঐ, পৃঃ ২০৬

এই একটি প্রবন্ধে প্রিয়নাথ বাবু, যে পাণ্ডিত্য, বিচারশক্তি, ভূয়োজ্ঞান ও রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার দ্বারা তিনি কলাবিদ্ তথা রস-পিপাসুদিগের নিকট চিরদিন সমাদৃত হইয়া থাকিবেন।

'গী দে মোপাসাঁ'

"গী দে মোপাসাঁ" প্রবন্ধটি দশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে।

গী দে মোপাসাঁ ফরাসী সাহিত্যের সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও ছোট-গল্প-লেখক। তাঁহার পরলোকগমনের অব্যবহিত পরেই প্রিয়নাথ বাবু এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। আলোচ্য প্রবন্ধের গোড়ায়, প্রিয়নাথ বাবু প্রসঙ্গ-

ক্রমে মূল ও তাহার অনুবাদ (অবশ্য অন্য ভাষায়) লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য বর্তমান থাকে কি না ইহাই আলোচ্য বিষয়। তিনি বলিতেছেন,—"অনুবাদে আমাদের বিশ্বাস নাই" (প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি—পৃঃ ২১২)। ইহার কারণ দর্শাইতে গিয়া তিনি কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—"পদ্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট গদ্যেরও রাগিণী আছে। 'Prose has its cadences'—সে রাগিণীও লেখকের ভাষার সহিত আজন্মমিশ্রিত। ভাব ও রস প্রকাশের জন্য তাহা ভাষারই সহিত, কেবল এক সঙ্গে নয়, একই অঙ্গে আবির্ভূত। তোমার অনুবাদ যদি ভাষান্তর মাত্র হয়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তুমি লেখকের রচনার অর্ধাঙ্গমাত্র অনুবাদ করিলে! ইহা ছাড়া আর এক কথা এই, প্রত্যেক ভাষাতেই এমন অনেক কথা দেখিতে পাইবে, যাহাদের স্বতন্ত্র প্রতিকৃতি, নিজস্ব চেহারা আছে। অপর ভাষায় তাহাদের প্রতিবাক্য কখনও তাহাদের সমস্ত অর্থ, তাহাদের সমস্ত প্রাণ যথাযথ প্রতিবিম্বিত করিতে পারে না। হয় ত কোন ভাষার একটি আদরের কথার অন্তরালে ঈষৎ ব্যঙ্গের বঙ্কিম হাসি প্রচ্ছন্ন আছে। অপর ভাষায় তাহার প্রতিবাক্যে তুমি আদরটুকু পাইবে, ব্যঙ্গটুকু পাইবে না। কিন্তু বোধ হয় সেই ব্যঙ্গের রঙ্গতেই আদরের বেশী আদর। রচনার অর্ধেক শ্রী—শব্দনির্বাচনে—এক একটি কথার সহিত কত স্মৃতিই জড়িত।"

ঐ, পৃঃ ২১৩-১৪

এই অনুবাদ-সম্পর্কিত আলোচনা পাঠে মনে হয় গী দে মোপাসাঁর ফরাসী ভাষায় লিখিত ছোটগল্পগুলি ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে, আবার সেই ইংরেজী অনুবাদ হইতে অনেকে সেগুলিকে বাংলায় ভাষান্তরিত করিয়াছেন। ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ-করা বাংলা গল্পগুলিতে খুব সম্ভবত মূলের (ফরাসী ভাষায় লিখিত) সৌন্দর্য রক্ষিত হয় নাই। তাই তিনি উপরি লিখিত আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, তিনি ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন।

গী দে মোপাসাঁ সম্বন্ধে প্রিয়নাথ বাবু বলিতেছেন—"আধুনিক ফরাসী লেখকদিগের মধ্যে Guy de Maupassant একজন অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রতিভাশালী। ছোটগল্প-রচনায় তাঁহার সমকক্ষ নাই। তিনি বড় উপন্যাসও

চ্যার পাঁচখানি লিখিয়াছেন, এবং তাহার মধ্যে দুই একখানি সাহিত্য-জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভও করিয়াছে। কিন্তু Maupassantর অসাধারণ গুণপণা ক্ষুদ্র গল্প রচনায়···ভাষা ও বর্ণনায় Maupassantর এমন একটু অসাধারণ বিশেষত্ব আছে, সৌন্দর্য-উদ্ভাবনে তাঁহার এমন বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে যে, ফরাসী ভাষায় প্রথম শ্রেণীর লেখকদিগকে তাঁহার কাছে মস্তক অবনত করিতে হয়।" ঐ, পৃঃ ২১৫

'বলেন্দ্রনাথ'

১২৭৭ সালের ২১এ কার্তিক রবিবার বলেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩০৬ সালের ৩রা ভাদ্র, মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার লিখিত গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে তিনি যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া আবেগময়ী ভাষায় প্রিয়নাথ বাবু বলিতেছেন—"কি গদ্যে—কি পদ্যে তাঁহার একটি অভিনব, সুন্দর মৌলিকতা দৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রথম গদ্য প্রবন্ধে—তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তকে বিকাশোন্মুখ প্রতিভার নবীন উন্মেষ পরিণত ভাষা ও ছন্দে প্রকাশিত। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কিশোর-প্রতিভা প্রায়ই পূর্বতন আচার্যদিগের পদানুসরণ করে। আমরা তাঁহার তরুণ কণ্ঠস্বরে পরিচিত পুরাতন স্বরভঙ্গী শুনিতে পাই—ভাষা-গঠনে পরিচিত শব্দবিন্যাসপদ্ধতি দেখিতে পাই—এবং ছন্দ-রচনায় পূর্বতন কবিদিগের শিল্পচাতুর্য অনুভব করি। বলেন্দ্রনাথের ইহা কম প্রশংসার কথা নয় যে, প্রথম হইতেই তাঁহার রচনা-প্রণালী তাঁহার নিজের ; এবং তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার ইহা অপেক্ষা আর স্পষ্ট নিদর্শন কি থাকিতে পারে যে, যখন সমস্ত বঙ্গদেশ রবীন্দ্রনাথের বীণাঝঙ্কারে কম্পিত উচ্ছলিত—যখন যে কোন আধুনিক কবিতা পড়িবে তাহারই ভিতর অল্প বা অধিক পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, ভাব, ভাষা-ভঙ্গীর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে, বলেন্দ্রনাথ তাঁহার ঘরের—তাঁহার সেই শিক্ষাগুরুর প্রভাব হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।" ঐ, পৃঃ—২২২

বলেন্দ্র কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথেরই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। বলেন্দ্রনাথের একমাত্র গদ্য-গ্রন্থ "চিত্র ও কাব্য।"

কবি-সমালোচক প্রিয়নাথ বাবু সমবেদনার সহিত বলিতেছেন—

"সাহিত্যে এমন অনুরাগ এমন অপূর্ব ক্ষমতার অকাল অবসানে বাংলা ভাষার, বিশেষত অভিনব ও উপচীয়মান বাংলা গদ্যের যে সুমহান্ ক্ষতি হইয়াছে তাহা শীঘ্র পূরণ হইবার নহে।" ঐ, পৃঃ ২২৯

বলেন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও গদ্য-লেখক। তাঁহার কবিতা অপেক্ষা গদ্য-রচনাকেই প্রিয়নাথ বাবু বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"তিনি জন্ম-কবি—আজন্ম রচনা-রসিক (stylist)। গদ্যে এবং পদ্যে উভয়েই তাঁহার নিজত্ব ছিল—এবং উভয়েই তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু গদ্যে তিনি যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন পদ্যে আজও তাহা পারেন নাই। ইহার অর্থ নয় যে, তাঁহার ছন্দোময়ী রচনা অপরিণত বা অসম্পূর্ণ। আমার বক্তব্য এই যে গদ্যের সকল পর্দাই তাঁহার ক্ষমতার অধীন ছিল – গদ্যের এমন কোন রহস্য বা ভঙ্গী নাই যাহা তাঁহার লেখনীর আয়ত্ত ছিল না। কিন্তু তাঁহার পদ্য সম্বন্ধে আমরা ঠিক একথা বলিতে পারি না। তাঁহার পদ্য-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইলেও আমাদের মনে হয় কবির ক্ষমতা এখনও সমস্ত বিকাশ পায় নাই এবং কালে এই সৌন্দর্য পরিসরে আরও বিস্তৃত হইবে—ইহার গভীরতা আরও বাড়িবে—এবং ইহার ঝঙ্কার ও উন্মাদনা আরও বৈচিত্র্য লাভ করিবে।" ঐ, পৃঃ ২২৩

বলেন্দ্রনাথের 'চিত্র ও কাব্য' গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রিয়নাথ বাবু কয়েকটি খাঁটি অথচ সুন্দর কথা বলিয়া এই গ্রন্থের সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—" 'চিত্র ও কাব্য' সাহিত্য ও ললিতকলা-বিষয়িণী সমালোচনা। এই সকল প্রবন্ধে তরুণ লেখকের রস-গ্রাহিতা শক্তি দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়—ততোধিক আশ্চর্য হইতে হয় ভাবোচ্ছল ভাষার কলাকুশল সংযম দেখিলে। লেখার ভিতর বুদ্ধির কোন প্যাঁচ নাই—পাণ্ডিত্য-প্রকাশের কোন প্রয়াস নাই—চক্‌চকে কথা বা কল্পনা লইয়া খেলা নাই। কেবল কাব্য ও কলা-সৌন্দর্যে মুগ্ধ তন্ময় হৃদয়ের বিভোরতা আছে। এই গ্রন্থে কালিদাস, ভবভূতি ও জয়দেব প্রভৃতি কবির কাব্য-সমালোচনায় তাঁহাদিগের প্রতিভার স্বরূপ অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহিভাবে নির্ণীত হইয়াছে। কাব্যোপভোগ-জনিত আনন্দের সহিত অমৃত-মিশ্রণে প্রোজ্জ্বল ও প্রস্ফুটিত অতি সহজ সরল যুক্তিসকল হৃদয়কে মধুর আকর্ষণে সত্য ও

সৌন্দর্যের কনকমন্দিরে উপনীত করে। গ্রন্থের ভিতর কোথাও দেখিলাম না, মিথ্যা বাক্‌চাতুরীর জালে চিরপ্রতিষ্ঠিত সত্যসকলের মর্যাদা লোপ করিয়া তাহাদের স্থানে উৎকট অভিনব মত স্থাপনের চেষ্টা—এবং রস ও সৌন্দর্য উপভোগের প্রধান অন্তরায় কাব্য-কলার তত্ত্বোদ্ভাবন-রূপ হালের আমদানী রোগ এ সুস্থ লেখকের লেখায় স্থান পায় নাই।" ঐ, পৃঃ ২২৪-২২৫

বলেন্দ্রনাথের লেখার দুইটি বিচিত্র আকর্ষণ আছে। প্রিয়নাথ বাবুর মতে, ইহার একটি অপূর্ব সম্মোহিনী শক্তি এবং অপরটি নির্ভীকতা। বলেন্দ্রনাথে এই দু'য়ের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। বলেন্দ্রনাথের 'নির্ভীকতা'র বর্ণনা করিতে গিয়া, প্রিয়নাথ বাবু লিখিতেছেন—"প্রতিভার আর একটি মনোহর এবং প্রকৃত লক্ষণ বলেন্দ্রনাথে বিদ্যমান—নির্ভীকতা। সমালোচনায় বা মৌলিক রচনায় যখন যাহা তিনি অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, বিনা সংশয় সঙ্কোচে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এ নির্ভীকতা ক্ষমতার পরিচায়ক, এবং প্রথম শ্রেণীর কলা-প্রবীণের স্বভাব-গত ধর্ম।" ঐ, পৃঃ ২২৮-২২৯

তাঁহার কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে প্রিয়নাথ বাবু কবির ভাষায় কি অপূর্ব বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শুধু পাঠযোগ্য নহে—উপভোগের সামগ্রী। এই প্রবন্ধের উপসংহারে ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—"এই দুই পুস্তকে বসন্ত ও বর্ষার বিভিন্ন শোভা ও বিচিত্র প্রভাবের মধ্যে কবির অন্তরের প্রেম আর অন্তরতমা সুন্দরী 'দিশে দিশে গীতে গন্ধে' মুঞ্জরিত। বিরহে—মিলনে, অন্তরে—বাহিরে, শয়নগৃহে—নদীবক্ষে, প্রেমের সেই নিত্য নব বসন্তোৎসব—আর হৃদয়ের সেই বর্ষা-ঘন-নিবিড় অনুরাগ। কিন্তু এ সুন্দরীর অবস্থান কোথায়—ইহার নাম কি? হৃদয়ের অন্তঃপুরে—কল্পনার দোলায় বাস এবং নাম মানসী। এক কথায় কবি তাঁহার হৃদয়বাসিনীকে সকল সুন্দরীর সৌন্দর্য, সকল বিলাস কলার শোভায় মণ্ডিত করিয়াছেন—

> 'একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
> সকল প্রেমের স্মৃতি'।" ঐ, পৃঃ ২২৭-২২৮

'ফলিত জ্যোতিষ'

"ফলিত জ্যোতিষ" প্রবন্ধে প্রিয়নাথ বাবু জ্যোতিষের এবং সেই সম্পর্কে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কোষ্ঠীর আলোচনা করিয়াছেন।

প্রবন্ধের ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন—"আজকাল ইয়োরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে ফলিত জ্যোতিষের চর্চা পূর্বেকার হইতে কিয়ৎপরিমাণে অধিকতর হইতেছে। উভয় মহাদেশেই ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে একাধিক সাময়িক পত্র সুচারুরূপে চলিত। এবং সম্প্রতি * * * * * * * * জনসাধারণের দৃষ্টি অধিক পরিমাণে ফলিত জ্যোতিষের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়—এমন কি এই জ্ঞানগর্বিত বিংশ শতাব্দীর একাধিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আগেকার মত ইহাকে অবজ্ঞার ভাবে দেখিতেছেন না। পুরাকালেও যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক-মাত্রই ইহার বিরুদ্ধ ছিলেন, তাহা বলা যায় না। ইহাতে বিশ্বাস-পরতন্ত্রতা সম্বন্ধে বিজ্ঞান-জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে! Bacon, Kepler এবং Newton ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস করিতেন।" প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি—পৃঃ ২৩১

তাঁহার মতে আমাদের দেশই ফলিত জ্যোতিষের জন্মস্থান। এখানে অতি প্রাচীনতম কাল হইতেই ইহার চর্চা ছিল। তিনি বলেন—"বেদে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। আমাদের দেশে ইহা ধ্রুববিদ্যা (Positive Science) বলিয়া পরিগণিত।" ঐ, পৃঃ ২৩৪

ফলিত জ্যোতিষের কোন সুদৃঢ় ভিত্তি আছে কি না, এবং এই শাস্ত্র প্রমাণসিদ্ধ কি না, তাহা লইয়া তিনি আলোচনা কারয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"ফলিত জ্যোতিষ বলে, মানুষের জীবনের উপর দুইটি প্রভাব লক্ষিত হয়। (১) তাহার নিজের কর্তৃত্ব—পুরুষকার, (২) অদৃষ্ট। এই দুই প্রভাবের অস্তিত্ব কেবল বিজ্ঞান-সম্মত নহে—সর্ববাদিসম্মত। নাস্তিক বা অজ্ঞ লোকেরা যাহাকে luck বা কপাল বলে, এই অদৃষ্ট সর্বতোভাবে না হউক আংশিকরূপে অজ্ঞ বিজ্ঞ সকল লোকের দ্বারাই স্বীকৃত। তাহার ভিতর কর্মফল, পরিবেষ্টনী (environment), luck প্রভৃতি আসিয়া পড়ে। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মানুষের কার্যকলাপ

ও চরিত্রগঠন সম্বন্ধে তাঁহার আত্মপ্রভাবকে অতিক্রম করিয়া বা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা মিলিত হইয়া দেশ, কাল, সমাজ, বংশ প্রভৃতি কার্য করে। তুমি দেশবিশেষে যেমন ভারতবর্ষে, কালবিশেষে যেমন আধুনিক কালে এবং বংশবিশেষে যেমন চণ্ডালবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিয়া তুমি পরাধীন, স্বায়ত্ত-শাসনে বঞ্চিত, নিরক্ষর, সমাজে উপেক্ষিত। তুমি কুষ্ঠীপিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া আজীবন স্বাস্থ্য-সুখ পাও নাই এবং তজ্জনিত নানা অভাব এবং দুঃখে পীড়িত। অদৃশ্য কারণ-সঞ্জাত তোমার সেই সকল অবস্থার দরুণ তোমার জীবন বিশেষ বিশেষ ঘটনাসঙ্কুল, তোমার বিশেষ বিশেষ সুখদুঃখ, তোমার চরিত্রে বিশেষ বিশেষ দোষগুণ। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে, এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে জন্মিলে তোমার জীবনের ঘটনাসকল, সুখদুঃখ, চরিত্রের বিকাশ বিভিন্ন প্রকারের হইত। কিন্তু দেশকাল প্রভৃতির নির্বাচনে মানুষের কোন কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা লক্ষিত হয় না। আমি কোন্ দেশ, কাল বা বংশে জন্মিব, তাহাতে আমার দৃশ্যত কোন হাত নাই। সুতরাং জীবনের বহুল অংশই অদৃশ্য প্রভাব বা অদৃষ্টের দ্বারা শাসিত এবং অন্ধকারে আবৃত। ফলিত জ্যোতিষ জীবনের এই অন্ধকারের কিয়দংশে আলোক প্রদান করে। জ্যোতিষীরা বলেন গ্রহনক্ষত্রাদি তোমার দেহ ও মনের উপর শক্তি সঞ্চালন করে এবং দেখাইয়া দেয় তোমার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিবে বা ঘটিতে পারে। জীবনের উপর বাহ্যপ্রভাবের মধ্যে সৌরজগতের গ্রহনক্ষত্রাদি অন্যতম। তাহারা মানব-জীবনের ঘটনাদি কতক অংশে পরিচালিত করে এবং পূর্ব হইতে নির্দেশ বা জ্ঞাপন করে। জ্যোতিষী-দের এই সকল কথার মধ্যে একটিও নিয়মের বিরুদ্ধ বা বহির্ভূত নহে।

"আমরা দেখিতে পাই, ভিন্ন ভিন্ন ঋতু দেহ এবং মনের উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব বিস্তার করে! ....বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রোগ উৎপাদিত হয়। 'সূর্যাবর্ত' (Sunstroke) প্রভৃতি রোগ সূর্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, গণ্ড-রোগাদি চন্দ্র হইতে সঞ্জাত, ইহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। তবে জ্যোতিষীরা যখন বলেন, হাম-রোগ মঙ্গল-গ্রহ হইতে উৎপন্ন, তখন তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে কেন? চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে অনেক রোগই জড়িত, তাহা পাশ্চাত্য-আয়ুর্বেদেও স্বীকৃত।" ঐ, পৃঃ ২৩২-২৩৪

ফলিত জ্যোতিষ যে সত্য ও অভ্রান্ত, এবং তাহা যে প্রত্যয় উৎপাদন করিতে পারে, প্রিয়নাথ বাবু তাহার দুইটি প্রমাণ দিয়াছেন ঃ—

"(১) জন্মকালে গ্রহসংস্থান দেখিয়া জ্যোতিষীরা জাতকের সাধারণ জীবন এবং প্রকৃতি নির্দেশ করেন, অর্থাৎ জাতক কি প্রকার লোক, তাহার বুদ্ধি, ধর্মভাগ্য প্রভৃতি কিরূপ বলিয়া দেন। তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী ও সন্তানাদির নির্দেশ করেন। জীবনের বিপদ্-আপদ্, সুখ-দুঃখ বলিয়া দেন।

(২) গ্রহগণের রাশিচক্র পরিভ্রমণকালে এবং ভিন্ন ভিন্ন দশায় জাতকের জীবনে কোন্ কোন্ সময়ে কি কি ঘটনা ঘটিবে, তাহা নিরূপণ করেন। বলা আবশ্যক এই ফলাফল-গণনা গণিত জ্যোতিষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। গণিত জ্যেতিষ যে মুহূর্ত, জাতকের জন্ম-মুহূর্ত বলিয়া নির্ধারিত করে, তাহা নির্ভুল হওয়া চাই—এবং সেই মুহূর্তে গ্রহগণের আকাশের কোন্ অংশে স্থিতি তাহার দ্রাঘিমা ইত্যাদি অভ্রান্তরূপে নির্ধারিত করিতে হইবে। গণিতে ভুল—গোড়ায় গলদ। তাহাতে ফলের তারতম্য হইবেই।"

ঐ, পৃঃ ২৩৬

কবিবর রবীন্দ্রনাথের কোষ্ঠী-বিচার

উপরি লিখিত দুইটি প্রমাণের সমর্থনকল্পে তিনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কোষ্ঠী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন ; এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন— "আমরা যদি কোন একখানি কোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে পারি যে, তাহা জাতকের প্রকৃতি এবং জীবনের ঘটনাদির সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলিতেছে, তাহা হইলে অনুসন্ধানের পথ খুলিয়া দিয়া সত্য এবং প্রকৃত তথ্য নির্ধারণের সাহায্য করিব।" ঐ, পৃঃ ২৩৭

অতঃপর তিনি রবীন্দ্রনাথের জন্মকালীন রাশিচক্রের একটি প্রতিলিপি দিয়াছেন। এবং রাশিচক্রের দ্বাদশটি গৃহের ভাববিচার, হার্সেল ও নেপচুন ব্যতীত নবগ্রহের অবস্থানবিচার, পরস্পরের সম্বন্ধবিচার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে,—" * * কোষ্ঠীর যে সাধারণ ফল লিখিত হইল, তাহা হইতে নিরপেক্ষ পাঠক বিচার করিবেন, ফলিত জ্যোতিষকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া কতদূর সঙ্গত।" ঐ, পৃঃ ২৪৫

বর্তমান সময়ের প্রায় ৩৯ বৎসর পূর্বে প্রিয়নাথ তাঁহার “ফলিত জ্যোতিষ” প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কোষ্ঠী বিচার করিয়াছেন। তিনি তৎকালে যেভাবে কবির কোষ্ঠী বিচারপূর্বক তাহার ফলাফল লিখিয়াছেন, তাহা বর্তমান সময়ে অনেকের কৌতূহল উদ্রেক করিবে। কারণ সে সময়ের রবীন্দ্রনাথ ও আজকালকার রবীন্দ্রনাথ,—দুই সমান নয়। তখনকার রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ও যশঃ বাংলা বা ভারতেই বিস্তৃত, আর এখন তাঁহার যশঃ ও খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীব্যাপী।

রবীন্দ্রনাথের কোষ্ঠী-বিচারের সূচনায় প্রিয়নাথ বলিতেছেনঃ—“এই জাতক যখন জন্মিয়াছেন, তখন পূর্বাকাশে মীনরাশি উদীয়মান; সুতরাং ইঁহার জন্মলগ্ন মীন। লগ্নে জাতকের আকৃতি, রূপ, স্বাস্থ্য, বল ও বংশ প্রভৃতি নিরাকৃত হয়। এই প্রবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কোষ্ঠী-বিচার হইতে পারে না এবং তাহা আমাদেরও উদ্দেশ্য নয়। তবে জাতক-জীবনে যাহা উল্লেখযোগ্য তাহাই বলিব এবং যে যে ভাব তাঁহাকে অপর সকল লোক হইতে বিশেষত্ব দিয়াছে, তাহা দেখাইব। এক কথায় উদ্ধৃত কোষ্ঠী জাতক সম্বন্ধে কি বিশেষ ভাগ্য নির্দেশ করে, তাহা বাস্তবের সঙ্গে মিলাইয়া ফলিত জ্যোতিষ যে ধ্রুববিদ্যা—উপন্যাস বা গালগল্প নহে,—তাহা বুঝাইব।”

ঐ, পৃঃ ২৪০

ইহার পর তিনি রবীন্দ্রনাথের জন্মকালীন রাশিচক্রে অবস্থিত গ্রহ এবং দ্বাদশ ভাবের বিচার করিয়াছেন। ইহা দীর্ঘ হইলেও, একজন বিশ্ববরেণ্য কবির অদৃষ্ট-বিচার বলিয়া তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ম / কে	র বু শু	লং চ / ০
বৃ		০
শ / ০	০	রা / ০
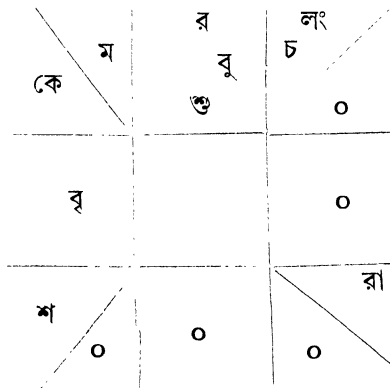
"জাতকের লগ্ন মীন, সর্বশ্রেষ্ঠ শুভগ্রহ বৃহস্পতির গৃহ। মীনরাশি স্বচ্ছবর্ণ সুতরাং জাতকের বর্ণ গৌর। সেখানে আবার গ্রহদিগের মধ্যে যে দু'টি গ্রহ গৌরবর্ণ, চন্দ্র এবং বৃহস্পতি, তাহাদের পূর্ণপ্রভাব লক্ষিত হয়। চন্দ্র মীন রাশিতেই অবস্থিত এবং স্বামিগ্রহ১ বৃহস্পতি লগ্নকে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছে। তাহাতে বর্ণকে আরও উজ্জ্বলতর করিয়াছে। রূপ এবং আকৃতি কান্ত, মনোহর এবং শোভন। স্বাস্থ্য এবং বল সম্বন্ধে ঐ কথাই খাটে। তিনি সুস্থদেহ এবং বলশালী। তাঁহার বংশ সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং উজ্জ্বল আভিজাত্য-গৌরবে অলঙ্কৃত। নৈসর্গিক তেজে সর্বাপেক্ষা তেজোময় গ্রহরাজ সূর্য, এবং সর্বাপেক্ষা শুভগ্রহ বৃহস্পতি, উভয়েই তুঙ্গী২ হইয়া জাতককে অপরদিক্ হইতে উচ্চ বংশ-গৌরব এবং সুস্থ সুন্দর দেহ, উন্নত মানসিক বৃত্তিসকল দিয়াছে। লগ্ন সম্বন্ধে জাতকের এই বিশেষত্ব।

"২য় স্থান বা ধন সম্বন্ধে জাতকের এই অসামান্য সৌভাগ্য দৃষ্ট হয় না। তবে জাতক ধনহীন নহে। তিনি ধনী। তুঙ্গগ্রহ রবি দ্বিতীয়স্থ বলিয়া তাঁহাকে ধন দিয়াছে, কিন্তু ঐ রবি শত্রু ভাবের অধিপতি৩ বলিয়া মাঝে মাঝে ধনের হানি হইয়া থাকে। ধনভাবস্থ বুধ ও শুক্র দুইটি সৌম্যগ্রহও তাঁহাকে ধন দিয়াছে, শুক্রগ্রহ উত্তরাধিকারি-সূত্রে। কিন্তু তাহারা অস্তগত বলিয়া ধনের হানি করিয়াছে। পরন্তু ধন সম্বন্ধে জাতকের বিশেষত্ব এই যে, বুধ ও শুক্র দ্বিতীয়স্থ থাকায় তাঁহার স্বীয় বিদ্যাবলে ধন উপার্জন হইবে।

"৩য় বা ভ্রাতৃস্থান অশুভ গ্রহ মঙ্গলযুক্ত এবং শনি কর্তৃক পূর্ণ বীক্ষিত; তজ্জন্য অনুজ না হইবার সম্ভাবনা, হইলেও তাঁহার মৃত্যু সম্ভাবিত; অন্ততঃ জাতকের অব্যবহিত অগ্রজ এবং কনিষ্ঠের অমঙ্গল স্পষ্টত সূচিত।

"৪র্থ অর্থাৎ মাতৃস্থান কেতু-যুক্ত। রাহু কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট। স্বামিগ্রহ বুধ অস্তগত এবং ষষ্ঠাধিপতি রবি এবং মরণাধিপতি শুক্রযুক্ত সুতরাং

---

১ মীন রাশির অধিপতি বৃহস্পতি, সে হিসাবে ইহাকে 'স্বামিগ্রহ' বলা হইয়াছে।

২ তুঙ্গী অর্থাৎ উচ্চ স্থানে স্থিত।

৩ কবির ষষ্ঠস্থান সিংহ এবং সিংহরাশির অধিপতি রবি। ষষ্ঠস্থানকে "শত্রুক্ষেত্র" বলা হয়।

জাতক অল্প বয়সেই মাতৃস্নেহ-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। তাঁহার বন্ধুত্ব-সৌভাগ্যও স্থায়ী নয়। একাধিক বন্ধুর সহিত মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ বা অপ্রীতি ঘটিতে পারে।

"৫ম স্থানে বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়। 'বুদ্ধি-প্রবন্ধাত্মজ-মন্ত্রবিদ্যা'। মুনি-ঋষিগণ মানসপুত্র এবং ঔরসজাত পুত্রের কল্পনা একই স্থানে করিয়াছেন। এই ভাবে জাতকের অসামান্য সৌভাগ্য। ৫ম স্থান কর্কটরাশি, সৌম্যগ্রহ চন্দ্রের গৃহ এবং চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ শুভগ্রহ বৃহস্পতি যুক্ত। সুতরাং ৫ম স্থান 'সৌম্যস্বামিযুতেক্ষিত' বলিয়া জাতকের বিদ্যাবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। তাহাতে কর্কটরাশি বৃহস্পতির তুঙ্গ বা সর্বোচ্চ স্থান। সে কারণে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি গরীয়সী। সেই বৃহস্পতি আবার লগ্নাধিপতি হইয়া পঞ্চমে অবস্থিত; সুতরাং আজন্ম বিদ্যানুশীলনে ও জ্ঞানচর্চায় রত এবং তাহাতে অসীম এবং অসামান্য সৌভাগ্যশালী। এখনও শুভপ্রভাবের শেষ হয় নাই।* পঞ্চমাধিপতি চন্দ্র লগ্নগত। একে ত' 'লগনচাঁদা বেদ বাখানে' তাহাতে এ স্থানে লগ্ন এবং পঞ্চম ভাবে বিনিময়। ইহা একটি অত্যন্ত দুর্লভ এবং অমৃততুল্য যোগ। পঞ্চম ভাবে এতগুলি শুভযোগ হাজার, দশহাজার বা লক্ষেও ঘটে না। জাতকের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একটি কথায় এবং কেবল একটি মাত্র কথায় দেওয়া যাইতে পারে; তাহা প্রতিভা। এবং লগ্নস্থ চন্দ্র তাঁহাকে সুন্দর এবং অনন্যসাধারণ কল্পনা শক্তি দিয়াছে।

"৭ম অর্থাৎ জায়াভাবে তাদৃক্ সৌভাগ্য দৃষ্ট হয় না। জায়াভাব গ্রহশূন্য স্বামিদৃষ্টিবর্জিত। এবং সৌম্য গ্রহদিগের মধ্যে কেবলমাত্র বৃহস্পতি কর্তৃক পাদদৃষ্ট। যেমন জায়াভাব জায়াধিপতির দৃষ্টিরহিত—জায়াকারক গ্রহ শুক্রেরও দৃষ্টিরহিত। এবং জায়াধিপতি এবং জায়াকারক গ্রহ, উভয়েই অস্তগত। অধিকন্তু মঙ্গলের ক্ষেত্রে শুক্রের অবস্থান হেতু জায়াহানি সূচিত। এবং শুক্র মরণাধিপতি হইয়া জায়াপতি বুধের সহিত যুক্ত। এই সকল প্রবল কারণে জাতক দাম্পত্যসুখ বহুদিন ভোগ করিতে পারেন নাই।

* প্রিয়নাথ বাবু এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন। এই প্রবন্ধটি ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার পর নোবেল-প্রাইজ প্রাপ্তি প্রভৃতি যে সমস্ত ঘটনা ঘটে, তাহা সাধারণে বিদিত আছেন।

"৯ম বা ভাগ্যস্থান উৎকৃষ্ট স্বামিগ্রহ মঙ্গল এবং সৌম্যগ্রহ বৃহস্পতি কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট। সুতরাং জাতক ভাগ্যবান্। অধিকন্তু ভাগ্যস্থান সর্বগ্রহ-বীক্ষিত বলিয়া জাতকের ভাগ্যের পরম উৎকর্ষসাধন করিয়াছে।

"১০ম, কর্ম এবং যশের স্থান। ইহার পরীক্ষা করিয়াই এই কোষ্ঠীর সাধারণ বিচার শেষ করিব। ১০ম স্থান বৃহস্পতির ক্ষেত্র, ধনুরাশি এবং যদিও উহা স্বামিগ্রহের দৃষ্টিবঞ্চিত—কিন্তু অপর সমস্ত গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইবার কারণ শুভ ফল-সূচক। পরন্তু ১০ম ভবননাথ বৃহস্পতি তুঙ্গী এবং ত্রিকোণস্থিত বলিয়া জাতক প্রসিদ্ধ 'ক্ষেত্র-সিংহাসন' যোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ফলে জাতকের বিশ্ববিখ্যাত কীর্তিলাভ করিবার কথা। তবে সে স্থানে রাহু অবস্থিত এবং বৃহস্পতির দৃষ্টি নাই বলিয়া সময়ে সময়ে জাতকের অপযশ ও অখ্যাতি ঘটে।

"এই দশম স্থানে পিতৃ-প্রকৃতি নিরূপিত হয়। জাতকের পিতা পরম ধার্মিক, উন্নত ও সাধুচরিত্র। এবং যে যে কারণে মধ্যে মধ্যে জাতকের যশের হানি হয়, সেই কারণে তাঁহার পিতারও সময়ে সময়ে স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং শারীরিক ও মানসিক কষ্টও পান।" ঐ, পৃঃ ২৪০-২৪৪

'সুলোচনা'

'সুলোচনা' একটি গল্প। গল্পটি ছোট, দশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাকে ঠিক ছোট গল্প বলা চলে না, স্মৃতি-কথার আকারে ইহা একটি করুণ কাহিনী। এ কাহিনী পাঠে মর্মের অন্তস্তলে ব্যথা অনুভূত হয়। এমন করুণরসাত্মক কাহিনী প্রাঞ্জল ভাষায় ও অপূর্ব ভঙ্গীতে লেখা খুব কমই পাঠ করা যায়। কাহিনী—পল্লীর একটি সরলা বালিকার—তাহারই নাম 'সুলোচনা'।

সুনিপুণ শিল্পী নিপুণতার সহিত এ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাতে ঘটনার কোন আড়ম্বর বা কোন বিশেষত্ব নাই। আছে দরদ দিয়া লেখা পল্লীর একখানি নিখুঁত চিত্র, সেই সঙ্গে একটি পল্লী-বালিকার করুণ কাহিনী।

শৈশবের কথা বলিতে গিয়া কবি প্রিয়নাথ আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার সৌন্দর্যবর্ষী লেখনীর মুখে সৌন্দর্য-ধারা ছড়াইয়া পড়িতেছে—

কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—"আহা সেই মধুর বালককাল। স্মৃতির আকাশপটে সেই মধুর তারকা! বর্তমান হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু স্মৃতিপটে তেমনি শোভন তেমনি উজ্জ্বল তেমনি মধুর! হারাণ মাণিক—যখন ছিল তখন ছিল বলিয়া আদর পায় নাই।......

"শৈশবকাল ইদন কানন! সে উদ্যানে অভাব নাই, সে উদ্যানে ক্লেশ নাই। এখন আমার ললিতমাংস, পলিত কেশ, সেই চঞ্চল ক্রীড়াশীল বালককে স্মরণ করিতেছে। আমার মন সেই সরল সহাস বালকাত্মার ধ্যান করিতেছে। লবণাক্ত সাগরগর্ভে নিমগ্না নদী সেই পর্বতবিহারিণী নির্ঝরিণীকে গভীর কল্লোলে ডাকিতেছে।

"কিন্তু সেই পর্বতবিহারিণী নির্ঝরিণী পর্বতবিহারী পবন সনে খেলিতেছে; মৃদুস্ফুট স্বরে গান গাহিতেছে, তীরস্থ প্রসূনমালে শ্যামকেশ বিনাইয়া নাচিতেছে, ভানুকিরণে ঈষৎ হাসিতেছে। সমুদ্র-কন্দর হইতে ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ করিয়া নদী ডাকিতেছে। নির্ঝরিণী খেলিতেছে, নাচিতেছে, মালা পরিতে পরিতে গাহিতেছে। হায় বালককাল, তোমাকে আর পাইব না।" প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি—পৃঃ ২৪৭-২৪৮

কি সুন্দর ও উপভোগ্য বর্ণনা! আর একস্থানে কবি প্রিয়নাথ পল্লী-প্রকৃতির একটি মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—"এইমাত্র বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। গাছের ভিজাপাতাগুলি সূর্যের আলোকে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। আর্দ্র পল্লব হইতে রামধনুক কাটিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিতেছে। নীল আকাশখানি—দিগন্তে শাদা মেঘগুলি ঘুমাইয়া রহিয়াছে। বর্ষা-বারিনিষিক্ত পৃথিবীর হৃদয় হইতে আনন্দ-বাষ্প উঠিতেছে। আমি সেই স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়াইয়া আছি। পুকুরের জলে নীল আকাশ কেমন হাসিতেছে।" ঐ, পৃঃ ২৪৮-২৪৯

প্রিয়নাথের পদ্য রচনা

তাঁহার বহু কবিতা 'ভারতী' 'বালক', 'কল্পনা', 'দীপিকা', 'সাহিত্য', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী', 'সমালোচনী', 'জাহ্নবী', 'মানসী', 'ব্রহ্মবিদ্যা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতা "নীহারিকা" ১২৮৯ সালের (খৃঃ ১৮৮২) 'ভারতী'তে বাহির হয়। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

'নীহারিকা'

(১)

"গভীর নিথর রাতি, মলিন চন্দ্রমা-ভাতি
বহে ধীরে শীতল পবন ;
শারদ গগন-ভালে অলস নীরদজালে
ভাঙ্গা চাঁদ দেখিছে স্বপন।
রজনীর অশ্রুজল ছুঁয়িছে মরমস্থল,
ভাঙ্গা গান, ভোলা তান ভেসে আসে কাণে !
নিদ্রা নয়, মৃত্যু নয়, কি এক অলসময়,
ছায়া মোর পড়িতেছে প্রাণে !
এমন নিথর রাতি, এমন উদাস ভাতি,
দেখেনি কখন আর আকাশ অবনী ;
এমন এমন করি জীবনের মূল ধরি,
গুপ্তকথা ধীরে ধীরে বলেনি রজনী।
স্থির অবসন্ন প্রাণ করিছে নিশীথে দান
জীবনের ভগ্ন অবশেষ,
মিলেছে বড়ই ভাল, ভাঙ্গা চাঁদ, ভাঙ্গা আলো,
ভাঙ্গা প্রাণে স্বপন-আবেশ।
ভাঙ্গা চাঁদ, ভাঙ্গা আলো, ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘজাল
ঘুমন্ত ছায়ার ওই ভাঙ্গা ভাঙ্গা দেহ।
সকলি গো হৃদিমাঝে নিথর সলিলে রাজে
আমি যেন হয়ে আছি রজনীর কেহ।
তমাল তরুটি হোথা, কিছু না কহিছে কথা,
মর মর সর সর অরণ্যের বাণী,
স্তম্ভিত বিস্ময়াবেশে দেখিতেছে পাদদেশে
নগনা জ্যোৎস্নার কোলে সুপ্ত ছায়াখানি।
জানি না কেমন ক'রে একখানি মেঘ স'রে
পড়িল ঢাকিয়া ধীরে চাঁদের বয়ান ;

চেতনা যা কিছু ছিল, তাহাও ফুরায়ে গেল।
স্মৃতিরও প্রেত-আত্মা করিল প্রয়াণ।

(২)

তুষার-অঙ্গুলি দিয়া মর্ম্মস্থান কাঁপাইয়া
শিরোদেশে স্থির নেত্র রজনী আমার,
পড়িছে নিশ্বাস মুখে শূন্য এ উদাস বুকে
আঁধার আঁধার তার করিছে সঞ্চার!
সেই আঁধারের কোলে, হৃদয় পড়িল ঢুলে,
রজনীর রাজ্যে আমি করিনু প্রবেশ;
উদাস অনিল ধীরে, কি মন্ত্র বলিল মোরে,
জাগিনু গেল না তবু নিদ্রার আবেশ।
বায়ুর সে কথা শুনি কেমন করিল প্রাণী
ছায়াময় আলো এলো হিয়ার মাঝারে।
সেই সে আলোক ধরি, চারিদিক্ ফিরি ঘুরি
দেখিনু চলেছে নদী কানন আঁধারে।
চারিদিকে বৃক্ষ যত নীরব নিঝুম নত
নাহি কোন সাড়া শব্দ অনন্ত গোধূলি।
ঈষৎ চঞ্চল জলে বোঁটা-ভাঙ্গা পদ্ম দোলে
হেরিছে মলিন মুখে মলিন তারকাগুলি।
তার মাঝে কি দেখিনু কেন কেন শিহরিণু
হৃদয়ের যত তার উঠিল বাজিয়া।
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ছিঁড়ে খুঁড়ে গেল মন,
উলটি পালটি গেল বিদলিত হিয়া।
সব গেল, সব গেল ভূত ভবিষ্যৎ গেল
দেহ, মন, প্রাণ গেল—গেল গেল সব।
রহিল কেবল জাগি শূন্যে শূন্যে কৃপা মাগি
আঁখি দুটি হারাইয়া অশ্রুর বিভব।

সেই সে গোধূলি মাঝে নদীর বুকের মাঝে
দেখিনু ভাসিছে ধীরে ঘুমন্ত আনন।
করুণা-ছানিত মুখ দেখিলে চমকে বুক,
অধরে ফুরাণ হাসি মুদিত নয়ন।

(৩)

অহো মোর প্রাণের মাঝারে—
লাগিয়া রয়েছে সেই শ্রান্ত হাসিখানি,
বিষাদে মুদ্রিত ছুটি নয়ন-পল্লব,
কুঞ্চিত কপোলে সেই করুণা-রাগিণী
উছলিয়া উঠে প্রাণে কাতর ক্রন্দন,
আঁখি মোর জলে আসে ভরে,
রজনী পরাণ তব দাও মিশাইয়া
আমার এ প্রাণের মাঝারে!
দাও সখি, দাও তব করুণ জ্যোছনাখানি
করুণ কুসুম তোর যত ;
কেঁদে কেঁদে হই সারা, জীবন ফুরায়ে যাক্
তোর শেষ হাসিটুক মত।
দিবস রাজার বেশে এস না আমার কাছে
এস না গো প্রভাতের বায় :
সম্পদের খর হাসি গৌরবের খর দীপ্তি
আসিও না তোমরা হেথায়।
দাও মা শ্মশান-ভূমি তোমার উদার কোল
তোমার ও চিতাভস্মরাশি,
বড় লাগিয়াছে প্রাণে তপস্বিনী বেশ তব
বিষাদ মাখান তব হাসি!
শুইয়া রহিব তোর বুকে,
নিমীলিয়া ক্লান্ত আঁখি ছু'টি,
চাঁদ মোর মুখপানে থাকিবে চাহিয়া।

কুলু কুলু কুলু কুলু নাদে
তোমার বারতা লয়ে লয়ে
আপনা বিলাতে নদী যাইবে বহিয়া।
দূর দূরান্তর হ'তে আসিবে প্রাণের মাঝে
শিবাদের হাহাকার নিশীথ ক্রন্দন,
পেচক কঠোর কণ্ঠে সুধাইবে রজনীরে
কাহাদের শোকাবেগ উদ্দাম এমন।
মরণ আসিলে সেইখানে
দুটি হাত ধরিয়া তাহার
নিবেদিব লয়ে চল—লয়ে চল মোরে
আছে যথা সেই মুখখানি,
করুণ নয়ন সেই দু'টি—
অনন্ত গোধূলিময় নদীর মাঝারে।"

এই কবিতায় প্রিয়নাথ বাবুর কবিত্বশক্তির যে স্ফুরণ দেখা যায়, তাহা সাধারণত প্রতিভাবান্ কবির প্রথম রচনার মধ্যে সকল সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। কবিতাটি দুঃখবাদসূচক হইলেও ইহার সুমিষ্ট ঝঙ্কার ও প্রসাদ-গুণ মনকে সহজেই মোহিত করে। শুধু কথার সাহায্যে একটির পর আর একটি সুন্দর চিত্র ধীরে ধীরে পাঠকের নয়ন-সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া তিনি অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

নিম্নে প্রিয়নাথ লিখিত "রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক একটি অপ্রকাশিত কবিতা উদ্ধৃত হইল—

"রবীন্দ্রনাথ

তোমার সঙ্গীত-রবে স্পন্দিত বরষ—
ললিত রাগিণী কভু বীণার কাঁদন,
কভু বা মুরজ-মন্দ্র গভীর বেদন
নর-হৃদয়ের! হেথা বসন্ত-সরস-
বাণী—বন অরণ্যের শ্যামল হরষ;
নিদাঘ রুদ্রের সেথা রাঙিম নয়ন;

বরষা-উৎসবে পুন সঘন শ্রাবণ—
ছন্দে ছন্দে বরষের বিচিত্র পরশ।
কালের অসীম নিশি আজি আলোকিত,
চন্দ্রে-সূর্যে নয়—তারা উঠে, অস্ত যায়—
প্রতিভার চিরোজ্জ্বল অমর প্রভায়
সমুজ্জ্বল চারি যুগ নয়নে উদিত!
'কল্পনা'—'কাহিনী'—'কথা'—'কণিকা' হীরার
চারিদিকে চারি রবি চতুষ্ক শোভার!"

কবি প্রমথনাথের উদ্দেশে সনেট

কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় প্রিয়নাথ বাবুর একজন প্রিয় সুহৃদ্ ছিলেন। প্রিয়নাথ বাবু ১৩০৭ হইতে ১৩১০ সাল পর্যন্ত এই চারি বর্ষের প্রতি প্রথম দিবসে (১লা বৈশাখ) প্রমথনাথকে একটি করিয়া স্বরচিত সনেট উপহার দেন। ১৩০৯ সালে লিখিত সনেটটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

সুহৃদ্বরেষু—

বর্ষ যায়—বর্ষ আসে! কেহ বহি আনে
দেবতার আশীর্বাদ—গৃহের প্রাঙ্গণ
ছেয়ে দেয় ফলফুলে প্রফুল্ল নয়ানে;
অশনিসম্পাতে কেহ করিয়া দহন
সুখকুঞ্জ রেখে যায় বিক্ষত উরসে
দীপ্ত লৌহশলাকার লেখন গভীর।
কেহ বাঁধে প্রীতি-রাখি মিলন হরষে,
বিরহে—বিয়োগে কেহ চক্ষে আনে নীর।
গত বর্ষ দিল মোরে আনন্দের থালি
ভেটিল অমর গান—নন্দন আলোক—
কবি-জীবনের চির বসন্তের ডালি
কবি-হৃদয়ের স্নেহ—অম্লান অশোক।

৺প্রিয়নাথ সেন ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

ভাসালে আঁধার গাঙ্গে শোভার 'দীপালি'
দীপ্ত ছায়াপথ যেন উজলে ভূলোক।"

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশে কবিতা

পরিহাস-রসিক সুকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সহিত প্রিয়নাথের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। ১৩১৩ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের নামেও তিনি একটি কবিতা রচনা করেন। নিম্নে ইহা উদ্ধৃত হইল—

"কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
সুহৃদ্বরেষু—

তোমার আতিথ্য, সখা, ভুলিবার নয়
ভুলিবার নয় তব পুত্রকন্যা দু'টি
'মণ্টু' আর 'মায়া'-মাতা—সরল নির্ভর,
শিশুজীবনের দুষ্টামির নাহি ত্রুটি,
পরস্পর স্নেহ বিনা অপর শাসন
নাহি—পিতৃসঙ্গ আর। শুধু কণ্ঠ সনে
কণ্ঠ নহে, মর্মে মর্ম করিয়া মিলন
তোমার প্রতিভা-লক্ষ্মী গড়িছে দু'জনে।
সে প্রতিভা হাস্যে শুধু? বঙ্গ-কবিকুলে
জাগাইতে হাস্য-রস তুমি একা, শুনি,
কিন্তু কাণ আছে যার, কাঁদে ফুলে ফুলে
শুনিয়া বীণার তব প্রচ্ছন্ন কাঁদুনি—
অশ্রুজলে আর্দ্র হাসি—অশ্রু হাস্যোজ্জ্বল
মেঘ রৌদ্রে ধরা যথা শরতে বিহ্বল।"

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গয়ায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময়ে প্রিয়নাথ বাবু একবার তাঁহার আতিথ্য-গ্রহণ করেন, গয়া হইতে ফিরিয়া তিনি এই কবিতাটি রচনা করেন।

প্রিয়নাথের ইংরেজী রচনা

প্রিয়নাথ ইংরেজীতেও কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার ইংরেজী

কবিতাও হৃদয়গ্রাহী ছিল। প্রিয়নাথ বাবুর একটি ইংরেজী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

"AT THE YEAR'S END

The year has found its goal,
Hope finds no work to begin,
Life yawns—a barren waste,
When—when will death close in?
What sturdy thorns to fight
To win a short-lived rose!
For a doubtful dawn to pass
What night of sleepless throes?
A wisp's faint light in front,
Behind—the Heaven's dome
Glares red, a beacon fire,
Fed by my burning home."

উপরে প্রিয়নাথ বাবুর যে ইংরেজী কবিতাটি দেওয়া হইল, তাহা তাঁহারি রচিত একটি বাংলা কবিতার অনুবাদ। এই কবিতা ১২৯৯ সালের মাঘ মাসের "সাহিত্যে" (পৃঃ ৬৪৮) প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নাম—"বৎসরের শেষে"। এখানে উহা উদ্ধৃত হইল—

"বৎসরের হলো শেষ
আশার পাই না থাই ;
জীবনে নাহিক কাজ
মরিলেই বেঁচে যাই।
কত কাঁটা ফুটেছিল
একটি ফুলের তরে,
কত অশ্রু ঝরেছিল
একটি হাসির পরে ;

সমুখে আলেয়া-আলো
পিছনে ফিরিয়া দেখি—
এখনো রক্তিম নভ
দগ্ধ-গৃহ-বহ্নি মাখি।"

প্রিয়নাথের কবিতাবলীর তালিকা

১২৮৯ সালের "ভারতী" পত্রিকায় তাঁহার তিনটি কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়, সে তিনটি কবিতার নাম—নীহারিকা, গাথা ও কবিতাসাধনা। তাহার পর ১২৯২ সালের "বালক" পত্রে "সোহাগ" ও "স্নেহের পুত্তলি" নামক দুইটি কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি ছাড়া বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ১২৯২ সাল হইতে ১৩২০ সাল পর্যন্ত—এই ২৯ বৎসরের মধ্যে তাঁহার নিম্নলিখিত একান্নটি কবিতা বাহির হয়—

১। গাহিতাম প্রেম গান
২। লজ্জাবতী
৩। উদ্দাম হৃদয়
৪। নব সম্ভাষণ
৫। মা
৬। অনন্ত রোদন
৭। ভুল
৮। কারাবাস
৯। নবজাত শিশুর প্রতি (১)
১০। নবজাত শিশুর প্রতি (২)
১১। বিবসনা
১২। বিরহ
১৩। উদ্বোধন
১৪। কোনও একটি বৃদ্ধের প্রতি (১)
১৫। কোনও একটি বৃদ্ধের প্রতি(২)
১৬। বৎসরের শেষে
১৭। জননী
১৮। নিশীথিনী
১৯। রবীন্দ্রনাথ
২০। শ্মশান
২১। স্বপন-পুরে
২২। বসন্ত-অন্তে
২৩। "চলি চলি পা পা"
২৪। মানসী
২৫। কতদিন
২৬। স্মৃতি
২৭। একটি তারকার প্রতি
২৮। ভিক্টর হিউগো হইতে
২৯। হেমচন্দ্র
৩০। মধ্যাহ্নে
৩১। কালিদাস
৩২। জাহ্নবী

৩৩।	আরতি	৩৪।	শ্রাবণে
৩৫।	আমার গীতগুলি	৩৬।	তেহি নো দিবসা গতাঃ
৩৭।	নির্বাসিত	৩৮।	আমোদিনী
৩৯।	বিষাদিনী	৪০।	পরিচয়
৪১।	ওমর খায়ামের রুবাই	৪২।	১লা বৈশাখ, ১৩০৭
৪৩।	১লা বৈশাখ, ১৩০৮	৪৪।	ঐ ১৩০৯
৪৫।	ঐ ১৩১০	৪৬।	কবি ও মধুকর
৪৭।	কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায়	৪৮।	প্রকৃতি
		৪৯।	প্রাচীন ফরাসী কবি হইতে
৫০।	সনেট	৫১।	ললনা

প্রিয়নাথের দুঃখবাদ

প্রিয়নাথের অনেক কবিতাতেই দুঃখবাদের আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার এই দুঃখবাদের ভিত্তি—প্রধানত পূর্বস্মৃতি। পূর্বে জীবনে যে সকল উদ্দাম আনন্দ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল, সে সকল এখনও তিনি মাঝে মাঝে অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহার "উদ্দাম হৃদয়" নামক কবিতাটিতে এই পরিচয় পাওয়া যায়—

"হায় কেমনে বলিব বারে বার—
তাহার সে মুখখানি সরল কুসুম সম
সাঁজের কোমল কায়ে আলোক প্রচার।
প্রাণের আঁধার মোর যায় না যায় না হায়
তার সে আলোক দানে;
তার সে সরল স্নেহ তার সে কোমল প্রাণ
পশে না পশে না মোর প্রাণে।
আঁধার আঁধার মোর হৃদি
গভীর অগাধ মোর তৃষা,
কেমনে মিটিবে বল কেমনে জুড়াবে বল
হৃদয়ের দারুণ পিপাসা।

জানি নাক যাহা আমি তাহার হৃদয় মাঝে
আছে গো কতই শোভা।
অজানা খনির গলে অপরূপ আলো জ্বেলে
আছে কত মণি মনোলোভা।
তুমি সখি এতটুকু রজত নীহার ধার,
কোমল কুসুমহৃদে তোমার আসন ;
এসো না আমার কাছে শুকাইয়া যাবে তুমি
প্রদীপ্ত ভাস্কর মোর অতৃপ্ত জীবন।
আমার প্রচণ্ড প্রেম উড়াইয়া দেয় কত
রাজ্য আর রাজার সম্পদ্।
অতৃপ্ত বাসনা-মুখে আসে গো যখন যাহা
ঘটে তার বিষম বিপদ্।
অনলের মত দহে দারুণ দুরন্ত প্রেম
বহে যায় ঝড়ের সমান ;
অতল জলধি-জল নিভাতে পারে না তারে
নিশি তায় করে না নির্বাণ।"

প্রিয়নাথের পরদুঃখে সহানুভূতি

অকপটভাবে যে ভালবাসিতে পারে, পরের দুঃখে, বেদনা ও হাহাকারে তাহার হৃদয় সহজেই ব্যথিত হয় ; অনেক সময় এও দেখা যায় যে, সেই সমস্ত কষ্ট নিজের শিরে বহন করিবার জন্য একটা ব্যাকুলতা তাহার মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়। কবির "অনন্ত রোদন" কবিতার মধ্যে এই ভাবটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—

"চিরদিন—চির সেই হাহাকার ধ্বনি,
গভীর নিশীথে জাগে করুণ ক্রন্দন,
জীবনে জীবিত সদা জীবের রোদন,
শত ঘায়ে প্রতিদিন মূৰ্ছিত ধরণী ;
কেন রে কিসের তরে আকাশ অবনী

বহে এই চিরন্তন দুঃখের কল্লোল—
মরুময় শুষ্ক কণ্ঠে আধ উতরোল,
আশাহীন, ভাষাহীন অশ্রুর কাহিনী ?
দেখিয়া এ জীবনের অনন্ত রোদন,
ব্যথিত কাতর ক্লিষ্ট পীড়িত সখারে,
সাধ যায় গড়ে তুলি—বিপুল জীবন
দাঁড়াই হিমাদ্রি সম দুঃখের সংসারে।
কেড়ে লই মানবের অসীম বেদন,
একা বুঝি, একা যুঝি দুরন্ত পাথারে।”

এই পর-সহানুভূতিই কবি-হৃদয়ের অমূল্য সম্পদ। ইহার অধিকারী হইয়াই কবি বলিতে সমর্থ হইয়াছেন—

“কেড়ে লই মানবের অসীম বেদন,
একা বুঝি, একা যুঝি দুরন্ত পাথারে।”

“কোনও একটি বৃদ্ধের প্রতি (২)” কবিতাতেও তাঁহার হৃদয় যে জীবের দুঃখে খুবই কাতর, তাহা বেশ বুঝা যায়, তাই তিনি বলিতেছেন—

“জীব হয়ে জীব-দুঃখ বাড়ায়ো না কভু।”

কবিতাটির শেষ ছয় পংক্তিতে কবি-হৃদয়ের পরদুঃখ-হরণের ভাবটি কি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

“একই ধ্যানে সদা মগ্ন—উজাব কেমনে
নরজন্ম-ব্রত! রাখি আঁখি অশ্রুহীন
কিসে—না মুছায়ে অশ্রু মানব-নয়নে ?
—না ঘুচায়ে মানবের অক্ষমতা দীন ?
জীবনের এক কার্য—বিশ্বহিত করা ;
জীবনের এক সুখ—জীবদুঃখ হরা ”

মানুষের চোখের জল না মুছাইয়া, তিনি নিজের আঁখিকে ‘অশ্রুহীন’ রাখিতে চান না, মানবের দীনতা ও অক্ষমতা দূর না করিয়া তিনি নিজে মহান্ ও ক্ষমতাবান্ হইবারও প্রার্থনা করেন না। তাই তিনি কবিতাটির

শেষে, বিশ্বের হিতসাধনকেই জীবনের একমাত্র কার্য এবং জীবের দুঃখ-হরণ করাকেই জীবনের একমাত্র সুখ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কবিতাটির ভিতরে বোধিসত্ত্ববাদের সুমহান্ চিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

স্মৃতির দুয়ার উদঘাটিত করিয়া, কবি 'বিষাদ-মাখা সুখে'র ও 'আনন্দভরা ব্যথা'র সন্ধান করিতে চান, বর্ত্তমানের 'কুহেলী-ঢাকা' অন্ধকারের মধ্য হইতে, তিনি সেই আলোকোজ্জ্বল অতীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল। তাঁহার "স্মৃতি" কবিতার মধ্যে নিম্নের কয়েকটি পংক্তিতে, এই সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে—

"কোথা হ'তে উঠে স্মৃতি
কুহেলীতে ঢাকা সব।
এসেছিনু হেথা কভু?
শুনেছিনু এই রব?
অতীত কাহিনী এ কি?
গত জীবনের কথা?
কি বিষাদে মাখা মুখ
কি আনন্দে ভরা ব্যথা।
কবে কোথা কোন্ বাণী
কোন্ আলো—কোন্ ঠাঁই?
হঠাৎ জাগায়ে তোলে
অতীতে ভাসিয়া যাই।"

প্রিয়নাথের প্রকৃতি-প্রীতি

"কারাবাস" নামক কবিতাটিতে প্রিয়নাথ বাবু এই জীবনকে দুঃখদায়ক বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন। তাঁহার চিত্ত এই ধরণীর ধূলি হইতে উর্দ্ধে উঠিবার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু তাহার উপায় কি? প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতায় কি মানুষের সমস্ত দৈন্য ঘুচিয়া যায়? এই কবিতায় মানুষের প্রতিদিনকার অকিঞ্চিৎকর গতানুগতিক জীবনের প্রতি কবির বিরাগ যেমন প্রকটিত হইয়াছে, তেমনি তাঁহার প্রকৃতি-প্রীতিও প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

নিম্নে কবিতাটি উদ্ধৃত করা গেল—

"একি মোর কারাবাস—দুর্লঙ্ঘ্য দুর্জয় !
দিনের সে গণ্ডীমাঝে দীনের জীবন।
সেই ক্ষুধা, সেই তৃষ্ণা—নিদ্রা জাগরণ।
চলিয়াছি সেই পথে—সেই পদ কয়।
নাহি জানি ভালবাসা, অন্য আশা ভয়।
প্রাতে সেই অঙ্গীকার সন্ধ্যায় মরণ
সেই হাইতোলা আর মিছে উদ্বোধন,
কি আঁধার আবর্তে রে ঘুরিছে হৃদয় !
সম্মুখে আছে ত দেবী অনন্ত প্রকৃতি
শিরোপরে চিরদীপ্ত অনন্ত বিমান—
মুক্ত বায়ু, মুক্ত আলো—জলের উল্লাস,
এ মহাসংস্পর্শে হায় যাবে না বিকৃতি ?
ভুলিব না নাগিনী এ ধরণীর গান,
উঠিবে না ধরা ছাড়ি—একটি উচ্ছ্বাস।"

এই কবিতার ন্যায় অন্য বহু কবিতাতেও প্রিয়নাথের প্রকৃতি-প্রীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মত এই যে, প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার যে সুনিবিড় যোগ রহিয়াছে, তাহার উপলব্ধিতেই মানব-প্রকৃতি আনন্দলাভ করে। বাস্তবিক প্রকৃতি-জননীর স্নেহ-স্পর্শ মানব-মনের সমস্ত যন্ত্রণাকে দূরীভূত করে। তাই তাঁহার বীণার তারে এই প্রকৃতি-প্রীতিই একটি মূল সুর-রূপে বাজিয়া উঠিয়াছে।

কবির "আমোদিনী" ও "বিষাদিনী" নামক দুইটি বড় কবিতা এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবিকে এবং তাঁহার কবিতাকে বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, এখানে একসঙ্গে এই দুইটি কবিতা উদ্ধৃত হইল—

'আমোদিনী'

"তেমনি কুসুমে ঢাকা
তেমনি প্রভাত মাখা,
মধু আলো মধু ছায়াময়;

তেমনি অলস বায়
আলুথালু বহে যায়
বনলক্ষ্মী সুখে শিহরয়।

লতা হতে লতান্তরে
তেমনি ভ্রমরা উড়ে
স্বপ্ন-পাখা তেমনি বিস্তারি;

কোকিল তেমনি স্বরে
আনন্দ বেদনা ভরে
মর্ম হাঁকে, চাপিতে না পারি।

দু'ধারে শ্যামল তরু
মাঝখানে পথ সরু
পূর্বদিকে চলিছে অধীর।

পথ যেন গিয়াছে রে
কোথা আছে খুঁজিবারে
অরুণের কনক মন্দির।

যাই যদি এই পথে
পাইব কি মনোরথে
পথশেষে বাসনার শেষ?

কল্পনা-শোভন দেশে
ফিরিব কি স্বপ্নাবেশে
যে স্বপন—সত্যেরই আদেশ।

সে স্বপ্নের প্রণোদনে
বিলাস উদাস মনে
অগ্রসরি' অলস চরণে,

সৌরভ-গৌরবে ভরা,
শোভায় মায়ায় ঘেরা,
আসিনু কি কল্পনা-কাননে?

আলো যথা প্রসারিয়া
প্রতি সীমা ছাড়াইয়া
দেয় ভরি' আকাশ মেদিনী ;
হাস্যে লাস্যে ছড়াইয়া
যেন প্রভাতের হিয়া
কুতূহলে খেলে আমোদিনী।

অরুণ আলোক লুটে
কুসুম-কোরক ফুটে
ফুটে উঠে মরমের বাণী।

আনন্দ উচ্ছল প্রাণ
যেন বিহগের গান—
আমোদিনী আমাদের রাণী।

আসি বসি তোর পাশে
ধরা ভরা-সুখে হাসে
দূরে থাকে দুঃখের কাহিনী ;
দরশে পরশে তোর
টুটে ভাবনার ডোর
সুখ-পূর্ণ জীবন-কাহিনী।

শূন্য হৃদয়ের ব্যথা
জগৎ কহে না কথা
মূঢ় প্রাণ অসাড়-বিলীন ;
তব হাসি তব গান
জাগায় মূর্ছিত প্রাণ
বাদকের স্পর্শে যথা বীণ !

পালাই তোমার পাশে,
নয়ন অরুণ নাশে
হৃদয়ের তামসী রজনী।

অধর বাঁধুলি টুটে'
রঙ্গের শোণিমা ছুটে
জীবন সুখের কেলিবন ;

শাখা হ'তে শাখান্তরে
বিহগ যেমন উড়ে
নব নব সাধে মাতে মন।

এক তিল স্থির নাই
ধারণার ভার নাই
সদা ছোটে জীবন-পবন ;

ক্রমে হ'য়ে আসে শ্রান্ত
হাসিতে করে যে ক্লান্ত
লক্ষ্যহীন ক্ষিপ্ত লঘু মন।

খেলাতে খেয়ালে মত্ত
দণ্ড পল করে নৃত্য
তাল দেয় চরণ অস্থির,

আমোদের এক টান
বুঝিতে পারে না প্রাণ—
প্রেম তাহে স্থির স্তব্ধ নীড়।

সাধ যায় ধরি করে
দু'দণ্ডেরই ক্ষণতরে
পাই প্রাণে প্রাণের পরশ,

আঁখিতে রাখিয়া আঁখি
হৃদয়-গহন দেখি
লভি প্রেম-সমাধির রস।

কিন্তু হায় মর্ম্ম ফুটে
চুম্বন হাসিতে টুটে—
রস-ভঙ্গে প্রেম অবসান।

পূজায় নিথর হৃদি
কেন্দ্রচ্যুত নিরবধি
পথহারা জপভ্রষ্ট ধ্যান।
প্রশান্ত জলধি-কোলে
আকাশেরই ছায়া তলে
ভেঙ্গে যায় বায়ু ক্ষিপ্ত যবে,
আমোদে উন্মত্ত উগ্র
ক্ষণিক তৃষায় ব্যগ্র
হেন হৃদে প্রেম কিসে রয় ?"

এখানে এই কবিতার প্রথমাংশে কবি প্রকৃতির যে সুন্দর ছবি দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই উপভোগের সামগ্রী। "আমোদিনী"র ছবি আঁকিতে আঁকিতে তাঁহার বর্ণনা-শক্তি কি উচ্চস্তরে উঠিয়াছে—

"আলো যথা প্রসারিয়া
প্রতি সীমা ছাড়াইয়া
দেয় ভরি আকাশ মেদিনী ;
হাস্যে লাস্যে ছড়াইয়া
যেন প্রভাতের হিয়া
কুতূহলে খেলে আমোদিনী।

* * *

খেলাতে খেয়ালে মত্ত
দণ্ড পল করে নৃত্য
তাল দেয় চরণ অস্থির।"

"আমোদিনীর" ছবি আঁকিতে গিয়াও, দুঃখবাদের কবি প্রিয়নাথের কণ্ঠে কি করুণ সুর বাজিয়া উঠিয়াছে—

"আঁখিতে রাখিয়া আঁখি
হৃদয়-গহন দেখি
লভি প্রেম-সমাধির রস।

কিন্তু হায় মর্ম ফুটে
চুম্বন হাসিতে টুটে—
রসভঙ্গে প্রেম অবসান।"

তাঁহার যে হৃদয় পূজায় 'নিথর' এবং তাঁহার 'নিরবধি কেন্দ্রচ্যুত' ও 'পথহারা' যে ধ্যান জপভ্রষ্ট, তাহা—

"প্রশান্ত জলধি-কোলে
আকাশেরই ছায়া তলে—"

বায়ুর ক্ষিপ্ততার সহিত ভাঙ্গিয়া যায়। তাঁহার আঁকা "বিষাদিনী"র চিত্র নিম্নরূপ—

'বিষাদিনী'

"সেই সন্ধ্যা আসিয়াছে
সেই তারা ফুটিয়াছে
বহে সেই উদাস পবন ;
সেই শ্রান্ত স্রোতস্বিনী
চাপিয়া কণ্ঠের ধ্বনি
কাশ-বনে লীন-বিচেতন।
চৌদিকে ধূসর বন
শুষ্ক শিরোরুহ যেন
তার মাঝে গিয়াছে চিরিয়া,
যেন বিধবার সীঁথি
সরল সঙ্কীর্ণ বীথি
কোন দিক্ না ঘুরি ফিরিয়া।
অদূরে পথের আগে
ধূর্জটি-ত্রিশূল জাগে
নাতি উচ্চ শিরে দেউলের ;
তুঙ্গ-শুভ্র সৌধ-ভালে
সন্ধ্যা-তারা আলো ঢালে
স্মৃতি সম পূর্ব জনমের !

দিবানিশি সন্ধিক্ষণে
সন্ধ্যার কোমল প্রাণে
প্রাণ যবে স্বপন-অধীন,
আকাশে নক্ষত্র সম
স্মৃতি ফুটে একক্রম
দৃশ্য ছাড়ি অদৃশ্যে বিলীন।

মনে আসে যাহা নাই—
আঁখি পরে দেখি তাই
সন্ধ্যার ছায়াতে ছায়া মিশি' ;
পূরবীর সুরে প্রাণ
গায় হারাণোর গান
ছায়াময় আলো দিশি দিশি।

অমৃত স্বপনপুর
দূরতায় করি দূর
হঠাৎ সমুখে খোলে দ্বার—
নীরব সঙ্গীতে ভরা
গোধূলি মাথায় ধরা
আমন্ত্রণ করে বার বার।

মুক্তিনভ সৌধ 'পরে
সন্ধ্যার আরতি ঘরে
মূর্তিমতী পূজার হৃদয়।
বিষাদিনী—একপ্রাণে
মুখ তুলি' নভ পানে
কার ধ্যানে চিত্ত তব লয় ?

আঁখিতারা তারা 'পরে
কপোলেতে অশ্রু ঝরে
কি বিষাদ প্রাণে জাগি' রহে,

দৈব হ'তে কি বারতা
আশায় কি নিষ্ফলতা,
হৃত স্বর্গ-স্মৃতি মর্ম দহে ?
তন্দ্রাহীন—শান্তিহীন,
অন্তরেতে চিরলীন,
দেখেছ কি অশ্রুভরা জ্ঞানে—
জীবন অতলে হায়—
জীবনেরই ছায়া প্রায়
কি অভাব সদা ব্যথা হানে ?
সৌন্দর্য প্রেমের ধ্যানে
প্রাণ নাহি তৃপ্তি জানে—
'নয়ন না তিরপিত ভেল' ;
নিরন্ধ্র মিলন মাঝে
অনন্ত বিরহ বাজে
এই এল—এই চলে গেল।
পরিপূর্ণ আলিঙ্গনে
বুকে তুলি যেই জনে
পরিপূর্ণ তারে কই পাই ?
পলাতক ফুলবাস,
ইন্দ্রধনু ক্ষণে নাশ,
সেই চলে যায়—যারে চাই।
জীবন যে দুখে ভরা
তাহা তব হৃদে ধরা
প্রচ্ছন্ন বাড়ব মর্মমাঝে,
ফুল-মৃদু পর-দুখে
লৌহ নিতে কষ্ট বুকে
সাক্ষাৎ দেবতা হৃদে রাজে।

অয়ি বিষাদিনী তুমি
করুণার পূতভূমি
তীর্থে যাই—যাই তব স্থানে,
বুকেতে রাখিয়া বুক
মুখপানে তুলে মুখ
দেখি কত ব্যথা তব প্রাণে।"

"আমোদিনী"র ন্যায় "বিষাদিনী" কবিতারও প্রারম্ভে কবি প্রকৃতির একটি পরিস্ফুট বর্ণনা দিয়াছেন। এই বর্ণনার মধ্যে বিধবার সীথির সহিত ধূসর বনমধ্যস্থ পথের উপমা কি সুন্দর! আলো ও ছায়ার ন্যায় স্মৃতি ও স্বপ্নের যে খেলা তিনি এই কবিতার ভিতরে দেখাইয়াছেন, তাহার ভাবের দ্যোতনা কি উচ্চ স্তরে উঠিয়াছে। আকাশে যেমন তারা ফুটিয়া উঠে, তেমনি তাঁহার হৃদয়েও স্মৃতি জাগ্রত হয়—আর স্মৃতির সেই জাগরণে তিনি 'দৃশ্য' ছাড়িয়া 'অদৃশ্যে' বিলীন হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার মানস-পটে তাহাই ছায়াপাত করে, যাহা তাঁহার সামনে নাই, আর তাহাই তিনি চোখের সাম্‌নে দেখিতে পান। ইহার ফলে, তাঁহার প্রাণ, যাহা তিনি হারাইয়াছেন, সেই হারাণোর গানই পূরবীর সুরে গাহিতে থাকে। বিরহ যে কেবল মিলনকে নিকট হইতে নিকটতম করে, তাহা নয়—বাঞ্ছিত প্রিয়ের সহিত সান্নিধ্যও ঘটাইয়া দেয়। তখন যাহা কিছু বাধা সব সরিয়া যায়, দূর নিকট হয়, অমূর্ত মূর্ত হইয়া উঠে। তাই এখানে কবির—

"অমূর্ত স্বপনপুর
দূরতায় করি দূর
হঠাৎ সমুখে খোলে দ্বার।"

কবি যে দুঃখবাদী, তাহার সবিশেষ পরিচয় এই কবিতার ভিতরে পাওয়া যায়। কি যেন কিসের অভাব এবং কি যেন কিসের বেদনার করুণ সুর তাঁহার এই কবিতার ভিতরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আশাও নিষ্ফলতা-ভরা আর তাঁহার অপহৃত স্বর্গস্মৃতি সর্বদাই তাঁহার মর্মকে দগ্ধ করিতেছে। ইহার সহিত কি যেন—কিসের একটা অভাব তাঁহার প্রাণে সর্বদাই ব্যথা হানিতেছে।

কবির 'নিরন্ধ্র' মিলনের মধ্যেও যে বিরহ-বেদনা বাজিয়া উঠিতেছে—তাহা অনন্ত। বাঞ্ছিতকে পাইয়াও তিনি পরমুহূর্তেই তাহাকে হারাইয়া ফেলিতেছেন। 'পরিপূর্ণ' আলিঙ্গনে তিনি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতে-ছেন, পরিপূর্ণভাবে তাহাকে পাওয়াও ত কবির ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিতেছে না। তাঁহার ফুলবাস 'পলাতক', সাধের ইন্দ্রধনু তাহাও ক্ষণেকের মধ্যেই লুপ্ত। যাহাকেই তিনি নিকটে পাইতে চান, সেই তাঁহার সান্নিধ্য হইতে দূরে চলিয়া যায়। এই ভাবনিচয়ে বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের সেই—

"শ্যামক কোরে যতনে ধনি শূতল
মদন-আলসে ভুহুঁ ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন
জনু কাঞ্চন মণি জোড়॥
কোরহি শ্যাম চমকি ধনি বোলত
কবে মোহে মীলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহিঁ মনু মীটব
অমিয়া করব সিনান॥
সো মুখ মাধুরী বঙ্ক নেহারই
সোঙরি সোঙরি মন ঝূর।
সো তনু সরস পরশ যব পাওব
তবহিঁ মনোরথ পুর॥
এত কহি সুন্দরি দীর্ঘ নিশাসই
মূরছিত হরল গেয়ান।
আকুব রাই শ্যাম পরবোধই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥"

কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পরিপূর্ণ তৃপ্তির মধ্যে যে অতৃপ্তি জাগিয়া উঠে, বাঞ্ছিতকে নিকটে পাইয়াও যে হারাই-হারাই ভাব মনকে শঙ্কিত করিয়া তোলে,—তাহা বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহারই সুরের প্রতিধ্বনি কবি প্রিয়নাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয়বার সমুদ্রমন্থনে হলাহল উত্থিত হয়। সেই জীবননাশকর অপেয় হলাহল ধূর্জটির কণ্ঠশোভাই বর্ধন করিয়াছিল। প্রিয়নাথের সমবেদনাময় হৃদয় অবাঞ্ছিতা বিষাদিনীকেই 'করুণার পূতভূমি'রূপে বরণ করিয়া লইতেছে। কেবল তাহাই নয়, কবির সুর এখানে কি উদাত্ত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়—

"তীর্থে যাই—যাই তব স্থানে,
বুকেতে রাখিয়া বুক
মুখপানে তুলে মুখ
দেখি কত ব্যথা তব প্রাণে।"

কবির "আমোদিনী" ও "বিষাদিনী" কবিতা দুইটি কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট। মাধুর্য ও কারুণ্যই ইহাদের প্রধান গুণ। ইহাদের ঝঙ্কার কাণের ভিতর দিয়া মর্মে প্রবেশ করিয়া প্রাণকে সহজেই বেদনায় আপ্লুত করে।

প্রিয়নাথের শোক-গীতি

অতৃপ্তির সুরে প্রিয়নাথ শোকের গান গাহিয়াছেন—সে গানে মর্ম-বেদনার স্রোত উছলিয়া পড়িয়াছে—তাঁহার "কতদিন" শীর্ষক কবিতায় এই ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নে কবিতাটি উদ্ধৃত করা হইল—

"কতদিন বল আর আসিব যাইব?
কতদিন দু'টি করে
ভাঙ্গা বুক চেপে ধরে
তোমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিব?
চাঁদের হাসিটি দেখ নিবিল—নিবিল!
নিশিদিন এই ভাবে
কত নিশিদিন যাবে
ভাঙ্গা তরী জলে বুঝি ডুবিল—ডুবিল!
রোপিলে যে তরু দেখ কাননের পরে
সৌরভে সঙ্গীতে আজ সমীরণে দোলে।
শিখাইতে যে পাখীরে সোহাগের বাণী
মধুর রহস্য ক'রে তুলি পুচ্ছখানি।

আমি শুধু স্বপ্ন দিয়া
বুঝাব—ভুলাব হিয়া—
সুদূর তারকা পানে হারা দু-নয়ান!
দিবস ফুরায়ে যাবে
রজনী ফুরায়ে যাবে
ফুরাবে না কভু হায় মোর শোক-গান।"

কবি যে 'শোক-গান' গাহিতেছেন,—সে গানগাওয়ার সমাপ্তি নাই—অনাদি ও অনন্ত কাল ধরিয়া তাঁহাকে সে গান গাহিয়া যাইতে হইবে—কত দিন, কত রাত্রি অতীতের কোলে লয় পাইবে, তবুও তাঁহার শোকের গান ফুরাইবে না। বাঞ্ছিতার কাছে যাওয়া-আসা—সকাতর নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকা—কবির সবই যেন ব্যর্থ হইতেছে। নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারের মধ্যে আশার ক্ষীণালোকও তিনি দেখিতেছেন না। তিনি ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন—

"নিশিদিন এই ভাবে
কত নিশিদিন যাবে।"

তাঁহার একমাত্র সম্বল যে ভগ্ন-তরী তাঁহাও বুঝি জলমগ্ন হইল। নিরাশ-হৃদয় কবি কেবল স্বপ্ন দিয়া তাঁহার আশাহত মনকে বুঝাইবেন—ভুলাইবেন। ছন্দ, ভাষা ও ভাবে কবিতাটি উৎকৃষ্ট। পাঠ করিলেই, মনের মধ্যে কেমন একটা সমবেদনার ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে।

তাঁহার "একটি তারকার প্রতি" কবিতাতেও নৈরাশ্যের মধ্যে তিনি আশার আলো দেখিতে পাইয়াছেন—

"সংসারের ভাঙ্গা ঘরে আমি আছি একা পড়ে
সংসারেরই ধূলি মাঝে নিদ্রিত পরাণ,
ধরাপানে নত দৃষ্টি— দেখি না বিশাল সৃষ্টি
প্রাণের স্ফটিক মোর ক্রমশই ম্লান।
দিবার প্রচণ্ড আলো আমার লাগে না ভালো,
আমি চাই নিমীলিত প্রচ্ছন্ন গোধূলি।

ভাষাহীন কি যে কথা নামহীন কি যে ব্যথা,—
সুদূর বীণার বাণী চমকে জীবনে।
... ...
শুনেছি হেমন্ত রাতে স্তব্ধ বিজনতা মাঝে
মন যবে গেছে মোর মনেরই ভিতর
শুষ্কপত্র খসিতেছে, পশিতেছে প্রাণে
মরণের পথ হতে অস্ফুট মর্মর।
যেন মোর কাণে কাণে অতিশয় সঙ্গোপনে,
তুলিয়া—ফেলিয়া শ্রান্ত কাতর নিশ্বাস
কে যেন রে বলিতেছে 'নাই, নাই—সে যে নাই'
তারপর হুহু ক'রে বহেছে বাতাস।
আলোকে-আঁধারে এই স্মৃতির গোধূলি পুরে
বেজে ওঠে শত শঙ্খধ্বনি—
কোন্ দৃশ্য এসে পড়ে বিহ্বল নয়ন-পাতে
ভেসে যায় কোথায় অবনী।
... ...
মহান্ প্রকৃতি মাঝে যা কিছু মহান্ আছে
সবই আমি ছিনু একদিন,—
মহান্ অচল ছিনু— মহান্ জ্যোতিষ্ক ছিনু—
ছিনু আমি নভঃ সীমাহীন।

এ জগতে ধূলি মাঝে— অন্ধ কারাগারে তবে
রব না—রব না আর বাঁধা,—
মহান্ উদ্দেশ্য দেখি— অনন্ত জীবন ব্যাপ্ত
আজ সব ঘুচিয়াছে ধাঁধা।
দৌড়াবার স্থান এত যখন সম্মুখে মোর,
অনন্ত উচ্ছ্বাস যবে প্রাণে,
সীমা হতে সীমান্তরে— উধাও ধাও রে প্রাণ
কেন বাঁধা রব এইখানে ?"

কবি সংসারের 'ভাঙ্গা ঘরে' 'ধূলি'-শয়নে একা 'নিদ্রিতপরাণে' পড়িয়া আছেন। উপরে চাহিয়া ভগবানের 'বিশাল-সৃষ্টি' দেখিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, কারণ তিনি নতদৃষ্টে 'ধরাপানে'ই চাহিয়া আছেন, প্রাণের জ্যোতিঃ তাঁহার ক্রমশই ম্লান হইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থায় পড়িয়া, তিনি 'নিমীলিত প্রচ্ছন্ন গোধূলির'ই অপেক্ষা করিতেছেন। যে কথা তিনি কহিতে চান—তাহা ভাষাহীন, যে ব্যথা তিনি ভোগ করিতেছেন, তাহাও নামহীন। অথচ ইহারই মাঝখানে 'সুদূর বীণার বাণী' তাঁহার জীবনকে চমকিত করিয়া তুলিতেছে। 'শুষ্কপত্র' খসিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণে 'মরণের পথ' হইতে অস্ফুট মর্মর ধ্বনি প্রবেশ করিতেছে। এই আশা-হত মর্মদাহী অবস্থায় অতি 'সঙ্গোপনে' কে যেন কাতর নিশ্বাসের সহিত বলিতেছেন—'নাই, নাই—সে যে নাই'। কিন্তু ইহাতেও, সকল-হারা কবি আপনাকে হারাইয়া ফেলেন নাই। তাই তিনি আলোক-আঁধার-ঘেরা স্মৃতির গোধূলি-পুরীতে শত শঙ্খের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন,—কি এক অজানা দৃশ্য তাঁহার 'বিহ্বল নয়নপাতে' নিপতিত হইয়া তাঁহার স্মৃতির বদ্ধ দুয়ারকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল। আত্মস্থ হইয়া,—তখন কবি জোর করিয়া বলিলেন—

"মহান্ প্রকৃতি মাঝে, যা কিছু মহান্ আছে
সবই আমি ছিনু একদিন,
মহান্ অচল ছিনু— মহান্ জ্যোতিষ্ক ছিনু—
ছিনু আমি নভঃ সীমাহীন।"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিরুৎসাহ ভাব—তাঁহার জড়তা সবই বিদূরিত হইল, অতীতে মহান্ ছিলেন,—বর্তমানে কেন এই জীবন-হীন জীবন যাপন করিবেন। তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার লুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া বলিতেছেন—না, না, আর আমি জগতের এই ধূলি মাঝে—এই অন্ধ কারাগারে আবদ্ধ থাকিব না। আমার এই অনন্ত জীবনের সহিত এক মহান উদ্দেশ্য জড়িত রহিয়াছে—হৃদয়-দৌর্বল্য আমার সাজে না। পার্থ-সারথির সেই অমোঘ উৎসাহ-বাণী—

"ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥"

যেন তাঁহার কাণের পরতে পরতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বাস্তবিক যখন তাঁহার সম্মুখে দৌড়াইবার অনন্ত স্থান রহিয়াছে, এবং প্রাণেও অনন্ত উচ্ছ্বাস বর্তমান, তখন তিনি কেনই বা নিশ্চেষ্ট ও নির্জীব অবস্থায় ধূলিশয়নে শুইয়া থাকিবেন? তখন আশার নবীন মন্ত্রে জাগ্রত কবি উদাত্ত সুরে গাহিয়া উঠিলেন—

"সীমা হ'তে সীমান্তরে— উধাও ধাও রে প্রাণ
কেন বাঁধা রব এইখানে?"

'মানসী'

কবি "মানসী"র যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা অতিসুন্দর; তাঁহার এই মানসীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"ধরা যে তোমার পাব, কেমনে কোথায়?"

আর কেমন করিয়াই বা তিনি তাঁহার 'লেলিহান দীর্ঘ তৃষা' মিটাইবেন, তাহার জন্য ব্যাকুল। তাঁহার 'ধ্যান,' তাঁহার 'প্রেম'—সকলই নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত হইয়াছে।

"পাইলেও পাই নাই— মিটে না পিয়াসা
চির-উপভোগ নেশা— চির অন্বেষণে!"

মানসীকে পেয়েও না পাওয়া—আর পান করেও চিরউপভোগ নেশার পিয়াসা তাঁহার না মেটা—চণ্ডীদাসের সেই প্রসিদ্ধ কবিতা—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারণু
নয়ন না তিরপিত ভেল"

স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রিয়নাথের কবিতাটির শেষের ছয় পংক্তি আরও সুন্দর—

"জড়-রূপে দেখা দিলে,— সদা কাঁদে প্রাণ
চেতনার সাড়া পেতে— অমূর্ত যখন,—

দরশ-পরশ-আশে হৃদি ম্রিয়মাণ ;—
দেহ-প্রাণ ধরি এলে, কোথা যে মিলন
তব অঙ্গে প্রতি অঙ্গ পাবে পরিত্রাণ
প্রাণ পাবে তব প্রাণে নিশ্চিন্ত নির্বাণ।”

মানসীর প্রাণের সহিত কবির প্রাণের সংযোগ—ইহাতেই কবির সকল কামনা, সকল তৃষ্ণা নিশ্চিন্ত নির্বাণ প্রাপ্ত হইবে।

‘পরিচয়’

কবির “পরিচয়”, বাহিরের পরিচয় নয়,—অন্তরের অন্তরেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সে পরিচয় লাভ হয়, তাই কবি বলিতেছেন—

“মৃণ্ময়ী তোমার রূপ, প্রকৃতি জননী,
ইন্দ্রিয়ের ভোগমাত্র ছিল যতদিন,
দেখি নাই—আত্মহারা দিবস রজনী—
চিন্ময়ী জননী মূর্তি অন্তরে আসীন।”

বাহিরের দশ ইন্দ্রিয় লুপ্ত না হইলে, অন্তরের দশ ইন্দ্রিয় জাগ্রত হয় না।—তখন এই মায়াময় জগৎ সাধককে আর বিমুগ্ধ করিতে পারে না,—তখন এই

“মায়াপঙ্কে ফুটে উঠে সত্য-শতদল।”

‘শ্মশান’

“শ্মশান” নামক কবিতায় কবির দুঃখবাদ মহান্ স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে। পরের দুঃখ, পরের হাহাকার বুক পাতিয়া লইতে তাঁহার কতই না ব্যাকুলতা ! বিশ্বের দুঃখরূপ শ্মশানকে তিনি নিজের হৃদয়ে ধারণ করিতে চান। বিশ্বের পাপতাপ, জরামৃত্যু—সমস্তই তিনি নিজের শিরে ধারণ করিয়া, উহাদের ভার লাঘব করিতে চান—

“আমার জীবন হ’ক শ্মশান প্রখর
দাঁড়াও পাবনী তাহে একা একেশ্বরী,
পড়ুক নিয়ত তাহে যা কিছু নশ্বর
পাপ যাহা, মৃত্যু যাহা—যাহা মৃত্যুকারী।

তোমাতে নিমগ্ন লুপ্ত—তুমি প্রাণময়,
বিশ্বের সে চিরচিতা ধরিবে হৃদয়।"

শ্মশানের কথা বলিতে গিয়া, নিজেই শ্মশান হইবার আকাঙ্ক্ষা সাধারণ কাব্যে দুর্লভ।

'জননী'

কবির "জননী" কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল—

"আছে কি কোথাও দেবি, এমন কোমল ?—
অমঙ্গল ছায়া স্বপ্নে চকিতা হরিণী—
আছে কি এমন দেবি, সুদৃঢ়-সবল ?
প্রিয়-শুভ তরে বুকে ধরে যে অশনি—
'মা' বলে তোমারে ডাকে মানব-হৃদয়
ভক্ত যবে পায় তব স্নেহ-পরিচয় !

* * * *

অপূর্ণা সৃষ্টির মাঝে সম্পূর্ণা জননী,
স্নেহ-কর্তব্যের তার নাহিক স্খলন !
নিঃস্বার্থের এক মূর্তি ! মিটায় তখনি
জাগায় যে সাধ-স্নেহ।—উদার পাবন
নিজের জীবন দিয়া রক্ষিছে জীবনে।
লুপ্ত করি ধূলি-নত স্বার্থ জগতের
সে স্নেহ করেছে জয় দুর্জয় আপনে।
এ কি ঘোর উপহাস সে মাতৃ-স্নেহের !
এ কি ঘোর উপহাস !—সে অসীম স্নেহ
পায় নি ক্ষমতা হায়, সৃষ্টির নীতিতে,
মৃত্যু যবে আসে নিতে, অন্ধ করি গেহে,
প্রাণ দিয়া প্রাণাধিকে বুকেতে রাখিতে।
মরত-জননী—তুমি দরিদ্রা আমার !—
জগৎ-জননী হতে শ্রেষ্ঠ শতবার।

এ কি রে প্রলাপ মূঢ়—পাপ অভিমান-
অন্ধ, করিতেছ সূর্যে তিমির আরোপ !
স্নেহের আকরে দেখ স্নেহের বিলোপ !
যা হ'তে মায়ের প্রাণ তার নাই প্রাণ !
ভাবিলি না হায় মূঢ়, নিজে কি জননী
গড়িয়াছে সঙ্গোপনে সে স্নেহ অচল
যাহার অমৃত-স্রোতে জীয়ে ধরাতল ?
শিশু কি গড়িল নিজে সে স্নেহের খনি ?
কতদূর দৃষ্টি চলে অন্ধ মানবের !
কে দেখেছে জীবনের পরিণাম হায় !
যখন আসিলে অন্ধ—রিক্ত—অসহায়,
মা দাঁড়াল অযাচিত স্নেহ-দাসত্বের
অপেক্ষায় ! আছে পুন পারে মরণের
মাতা হ'তে মাতৃতমা তব প্রতীক্ষায় !"

কয়টি পংক্তিতে কবি মায়ের যে মূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন তাহা বাংলা কাব্য-সাহিত্যে দুর্লভ। যেমন—

"অমঙ্গল ছায়া স্বপ্নে চকিতা হরিণী।
... ...
যখন আসিলে অন্ধ—রিক্ত—অসহায়,
মা দাঁড়াল অযাচিত স্নেহ-দাসত্বের
অপেক্ষায়।
... ...
অপূর্ণা সৃষ্টির মাঝে সম্পূর্ণা জননী।"

বাস্তবিক স্বার্থপর এই জগতে কেবল স্বার্থের দ্বন্দ্বই চলিতেছে। জননীই স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-সীমার বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। কেবল তাহাই নয়, দুর্জয় অহং ভাবও মায়ের সন্তান-স্নেহের নিকট পরাজিত—

"লুপ্ত করি ধূলি-নত স্বার্থ জগতের
সে স্নেহ করেছে জয় দুর্জয় আপনে।"

তাই মাতৃভক্ত কবি মাতৃ-স্নেহের পাবনী ধারায় স্নাত হইয়া মুক্তকণ্ঠে গাহিতেছেন—

"মরত জননী তুমি—দরিদ্রা আমার!
জগৎ-জননী হ'তে শ্রেষ্ঠ শতবার।"

'নবজাত শিশুর প্রতি'

কোথা হ'তে এলি বাছা তুই,
কোন্ পথ হতে এলি বল?
যে পথে প্রভাত ফোটে, শুকতারা
চেয়ে থাকে, হাঁসে ফুলদল!
জ্যোছনা কি এল তোরে পথ দেখাইয়া?
পাখী তোরে ডেকেছিল নাম ধ'রে?
শিশির-বিধৌত ধরা নব দূর্বা ছড়াইয়া
তুলেছিল ফুলভরা ক্রোড়ে?
বসন্তের উপহার তুই কিরে বাছা—
ঊষার বিমল প্রীতিদান!
তারা-ভরা ফুলভরা জ্যোৎস্না-ভরা রজনীর
স্বপ্নময় উচ্ছ্বসিত প্রাণ।
আকাশের চুমো কিরে তুই বাছা—
আকুল এ ধরণীর গায়?
তাকাইলে তোর পানে—আঁখি মোর
আরো—আরো—আরো ভুলে যায়।"

কবিতাটির মিষ্টত্ব সহজেই মন হরণ করে। বলিবার ভঙ্গীও এমন সুন্দর যে, চোখের সাম্‌নে নন্দনের অপরূপ নয়নমুগ্ধকর ছবি ফুটাইয়া তোলে।

প্রিয়নাথের কবিতা কাব্য-প্লাবিত বাংলা দেশের এক অমূল্য সম্পদ্। বাংলার এই প্রিয় কবির কাব্যরসধারা পান করিয়া বাঙালী যে পরিতৃপ্ত হইবে, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

সংবাদ-পত্রে প্রিয়নাথের প্রশংসা

১৩২৩ সনের কার্তিক মাসে (ইং অক্টোবর, ১৯১৬) প্রিয়নাথ সেন মহাশয় পরলোক গমন করেন ; তাঁহার পরলোক-গমনের পর 'বেঙ্গলী' পত্রে (১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে) তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বাহির হয়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"DEATH OF A LITTERATEUR

We regret to announce the death of Babu Priya Nath Sen, of 8-1 Mathur Sen's Garden Lane, which took place at 4 A.M. on the morning of the 25th instant. Belonging to the family of late Mathur Chandra Sen, Babu Priya Nath Sen was connected for a good length of time with the firm, Messrs. Manuel and Agarwalla. His articles and critiques that appeared frequently in leading Bengali Magazines, the Sahitya, Manasi, Sabuj Patra, are well-known to readers of Bengali literature. He had a vast command of the English and French languages. He was one of the best friends of Sir Rabindra Nath Tagore, who speaks of him and his literary ability in very high terms in his Jiban Smriti. His was perhaps the best discourse during the Chitrangada controversy. He leaves behind him a fine Library which would be worth about a lakh of rupees. He leaves 5 sons and a widow,"

"সবুজ পত্র" সম্পাদক সুলেখক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় ১৩২৩ সনের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'সবুজ পত্রে' (পৃঃ ৪৩৯) "৺প্রিয়নাথ সেন" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে তিনি প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের রসগ্রাহিতা, ঐকান্তিক সাহিত্য-প্রীতি ও অন্যান্য সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটি নিম্নরূপ—

"৺প্রিয়নাথ সেন

সকল দেশে সকল যুগেই এমন জনকতক লোক থাকেন, যাঁরা পাঠক-সমাজের কাছে বিশেষ পরিচিত না হ'লেও সে যুগের লেখক-সমাজের কাছে

সুপরিচিত। এ শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের মনের ছাপ সাহিত্যের উপর নয়,—সাহিত্যিকদের উপর রেখে যান। এঁরা লেখকদের সহজ বন্ধু, এবং এঁদের সঙ্গে আলাপে নবীন লেখকেরা আনন্দও পান, শিক্ষাও লাভ করেন। ৺প্রিয়নাথ সেন এই শ্রেণীর একজন লোক ছিলেন। বাংলা দেশে এ-জাতীয় লোক নিতান্ত দুর্লভ, সুতরাং তাঁর অভাবে তাঁর লেখক বন্ধুরা যেরূপ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, নিজেদের সেইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত মনে কর্‌ছেন। লেখক হিসাবে যাঁরা ৺প্রিয়নাথ সেনের নিকট ঋণী আমি তার মধ্যে একজন।

আজ ছাব্বিশ কি সাতাশ বৎসর পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে সঙ্গে ক'রে প্রিয়নাথ সেনের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর ঘরে প্রবেশ করবামাত্র আমি বুঝলুম যে, তিনি আর আমি, আমরা দু'জনেই জীবনের সেই এক পথের পথিক, যে পথ সকলে অবলম্বন করেন না; সুতরাং আমাদের উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তা জন্মাতে বাধ্য।

পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক টাকা ভালবাসে—আর কিছু ভালবাসে না। কিন্তু সকল দেশের সকল সমাজেই এমন জনকতক লোক থাকেন, টাকার একান্ত মায়া যাঁদের ধাতে নেই। তাঁরা হয় টাকা ভালবাসেন না, নয় টাকা ছাড়া আরও কিছু ভালবাসেন এবং সম্ভবত তা টাকার চাইতে বেশী পরিমাণে। এ জগতের অনুরাগকে বৈষয়িক লোকেরা নেশা বলে থাকেন। আমাদের দেশে কারও কারও গানবাজনার নেশা আছে। বিলাতের লোকদের গান-বাজনা ছাড়া আরও পাঁচ রকমের নেশা আছে। সে দেশে কেউ বা ফুল ভালবাসে, কেউ বা ছবি, কেউ বা শিকার, কেউ বা কুকুর। কিন্তু বই ভালবাসে, এমন লোক সব দেশেই কম—এবং আমাদের দেশে নেই বল্লেও হয়। বিলেতে সকলে সরস্বতীর পূজা করুন আর না করুন, ঘরের এক কোণে তাঁর জন্য টাট্ সাজিয়ে রাখতে বাধ্য হন। তার কারণ, দেশে যাঁর বৈঠকখানায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোকদের অন্তত দু' একশ বই না থাকে, তিনি ভদ্রসমাজে ভদ্রলোক বলে গণ্য হন না। এ দেশে ঠিক তার উল্টো। আমাদের সমাজে যিনি বই ভালবাসেন, বুদ্ধিমান লোকেরা তাঁকে অবজ্ঞার চক্ষেই দেখেন; বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধির যে কোন সম্পর্ক আছে, বিজ্ঞ লোকেরা

তা সহজে স্বীকার করেন না। এঁদের মতে বই পড়াটা একটা বাতিকের মধ্যে। বই পড়াটা না হোক্, কেনাটা যে একটা বাতিক, একথা আমরা সকলেই স্বীকার করি। এ বাতিক আমারও আছে, এবং প্রিয়নাথ সেনেরও যে পূরামাত্রায় ছিল, তার প্রকৃষ্ট ও অপর্যাপ্ত প্রমাণ তাঁর গৃহে প্রবেশ করবামাত্রই পাওয়া যেত। একেবারে আসবাবহীন তাঁর ঐ ছোট কুঠরীটি আমার চোখকে যে পরিমাণে আনন্দ দিতেছিল, তার সিকির সিকি আনন্দও এদেশের বিলাতী আসবাব্-সঙ্কুল, চিত্র-বিচিত্র রাজপ্রাসাদ দর্শনে আমি কখন পাই নি।—সেকালে গৃহাভ্যন্তরে পুস্তককে উচ্চ আসন দেবার ফ্যাসান আমাদের ধনি-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল না,—আজকাল হয়েছে। লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা এবং প্রিয়পাত্রেরা যে সরস্বতীর হস্তের বীণার না হোক, পুস্তকের আদর কর্‌তে শিখেছেন, এ অবশ্য অতীব সুখের বিষয় কিন্তু বই কেনার ফ্যাসান ও তার ব্যসনের মধ্যে অনেকটা প্রভেদ আছে।

ধনী লোকদের পোষা লাইব্রেরীর দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লেই দেখা যায় যে, তা সরস্বতীর মন্দির নয়,—সমাধি-মন্দির। মনে হয়, ও-সব ক্ষেত্রে পুস্তকাবলী যেন মলাটের কফিন-বন্দী হ'য়ে চিরশান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছে। ৺প্রিয়নাথ সেনের বই যে গৃহসজ্জার জন্য সংগৃহীত হয় নি, সে যে ধনীর নয়, গুণীর হাতের বই,—তা বুঝতে কারও দেরি হত না। কেননা তাঁর বই দেওয়ালের গায়ে ছবির মত সাজানো থাকত না, আশে পাশে ছড়ানো থাক্‌ত। মেঝের উপর, ঘরের কোণে, বেঞ্চের উপর, যেখানে চোখ পড়ত সেইখানেই দেখা যেত, অসংখ্য বই স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। গৃহস্বামী যে সেগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তার প্রমাণ তাদের বিপর্যস্ত অবস্থার ভিতরেই পাওয়া যেত। এই অনাদরই তাদের যথার্থ আদরের পরিচয় দিত।—আর সেই পুস্তকরাশির অধিকাংশ সেই জাতের, যাদের দর্শন কলিকাতার কোন বইয়ের দোকানে কিম্বা ধনী লোকের পুস্তকাগারে দু'বেলা মেলে না।—অর্থাৎ ইয়োরোপের নব সাহিত্যে তাঁর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল।

এই বই ভালবাসাটা সাহিত্যানুরাগের বাহ্য লক্ষণ হলেও, একটি বিশিষ্ট

লক্ষণ। যাঁরা যথার্থ সাহিত্য ভালবাসেন, তাঁরা সাহিত্যের শুধু রস নয়, রূপও ভালবাসেন।

আমরা উভয়ে একই রসের—সাহিত্য-রসের—রসিক বলে, সেই প্রথম সাক্ষাতে আমাদের উভয়ের মধ্যে যে আত্মীয়তা জন্মায়, তা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। যদিচ তখন আমি কলেজের ছাত্র, এবং তিনি সাহিত্য-সমাজে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, তবুও পাঁচ মিনিটের আলাপে আমরা পরস্পরের বন্ধু হ'য়ে উঠলুম। তার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। পৃথিবীতে যিনি বিষয়-সম্পত্তি ছাড়া অপর কোনও বস্তুতে সুখ পান, তিনি আর পাঁচজনকে সে সুখের ভাগ দিতে চান্। সংসারে যে আমাদের দুঃখের দুঃখী, সেই যেমন আমাদের যথার্থ বন্ধু, মনোরাজ্যে তেমনি যে আমাদের সুখের সুখী, সেই আমাদের যথার্থ বন্ধু। ৺প্রিয়নাথ সেন ফরাসী সাহিত্যের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। ফরাসী ভাষার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় এবং ফরাসী সাহিত্যের প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল বলে, প্রথম থেকেই তিনি আমাকে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুশ্রেণীতে ভুক্ত করে নেন্।

আমি পূর্বেই বলেছি—৺প্রিয়নাথ তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের মনের উপর তাঁর মনের ছাপ রেখে গেছেন। এর কারণ, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যথার্থ appreciation ছিল।

তিনি সাহিত্যের একজন যথার্থ গুণগ্রাহী ছিলেন। কাব্যের সর্বপ্রধান গুণ যে তার রস, এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, এবং আমার বিশ্বাস কাব্যে তিনি এই রস ব্যতীত অপর কোনও গুণের সন্ধানে ফিরতেন না। আমাদের পাঁচজনের আর পাঁচ বিষয়ে মন আছে,—যথা রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি,—কিন্তু ৺প্রিয়নাথ সেন এ সকল বিষয়ের আলোচনায় কখনও নিজের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করতেন না। একমাত্র সাহিত্যের প্রতিই তাঁর ঐকান্তিক প্রীতি ছিল, এবং তিনি তাঁর সকল মন সকল প্রাণ দিয়ে আজীবন একমাত্র সাহিত্যেরই চর্চা করেছেন। সাহিত্যের এই একাগ্র চর্চার ফলে তাঁর সহজ রসবোধ যেমন পরিপুষ্ট হয়েছিল, কাব্য সম্বন্ধে তাঁর মতামতও তেমনি উদারতা লাভ করেছিল। তিনি জানতেন

যে, সাহিত্য-জগতে এমন কোনও কষ্টিপাথর নেই, যার সাহায্যে সকল প্রকার কাব্য সমান যাচিয়ে নেওয়া যেতে পারে। রূপে গুণে Shelleyর কবিতার সঙ্গে Gautierএর কোনও সাদৃশ্য না থাকলেও—এ দুই যে কাব্য, এবং উঁচুদরের কাব্য, এ জ্ঞান আমাদের সকলের নেই। তাঁর ছিল। তাঁর মন সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও তৈরী মতামতের অধীন ছিলনা বলে, তিনি সাহিত্যে নববস্তুর গুণ গ্রহণ করতে পার্‌তেন,—অবশ্য তাতে যদি কোন গুণ থাক্‌ত। তাই আমাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের লেখা সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানবার জন্য উৎসুক হ'য়ে থাকতুম, এবং সে লেখা তাঁর মনোমত হলে আশ্বস্ত হতুম।

৺প্রিয়নাথ সেনের অভাবে তাঁর লেখক বন্ধুরা যে নিজেদের একান্ত ক্ষতিগ্রস্ত মনে কর্‌ছেন, তার কারণ,—সাহিত্যে সুরের কাণ সকলের নেই; শুধু তাই নয়, কাব্যকে কাব্য হিসাবে না দেখে,—দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি কিম্বা সমাজনীতির অঙ্গ হিসেবে দেখবার এবং সেই হিসেবে বিচার করবার সহজ পদ্ধতিটি অবলম্বন করাটাই একালের দস্তুর হয়ে উঠেছে।

৺প্রিয়নাথ সেন আমাদের সাহিত্যভাণ্ডারে যে বিশেষ কিছু ধনরত্ন রেখে যান নি,—অর্থাৎ তিনি যে একজন বড় লেখক হননি,—তার কারণ তিনি ছিলেন একজন বড় পাঠক। সাহিত্যের বড় স্ফূর্তি ও উন্নতির জন্য লেখকও চাই, পাঠকও চাই; কেননা এ উভয়ের মনের সংযোগ না হলে সাহিত্য বাড়তে পারে না। এবং এ দেশে এ যুগে, গুণী লেখকের মত, সমাজদার পাঠকও শতেকে জনেক হয়। সেই একশ'র মধ্যে একজনের মৃত্যুতে সাহিত্য-সমাজের একটি উচ্চ আসন শূন্য হয়ে পড়ে। তাই ৺প্রিয়নাথ সেন আমাদের সাহিত্য-সমাজে একটি বড় ফাঁক রেখে চলে গেছেন।"

"বিদ্যাপতির পদাবলী"র সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় প্রিয়নাথ বাবুর বহুদিনের বন্ধু। গত ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় Some Celebrities নামক প্রবন্ধে (পৃঃ ৫৪৪) প্রিয়নাথ বাবুর সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেক জানিবার কথা আছে। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল—

"PREO NATH SEN

Preo Nath Sen was some years older than myself, but he strongly attracted young people interested in literature. I met him first in 1881 and retained his valued friendship to the end of his life. He should have become a solicitor, but he was so deeply absorbed in literature that he never passed the examination necessary to qualify him for that profession. He did not do much creative work and has left no literary works behind him, but literature was to him the very breath of life.(?). He was a bibliophile in the best sense of the word and his literary judgment was wonderfully keen and accurate. He had one of the finest libraries I have seen and not a week passed in which he did not add to his collection of books. And he read every book that he bought. As a linguist I have not met his equal, not because of the number of languages he knew but the ease with which he acquired a new language. A biglot dictionary, a grammar of the new language, and in a few months Preo Nath would be reading books in a new language. Of course, the correct enunciation of the words of a new language cannot be learned in this manner but this is a small detail when the object is to read books and not to speak the language. When I first saw him, Preo Nath could read French and Italian in the original, and subsequently learned other European languages. Persian he learned last and I borrowed from him a splendid edition of Hafiz's poems with an English translation. His books had encroached upon every available space in his house. Besides the almirahs and shelves in the inner portion of the house, his sitting room, which contained no furniture, was full of books which were stacked under the windows and overflowed into the verandah. With all his great love for books, he readily lent them not only to his friends but even to slight acquaintances. I must have read hundreds of books from

his library and this gave him great pleasure. Among his constant visitors were Rabindranath Tagore, Behari Lal Chakravarti, Devendranath Sen and many others. It was in deference to his unfavourable opinion that Rabindranath Tagore withdrew one of his early works from circulation and it has never been reprinted. In almost every case Preo Nath's literary judgment was sound and he was invariably candid and outspoken. His favourite author was Swinburne and he carefully collected every line of prose and verse that the English poet ever wrote.

Most of the men who used to meet at the house of Preo Nath Sen to discuss literature have passed away. Rabindranath Tagore and myself are still left to cherish his memory and recall his fine character."

স্বর্গীয় মাণিকলাল দত্ত

স্বর্গীয় মাণিকলাল দত্ত হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমার অধিবাসী। তিনি জাতিতে সুবর্ণবণিক্। তাঁহার পিতার নাম ৺বিশ্বম্ভর দত্ত; তাঁহার পৈত্রিক বাসভবন শ্রীরামপুরে রাজা কিশোরীমোহন গোস্বামী ষ্ট্রীটে অবস্থিত।

শ্রীরামপুরের অধিবাসী হইলেও কলিকাতা সহরেই তিনি স্থায়িভাবে বসবাস করিতেন। কলিকাতায় তিনি বিশ্বনাথ মতিলাল লেনস্থ বাড়ীতেই থাকিতেন।

রাধাবাজারে জে দেব এণ্ড কোং নামে তাঁহার চুরটের দোকান ছিল। এই দোকান বেশ চলতি কারবার ছিল এবং উহা হইতে তাঁহার প্রভূত আয় হইত। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে দীর্ঘকাল উক্ত দোকান বন্ধ ছিল। দোকান বন্ধথাকাকালে তিনি একদিন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ মহাশয়ের বাড়ী আগমন করত তাঁহার হাতে দোকানের চাবি দিয়া উক্ত দোকানের আসবাবপত্র সমুদয় বিক্রয় করিতে বলেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'সপ্তগ্রাম উদ্ধারণ দত্ত স্থায়ী সেবা ভাণ্ডারে' প্রদান করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে উপেনবাবু উক্ত দোকানের বিক্রয়লব্ধ অর্থে সপ্তগ্রাম শ্রীপাট উদ্ধারণ দত্ত স্থায়ী সেবা ভাণ্ডারে ৩॥০ টাকা সুদী ৫০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়া দিয়াছেন।

তিনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাঁহার পত্নী তাঁহার জীবিতকালেই স্বর্গারোহণ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই বা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন নাই।

তিনি ১৩৩৪ সালে ১৫ই ও ১৬ই পৌষ তারিখে অনুষ্ঠিত কলিকাতায় বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর অধিবেশনের অব্যবহিত পরে পরলোক গমন করেন।

মাণিকলাল দত্তের উইল

মৃত্যুর পূর্বে ১৯২৭ সনের ১২ আগষ্ট তারিখে তিনি একটি উইল ও কডিসিল দ্বারা তাঁহার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দেবসেবা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় সুপরিস্ফুট। এই দানের পরিমাণ আনুমানিক ৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। বঙ্গদেশের অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনারেল এই উইলের এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টী। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল পাইন, সলিসিটার, শ্রীযুক্ত কনকচন্দ্র বড়াল এম বি ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস দে—এই তিনজন এই উইলের সাক্ষী। এই উইল ১৯২৭ সনের ১৩ই আগষ্ট তারিখে বেলা ১টার সময় কলিকাতার ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার অব অ্যাসিউরেন্সের নিকট রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে।

কলিকাতায় ৩১নং হিদারাম ব্যানার্জি লেন, ৭।১,৯ ও ৯।২ নং বাবুরাম শীলের লেন, ২।৩ নং বিশ্বনাথ মতিলাল লেন, এবং ২নং কৃষ্ণলাহা লেনস্থ বাটী, শ্রীরামপুরে রাজা কিশোরীমোহন গোস্বামী ষ্ট্রীটস্থ বসতবাটীর অর্ধাংশ, বেনিয়াপাড়া লেনস্থ জমির অর্ধাংশ ও শ্রীরামপুর বাজারে অবস্থিত তিনিখানি দোকান ঘরের অর্ধাংশ তাঁহার উইলের স্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি, গভর্ণমেণ্ট বণ্ড, জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর অংশপত্র, ডিবেঞ্চার, স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার, হীরাজহরৎ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে উইলের মর্ম উদ্ধৃত হইল :—

"১। আমি এতদ্দ্বারা আমার পূর্বকৃত উইলসমূহ প্রত্যাহার করিতেছি এবং ১৯২৪ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের উইল বাতিল করিতেছি। ইহাই আমার শেষ উইল।

*　　*　　*　　*

"৫। ৩১নং হিদারাম ব্যানার্জি লেনস্থ বাটীতে আমি ঠাকুর রাধাকান্ত জিউ ও গোপাল জিউ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। পরবর্তী নির্দেশ মত অন্য ঠাকুর-বাটী প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত এই বাটী ঠাকুরবাটীরূপে ব্যবহৃত হইবে, এবং ইহার দ্বারদেশে 'মাণিকলাল দত্ত প্রতিষ্ঠিত সৌদামিনী দাসী ঠাকুরবাড়ী' এই কথা কয়টি উৎকীর্ণ ফলক স্থাপন করিতে হইবে।

"৬। আমি নির্দেশ করিতেছি যে আমার সম্পত্তি হইতে ৪৫০০০৲ টাকা

কলিকাতা সহরে কমবেশ ৪।৫ কাঠা জমি ক্রয়ের জন্য ও রাধাকান্ত জিউ ও গোপাল জিউ ঠাকুরদ্বয়ের বাসস্থানের জন্য বাটী প্রস্তুতার্থ অথবা ৪।৫ কাঠা জমির উপর কোন নূতন প্রস্তুত বাড়ী উপরোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার উপযোগী বিশিষ্ট ভদ্রপল্লীতে ক্রয়ের জন্য পৃথক করিয়া রাখিবেন। উক্ত ঠাকুরবাটী নির্মিত বা ক্রীত হইলে উহার দ্বারদেশে 'মাণিককাল দত্ত প্রতিষ্ঠিত সৌদামিনী দাসী ঠাকুরবাটী' এই কথা কয়টি উৎকীর্ণ ফলক স্থাপন করিতে হইবে। এই বাটী ও উহার সংলগ্ন জমি ঠাকুর রাধাকান্ত জিউ ও গোপাল জিউর সম্পত্তি হইবে।

* * * *

"৯। আমি নির্দেশ করিতেছি যে, আমার এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টি ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ৩।০ টাকা সুদী কোম্পানীর কাগজে রূপান্তরিত করিবেন এবং ইহা 'রাধাকান্ত জিউ গোপাল জিউ দেবোত্তর ফণ্ড' নামে অভিহিত হইবে। এই ফণ্ড উক্ত ঠাকুরের সম্পত্তি হইবে। এই ফণ্ডের আয় হইতে ঠাকুরবাটীর সাময়িক সেবার খরচ প্রদত্ত হইবে। উদ্বৃত্ত আয় হইতে মাসিক ২৫০৲ টাকা ঠাকুরের নিত্য সেবা ও ভোগের জন্য সেবায়তকে দিতে হইবে। পূজারী, রাঁধুনী, চাকরদিগের বেতন ও অন্যান্য খরচ ইহার অন্তর্ভুক্ত। ঠাকুরবাটীর মেরামত খরচ, সেবা ও ভোগের অন্য মাসিক ২৫০৲ টাকা ও অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের টাকা আদায়ের কমিশন প্রভৃতি বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা নিম্নলিখিত প্রকারে সাময়িক উৎসবাদিতে ব্যয়িত হইবে ঃ—

ঝুলন যাত্রা ... ১২৫০৲
দোল ,, ... ৭৫০৲
বার্ষিক মহোৎসব এবং দরিদ্র ও অতিথিসেবা এবং
অন্যান্য উৎসব ... ... ৭৫০৲

আমার এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টী সেবায়তগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দেবোত্তর ফণ্ডের পরিচালনা ও ঠাকুরের সেবা ও ভোগাদির জন্য পরিকল্পনা করিবেন। আমার এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টি উদ্বৃত্ত আয় হইতে ঠাকুরবাটীর উন্নতি ও আকস্মিক খরচের জন্য ১০,০০০ টাকা 'রিজার্ভ ফণ্ড'রূপে রাখিতে অধিকারী হইবেন।

"১০। আমি নির্দেশ করিতেছি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী কিরণবালা দাসী তাহার জীবিতকাল পর্যন্ত ঠাকুরবাটীতে বাস করিয়া ঠাকুরের সেবা-পূজার তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে। এই দেবোত্তর ফণ্ডের আয় হইতে তাহার ভরণপোষণ চলিবে। অন্য কোন সেবায়ত বা তাহাদের আত্মীয় ঠাকুরবাড়ীতে স্থায়ী বা অস্থায়িভাবে বাস করিতে পারিবে না।

"১১। আমার ভ্রাতা শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভাগীনেয় চন্দননগরের হরিপদ শীলের পুত্র শ্রীহীরালাল শীল, স্বর্গীয় জয়গোপাল দত্তের পুত্র আমার খুড়তুত ভাই যোগেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় রাধানাথ দত্তের পুত্র, আমার খুড়তুত ভাই মাণিকলাল দত্ত এবং ৮নং হিদারাম ব্যানার্জি লেনস্থ সুবর্ণ-বণিক্ সমাজের সেক্রেটারী—এই কয়জনকে আমি ঠাকুরের সেবায়ত নিযুক্ত করিলাম।

* * * *

"১৩। আমি নির্দেশ করিতেছি যে, আমার এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের কার্যনির্বাহক সমিতি বা সাময়িক কর্তৃপক্ষকে আমার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ 'বিশ্বম্ভর দত্ত বালক-বালিকা ওয়ার্ড' প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণের জন্য ২০,০০০৲ টাকা দিবেন; তবে সর্ত এই যে, এই উইলের ১৪ দফা অনুসারে দুইটি ছাত্রকে কলেজে ভর্তি করিতে হইবে। উহাদের বেতন আমার এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টি দিবেন।

"১৪। আমি নির্দেশ করিতেছি যে আমার ট্রাষ্টি ও এক্সিকিউটার ২০০০৲ টাকা ৩।০ টাকা সুদী কোম্পানীর কাগজে রূপান্তরিত করিবেন। উহা আমার মাতার নামে 'গোলাপমণি দাসী ফণ্ড' নামে অভিহিত হইবে। এই ফণ্ডের আয় হইতে আদায়ের খরচ বাদে ৩।৪টি সুবর্ণবণিক্‌জাতির হিন্দু দরিদ্র ছাত্রের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত অন্য কোন মেডিকেল কলেজে সমগ্র পাঠ্যকালের বেতন দিতে হইবে। এই ছাত্রগণ কলিকাতা সুবর্ণ-বণিক্ সমাজের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক মনোনীত হইবে; যদি কখনো এই সমাজের অস্তিত্ব না থাকে তবে উক্ত কার্যের জন্য ট্রাষ্টি কর্তৃক নিযুক্ত ৪ জন সুবর্ণবণিক্ দ্বারা ছাত্রগণ মনোনীত হইবে। নির্দিষ্টসংখ্যক

সুবর্ণবণিক্ ছাত্র পাওয়া না গেলে অন্য জাতীয় দরিদ্র হিন্দু ছাত্রকে উক্ত বিনা বেতনে পাঠের সুযোগ দেওয়া হইবে। যখনই কোন ফ্রি-ছাত্রের স্থান পাঠশেষ হেতু, অথবা পাঠত্যাগ হেতু বা অন্য কারণে শূন্য হইবে, অমনি তাহা আমার পূর্ব নির্দেশ মত পূর্ণ করিতে হইবে।

"১৫। আমি নির্দেশ করিতেছি যে, আমার এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টি ৫০,০০০৲ টাকা ৩৷৷০ সুদী কোম্পানীর কাগজে রূপান্তরিত করিবেন, উহা 'আশুতোষ দে মেমোরিয়্যাল ফণ্ড' নামে অভিহিত হইবে। ইহার মোট আয় হইতে আয়কর ও আদায়ের খরচ বাদ দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত ২০টি হিন্দু বাঙালী ছাত্রকে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজে ১০টি ছাত্রকে—তন্মধ্যে ৬টি আই এ বা আই এস্-সি ও ৪টি বি এ বা বি-এস সি —বিনা বেতনে পরিবার সুবিধা দান করিতে হইবে। উক্ত ২০ ও ১০ জন ছাত্রের মধ্যে যথাক্রমে ১০ জন ও ৫ জন সুবর্ণবণিক্ ছাত্র হইবে। যদি নির্দিষ্টসংখ্যক সুবর্ণবণিক্ ছাত্র না থাকে, তবে অন্য জাতীয় বাঙালী হিন্দু ছাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ট্রাষ্টি দ্বারা নির্বাচিত দুই জন সুবর্ণবণিক্ জাতীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সহিত একযোগে পরামর্শ করিয়া করিতে হইবে। যখন কোন ছাত্রের স্থান পাঠশেষ, পাঠত্যাগ বা অন্য কারণে খালি হইবে, অমনি সেই স্থান আমার নির্দেশানুসারে পূর্ণ করিতে হইবে।

"১৬। আমি আরও নির্দেশ করিতেছি যে, আমার এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টি এক লক্ষ দশ হাজার টাকা মূল্যের ৩৷৷০ টাকা সুদী কোম্পানীর কাগজ খরিদ করিয়া আমার স্ত্রী শ্রীমতী প্রেমবতী দাসীর নামানুসারে 'প্রেমবতী দাসী বিধবা ও বিবাহ ফণ্ড' গঠন করিবেন। এই ফণ্ডের আয় হইতে প্রত্যেক মাসে আমার এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টি ১০০৲ টাকা কলিকাতা, শ্রীরামপুর, হুগলী, চুঁচুড়া ও চন্দননগরের ২৫টি বিধবাকে বিভাগ করিয়া দিবেন। আমি আরও নির্দেশ করিতেছি যে, অবশিষ্ট আয় কলিকাতা, শ্রীরামপুর, হুগলী, চুঁচুড়া ও চন্দননগরের দরিদ্র সুবর্ণবণিক্‌গণকে তাঁহাদের কন্যার বিবাহদানার্থ এককালীন ১০০৲ টাকা হিসাবে সাহায্য করিবেন।

এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টি এই কার্য নির্বাহের জন্য তাঁহার মনোনীত সুবর্ণবণিক্ জাতীয় ৪ জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সহিত একযোগে পরামর্শ করিয়া কার্য করিবেন।

"১৭। আমি শ্রীরামপুর গভর্ণমেণ্ট হাসপাতালের সংলগ্ন "মাণিকলাল দত্ত দাতব্য চক্ষুচিকিৎসালয়' নামে এক দাতব্য চক্ষুচিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের হাতে ৫০ হাজার টাকা দান করিতেছি। আমি নির্দেশ করিতেছি যে উক্ত ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ৫ হাজার টাকা উক্ত চক্ষুচিকিৎসালয়ের গৃহ-নির্মাণার্থ ব্যয়িত হইবে। অবশিষ্ট ৪৫ হাজার টাকা কোম্পানীর কাগজে খাটাইয়া উহার সুদ হইতে চক্ষুচিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্বাহ হইবে। আমি আমার ট্রাষ্টি ও এক্সিকিউটারকে উক্ত টাকা গভর্ণমেণ্টের কর্মচারী বা শ্রীরামপুরে উক্ত হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করিতে নির্দেশ করিতেছি।

"১৮। আমি নির্দেশ করিতেছি যে, আমার এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টি ১০ হাজার টাকা হুগলী ও বর্ধমান জেলায় পানীয় জলের জন্য নলকূপ-খননার্থ পৃথক করিয়া রাখিবেন। যে যে স্থানে নলকূপ খনন করিতে হইবে, তাহা তিনি হুগলীর কলেক্টারের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন। প্রত্যেক নলকূপের নিকট 'শ্রীরামপুরের মাণিকলাল দত্তের স্মৃতিরক্ষার্থ' এই কথা কয়টি উৎকীর্ণ ফলক স্থাপন করিতে হইবে।

"১৯। আমি বেনিয়াপাড়া লেনস্থ জমির অর্ধাংশ শ্রীরামপুর এম্ ই স্কুলকে দান করিতেছি। উক্ত স্কুলের গৃহ-নির্মাণার্থ আরও ৫ হাজার টাকা দান করিতেছি। আমার ট্রাষ্টি দেখিবেন যেন, অচিরে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মিত হয়।

"২০। আমি ইটালির ২৪নং গোরাচাঁদ রোডস্থ চিত্তরঞ্জন হাস-পাতালের আয়ুর্বিজ্ঞান পরিষদ্‌কে উহার সংশ্লিষ্ট প্রসূতি-বিভাগের ফ্রি বেড বৃদ্ধির জন্য দশ হাজার টাকা দান করিতেছি; এই ফ্রি বেড 'মাণিকলাল দত্ত ফ্রি বেড' নামে পরিচিত হইবে।

"২১। আমি ৪৪নং ইয়োরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনস্থ কলিকাতা মেডিকেল এইড এণ্ড রিসার্স সোসাইটি ও ২৪ পরগণার যাদবপুরে অবস্থিত

চন্দ্রমোহন ঘোষ মেমোরিয়্যাল সেনিটেরিয়াম নামক যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ে দশ হাজার টাকা দান করিতেছি। ইহা দ্বারা যতগুলি সম্ভব ফ্রি বেড প্রতিষ্ঠিত হইবে ও উহা 'মাণিকলাল দত্ত ফ্রি বেড' নামে অভিহিত হইবে।

"২২। আমি আমার শ্রীরামপুরের রাজা কিশোরী মোহন গোস্বামী ষ্ট্রীটস্থ বসতবাটী আমার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্তকে তাহার জীবিত-কালে ভোগদখলের জন্য দান করিতেছি। তাহার মৃত্যুর পর উহা আমাদের গৃহদেবতা ঠাকুর শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দন জিউর সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবে। আমি শ্রীরামপুর বাজারে তিনখানা দোকানের অর্দ্ধেক অংশও আমাদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দন জিউকে দান করিতেছি ; তবে সর্ত এই যে উহার আয় হইতে প্রত্যেক মাসে মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে শ্রীরামপুরের বেনিয়াপাড়ার খালধারে অবস্থিত মহাপ্রভু ঠাকুরের সেবা-পূজার জন্য দিতে হইবে।

* * * *

"২৪। আমার সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ হইতে, প্রথমে শ্রীরামপুর বালিকা বিদ্যালয়ের উপযোগী গৃহ-নির্মাণার্থ দুই হাজার টাকা দিতে হইবে। তৎপরে ৫ হাজার টাকা পূর্ব্বলিখিত নলকূপের সংরক্ষণার্থ ব্যয়িত হইবে এবং উক্ত অবশিষ্টাংশ রাধাকান্তজিউ ও গোপালজিউর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।"

উপরি লিখিত ২৪ দফা উইল ব্যতীত তিনি ১৯২৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে একটি কডিসিল সম্পাদন করেন। এই কডিসিল রেজিষ্ট্রিকৃত নহে। উহার সাক্ষী শ্রীযুক্ত মদনগোপাল দে ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র পাল।

উপরি লিখিত উইল ও কডিসিল তাঁহার দ্বিতীয় উইল। তিনি প্রথমে অন্য একখানি উইল করিয়াছিলেন। উহা ১৯২৪ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে সম্পাদিত হইয়াছিল।

মাণিকলাল দত্তের সম্পাদিত কডিসিল

৺মাণিকলাল দত্ত মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয় উইল ব্যতীত একটি কডিসিলও সম্পাদন করেন। এই কডিসিলের দ্বারা তিনি তাঁহার গুরু,

পুরোহিত, ভিক্ষাপুত্র ও আত্মীয়স্বজনগণকে নগদ টাকা, অলঙ্কার প্রভৃতি দান করিয়াছেন। উহার বিবরণ নিম্নরূপ—

১। বাদলা, সিঙ্গারকোণনিবাসী গুরু শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী ... ৫০০৲ টাকা

২। শ্রীরামপুরনিবাসী পুরোহিত শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী ... ১০০৲ "

৩। শ্রীরামপুরনিবাসী পুরোহিত শ্রীঅঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী ... ২০০৲ "

৪। শ্রীরামপুরনিবাসী পুরোহিত শ্রীবামাপদ চক্রবর্ত্তী ... ১০০৲ "

৫। কলিকাতা ইটালিনিবাসী স্বর্গীয় নরোত্তম মুখোপধ্যায়ের পুত্র, ভিক্ষাপুত্র শ্রীহরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ২০০০৲ "

৬। ফরাসী চন্দননগরের অধিবাসী শ্রীহরিপদ শীলের পত্নী, ভগ্নী শ্রীমতী আশাময়ী দাসী ... ৫০০০৲ "

৭। খুড়তুত ভাই ৫১।১নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র শ্রীমান্ তিনকড়ি দত্ত ... ২০০০৲ "

৮। ৩১নং হিদারাম ব্যানার্জি লেন নিবাসী ৺লালবিহারী মল্লিকের বিধবা পত্নী শ্রীমতী কিরণবালা দাসী ... ১০০০৲ "

২১০০০৲ টাকার ৩।০ টাকা সুদী কোম্পানীর কাগজ ও ১০০০৲ টাকার ৪ টাকা সুদী মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার তিনি তাঁহার খুড়তুত ভাই ৫১।১ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দত্ত ও ২১নং ফিয়ার্স লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দত্তকে সমানভাগে দিয়াছেন।

তাঁহার সমস্ত হীরা-জহরতাদি ও স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ৫১।১নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীতিনকড়ি দত্তের পত্নী শ্রীমতী রাজকুমারী

দাসীকে ও অন্য ভ্রাতুষ্পুত্র ২১নং ফিয়ার্স লেন নিবাসী শ্রীদুলালচন্দ্র দত্তের পত্নী শ্রীমতী শোভাময়ী দাসীকে সমানভাগে দিয়াছেন।

শ্রীরামপুরনিবাসী ৺জয়গোপাল দত্তের পুত্র তাঁহার জেঠতুত ভাই শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দত্তকে তিনি ১০০০৲ টাকা তাঁহার অবিবাহিতা কন্যার বিবাহের জন্য দান করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন কলিকাতা, ১২নং পঞ্চানন তলা রোড নিবাসী তাঁহার বন্ধু, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মল্লিক তাঁহাকে যে তাঁহার বসতবাটী বন্ধক দিয়াছিলেন, তিনি উহার দাবী প্রত্যাহার করেন। তাঁহার জেঠতুত ভাই শ্রীরামপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দত্তের বন্ধকী বাটীর দাবীও তিনি এই সঙ্গে প্রত্যাহার করিয়াছেন।

তাঁহার ৫১নং হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় লেনস্থ সমস্ত স্বর্ণ, রৌপ্য ও কাঁসার বাসনপত্র ঠাকুর-সেবার জন্য সেবায়তগণের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য উইলের এক্সিকিউটারকে নির্দেশ করিয়াছেন।

প্রথম উইলের বিবরণ

বর্তমান উইলের পূর্বে তিনি একখানি উইল সম্পাদন করিয়াছিলেন। বর্তমান উইলে উহা বাতিল করেন। নিম্নে তাঁহার প্রথম উইলের মর্ম প্রদত্ত হইল। ইহাতে উভয় উইলের পার্থক্য সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে।

প্রথম উইলে তিনি স্বীয় শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডকরণের জন্য ৫০০০৲ টাকা নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপুর বেনিয়াপাড়া লেনস্থ জমির অর্ধাংশে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জিউর ঠাকুরবাড়ী ২৫,০০০৲ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইবে। উক্ত ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ২০০০৲ টাকার অধিক ব্যয় হইবে না, এবং উক্ত ঠাকুরবাড়ীর নাম “মাণিকমন্দির” রাখিতে হইবে। উক্ত ঠাকুরের সেবার জন্য মাসিক তিনশত টাকা ও উৎসবাদির জন্য বার্ষিক ২৪০০৲ টাকা ব্যয়িত হইবে। এই উদ্দেশ্যে একলক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি বা বণ্ডে রূপান্তরিত করিতে হইবে, যাহাতে মাসিক ৫০০৲ টাকা আয় হয়।

তাঁহার শ্রীরামপুরস্থ বাটীতে "বিশ্বম্ভর দাতব্য ঔষধালয়" প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই ঔষধালয় নির্মাণে ৫০০০৲ টাকার অনধিক ব্যয়িত হইবে। ৫০০০০৲ টাকা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে, যাহাতে এই দাতব্য ঔষধালয়ের খরচ-নির্বাহার্থ মাসিক ২৫০৲ টাকা আয় হয়।

৫০,০০০৲ টাকা মাসিক ২৫০৲ টাকা আয় হয় এইরূপ গভর্ণমেণ্ট বণ্ডে রূপান্তরিত করিয়া "শ্রীমতী গোলাপমণি দাসী বিধবা ও দরিদ্র ভাণ্ডার" স্থাপন করিতে হইবে। এই আয় সুবর্ণবণিক্ জাতীয় বিধবা ও দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে।

২৫০০০৲ টাকা গভর্ণমেণ্ড বণ্ডে রূপান্তরিত করিতে হইবে, যাহাতে বার্ষিক ১৫০০৲ আয় হয়। ইহা দ্বারা "শ্রীমতী প্রেমবতী দাসী বালিকা বিবাহ সাহায্য ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ট্রাষ্টির বিবেচনানুসারে উহা দরিদ্র সুবর্ণবণিক্-বালিকা-বিবাহে সাহায্যার্থ প্রদত্ত হইবে। এই সমস্ত দরিদ্র, বিধবা ও বালিকা শ্রীরামপুর, হুগলী, চুঁচুড়া ও চন্দননগরের অধিবাসী হওয়া চাই।

২৫,০০০৲ হাজার টাকা ব্যয়ে শ্রীরামপুরে জমি ক্রয় করিয়া গৃহনির্মাণ করিতে হইবে, উহাতে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, উহার নাম হইবে "মাণিকলাল দত্ত ফ্রি স্কুল"। এক লক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্ট বণ্ডে রূপান্তরিত করিয়া যাহাতে মাসিক ৫০০৲ টাকা আয় হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ৫০০৲ টাকা স্কুলের খরচ সরবরাহ করিবে।

তিন হাজার টাকা কোম্পানীর কাগজে খাটাইতে হইবে যাহাতে মাসিক ১৫৲ টাকা আয় হয়। ঐ টাকা শ্রীরামপুর বেনিয়াপাড়ার সন্নিকটস্থ খালধারের মহাপ্রভুর সেবার জন্য ব্যয়িত হইবে।

তাঁহার খুড়তুত ভাই শ্রীসত্যচরণ দত্তের দুই কন্যার বিবাহার্থ প্রত্যেককে ৫০০৲ হিসাবে দেওয়ার নির্দেশ আছে।

গুরু শ্রীনিত্যনন্দ গোস্বামী	...	১০০০৲ টাকা
পুরোহিত শ্রীঅঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী	...	১০০০৲ ,,
,, শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী	...	৫০০৲ ,,

পুরোহিত শ্রীবামাপদ চক্রবর্ত্তী	...	৫০০্ টাকা
ভিক্ষাপুত্র শ্রীহরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	৫০০০্ „
ভগ্নী শ্রীমতী আশাময়ী দাসী	...	২০০০্ „
ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ তিনকড়ি দত্ত	...	৫০০০্ „
কলিকাতা ১২নং পঞ্চাননতলা নিবাসী শ্রীবিপিন-বিহারী মল্লিকের দুই পুত্র শ্রীনিতাইচাঁদ মল্লিক ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রত্যেকে ৫০০্ হিঃ	...	১০০০্ „
চুঁচুড়ার স্বর্গীয় লালবিহারী মল্লিকের বিধবা পত্নী শ্রীমতী কিরণবালা দাসী	...	৫০০্ „

অবশিষ্ট সম্পত্তি তিনি এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টিকে দান করিয়া যান, যেন তাঁহারা উহা বিক্রয় করিয়া সমস্ত অর্থ রক্ষা করেন ও জনহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয় করেন।

শ্রীরামপুরের দুইজন জমিদার প্রথম উইলের এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টী ছিলেন।

প্রথম উইল সম্পাদনের পর তিনি উইল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং তাঁহার ও শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের সুপরামর্শে ব্যক্তিগত ট্রাষ্টে এই বিশাল সম্পত্তি দান রহিত করিয়া উহাকে গভর্ণমেণ্ট ট্রাষ্টে পরিবর্তিত করেন এবং ব্যক্তিগত দান হ্রাস করিয়া সাধারণের উপকারার্থ দানের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন।

৫এ অক্রুর দত্ত লেনে উইলের সর্তানুযায়ী শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জিউ ও শ্রীশ্রীগোপাল জিউর ঠাকুর-বাটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার বহির্দেশে দেওয়ালে মর্মরফলকে নিম্নলিখিত অংশ উৎকীর্ণ রহিয়াছে—

"শ্রীশ্রীরাধাকান্তজিউ ও শ্রীশ্রীগোপালজিউ
ঠাকুর বাটী
শ্রীরামপুর নিবাসী বৈষ্ণবদাসানুদাস
৺মাণিকলাল দত্ত প্রতিষ্ঠিত
সন ১৩৪৫ সাল।"

সুকবি ৺রাজনারায়ণ দত্ত

সুকবি রাজনারায়ণ দত্ত

সুকবি রাজনারায়ণ দত্ত মহাশয় সাবেক আমলের একজন সিনিয়ার স্কলার ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য ও রচনায় তাঁহার দখল ছিল। সুপ্রসিদ্ধ হেয়ার সাহেব (David Hare) তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। সিনিয়ার স্কলারসিপ পাঠের সময় তিনি সুপণ্ডিত ডি এল্ রিচার্ডসন সাহেবের সহিত পরিচিত হন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণবাবু Osmyn নামক একখানি ইংরেজী কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য তাঁহার গুরু রিচার্ডসনএর নামে উৎসৃষ্ট। ৪টি অধ্যায়ে ১০৪ পৃষ্ঠায় এই কাব্য সমাপ্ত। আরব দেশীয় Osman নামক একটি বীর যুবকের প্রণয়-কাহিনী লইয়া এই কাব্য রচিত হইয়াছে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বাবু The Chuckerbutty Faction নামক একখানি বিদ্রূপরসাত্মক প্রহসন রচনা করেন। তিনটি অঙ্কে ৭২ পৃষ্ঠায় প্রহসনখানি সমাপ্ত। তাঁহার প্রথম রচিত খণ্ডকাব্য Leisure Hour এখন দুষ্প্রাপ্য। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-সম্পাদক উদয়চাঁদ আঢ্য ইঁহার সতীর্থ ছিলেন।

'ওস্‌মিন' কাব্য

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের রচিত "ওস্‌মিন" কাব্যখানির নামপত্রের প্রতিলিপি নিম্নরূপ—

"Osmyn
An Arabian Tale
by
Rajnarain Dutt.

'A schoolboy freak, unworthy praise or blame
I printed—older children do the same.
'T is pleasant, sure, to see one's name in print;
A book's a book, although there's nothing in't.'
Byron

Calcutta
Printed at the Bengal Superior Press,
No. 74, Bowbazar.
1842"

পুস্তকখানির উৎসর্গ-পত্র নিম্নরূপ—

"To

D. L. Richardson Esqr.

Sir,

Were I to select a patron from amongst those whose names would enhance the respectability of any publication, I could not but turn to you.

Permit me then to inscribe to you the first juvenile production with which I shall trespass on public patience, and your indulgence, and accept it as a slight, but sincere token of gratitude and respect from

Calcutta
8th May, 1841

Your obliged and humble servant
Rajnarain Dutt"

পুস্তকখানির ভূমিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"Preface

In presenting his little volume to the public, the author feels it as much his duty, as his pleasure to announce the motives which have led him to the execution of the work.

So rare are poetical publications in this country, and so few persons have the courage, or the ambition to excel in verse, that perhaps every effort of this nature, however imperfect, should meet with encouragement and support.

He is not, and does not desire to be considered a professional poet;—this unpretending little work is the amusement of such leisure as more important and laborious duties have from time to time afforded him; he, therefore, flatters himself with the idea, that the public will treat him with a

generous indulgence, and thus taking even humble talent by the hand, aid it in its laudable exertions."

'ওস্‌মিন' কাব্যের গল্পাংশ

ওস্‌মিন কাব্যের মূল আখ্যানটি নিম্নরূপ :—

একদা আরব দেশে ওমন সমুদ্রের ধারে এক জনপদে ওস্‌মিন নামে এক আমীর রাজত্ব করিতেন। তিনি যেমন বীর তেমনই সুশাসক ছিলেন। প্রজারা তাঁহার অধীনে সন্তুষ্টচিত্তে বাস করিত। কিন্তু তাঁহার মনে সুখ ছিল না। তিনি জেলিকা নাম্নী একটি রমণীকে ভালবাসিয়া ছিলেন। তাঁহাদের বিবাহ প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছিল, এমন সময়ে তাঁহাকে যুদ্ধযাত্রা করিতে হয়। যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি শুনিলেন যে, জেলিকা তাঁহার চিরশত্রু হাসানের সহিত পরিণীতা হইয়াছে। সেই অবধি তিনি মর্মাহত হইয়া রহিলেন। ওস্‌মিন যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গিয়াছেন, এই মিথ্যা সংবাদ দিয়া হাসান জেলিকাকে অনেক কষ্টে বিবাহ করিতে সমর্থ হয়।

একদিন রাত্রিতে ওস্‌মিন উদারভাবে সমুদ্রতটে পদচারণা করিতেছিলেন এমন সময় একটি রমণীর করুণ বিলাপধ্বনি তাঁহার কাণে গেল। রমণী তাঁহার স্বামীর সহিত যে সকল সুখের দিন অতিবাহিত করিয়াছেন, সেই অতীত কথা স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছিলেন। ওস্‌মিন কাছে আসিয়া দেখিলেন, এ আর কেহই নহে—জেলিকা। তখন উভয়ে উভয়ের নিকট মনোব্যথা খুলিয়া বলিতে লাগিলেন। জেলিকা বলিলেন,—"আমাকে এই নর-পিশাচের হাত হইতে রক্ষা কর। চল আমরা কোথাও পলাইয়া যাই।" ওস্‌মিনও তাই চাহেন। কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন আগে হাসানের যথোচিত শাস্তি-বিধান করিবেন, তারপর অন্য কথা। এই বলিয়া পাছে জেলিকার আকর্ষণে প্রতিহিংসার কথা ভুলিয়া যান সেইজন্য দ্রুত চলিয়া গেলেন।

হাসানের জন্মদিন উপলক্ষে সমস্ত নগরী যেন আনন্দে হাসিতেছিল। নানা প্রকার আমোদ-ক্রীড়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তন্মধ্যে বল্লম-ক্রীড়াই

বিশেষ প্রসিদ্ধ। দুইজন দুইজন করিয়া লোক আসিয়া পরস্পর যুঝিতেছিল। শেষকালে স্বয়ং হাসান বল্লম হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। প্রভু ও দলপতির সহিত দলের কোন্ লোক যুঝিবে! এমন সময় দেখা গেল অপরিচিত ব্যক্তি দেখা দিয়াছেন। তাঁহার ঢালের মধ্যে সিংহের ছবি এবং লেখা রহিয়াছে 'যে আমার সহিত যুঝিতে সাহস করিবে তাহার নিশ্চিত মৃত্যু।' তিনি একেবারে মসীকৃষ্ণ ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছেন। দুইজনে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। অনেকক্ষণ পরে হাসানের ঢাল চূরমার করিয়া দিয়া হাসানকে তাঁহার শত্রু ভূপাতিত করিলেন। তারপর তাঁহার বক্ষের উপর পা দিয়া তাঁহার শত্রু কাণে কাণে কিছু বলিয়া উঠিলেন ও তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন হাসান তাঁহার বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া হঠাৎ দলস্থ সকলকে ছাড়িয়া কোন পাহাড়ের উপর চলিয়া গেলেন। তিনি আর ফিরিলেন না। তাঁহার রাজ্যে একটা শোকের ঝড় উঠিল। নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। তাঁহার ঘোড়া যে রক্তাক্ত দেহে প্রভুকে না লইয়াই ফিরিয়া আসিয়াছিল ইহা সকলেই দেখিয়াছে।

হাসানের মৃত্যুর পর ওস্‌মিনের সহিত জেলিকার বিবাহের আর কোন বাধা রহিল না। কিন্তু ওস্‌মিনের সহিত মিলিত হইবার সম্ভাবনাতেও জেলিকা নিজের বিষণ্ণতা কাটাইয়া উঠিতে পারিলেন না। বিবাহের দিন সমাগত হইল। মোল্লা উভয়কে একত্র করিতে যাইবে, এমন সময় সেই মস্‌জিদের মধ্যে এক অপার্থিব ভীষণ বাণী জেলিকাকে লক্ষ্য করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিল—'পাপিষ্ঠা তুই কি ইহারি মধ্যে ভুলিয়া গেলি যে আমি তোর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম?" ওস্‌মিনকে বলিল,—'শয়তান ভাবিয়াছ কি তোমার আনন্দের দিন অফুরন্ত?' জেলিকা কাঁদিয়া বলিলেন,—'হায় ভগবান্ এ সেই!' ইহার পর একদিন নিভৃতে ওস্‌মিন জেলিকাকে স্পষ্ট বলিলেন—কিরূপে তিনিই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হাসানকে হত্যা করেন। তারপর তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত বেদুইনদের রাজ্যে পলাইয়া যান।

খলিফ্ ওস্‌মিনকে শাস্তি দিবার জন্য অনেক সৈন্য-সামন্ত পাঠাইয়া

দেন। খলিফের সৈন্যেরা যখন দূরে সমুদ্রতীরে বিশ্রাম করিতেছিল তখন ওস্‌মিন ও তাঁহার বেদুইন সৈন্য তাঁহাদের আক্রমণ করেন। অতর্কিত আক্রমণে প্রথমটা কাবু হইলেও শেষকালে খলিফের সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া ওস্‌মিন অবশিষ্ট বেদুইন সৈন্য সহ দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। ইতিমধ্যে জেলিকা পুরুষ বেশে ক্ষতবিক্ষত হইয়া বেদুইনের দেশে চলিয়া আসিয়াছেন।

দুর্গের ভিতর আশ্রয় লইয়াও নিস্তার নাই। খলিফের সৈন্যেরা আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করিল এবং দেখিতে দেখিতে দুর্গের পতন ঘটিল। ওস্‌মিন যুদ্ধ করিতে করিতে মারা পড়িলেন, আর অন্তিম সময়ে দেখিতে পাইলেন জেলিকা কাছে রহিয়াছেন। জেলিকাও যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার পাশে চির-নিদ্রিতা হইলেন।

এই কাব্যটিতে টেনিসনের প্রভাব খুব বেশী লক্ষিত হয়। তাঁহার কিং আর্থার কাব্য যেমন একটি অদৃশ্য রমণী-হস্ত অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছিল, এ কাব্যেও সেরূপ রহস্যপূর্ণ বাণী ও রহস্যপূর্ণ পুরুষ লইয়া আগাগোড়া গল্পটা সাজানো হইয়াছে। কোথাও কোথাও গ্রের Elegyকেও মনে পড়াইয়া দেয়। যথা,—

"Now all was rest, the revellers had gone,
And left the night, Osmyn, and cares alone." (p. 58)

কোন কোন স্থলে উৎকৃষ্ট কাব্য-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। কবি প্রকৃতি-বর্ণনায় উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। এখানে দুইটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

"The vault of heaven is fair and blue,
The radiant stars are shining bright;
And nature clad in softest hue
Sleeps in the morn's transparent light;" (p. 25)

"The moon shines bright;—it is the hour that wakes
The musing soul to dream of pleasure past;
It is the hour that bright-winged fancy takes
To wreathe her spell round joys that would not last."
(p. 64)

'দি চাকারবাত্তি ফ্যাকসন'

'দি চাকারবাত্তি ফ্যাকসন' কবি রাজনারায়ণ বাবুর রচিত একখানি ব্যঙ্গরসাত্মক ইংরেজী প্রহসন। নিম্নে দি চাকারবাত্তি ফ্যাকসনের নামপত্র প্রদত্ত হইল—

"The Chuckerbutty Faction
or
Calcutta Preserved
A Farce
In three Acts.
'Hereditary Bondsmen! know ye not
Who would be free, himself must strike the blow.'
Calcutta
1843
Price One Rupee—No tick."

এই পুস্তকের ভূমিকা নিম্নরূপ—

"Preface

The tale which these disjointed scenes present is written to give a faint idea of the manners and character of the enlightened class of natives, and fictitious characters are introduced for the sake of giving some connection to the piece, which however make no pretence to regularity.

It has been suggested to the author by friends, that in these characters he may incur the suspicion of having intended some real personages; this he begs leave once for all to disclaim; for though in some trivial particulars, and those merely local, there might be ground for such a notion, yet in the main points he should hope there is none.

It is almost superfluous to mention that the circumstances on which the drama, if it may be so called, is founded being purely imaginary, no allusion either personal or indirect is intended unless one should choose to place the cap on one's own head.

The publication of a work of this nature in India is not a frequent occurrence and the author trusts that the discerning critic will overlook the imperfections of this little work."

নিম্নে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম দেওয়া গেল—

Dramatis Personæ

Men

Lord Villain-thorough
Chuckerbutty
Sreenath
Dwarky
Humbug
(Chuckerbutty, Sreenath, Dwarky, Humbug — Conspirators)
Zalimkha, King of Kabul

Sidarkha, an Afghan chief in charge of the British Prisoners, Members of Council, Secretary, Aide-de-Camp, Guards, Conspirators, Citizens, etc. etc.

Women

Lady Magdalene, one of the Kabul prisoners; Marina, her friend.

Scene—partly in Calcutta and partly in Kabul

Time—the close of the Nineteenth Century

রাজনারায়ণ বাবুর দান

রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে ২০,০০০৲ বিশ হাজার টাকার একটি ট্রাষ্ট ফণ্ড গঠন করিয়া যান। তাঁহার জামাতা প্রসাদলাল দত্ত, ভাগিনেয় কেশবলাল দে ও পুত্র বলাইচাঁদ দত্ত—এই তিন জনকে তিনি ফণ্ডের ট্রাষ্টি করেন। রাজনারায়ণ বাবুর নির্দেশানুসারে ট্রাষ্টিগণ এই ফণ্ডের সুদ হইতে মাসিক এক হইতে তিন টাকা পর্যন্ত সর্বজাতির দরিদ্র বিধবাগণকে দান করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। প্রথমোক্ত দুইজন ট্রাষ্টির

মৃত্যু হইলে, বলাই বাবু একমাত্র ট্রাষ্টি থাকেন। মৃত্যুর কিছু পূর্বে বলাই বাবু পিতৃপ্রদত্ত এই ফণ্ডে (২০,০০০৲ টাকার) আরও দুই হাজার টাকা নিজে দিয়া মোট ২২,০০০৲ হাজার টাকা বাংলার অফিসিয়্যাল ট্রাষ্টির হাতে জমা দেন। এই টাকার সুদ হইতে ২০।২৫ জন বিধবা মাসিক বৃত্তি এবং শীতকালে গাত্র-বস্ত্রের জন্য দুই টাকা হিসাবে পাইয়া থাকেন। রাজনারায়ণ বাবুর মৃত্যুর পর হইতে আজ পর্যন্ত এই দান সমভাবে চলিয়া আসিতেছে।

৺বলাইচাঁদ দত্ত

৺বলাইচাঁদ দত্ত প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল, মধুপুর, সাঁওতাল পরগণা
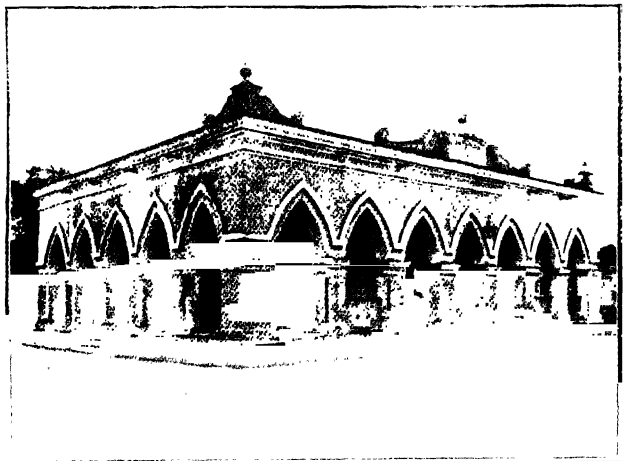
স্বর্গীয় বলাইচাঁদ দত্ত

যে সমস্ত মহাপ্রাণ সুবর্ণবণিক্ জনহিতকর অনুষ্ঠান দ্বারা দেশের ও সমাজের বহু কল্যাণসাধন করিয়াছেন, স্বর্গীয় বলাইচাঁদ দত্ত তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মধুপুরের দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল, কলিকাতার ছাত্রাবাস, ধর্মশালা, ঠাকুরবাড়ী, বৃত্তি প্রভৃতি তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

আনুমানিক ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মাঘী পূর্ণিমার দিন, '২৭নং কলুটোলা ষ্ট্রীটের ভবনে' বলাইচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় রাজনারায়ণ দত্ত। রাজনারায়ণ বাবুর দুই বিবাহ; প্রথমা পত্নী শ্যামাসুন্দরী, দ্বিতীয়া পত্নী প্রসন্নময়ী। প্রথমা পত্নীর একটি কন্যা হয়, তাঁহার নাম বসন্তকুমারী। ইঁহার সহিত ৺পুলিনবিহারী দত্তের পিতা প্রসাদলাল দত্তের বিবাহ হয়। বলাইচাঁদ দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্র।

বলাইচাঁদের বিদ্যাশিক্ষা

বাল্যে বলাইচাঁদ তৎকাল-প্রচলিত প্রথামত গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ভর্তি হন। সেখানকার পাঠ সমাপন করিয়া তিনি হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করেন। এই বিদ্যালয় হইতে তিনি ১৬ বৎসর বয়সে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি একটি বৃত্তিও লাভ করেন। তারপর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে যথাসময়ে এফ্ এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া, উক্ত কলেজেই বি এ পড়িতে থাকেন। সে সময় J. Sutcliffe সাহেব প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

এটর্নি বলাইচাঁদ

বলাইচাঁদ বি এ পড়িবার সময় পিতার কাছে ইংরেজী শিখিতেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বলাইচাঁদ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি এ পাশ করেন। বি এ পাশের পর আইন শিক্ষার জন্য বলাইচাঁদের আগ্রহ হয়। তিনি তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট সলিসিটার্স মেসার্স বারনার্ড এণ্ড স্যাণ্ডারসন কোম্পানীর অফিসে প্রবেশ করিবার জন্য দরখাস্ত করেন। তাঁহার দরখাস্ত

পাইয়া স্যাণ্ডারসন কোম্পানী তাঁহার নিকট অনেক টাকা প্রবেশিকা চাহেন। বলাইচাঁদের পিতা তত টাকা দিতে ইতস্ততঃ করায়, তিনি অধ্যক্ষ সাটক্লিফ সাহেবের শরণাপন্ন হন। সাটক্লিফ সাহেব বলাইচাঁদকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি বলাইচাঁদের সহিত স্যাণ্ডারসন কোম্পানীর অফিসে যাইয়া তাঁহাকে সেখানে ভর্তি করিয়া দেন। কর্মকর্তাদিগের মধ্যে অনেকেই সাটক্লিফ সাহেবের বিশেষ পরিচিত ও বন্ধু। তাঁহার প্রমুখাৎ বলাইচাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাব-চরিত্রের পরিচয় পাইয়া তাঁহারা ফি-স্বরূপ মাত্র ১০৲ দশ টাকা গ্রহণ করিলেন। এই অফিসে শিক্ষানবিশী করিবার কালে তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বি এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর যথাসময়ে বলাইচাঁদ এটর্ণিসিপ পরীক্ষা পাস করেন। পাসের পর তিনি দু'এক বৎসর ঐ অফিসেই কাজ করিয়া পরে নিজে স্বাধীনভাবে কার্য করিতে থাকেন।

তাঁহার শরীর তেমন সবল না থাকায় তিনি পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। সেই জন্য এই ব্যবসায়ে অর্থোপার্জন বা প্রতিপত্তিলাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলাইচাঁদ

বলাইচাঁদের পিতা অর্থশালী ছিলেন। বলাইচাঁদই তাহার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। কারণ বলাইচাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৭।৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা বৈমাত্রেয় ভগিনী বসন্তকুমারী পূর্বেই উপযুক্ত পাত্রে পরিণীতা হন।

অর্থের জন্য বলাইচাঁদকে কোন দিনই ভাবিতে হয় নাই। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বলাইচাঁদের পিতা পরলোক গমন করায়, বলাইচাঁদ তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

পৈতৃক ধর্মানুষ্ঠান

এফ্ এ পাশ করিবার পর, কিছুদিনের জন্য বলাইচাঁদ আদি ব্রাহ্ম-সমাজের অনুকরণে নিজ বাটীর একতলার বৈঠকখানা গৃহে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণকে লইয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। তারপর তিনি এ পথ

পরিত্যাগ করেন। পৈত্রিক অনুষ্ঠান,—দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরেও যাহাতে রীতিমতভাবে এই অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া যান।

বিবাহ ও জনহিতকর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি

এফ্‌ এ পাশ করিবার পর জোড়াসাঁকো নিবাসী শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা নিস্তারিণী দাসীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহাদের একটিমাত্র কন্যা হয়। কিন্তু শৈশবেই সেই কন্যা মারা যায়। কন্যার মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহারা উভয়ে বিশেষ শোকাকুল ও মর্মাহত হন। এই সময় তাঁহার জীবনে একটি বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। পরোপকার-প্রবৃত্তি ও জনহিতকর অনুষ্ঠানের দিকে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। বাল্যকাল হইতেই স্বভাবত তিনি করুণ ও কোমল প্রকৃতির লোক ছিলেন। পরের দুঃখ বা কষ্ট দেখিলে তিনি বিচলিত হইতেন এবং সেই দুঃখ মোচনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। তবে লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা না থাকায়, জীবনে তাঁহাকে এজন্য বহুবার প্রতারিত হইতে হইয়াছিল।

প্রৌঢ় বয়সে বলাইচাঁদ ফ্রী-মেশন দলে মিশিয়া অনেক টাকা ব্যয় করেন। ফ্রী-মেশন দল হইতে তিনি একটি বিশিষ্ট উপাধিও লাভ করেন।

দেববিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

১৩০৯ সালে ২৬শে বৈশাখ শুক্রবার (অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ব দিন), ১৯০২ খৃষ্টাব্দ, ৯ই মে তারিখে ২৭ নং কলুটোলা ষ্ট্রীটে, পৈত্রিক বাড়ীতে তিনি "বিজয় রাধামাধব" নামে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি এবং পিতা রাজনারায়ণবাবুর নামানুসরণে "রাজরাজেশ্বর" শ্রীধর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঠাকুরবাড়ী তাঁহাদের কুলগুরু ৺রাধাগোবিন্দ গোস্বামীর নামে প্রতিষ্ঠিত। ইঁহার বাড়ী বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রামে।

বাড়ীটি দুই মহল—বাহিরের মহলে একতলে ঠাকুরের গৃহ, সুবিস্তৃত দালান, প্রশস্ত প্রাঙ্গণ এবং কর্মচারীর গৃহ, দ্বিতলে প্রকাণ্ড বৈঠকখানা বা বসিবার ঘর, ত্রিতলে পূজারীর ঘর। ভিতরের মহলে একতলায় ভোগের

ঘর, ভাঁড়ারের ও অতিথিগণের আহারের ঘর এবং দ্বিতলে মহিলাদের জন্য ৫ খানি ঘর আছে।

ঠাকুরবাড়ীর দেওয়ালে নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—

"শ্রীরাধাবিজয়াখ্য-মাধব-সমভ্যর্চা-বিধৌ মন্দিরং
পিত্রোঃ প্রীতিকৃতে হরেঃ পদজুষোর্বৈকুণ্ঠলোকে মুদা।
সস্ত্রীকেণ বলাইচাঁদ-কৃতি-দত্তেন প্রতিষ্ঠাপিতং
শাকাব্দে শ্রুতি-যুক্-কুলাচল-বিধৌ কাব্যে সিতে মাধবে॥
রাধামাধব পূজনার্থ পিতৃলোকানন্দ সম্প্রাপিত
শ্রীরাধাবিজয়ের মন্দির ইহা হৈল প্রতিষ্ঠাপিত।
জায়াযুক্ত বলাইচাঁদ বিনয়ী দত্তান্বয়ী কর্তৃক
শাকাষ্টাদশ চব্বিশাব্দ-মুখ-ষড়বিংশে দিনে ভার্গবে॥"

বর্তমানে এই মন্দির-পরিচালনার ব্যয়সঙ্কুলানার্থ নিত্য সেবার জন্য মাসিক ১৮০৲ টাকা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট পার্বণের জন্য বাৎসরিক ১৫০০৲-২০০০৲ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন এই ঠাকুর বাড়ীতে ১৫।১৬ জন অভ্যাগত দুই বেলা প্রসাদ পায়। পূর্বপ্রথানুযায়ী ঠাকুরবাড়ীতে এখনও রথ, জন্মাষ্টমী, ঝুলন, দুর্গোৎসব, রাস ও দোল প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

বলাইচাঁদের মৃত্যু

খৃষ্টাব্দ ১৯০৬, জুলাই মাসে (১৩১০, আষাঢ়) বলাইচাঁদ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া তিন চারিদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সে সময়ে তাঁহার সহধর্মিণী নিস্তারিণী দাসীও কঠিন রোগে শয্যাগত ছিলেন।

নিস্তারিণী দাসী

স্বনামধন্য মতিলাল শীল মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত বলাই বাবুর শ্বশুর ৺শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয়ের বিবাহ হয়। এই সম্পর্কে বলাই বাবুর পত্নী ৺নিস্তারিণী দাসী মতিলাল শীল মহাশয়ের দৌহিত্রী। ৺শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয়ের পিতা জোড়াসাঁকো নিবাসী ৺রূপলাল মল্লিক মহাশয়ও অর্থশালী ব্যক্তি ছিলেন।

৺নিস্তারিণী দাসী

বাল্যে নিস্তারিণী, জোড়াসাঁকো চিৎপুর রোডস্থিত তাঁহার পিত্রালয়ের পার্শ্বস্থিত বাটিতে গভর্ণমেণ্ট বাংলা পাঠশালায় চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ১৩০৯ সালের ২৬শে বৈশাখ বিজয়রাধামাধব ঠাকুর প্রতিষ্ঠার প্রায় ছয় মাস পরে নিস্তারিণী দীর্ঘকালব্যাপী কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। নানারূপ চিকিৎসায় তাঁহার রোগের উপশম হইল না। ১৩১০ সালের ২রা আষাঢ় তাঁহার স্বামী বলাই বাবুর মৃত্যু হয়। ইহার পঁচিশ দিন পরে নিস্তারিণী পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স প্রায় ৪৬ বৎসর হইয়াছিল।

পরলোক গমনের কয়েক দিন পূর্বে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি, আনুমানিক প্রায় ১২৫,০০০৲ এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা নানা সৎকার্যে ও স্বামীর প্রতিষ্ঠিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যের জন্য দান করিয়া যান। তিনি উইল করিয়া ৺বলাই বাবুর মাতুল ৺হরিচরণ শীল, শ্রীযুক্ত নন্দলাল চন্দ্র এবং ঢাকা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র* প্রভৃতি তিন জনকে তাঁহার সম্পত্তির এক্সিকিউটার নিযুক্ত করেন।

বলাই বাবুর দান

বাংলার অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনারেলের হাতে বলাই বাবু দাতব্য অনুষ্ঠানসমূহ এবং মধুপুরের হাসপাতাল ও ঔষধালয় পরিচালনার জন্য মোট তিন লক্ষ টাকা দান করেন।

মধুপুরের হাসপাতাল ও দাতব্য ঔষধালয়

৺পূজার ছুটিতে বলাই বাবু প্রায়ই তীর্থ ও দেশ ভ্রমণে বাহির হইতেন। শেষ বয়সে নানা স্থানে যাতায়াত ক্লেশকর হওয়ায়, মধুপুর ষ্টেশনের সন্নিকটে একজন সাহেবের নিকট হইতে একখানা বাংলো ক্রয় করিয়া তিনি তথায় পূজাবকাশ যাপন করিতেন। একবার সেখানে তাঁহার এক পাচক ব্রাহ্মণের কলেরা হয়। বহু অনুসন্ধানেও তিনি তথায় ভাল চিকিৎসক পাইলেন না। পাচকটি উক্ত রোগে প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনায়

*ইনি কাশীর প্রসিদ্ধ ডাঃ লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের পুত্র এবং কলিকাতার ডাঃ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের অগ্রজ।

মনে আঘাত পাইয়া তিনি মধুপুরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। মধুপুরে জায়গা কিনিয়া তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনে মনোযোগী হন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাড়ী প্রস্তুত হইলে বাংলার তৎকালীন গভর্ণর সার জন উড্‌বার্ণ কর্তৃক ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটিত হয়। মধুপুরের হাসপাতালে এ বিষয়ে প্রস্তরফলক উৎকীর্ণ আছে, তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদান করা গেল—

"The Dutt Charitable Dispensary
erected out of filial respect
to the sacred memory of
Babu Rajnarain Dutt
Late of Kalutola Street, Calcutta
by his son
Bolye C. Dutt
A. D. 1900
Foundation laid by the
Hon'ble Justice C. M. Ghose
Opened by His Honor the Lieutt. Govr. of Bengal"

প্রথমেই বলাই বাবু এই চিকিৎসালয়ে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার, একজন কম্পাউণ্ডার এবং একজন বেহারা নিযুক্ত করেন। এই হাসপাতাল পরিচালনার জন্য তিনি বাংলার অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেলের হাতে প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়া আরও ব্যবস্থা করিয়া যান যে, যদি তাঁহার ন্যস্ত সম্পত্তি ও অর্থে কুলায় তবে তাহা হইতে এই দাতব্য ঔষধালয়টির সহিত যেন একটি দাতব্য হাসপাতালও করা হয়। তাঁহার এই নির্দেশমত তাঁহার ভাগিনেয়গণ নিম্নের বিভাগগুলি তৈয়ারী করিয়া এবং অস্ত্রোপচারের উপযোগী যন্ত্রপাতি কিনিয়া এই দাতব্য ঔষধালয়টিকে, "দাতব্য ঔষধালয় ও হাসপাতালে" পরিণত করেন। এজন্য বলাই বাবুর সম্পত্তি হইতে ১৮,০০০৲ টাকা দেওয়া হয় এবং নিস্তারিণী দাসীর এক্সিকিউটারগণ ৫,০০০৲ টাকা দান করেন।

হাসপাতালের বাড়ী

মধুপুর ষ্টেশন হইতে Dutt's Charitable Dispensary প্রায় ৫।৬ মিনিটের পথ। এই ঔষধালয় ও হাসপাতাল মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের 'Tagore Cot'এর দক্ষিণে "বলাই দত্ত রোডের" উপর অবস্থিত। মধুপুরের মিউনিসিপ্যালিটি বলাই বাবুর এই সৎকীর্তির জন্য তাঁহার নামে এই রাস্তাটির নামকরণ করিয়াছেন। প্রায় পাঁচ বিঘা জায়গার উপর হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় অবস্থিত। Dutt's Charitable Dispensaryর সীমানার মধ্যস্থলে হাসপাতালের গৃহ বর্ত্তমান। এই বাড়ীটির দৃশ্য সুন্দর। হাসপাতাল বাড়ীটি দুই অংশে বিভক্ত—পুরুষ ও মহিলা-বিভাগ। বাড়ীটির তিন দিকে প্রশস্ত বারান্দা। সর্বসমেত এই হাসপাতালে ১০টি রোগীর শয্যা (বেড) আছে। তন্মধ্যে পুরুষদিগের জন্য ছয়টি এবং স্ত্রীলোকদিগের জন্য চারিটি শয্যা নির্দিষ্ট।

হাসপাতাল-গৃহের দক্ষিণ দিকের বাড়ীটির বিভিন্ন বিভাগে দাতব্য ঔষধালয়, ডিস্‌পেন্‌সারী, অস্ত্রোপচার এবং নিভৃত পরীক্ষার গৃহ অবস্থিত। বাম দিকে হাসপাতালের ডাক্তার বাবুর গৃহ এবং পশ্চাদ্‌ভাগের দক্ষিণ কোণের এক অংশে কম্পাউণ্ডার এবং অপরাংশে ধাত্রীর গৃহ। এই সমস্ত বাড়ী ব্যতীত বহু খোলা জায়গা পড়িয়া আছে। হাসপাতালের সর্বত্রই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল। অস্ত্রোপচারের জন্য নানাপ্রকার যন্ত্র এবং মূল্যবান্ ঔষধাদিও এখানে আছে। ডিস্‌পেনসারী গৃহের প্রাচীরে বলাই বাবু ও তাঁহার পিতা রাজনারায়ণ বাবুর দুইখানি সুবৃহৎ চিত্র বিদ্যমান।

হাসপাতালের পরিচালনা

হাসপাতালের কার্য-পরিচালনার জন্য এখানে একটি স্থানীয় পরামর্শ-সমিতি (Local Advisory Committee) আছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সেই সমিতির সভ্য এবং মধুপুর মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক।

১। শ্রীযুক্ত মহম্মদ ইসাক্, স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার

২। দেওঘরের সাব্‌ডিভিসনাল অফিসার
৩। ডুম্‌কার সিভিল সার্জন
৪। বাংলার অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনারেলের প্রতিনিধি
৫। প্রতিষ্ঠাতার পক্ষের প্রতিনিধি
৬। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল

এই হাসপাতালে যে কোন জাতির রোগী বা রোগিণীকে রাখা ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে আগত সকলকেই ঔষধ দেওয়া হয়। হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের জন্য বর্তমানে একজন ডাক্তার, একজন কম্পাউণ্ডার, একজন চাকর, একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও একজন মেথরের বন্দোবস্ত আছে।

হাসপাতালের ব্যয়

হাসপাতালের সমস্ত খরচা Inspector General of Civil Hospitals, Behar and Orissa, অনুমোদন করিয়া Administrator General of Bengal এর কাছে পাঠাইয়া দেন। তারপর Administrator General সমস্ত খরচার টাকা প্রদান করেন। গৃহের সংস্কার প্রয়োজন হইলে, তাহার টাকাও প্রদত্ত হয়।

বলাই বাবু কৃত ব্যবস্থায় ধাত্রীর কোন বন্দোবস্ত নাই। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ৪০৲ টাকা বেতনে মধুপুরের মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক একজন ধাত্রী এই হাসপাতালে রাখা হয়। তাঁহার ও একজন মেথরাণীর বেতন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিই দিতেন। তারপর কোন কারণে এ ব্যবস্থা লোপ পায়। উপস্থিত আবার ৫০৲ টাকা বেতনে একজন ধাত্রী রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এ টাকা মিউনিসিপ্যালিটিই দিবেন।

হাসপাতালের ডাক্তার নিয়োগ এবং তাঁহাকে পরিবর্তন করিবার ভার বিহার ও উড়িষ্যার Inspector General of Civil Hospitalsএর উপর ন্যস্ত আছে। বাংলার অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনারেল ডাক্তার বাবুর জন্য মাসিক ১০৯৲ টাকা দেন। অতিরিক্ত যাহা লাগে তাহা বিহার ও উড়িষ্যার Inspector General of Civil Hospitals-কে দিতে হয়। ১৯২৮ হইতে ১৯৩০ পর্যন্ত এই তিন বৎসরে হাসপাতালের ভিতরে স্থান

প্রাপ্ত ও বাহিরের রোগীর তালিকা এবং কোন্ বৎসরে কত টাকা খরচ হইয়াছে, তাহার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল—

	হাসপাতালের ভিতরে স্থানপ্রাপ্ত রোগী	বাহিরের রোগী	মোট সংখ্যা	মোট খরচ
১৯২৮ খৃষ্টাব্দ	৮৬	৬,৯৪০	৭,০২৬	৪,১৯৯৲
১৯২৯ ,,	১০৭	৬,০২৩	৬,১৩০	৩,৬৯১৲
১৯৩০ ,,	৮২	৬,৫৪৯	৬,৬৩১	৫,৬৩১৲

বর্ষকাল বহু মধুপুরবাসী ও নানা স্থান হইতে বায়ু-পরিবর্তনার্থ আগত নরনারীর উপকার সাধন করিতেছে।

ঠাকুরবাড়ী

২৭ নং কলুটোলা ষ্ট্রীটে বলাইবাবুর প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরবাড়ীর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (পৃঃ ২৯৯) এই ঠাকুরবাড়ী সংক্রান্ত কার্যাদি ও দেব-সেবার তত্ত্বাবধানের ভার বলাইবাবু স্বীয় ছয় ভাগিনেয় ৺পুলিনবিহারী দত্ত, ৺মহেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বটবিহারী দত্ত, ৺রাসবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত রামবিহারী দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত মহাশয়গণের উপর অর্পণ করিয়া যান। এক বৎসর হিসাবে ইঁহাদের প্রত্যেকের পালা পড়ে। ইঁহাদের যত্নে ঠাকুরবাড়ী ও দেব-সেবার কার্য সুশৃঙ্খলে চলিতেছে। বলাইবাবুর পত্নী নিস্তারিণী দাসীর এক্সিকিউটার মহাশয়েরা ঠাকুরবাড়ী ও দেব-সেবার জন্য নিস্তারিণী দাসীর ফণ্ড হইতে মাসিক কুড়ি টাকা হিসাবে সাহায্য করেন।

ধর্মশালা

বলাইবাবু মৃত্যুর পূর্বে ৭১।এ ও ৭১।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীটে দুইটি বাড়ী ক্রয় করেন। প্রথমে ৭১।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীটের সুবৃহৎ ত্রিতল বাড়ীটি বলাইবাবুর উইলের নির্দেশ অনুসারে—"Temporary residence for respectable Hindus coming to town for religious purposes" রূপে ব্যবহৃত হইত। পার্শ্বের ৭১।এ নম্বরের বাড়ীটি সংস্কৃত-পাঠার্থী

ছাত্রদিগের বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট ছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ৭১।এ কলুটোলা ষ্ট্রীটের বাড়ীটির পাশ দিয়া কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের একটি নূতন রাস্তা বাহির হয়। এই কারণে ও দেবোত্তর প্রভৃতি পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায়, ৭১।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীটের বাড়ীটি ভাড়া দেওয়া হয় এবং ১৩নং রতু সরকারের গলিতে পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি নূতন ত্রিতল বাড়ী নির্মাণ করাইয়া সেই বাড়ীতে সংস্কৃত-পাঠার্থীদিগের ছাত্রাবাস স্থানান্তরিত হয়। এই বন্দোবস্ত অনুসারে ছাত্রাবাসের পূর্বতন বাড়ী অর্থাৎ ৭১।এ নং কলুটোলা ষ্ট্রীটে ধর্মশালা স্থান পাইল। বাড়ীটি ত্রিতল, বৃহৎ উঠান, তিনটি তলেই অনেকগুলি ঘর এবং ঘর-সংলগ্ন প্রশস্ত বারান্দা —ধর্মশালার বৃহদনুষ্ঠানের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। বাড়ীটির তত্ত্বাবধানের ভারও বলাইবাবুর ভাগিনেয়গণের উপর ন্যস্ত আছে।

ছাত্রাবাস

বর্তমানে কলুটোলায় ১৩ নং রতু সরকারের লেনে এই ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত। ছাত্রাবাসের বাহিরে উৎকীর্ণ প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—

"Balie Chand Dutt
and
Nistarini Dasi Free Home
for Sanskrit Students.
বলাইচাঁদ দত্ত
ও
নিস্তারিণী দাসী প্রদত্ত
সংস্কৃত-শিক্ষার্থী-নিবাস"

বাড়ীটির মেরামত ও আনুষঙ্গিক খরচা বলাই বাবুর সম্পত্তির আয় হইতেই নির্বাহিত হয়। নিস্তারিণী দাসীর এক্সিকিউটারগণ ৫১,৫০০৲ টাকা বাংলার অ্যাড্মিনিষ্ট্রেটর জেনারেলের হাতে এই সর্তে দিয়াছেন যে, এই টাকার আয় হইতে ছাত্রাবাসে অবস্থিত ছাত্রগণ আহারাদির জন্য একটা মাসিক বৃত্তি পাইবে। বলাইবাবু ও তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর পর বাংলার অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেল, বলাইবাবুর ভাগিনেয়গণ ও নিস্তারিণী

দাসীর এক্সিকিউটারগণের মধ্যে ইহা স্থির হয় যে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় পঁচিশটি পর্যন্ত উপযুক্ত সংস্কৃত-পাঠার্থী (টোল বিভাগের) ছাত্র নির্বাচন করিবেন। এই পঁচিশটি ছাত্র বলাই বাবুর ছাত্রাবাসে থাকিতে পারিবে এবং নিস্তারণী দাসী প্রদত্ত মাসিক বৃত্তি পাইবে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় বা তাঁহার নির্বাচিত উক্ত কলেজের কোন অধ্যাপক এই ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধান করিবেন।

পূর্বে ছাত্রেরা খোরাকীর জন্য মাসিক ছয় টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইত, এখন মাসিক ৮৲ টাকা হিসাবে পাইতেছে। ছাত্রাবাসের একতলার দুইখানি ঘর ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতলে ৬খানি এবং ত্রিতলে ৫খানি ঘর। এই ১১খানি ঘর ছাত্রদিগের বাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। চতুর্থ তলে ৬খানি ঘর আছে। এই ঘরগুলি পাকাদি কার্যের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

মাসিক বৃত্তি ব্যতীত ছাত্রেরা প্রতি বৎসর শীতের সময় একখানি করিয়া কম্বল পায়। বর্তমানে সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় এই ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধান করেন। এখন ছাত্রাবাসে মোট একুশ জন ছাত্র অবস্থান করিতেছে; তন্মধ্যে

দর্শন-পাঠার্থী	...	১২ জন
ন্যায়—৭ জন, সাংখ্য—৫ ,,		
স্মৃতি-পাঠার্থী	...	৬ জন
ব্যাকরণ ,,	...	৩ জন
	মোট	২১ জন

স্মৃতি-পাঠার্থীদিগের মধ্যে ফরিদপুরের অন্তর্গত ধানুকা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাকরণতীর্থ সুবর্ণবণিক্ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

নিস্তারিণী দাসীর দান

স্বামীর প্রতিষ্ঠিত মধুপুর হাসপাতালে ৫,০০০৲ টাকা, সংস্কৃত-পাঠার্থী ছাত্রদিগের বৃত্তির জন্য ৫১,৫০০৲ এবং বিজয় রাধামাধব ঠাকুর সেবার জন্য

মাসিক ২০৲ টাকা দান ব্যতীত নিম্নলিখিত দানগুলিও নিস্তারিণী দাসীর ফণ্ড হইতে করা হইয়াছে। এই দানশীলা মহিলা সর্বসমেত প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা নানা সৎকার্যের জন্য দান করিয়া যান।

প্রেসিডেন্সী কলেজে বৃত্তি

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে নিস্তারিণী দাসীর নামে দুইটি বৃত্তি আছে। এই বৃত্তির জন্য নিস্তারিণী দাসীর এক্সিকিউটারগণ প্রেসিডেন্সী কলেজের কর্তৃপক্ষের হস্তে ১৮,০০০৲ আঠার হাজার টাকা প্রদান করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "Information concerning Presidency College, Calcutta, Session 1930-31" পুস্তিকার ১০এর পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়—

"Two scholarships of the value of Rs. 12 a month each, tenable for two years, are awarded annually to Hindu candidates on the results of the Intermediate examination in Science and the Bachelor of Science examination. A prize of the approximate value of Rs. 54 is also awarded annually to the Hindu students of the 2nd year Inter-Science class, who produces the best laboratory notes on experimental work in Physics. They were founded in 1912 by the executors to the estate of Srimati Nistarini Dasi, deceased, widow of late Balye Chand Dutt of Calcutta."

লুইস জুবিলি স্যানিটেরিয়ামে দান

দার্জিলিংএ স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য গমন করিয়া যাহাতে অক্ষম ব্যক্তিও সস্ত্রীক বিনা খরচায় থাকিতে পান, তাহার ব্যবস্থার জন্য নিস্তারিণী দাসীর এক্সিকিউটারগণ লুইস জুবিলি স্যানিটেরিয়ামের কর্তৃপক্ষের হস্তে ছয় হাজার টাকা দান করেন। এই টাকা দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তি সস্ত্রীক উক্ত স্বাস্থ্যাবাসে বিনা খরচায় থাকিতে ও খাইতে পারে।

অন্যান্য দান

(১) কলিকাতা মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষের হাতে ছয়টি 'বেডে'র জন্য এক্সিকিউটারগণ ছত্রিশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

(২) কলিকাতা মেয়ো হাসপাতালেও নিস্তারিণী দাসীর একটি অবৈতনিক 'বেড' আছে।

(৩) বাংলার অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেলের হাতে এক্সিকিউটারগণ নিস্তারিণী দাসীর ফণ্ড হইতে দশ হাজার টাকা জমা দিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে বলাই বাবু ও নিস্তারিণী দাসীর গুরু ও পুরোহিতগণ মাসিক ২৫।৩০ টাকা বৃত্তি পান।

বলাই বাবুর সৎকার্যের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন রতু সরকারের লেনের সামনের (পশ্চিম দিকের) রাস্তাটির নাম বলাই বাবুর নামে নামকরণ করিয়া দিয়াছেন।

এই সহৃদয় দানশীল দম্পতি সাধারণের উপকারার্থ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেবা ও ধর্মকার্যের জন্য তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া সমাজে এক উচ্চ আদর্শ দেখাইয়াছেন, যাহা সর্বথা অনুকরণযোগ্য।

৺পুলিনবিহারী দত্ত

১২৬০ (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ) সালের ১লা ভাদ্র, মধ্যম ঝুলনের দিন ৺পুলিনবিহারী দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম প্রসাদলাল দত্ত।

মধুপুরে হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় বলাইচাঁদ দত্ত মহাশয়ের পিতা রাজনারায়ণ বাবুর দুই বিবাহ। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত কন্যা বসন্তকুমারীর সহিত প্রসাদলাল দত্ত মহাশয়ের বিবাহ হয়। এই হিসাবে বলাই বাবু পুলিন বাবুর মাতুল।

বিদ্যাশিক্ষা

কালাকার ষ্ট্রীটের জয়গোপাল বসাকের বাড়ীতে, রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পাঠশালায় পুলিনবাবুর শিক্ষারম্ভ হয়। পরে তিনি মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনে ভর্তি হন। যাতায়াতের অসুবিধার জন্য, তাঁহার পিতা তাঁহাকে চিৎপুর রোডস্থিত দুনিয়ালাল শীল মহাশয়ের বাড়ীতে তৎকাল-প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্ট নর্মাল স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। ইহার পর তিনি সংস্কৃত কলেজের স্কুল-বিভাগে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে উদার-হৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বজাতীয় ছাত্রের জন্য সংস্কৃত কলেজ ও তৎসংলগ্ন বিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও 'সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস' প্রণেতা স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় পুলিন বাবুর সতীর্থ। শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত পুলিন বাবুর পরিচয়, উক্ত বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীতে হয়। বয়সে পুলিন বাবু শাস্ত্রী মহাশয়ের অপেক্ষা কয়েক মাসের বড়। স্কুলে পড়িবার সময় পুলিন বাবু সংস্কৃত শ্লোকের সুন্দর বঙ্গানুবাদ করিতে পারিতেন। সেই জন্য তৎকালীন সংস্কৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষক "কুলীন-কুলসর্বস্ব"-প্রণেতা রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

সুবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তি

৺পুলিনবিহারী দত্ত

কর্মজীবন

উচ্চশিক্ষায় কৃতকার্য হইতে না পারিয়া তিনি হরিদাস দত্ত কোম্পানীর অফিসে কিছুদিন হিসাবাদি শিক্ষা করেন। ইহার পর তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনে এসেস্‌মেণ্ট বিভাগে কাজ করেন। এখানে প্রায় ২৩ বৎসর কাল কার্য করিয়া তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে পেন্‌সন্‌ লইয়া কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

'হৃদয়-প্রতিধ্বনি'

পঠদ্দশা হইতে পুলিন বাবু সাহিত্য-সেবায় ব্রতী হন। তাঁহার রচিত প্রথম কবিতা মদনমোহন মিত্র সম্পাদিত "হালিসহর পত্রিকায়" প্রকাশিত হয়। ক্রমান্বয়ে তিনি অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত "সাধারণী" ও রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত "বীণা" প্রভৃতি পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতা-সমষ্টি ১২৮৯ সনে (১৮৮২ খৃঃ) "হৃদয়-প্রতিধ্বনি" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহাই পুলিন বাবুর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এ সময় পুলিন বাবুর বয়স ত্রিশ বৎসর। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুলিন বাবুকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন—

"13, Bosepara Lane
Calcutta, 27th February, 1890

My dear Poolin Babu,

Myself and our mutual friend Babu Debendra Nath Mazumdar read together your Hridai Pratidhani, and spent a couple of pleasant hours over it. It is not a 'School-boy freak' as you modestly call it. The book is a book with something solid in it. I found in it much to praise. Our friend Debendra Babu, I mean, the brother of late lamented Surendra Nath Mazumdar the poet, was also very deeply impressed as myself with your fluent lines. They were all spontaneous flow of a poetic heart, and not couplets of syllable-

counting Rhymers. Within the compass of a letter, I cannot fully dilate on its merits although it would be a very agreeable task to do it. I could say a great deal. There is much to say on the chastity of the style and thought, the soberness of melancholy pervading the work, the adoration of Nature, the rapture of Love, the Religious ecstasy and the grateful tribute of respect to the departed soul who watched on your tender years. All these I could dwell (on) with pleasure but my space forbids, and reluctantly close with a hearty thanks for your valuable present and your kindness towards me throughout.

Yours very sincerely
Girish Chandra Ghose"

'কাব্য-রেণু'

মধ্যে মধ্যে পুলিন বাবুকে বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে গান ও কবিতা লিখিতে হইত। সেগুলি একত্র করিয়া ১৩১৭ সালে (১৯১০ খৃঃ) তিনি "কাব্য-রেণু" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। "কাব্যরেণু" প্রকাশের পর তাঁহার দুইখানি মূল্যবান্ গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

'বৃন্দাবন-কথা'

১৩২৬ সালে বা ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম গদ্য গ্রন্থ "বৃন্দাবন-কথা" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের একটু ইতিহাস আছে। পুলিনবাবুর পিতামহী, পিতা ও মাতা তিনজনেরই চিতাভস্ম রাধাকুণ্ডের নিকট মল্হার-কুঞ্জে সমাহিত হয়। সে কারণ তিনি ৭।৮ বার বৃন্দাবনে গমন করেন। তাহারই ফলে "বৃন্দাবন-কথা" এবং তৎপরবর্তী গ্রন্থ "মাথুর-কথা"র উদ্ভব হয়। "বৃন্দাবন-কথা"র ভূমিকায় পুলিনবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল—

"নানা কারণে আমাকে ইং ১৮৮০ সন হইতে ১৯১৬ সন পর্যন্ত, সাতবার বৃন্দাবন ধামে যাইতে হইয়াছে। প্রথম চারিবার সাধারণ তীর্থযাত্রীর মত দর্শনাদি করিয়া আসি। পঞ্চম বারে ১৯১২ সনে চৈত্র

মাসে বৃন্দাবনে যাইয়া, একজন প্রাচীনা ব্রজবাসিনীর নিকট হইতে গীতগোবিন্দ, ব্রহ্ম-সংহিতা, উপাসনাপদ্ধতি প্রভৃতি কয়েকখানি পুঁথি[১] ও আনন্দবল্লভ ফটোগ্রাফারের তোলা কতকগুলি সুরম্য কারুকার্যখচিত মন্দিরের চিত্র ক্রয় করিয়া আনি। * * * *

১৯১৫ সালে হোলির সময় বৃন্দাবনে যাইয়া, এক মাস থাকিয়া, হোলি-উৎসব ও কুম্ভমেলা দর্শন করি। এবারে তথাকার কিছু কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনি। এই সময়ে 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত[২] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আলাপ হয়, তিনি আমার আনীত ফটোগুলি দেখিয়া ঐ সকল মন্দিরের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন।"[৩]

এই অনুরোধ রক্ষার জন্য পুলিন বাবু ১৯১৬ সালে পুনর্বার হোলির সময় বিবরণাদি সংগ্রহের জন্য বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে গিয়া বৃন্দাবনবাসী প্রবীণ গোস্বামী ও ব্রজবাসিবৃন্দের নিকট হইতে নানা তথ্য ও বিবরণ প্রাপ্ত হন। সেখানে গোস্বামিগৃহে রক্ষিত প্রায় চারিশত বৎসরের একখানি পুরাতন পুঁথি অবলোকন করেন। পুঁথিখানির নাম,—"সেবা-প্রাকট্য ও ইষ্টলাভের দিন-নির্ণয়"। এই গ্রন্থ হইতে পুলিন বাবু "কোন্ সময়ে মদন-মোহন, গোবিন্দদেব ও রাধাদামোদর প্রভৃতি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ঠাকুরগুলি স্থাপিত হইয়াছিল এবং রূপ, সনাতন, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি গোস্বামিগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব কাল" অবগত হন।

তারপর ফিরিয়া আসিয়া "ব্রজকাহিনী" নামে তিনি ধারাবাহিকভাবে "মানসী ও মর্মবাণী" পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহাই পরে "বৃন্দাবন-কথা" নামে প্রকাশিত হয়।

পুরাকীর্তি সংগ্রহ

এই সমস্ত অনুসন্ধানের সময় তিনি বৃন্দাবন ও মথুরা হইতে পাথরের নিম্নলিখিত কয়েকটি ধ্বংসাবশেষ (মূর্তি, ফুল প্রভৃতি কারুকার্য) সংগ্রহ করিয়া আনেন। এগুলি চারি শত হইতে দুই হাজার বৎসরের পুরাতন—

---

১ পুঁথিগুলি পুলিনবাবু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে উপহার দেন।

২ বর্তমানে পরলোকগত।

৩ বৃন্দাবন-কথা, বিনীত নিবেদন—পৃঃ ৷/০

১। মথুরার কঙ্কালী টীলা হইতে অনুমান পনের শত বৎসরের পুরাতন ভগ্ন নারী-হস্ত।

২। কেশবদেবের পুরাতন মন্দির (যাহা ভাঙ্গিয়া সম্রাট্ আওরঙ্গজেব মস্‌জিদ্ করিয়াছেন) হইতে ভগ্ন গোমুণ্ড।

৩। মানসিংহ নির্মিত গোবিন্দজীর মন্দির হইতে কমল-কোরক।

৪। ভরতপুরের পাথরে খোদিত কয়েকটি লতাপাতা।

৫। মাঠ গ্রামে* প্রাপ্ত কৃষ্ণপ্রস্তর-রচিত একটি নারী-মূর্তি। এই সমস্তগুলিই পুলিন বাবু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 'রমেশ-ভবনে' উপহার দেন।

'মাথুর-কথা'

বৃন্দাবন-কথা প্রকাশের ছয় বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে (১৯২৭ খৃঃ) তাঁহার দ্বিতীয় গদ্য গ্রন্থ "মাথুর-কথা" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি "সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী" ভুক্ত। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে ইহাও পূর্ব গ্রন্থের ন্যায় "মানসী ও মর্মবাণী" পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'প্রেমের ফাঁদ'

পুলিন বাবুর শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ "প্রেমের ফাঁদ"। ইহা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বাহির হইয়াছে। এখানি নাটক। দৈব ও পুরুষকারের খেলা লইয়া রচিত। দুই তিন স্থানে অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচনাও আছে। পুলিন বাবুর লিখিত "বিনীত নিবেদনে"র মারফতে এই গ্রন্থ প্রকাশের বিবরণ জানিতে পারা যায়—

"জীবনের তেজোদীপ্ত মধ্যাহ্ন সময়ে
আরম্ভ করিয়াছিনু যেই গ্রন্থখানি—
দুর্ভাগ্যের বারম্বার ভীষণ পেষণে,
মৃত্যুর নির্মম শোক-অশ্রুর প্লাবনে
অসমাপ্ত ছিল তাহা বহুদিন ধরে।
আজি, এ ধরণী হ'তে বিদায় সময়ে

* মথুরার যাদুঘরের কিউরেটার রায় রাধাকিষণ বাহাদুর শেষোক্তটি পুলিন বাবুকে উপহার দেন। ইনিই উক্ত মাঠগ্রামে কনিষ্কের মুণ্ডহীন মূর্তি আবিষ্কার করেন।

দৃষ্টি, স্মৃতি, বল, বুদ্ধি সকলি হারায়ে
মুখে ব'লে, কানে শুনে, রুগ্ন-ভগ্ন-দেহে
সমাপ্ত করিনু তাহা ম্লান-সন্ধ্যালোকে।"

গঙ্গাসাগরের নিকটবর্তী ধবলাট দ্বীপ পুলিন বাবুর পিতার জমিদারীভুক্ত ছিল। ১২৭১ সালে (ইং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ) ২০শে আশ্বিনে ঝড়ের সময় উক্ত স্থানের প্রজাবর্গের গৃহাদি ঝড়ে নষ্ট হইয়া গেলে এবং বহু যাত্রী বিপন্ন হইলে পুলিন বাবুর পিতা বহু অর্থ ব্যয়ে তাঁহাদের সাহায্য ও উদ্ধার করেন। সেই জন্য উক্ত স্থানের অনেকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত।

পুলিন বাবুরা সাত ভাই। তন্মধ্যে পুলিন বাবুই জ্যেষ্ঠ। কলুটোলা নিবাসী ৺গোপীনাথ রায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত পুলিন বাবুর বিবাহ হয়। পুলিনবাবুর চারি পুত্র ও এক কন্যা। তন্মধ্যে একটি পুত্র—শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত মহাশয় জীবিত। কয়েক বৎসর পূর্বে পুলিন বাবুর স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। তাঁহার মাথুর-কথা গ্রন্থখানি, তিনি পরলোকগতা সহধর্মিণীর নামে উৎসর্গ করিয়াছেন।

পুলিন বাবুর দান

পত্নীর 'অন্তিম অনুরোধে' পুলিন বাবু সাহিত্য-পরিষদের "দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে" ১০,৫০০৲ দশ হাজার পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন।

তাঁহার দানপত্রের মধ্য হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল—

"কস্য ট্রাষ্ট (Trust) বা নিয়োগ-পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি বঙ্গভাষার সেবক দুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবার সঙ্কল্প করিয়া আপনাদের হস্তে ১০,৫০০৲ দশ হাজার পাঁচ শত টাকার বার্ষিক ৩৷৹ টাকা সুদের ভারত গভর্ণমেণ্টের সিকিউরিটি বা প্রমিসারি নোট দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। * * * তন্মধ্যে নিম্নে তপশীলে বর্ণিত ২,১০০৲ দুই হাজার একশত টাকার সিকিউরিটি আপনাদের হস্তে পূর্বে দিয়াছি*। অদ্য তপশীলে বর্ণিত

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের হিসাব এইরূপ ঃ

১৩২৭ সালে কোং কাগজ ১,৫০০৲ ; নগদ ৯৲ ; ১৩২৮ সালে কোং কাগজ ১০০৲ ; ১৩২৯ সালে সুদ ১১৪৶৫ ; ১৩৩০ সালে সুদ ৫৯৷৹ ; ১৩৩১ সালে কোং কাগজ ৫০০৲ ; ১৩৩১ সালে সুদ ৬৮৷৹ ; মোট ২৩৫০৸৶৫।

৮,৪০০৲ আট হাজার চারি শত টাকার সিকিউরিটি আপনাদের হস্তে দিতেছি। উক্ত দশ হাজার পাঁচ শত টাকার সিকিউরিটি আপনাদের হস্তে (Trust) ন্যস্ত রহিল। উক্ত সিকিউরিটির সুদ যে যে সময়ে প্রাপ্য হইবে আপনারা উঠাইয়া লইবেন ও গ্রহণ করিবেন। ঐ সুদের টাকা হইতে আমার পরলোকগতা সহধর্মিণীর অন্তিম অনুরোধ মত কোন একটি দুঃস্থ সাহিত্যিকের অসহায় শিশুকে মাসিক পাঁচ টাকা দান করিয়া সাহায্য করিবেন ও অবশিষ্ট সুদের টাকা হইতে বঙ্গভাষার সেবক এক বা একাধিক দুঃস্থ সাহিত্যিককে অথবা তাঁহার বা তাঁহাদের পরিবারগণকে এককালীন বা মাসে মাসে সাহায্য করিবেন। * * *"

এই সাহায্যদান সম্বন্ধে পুলিন বাবু পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির উপর সম্পূর্ণ ভার দেন। এ পর্যন্ত পুলিন বাবু পরিষদের "দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে" ১১৭৯৪৸৵৫ নিম্নলিখিত হিসাবে জমা দিয়াছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারের পরিচালনা

মূল কোম্পানীর কাগজ	...	১০,৮৭০৷৹
ঐ সুদ হিসাবে	...	৯২৪।৵৫
	মোট	১১,৭৯৪৸৵৫

যেদিন পুলিন বাবু উক্ত টাকা দান করিবার সঙ্কল্প করেন, সেই দিন হইতে তিনি হিসাব করিয়া সুদ বাবদ উক্ত ৯২৪।৵৫ মূলের সহিত দান করেন। ইহা ব্যতীত তিনি ২০০ শত কপি বৃন্দাবন-কথা ও ৪০০ কপি মাথুর-কথা উক্ত ভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে পরিষদের হস্তে দান করিয়াছেন। গ্রন্থ দুইখানির বিক্রয়লব্ধ অর্থও উক্ত ভাণ্ডারে জমা হইতেছে।

সাহিত্য-পরিষদে বহু মহানুভব ব্যক্তি নানা উদ্দেশ্যে অনেক অর্থ দান করিয়াছেন। কিন্তু দুঃস্থ বাংলা সাহিত্য-সেবকের জন্য দান পুলিন বাবুর একটি অভিনব প্রচেষ্টা। ১৩২৭ হইতে ১৩৩৭ পর্যন্ত, গত এগার বৎসরে মোট ৯৬৮৲ টাকা নিম্নলিখিতভাবে এই ভাণ্ডার হইতে দান করা হইয়াছে—

১। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের
বিধবা কন্যা শ্রীমতী পঞ্চাননী দেবী ৪৪১৲

২। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বিধবা পত্নী ৩৮০৲

৩।	স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যা	২৫৲
৪।	শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ	৭২৲
৫।	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	৫০৲
	মোট	৯৬৮৲

পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত ৺রাধাকান্ত জিউর এবং মাতুল বলাইচাঁদ দত্তের প্রতিষ্ঠিত ৺রাধামাধব ঠাকুরের তিনি সেবায়ত ছিলেন।

পুলিন বাবুর কাব্যসমূহের আলোচনা

৺পুলিনবাবুর প্রথম গ্রন্থ "হৃদয়-প্রতিধ্বনি" নূতন বাংলা যন্ত্রে দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২৮৯ সালের (১৮৮২ খৃষ্টাব্দ) ১৫ই বৈশাখ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির মূল্য আট আনা। ইহা গ্রন্থকারের স্বর্গীয়া পিতামহীর নামে উৎসৃষ্ট। গ্রন্থমধ্যে "স্বর্গীয়া পিতামহীর চরণোদ্দেশে" একটি কবিতাও স্থান পাইয়াছে। পিতামহীর উদ্দেশে লিখিত—

"তব সেই মন্ত্র, আর্যে, আজিও যৌবনে—
দেখায় অদ্ভুত স্বপ্ন জাগ্রত রাখিয়া,
আনন্দে কহায় কত কথা জড় সনে,
সচেতন সম তারে দেহ মন দিয়া।
হাসে ফুল, নাচে লতা, গায় বিহঙ্গিনী,
তিতে তরু নেত্র-নীরে, খেলে সৌদামিনী,
ভূধরের সঙ্গে কথা কয় তরঙ্গিণী,
আকাশে কুসুম ফোটে, ঘুমায় মেদিনী,
সিন্ধু সহ রণরঙ্গে মাতায় পবনে,
নন্দনের পারিজাত সাজায় ভূতলে,
শুনায় অপ্সরা-গীতি নিকুঞ্জ কাননে,
ছড়ায় মুকুতাপুঞ্জ শ্যাম দূর্বাদলে।"

পুলিন বাবুর প্রথম কবি-হৃদয়ের সুন্দর অভিব্যক্তি। নানা ছন্দের তেইশটি কবিতা আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ডিমাই ১২ পেজী আকারে ৭৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত।

পুলিনবাবুর "কোথা পাব সুখ?" কবিতাটির ভিতরে দুইটি কথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।—

"প্রকৃতির রাজ্যে যেখানে যাইবে,
অবিচল সুখ সেখানে পাইবে।
সৃষ্টির মাঝারে দেখিতে স্রষ্টারে
সদা সাবধানে করিবে সাধনা,
নিসর্গ-সন্দর্ভ যাঁহার রচনা।" পৃঃ ৯

"প্রকৃতির রাজ্যে অবিচল সুখ" পড়িয়া কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের কথা মনে পড়ে। পত্নীহারা শোকদগ্ধ কবি যখন শান্তির অনুসন্ধানে ব্যাকুল, সেই সময় তিনি প্রকৃতির স্নেহ-কোলে শান্তি পাইলেন। তাই জননীরূপা প্রকৃতি দেবীকে সম্বোধন করিয়া বড়াল-কবি লিখিয়াছিলেন—

"প্রকৃতি জননী জননী!
করিয়া তোমার স্তন-সুধা পান
পরাণে জাগিছে নূতন পরাণ!
নূতন শোণিত, নূতন নয়ান,
নূতন মধুর ধরণী।" এষা, পৃঃ ১২৫

তারপর পুলিন বাবুর "সৃষ্টির মাঝারে দেখিতে স্রষ্টারে।
সদা সাবধানে করিবে সাধনা।"
সৃষ্টির ভিতর দিয়া স্রষ্টাকে অনুসন্ধান করা—এ নীতি ও পদ্ধতি সনাতন।

সুখ দুঃখ সবই মানুষ মন দিয়া অনুভব করে। তাই পুলিন বাবু লিখিয়াছেন—

"সুখের দুঃখের মনই জনক,
মনেই স্বরগ, মনেই নরক।" পৃঃ ৯

তেইশটি কবিতার মধ্যে "কাহে ঝুরে আঁখি" শীর্ষক কবিতাটি ব্রজভাষায় (ব্রজবুলি) রচিত। ব্রজভাষায় কবিতা রচনা করিতে গিয়া পুলিন বাবু কিরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন—

"কাহে দিন যামিনী ঝুরে মঝু আঁখি,
কাহে, সখি, পুছসি হামারে ?
যদি হিয়া-বল্লভ পরবাসে যাওত,
টুটইয়ে পেম-হেম-হারে,
তাহে ব্যথা কৈছন পরাণে না লাগত,
বিরহে পিরিতি পরিপাক,
থোড়ি গমই সুসমাগমে পুন
হরষ বাঢ়ত লাখে লাখ।" পৃঃ ৪১

"হৃদয়-প্রতিধ্বনি"র স্থানে স্থানে পুলিন বাবুর উপমা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। "প্রকৃতি সম্বোধনে" কবিতাটিতে, প্রকৃতি দেবীকে সম্বোধন-পূর্বক কবি লিখিতেছেন—

"শ্যামল গগন তব নিবিড় কবরী
ছায়াপথ সিঁথিরূপে সীমন্তে বিরাজে ;" পৃঃ ৬৩

সুন্দর উপমা। গ্রন্থোক্ত শেষ কবিতা "বিদায় বিদ্যালয়" করুণ। বিদ্যালয় পরিত্যাগকালে তাঁহার হৃদয় যে করুণভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে, ইহা তাহার একখানি নিখুঁত ফটো। তাঁহার এই প্রথম কাব্যগ্রন্থকে পুলিন বাবু "A school-boy freak"† বলিয়া দীনতা প্রকাশ করিলেও, বাস্তবিকই ইহা school-boy freak নহে। মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ভাষায় বলিতে হয়,—"The book's a book with something solid in it."

১৩১৬ সালে বা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "কাব্যকণা" প্রকাশিত হয়। ইহা পুলিন বাবুর দ্বিতীয় গ্রন্থ। গ্রন্থখানি জোড়াসাঁকের সুলভ প্রেসে মুদ্রিত এবং পুলিন বাবুর পিতার নামে উৎসৃষ্ট। এ গ্রন্থে কোন সূচীপত্র দেওয়া হয় নাই। ডিমাই ১২ পেজী আকারে ১২১ পৃষ্ঠায় ইহা সমাপ্ত।

† কবি বায়রণের নিম্নোদ্ধৃত কবিতার অংশ "হৃদয়-প্রতিধ্বনি"র মলাট ও প্রচ্ছদ-পত্রে পুলিন বাবু সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—

"A school-boy freak, unworthy praise or blame
I printed—older children do the same.
'Tis pleasant, sure, to see one's name in print;
A book's a book, although there's nothing in't."

ইহাতে পুলিন বাবুর লিখিত কতকগুলি গান ও কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ফুলদোল, জামাইষষ্ঠী, দশহরা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা পুনর্যাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, রাধাষ্টমী, ষষ্ঠী আগমনী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, বিজয়া-দশমী, হরগৌরী, কোজাগর লক্ষ্মী-পূজা, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, জগদ্ধাত্রীপূজা, অন্নপূর্ণা, চড়কপূজা প্রভৃতি কবিতাগুলিতে হিন্দুর সমস্ত পূজা ও পার্বণের পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে ৩।৪টি কবিতা চল্‌তি ভাষায় লেখা। চল্‌তি ভাষায় কবিতা রচনা করিতে গিয়া পুলিন বাবুর কোথাও ছন্দ, মিল ও যতির দোষ হয় নাই। আর এই কবিতাগুলি বেশ বর্ণনাত্মক হইয়াছে। পরিচয়ের জন্য একটিমাত্র কবিতা উদ্ধৃত হইল—

"ঘণ্টাকর্ণ পূজা

খুদে খুদে ছোকরাগুলি, মালকোচা মেরে,
ভোরের বেলার নাছ দরজায় দাঁড়িয়ে লাঠি ধরে।
কাণা কড়ি, ছুতো হাঁড়ি, গোবর ছেঁড়া চুল,
মসুর সিঁদুর হল্‌দে কানি তায় ঘেঁটুর ফুল।
বাম হাতে পূজো, সাঙ্গ ধপাস্ লাঠির ঘায়
খোস পাঁচড়া নিয়ে ঘেঁটু হচ্চেন বিদায়।" পৃঃ ২০

সঙ্গীত-রচনায় কৃতিত্ব

পুলিন বাবু সুকবি, সঙ্গীত-রচনায়ও তিনি কিরূপ সিদ্ধকাম হইয়াছেন তাহা গ্রন্থনিহিত সঙ্গীতসমূহের মধ্য হইতে মাত্র তিনখানি গান উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইল—

(১)

"শ্যামসাগরে যে ডুবেছে তার কিবা কলঙ্কের ভয় ?
অন্তর বাহির রাধার শ্যাম শ্যাম শ্যামময়।
জীব জন্তু লতাপাতা, সেই শ্যাম-সূত্রে গাঁথা
জলস্থল চরাচর শ্যামেতে উদয় লয়।
রূপভেদে গুণভেদে, শ্যাম নাম গায় বেদে,
ভক্ত বিনা কে বুঝিবে শ্যামের স্বরূপ পরিচয়।" পৃঃ ২২

(২)

"ওমা আমি যে তোর জংলা পাখী।
যেমন পেটের জ্বালায় পাখী চেঁচায়,
আমি তোমায় তেমনি ডাকি।
যখন রোগ শোক পরিতাপে, মন পোড়ে কি প্রাণ কাঁপে,
তখনি মা চ্যাঁ চ্যাঁ করি খাবার পেলেই ভুলে থাকি।
সদা ভাবি অর্থ কাম, না শিখিনু আত্মারাম,
এ সংসারের দাঁড়ে বসে, মায়ার শেকল ঘুচ্‌বে না কি ?" পৃঃ ২৯

(৩)

"আমি আমি করি মাগো আমি কোন্‌টা এ জগতে ?
দেহটা না প্রাণটা আমি বোঝা যায়না কোন মতে।
সংজ্ঞা-হীন শব-দেহ, আমি তো ভাবে না কেহ ;
দেহচ্যুত আত্মা কি মা আমি বলে শূন্য পথে ?
প্রাণ যবে কায়া সনে, ঐক্য হয় সম্মিলনে,
তখনি আমির সৃষ্টি প্রকৃতি পুরুষ হতে।
জড়েতে চৈতন্যযোগে, জীব সুখ দুঃখ ভোগে,
অহঙ্কার থাকে না আর, উভয়ে প্রভেদ গতে।" পৃঃ ৬৩

পৌরাণিক ও পারমার্থিক একশতখানি গানের মধ্যে উপরে মাত্র তিনখানি গান উদ্ধৃত হইল। পুলিন বাবুর

"তুমি না ডাকালে হরি, কে তোমারে ডাকতে পারে ?
মায়ার কুহকে পড়ি মত্ত আছি অহঙ্কারে।" পৃঃ ২৭

গানটি সমস্ত গানের মধ্যে ভাবগৌরব ও শব্দযোজনায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিবে। এই সমস্ত গান ব্যতীত—পুস্তকে

	রহস্যবিষয়ক—	১৬ খানি
	প্রেম-গীতি—	৪০ "
এবং	নানা বিষয়ক—	৩৬ "

আরও ৯২ খানি গান স্থান পাইয়াছে।

"কাব্য-রেণু" পুলিন বাবুর তৃতীয় কাব্য। ১৩৩৭ সালে (১৯৩০ খৃষ্টাব্দ) এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ডিমাই ১২ পেজী আকারে ৭২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত। গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পটে পুলিন বাবুর স্বরচিত নিম্নের ৪ পংক্তি কবিতা আছে—

"অনিত্যতা, অনুতাপ, আত্ম-নিবেদন,
ভীমরথি-ধরা প্রাণে উঠে অনুক্ষণ,
সুখ-দুঃখ শোক-তাপ যা করেছি পুণ্য-পাপ
তোমারই চরণে দেব ! করিনু অর্পণ।"

কয়েকজন পরলোকগত বাল্যবন্ধুর নামে পুলিন বাবু আলোচ্য গ্রন্থখানি "স্মৃতি-তর্পণ" করিয়াছেন। কাব্যরেণুতে ৬৪টি কবিতা ও গান, স্মৃতির ছিন্ন পৃষ্ঠা নামক ৬৯ চরণের একটি দীর্ঘ কবিতা এবং নাতি-নাতনী-ভুলান তিনটি ছড়া আছে। "স্মৃতির ছিন্ন পৃষ্ঠা" পুলিন বাবুর বিবাহ ও পিতামহীর পরলোকগমন এই দুই হর্ষবিষাদবিজড়িত ঘটনা লইয়া লিখিত। প্রাণ দিয়া লেখা—কামারহাটী গ্রামের গঙ্গাতীর, রাসমঞ্চ,* অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ-যুগলের বর্ণনা প্রাণস্পর্শী।

গ্রন্থখানির অনেক কবিতাতেই পরপারে যাবার সুর ধ্বনিত হইতেছে। উৎসর্গ-কবিতাটির শেষে—

"পিতামাতা স্বর্গে, হারায়েছি স্নেহ
পত্নী পরলোকে, বন্ধু নাই কেহ,
রোগে-শোকে ভগ্ন, জরা জীর্ণ দেহ,
বুদ্ধি-স্মৃতি লুপ্ত, দৃষ্টি-শক্তি-হীন।
কেনা-বেচা শেষ এ ভবের হাটে,
একা আছি বসে বৈতরণী-ঘাটে,
এ তিক্ত জীবন সঁপি চিতা-কাঠে,
(কবে) তোমাদের দলে হইব বিলীন ?"

পৃষ্ঠা ।০ আনা

* কামারহাটীতে বিখ্যাত কলাবাগানের রাস পুলিন বাবুদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইত।

তারপর ৬০ বর্ষ গতে কবি (এখন হইতে প্রায় সাতাশ বর্ষ আগে) পত্নীকে সম্বোধন করিয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া পুলিন বাবুর রচিত কবিতা ও গানের পরিচয় শেষ করা হইবে। সাতাশ বৎসর আগে পুলিন বাবুর মনে যে ভাব উঠিয়াছিল, তাহাই নিম্নোক্ত কবিতাটির মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে—

"চারুশীলে! তোমায় আমায়—
সংসারের রঙ্গভূমে ক্রীড়া সাঙ্গপ্রায়
তিন কুড়ি বর্ষ গত, ওলোট পালট কত
সহিয়াছি, অবিরত বিনীত মাথায়।
সুখ-দুঃখ রাশি রাশি, কত কান্না কত হাসি,
স্মৃতি সদা সে কাহিনী হৃদয়ে জাগায়।
কত ছাত্র বাল্যকালে, পড়িতাম পাঠশালে,
কয়জন তাহাদের আছে এ ধরায়?
যৌবনের সঙ্গী যত কীটদষ্ট বৃক্ষ মত,
অকালে মিলায়ে গেছে কালের বাত্যায়।
বৃন্ত্যচ্যুত পুষ্পপ্রায় তনয়-তনয়া হায়!
ক্রোড়শূন্য ক'রে মরি, লুকাল কোথায়?
জনক-জননীদ্বয়, গিয়াছেন স্বর্গালয়,
বহে ঘটনার স্রোত, অনন্ত ধারায়।
বাকি মাত্র তুমি আমি, কে হইবে অগ্রগামী,
নিশিদিন ভাসি, দোঁহে সেই ভাবনায়।
নারীধর্ম অনুরাগে, তুমি যেতে চাও আগে
এবার আমার পালা, বর্ষ গণনায়।
যা আছে বিধির মনে, ঘটিবে অচির দিনে,
কি সাধ্য মানবশক্তি, লঙ্ঘিব তাহায়।"

পৃঃ ৩৯

"কে হইবে অগ্রগামী" পুলিন বাবুর এই প্রশ্নের সমাধান তাঁহার পত্নীই করিয়া দিলেন। পতিকে রাখিয়া তিনিই 'অগ্রগামী' হইলেন।

পুলিন বাবুর কবিতার আলোচনা করিতে গিয়া সমালোচক (বসুমতী-সম্পাদক) যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য—"ইহাতে (পুলিন বাবুর কবিতায়) ভাষার উপর অত্যাচার বা ভাবের উপর অপচার কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। কবিতাগুলি খাঁটি বাঙালীর রচনা, বাঙালীর হৃদয়ের ভাব পরিস্ফুটিত।"

পুলিন বাবুর গদ্য রচনার পরিচয়

পুলিন বাবুর লিখিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ "বৃন্দাবন-কথা"। ইহা বৃন্দাবন-ধামের একখানি বিস্তৃত বিবরণ। বৃন্দাবনের উল্লেখযোগ্য দেবালয়, দেবমূর্তি, কুঞ্জ, উদ্যান, জলাশয়, কূপ প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ এবং বৃন্দাবনের সহিত সংশ্লিষ্ট ভক্ত ও গোস্বামিবৃন্দের জীবনী ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৩২৩ সালের শ্রাবণ মাসের মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকায় (পৃঃ ৬১১) ইহার প্রথম পরিচ্ছেদ বাহির হইয়াছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া ১৩২৩ সালের কার্তিক মাস হইতে ১৩২৫ সালের মাঘ মাস পর্যন্ত চৌদ্দটি সচিত্র প্রবন্ধে এই "ব্রজকাহিনী" সমাপ্ত হয়।

পত্রিকায় "ব্রজকাহিনী" সমাপ্ত হইবার প্রায় এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩২৬ সালের পৌষ মাসে "বৃন্দাবন-কথা" বাহির হয়। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে ২৮১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত। ইহা ব্যতীত পরিশিষ্ট ১ পৃষ্ঠা এবং উৎসর্গ, নিবেদন, লেখসূচি ও চিত্রসূচি প্রভৃতিতে ১৪ পৃষ্ঠা আছে। উৎকৃষ্ট কাগজে গ্রন্থখানি সুন্দরভাবে ছাপা। ইহার মূল্য দুই টাকা। গ্রন্থখানির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ইহাতে বৃন্দাবনের বিভিন্ন দেবমন্দির, সমাধি-মন্দির, কুণ্ড, ঘাট, গোস্বামী ও ভক্তবৃন্দের ৪৬ খানি হাফ্‌টোন চিত্র সন্নি-বেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্রে 'মন্থপাশধর' বালকৃষ্ণমূর্তির একখানি ছবি দেওয়া হইয়াছে। অনেকে এইটিকে আদিকৃষ্ণমূর্তি বলে (বৃন্দাবন-কথা, ১৮৩ পৃষ্ঠা, পাদটীকা)। দক্ষিণ কানাড়ার অন্তর্গত উদিপী সহরে পাপনাশন নদীতীরে মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান মঠ স্থাপিত আছে, সেইখানে সমারোহে এই মূর্তির অর্চনা হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় আনুমানিক ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে (বৃন্দাবন-কথা, পৃঃ ১০) চৈতন্যদেবের নির্দেশে রূপ ও সনাতন লুপ্ত বৃন্দাবনের উদ্ধার সাধনের

জন্য প্রেরিত হন। তারপর ক্রমে ক্রমে শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত গৌড়ীয় গোস্বামী ও ভক্তবৃন্দ যাইয়া বৃন্দাবনে বাস করিতে থাকেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন গমন করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদের শেষাংশে এবং অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে তাঁহার বৃন্দাবন দর্শন ও পরিক্রমার কথা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। সে সময়ে ব্রজমণ্ডলে দ্বাদশটি বিগ্রহ বর্তমান ছিল। মন্দিরগুলির অবস্থাও ভাল নয়। বহু লীলাস্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ব্রজমণ্ডলের এই অবস্থা দেখিয়া তিনি রূপ ও সনাতনকে উহা সংস্কারের জন্য পাঠাইয়া দেন। রূপ-সনাতনের আগমন হইতে বৃন্দাবনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়।

সমসাময়িক ইতিহাস, তন্ত্র, পুরাণ, নানা বৈষ্ণবগ্রন্থ, হিত হরিবংশ, সঙ্গীতসুধাসিন্ধু প্রভৃতি বহু গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পুলিন বাবু এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তেইশটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ইতিহাস ও বিবরণ প্রদান করিয়াছেন—

১। পৌরাণিক ও সাধারণ কথা, চৈতন্যদেব, বর্তমান বৃন্দাবন

২। গোবিন্দদেব, রূপ গোস্বামী, আকবর, মানসিংহ

৩। মদনমোহনজি, সনাতন গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কর্পূর

৪। গোপীনাথজি, জাহ্নবা ঠাকুরাণী, রায়সিংহ

৫। রাধাদামোদরজি, জীব গোস্বামী

৬। রাধারমণজী, গোপাল ভট্ট, শ্রীনিবাস আচার্য

৭। রাধাবিনোদ, গোকুলানন্দ, লোকনাথ-গোস্বামী, নরোত্তম ঠাকুর, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস গোস্বামী

৮। শ্যামসুন্দরজি, শ্যামানন্দ গোস্বামী ও ব্রজমণ্ডলের পরিচয়

৯। বাঁকেবিহারজী, হরিদাস স্বামী, তানসেন

১০। রাধাবল্লভজি, হিত হরিবংশ

১১। যুগলকিশোরজি, হরিরামব্যাস, যুগলবিহারীজি

১২। বল্লভাচার্য, মীরাবাই

১৩। অন্ধ সুরদাস, সুরদাস মদনমোহন, থানেশ্বরী, জগন্নাথ

১৪। তুলসীদাস, শিবলিঙ্গ, সূর্যমন্দির, শক্তিপীঠ, নাগপূজা

১৫। বিল্বমঙ্গলের কুঞ্জ, জয়দেবের মন্দির, সাক্ষীগোপাল

১৬। বংশীবট, অদ্বৈতবট, শৃঙ্গারবট, অক্রূরঘাট, ভোজন্টীলা, আমলিতলা

১৭। ধীর সমীর, উত্থান, কুণ্ড, বাপী, কূপ

১৮। দ্বাদশ আখড়া, মোনীদাসের টাটী, জ্ঞান ও দরী, যমুনাপুলিন, চৌষট্টি মহান্তের সমাজ

১৯। আওরঙ্গজেবের উপদ্রব, জয়সিংহ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ, জয়পুর, ভরতপুর ও অহল্যাবাঈএর দেবালয়

২০। ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরাদি

২১। শেঠদের মন্দির

২২। সাহজির মন্দির

২৩। ঘাট, পল্লী, সনাঢ্য, গোরহে-ছত্রী

বৃন্দাবন-সম্বন্ধে এই তথ্য ও বিবরণপূর্ণ গ্রন্থখানি বাংলা ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছে।

'বৃন্দাবন-কথা' সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমত

বৃন্দাবন-কথা প্রকাশের পর, শিক্ষিত ও সাহিত্যসমাজে ইহা কিরূপ আদৃত হইয়াছিল, তাহা বাংলার কয়েকখানি প্রসিদ্ধ সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকার নিম্নলিখিত অভিমত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে—

The Hindoo Patriot: "To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable *vade-mecum*, to the stay-at-home reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading."

বঙ্গবাসী—"বৃন্দাবন সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাংলায় নাই বলিলেই চলে।"

মানসী ও মর্মবাণী—"ইহা বৃন্দাবনের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ। বৃন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় কাহিনী। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণবসমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।"

ভারতবর্ষ—"ইহাতে শ্রীধাম বৃন্দাবনসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বর্ণনাকৌশল একজন ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাজ্বল্যমান।"

পুলিন বাবুর গদ্য রচনার ভঙ্গী সুন্দর, ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল। এখানে তাহার একটু নমুনা দেওয়া হইল—

"মা! নদীয়ার সেই প্রেমিকসন্ন্যাসী-সমর্পিতা উজ্জ্বল পীযূষ-রস-পরিপ্লাবিতা মধুর সাধনা শিখিবার লোভে, আমি ত কয়েকবার বৃন্দারণ্যে ছুটিয়াছিলাম। কৈ মা! কি শিখিলাম? কি পাইলাম? আমি কি 'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে! হৃদয়ং ত্বদ্‌লোককাতরং দয়িত! ভ্রাম্যতি, কিং করোম্যহং?' বলিয়া প্রাণকান্তের চরণপ্রান্তে পঁহুছিতে পারিলাম? না আত্মহারা প্রাণে সেই আনন্দঘনের সত্তা দেখিতে শিখিলাম? * * * * * * তবে এ ছোট মুখে কোন্ সাহসে সেই সব বড় কথা আনিব।"*

'মাথুর-কথা'র আখ্যানবস্তু

পুলিনবাবুর দ্বিতীয় গদ্য গ্রন্থ "মাথুর-কথা," মথুরার ইতিহাস ও কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ইহা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ কর্তৃক ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির মূল্য সাধারণ পক্ষে ২৷৷০ টাকা। ডবল ফুলস্কেপ ১৬ পেজী আকারে ৩৩৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত। ইহা ব্যতীত আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন ৪ পৃষ্ঠা, ভূমিকা ৯ পৃষ্ঠা, লেখ-সূচী ৭ পৃষ্ঠা আছে। অধ্যাপক স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকাটি লিখিয়া দিয়াছেন। 'বৃন্দাবন-কথা'র ন্যায় বর্তমান গ্রন্থও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে ধারাবাহিকরূপে "মানসী ও মর্মবাণী" পত্রিকায় বাহির হয়।

'মাথুর-কথা'র চিত্রাবলী

গ্রন্থখানিতে ৬৫ খানি হাফ্‌টোন ছবি ও মথুরার ১ খানি মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের চিত্রগুলি প্রাচীন ও মূল্যবান্। চিত্রগুলি

---

* বৃন্দাবন-কথার উৎসর্গ-পত্র—পৃঃ ।/০-।৶০

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মসংক্রান্ত ইতিহাস-লেখকের কাজে লাগিবে। এই চিত্রগুলিতে গ্রন্থখানির মূল্য সমধিক বর্ধিত হইয়াছে। নিম্নে সেগুলির একটি তালিকা দেওয়া হইল—

১। পাষাণ-ফলকে অঙ্কিত জৈন স্তূপের ভগ্ন আয়াগপট (Tablet of Homage)

২। মহাবীরকে বেষ্টন করিয়া ২৩ জন পূর্ব তীর্থঙ্কর

৩। বিশালকায় মহাবীরের ভগ্ন মূর্তি

৪। স্তূপের স্তম্ভে অঙ্কিতা দিব্যাঙ্গনা বা নর্তকী, পশ্চাতে কমলদল

৫। অশোক-স্তম্ভের সদৃশ মাথ্লা ও পক্ষযুক্ত সিংহ অঙ্কিত পারস্যের অনুরূপ মাথ্লা

৬। তিব্বতীয় পতাকায় অঙ্কিত বিতর্ক-মুদ্রায় উপবিষ্ট অশোকমূর্তি

৭। লুম্বিনী গ্রামে বুদ্ধদেবের জন্মস্থানে অশোক কর্তৃক স্থাপিত পাষাণ-স্তম্ভ

৮। উরুবিল্ব বা বুধ-গয়ায় অশোক-নির্মিত মন্দির (সংস্কারের পর)

৯। বোধিদ্রুমতলে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি, সম্মুখে বজ্রাসন

১০। ঋষিপতন বা সারনাথে অশোকনির্মিত ধামেক নামে প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন স্তূপ (সংস্কারের পূর্বে)

১১। অশোকনির্মিত বিদিশা সন্নিহিত সাঁচীর স্তূপ (সংস্কারের পর)

১২। সর্বপ্রাচীন মৌর্য যুগের পারখাম গ্রামে প্রাপ্ত যক্ষমূর্তি

১৩। মাঠ-গ্রামে আবিষ্কৃত মুণ্ডহীন দেবপুত্র সম্রাট্ কনিষ্কের মূর্তি

১৪। গান্ধারে প্রাপ্ত, পৃথিবীর উপর দণ্ডায়মানা কমনীয়া নারীমূর্তি। কেহ কেহ এই মূর্তিকে কনিষ্কের মহিষীর মূর্তি বলিয়া মনে করেন। এই মূর্তির করদ্বয়ে ধৃত পেটিকাটির ভিতরে যে মণিময় বৌদ্ধমূর্তি ছিল, তাহা অপহৃত হইয়াছে।

১৫। মাঠ-গ্রামে প্রাপ্ত ওয়েমা কদ্ফিসের ভগ্ন মূর্ত্তি

১৬। তুর্কী-টুপি-পরিহিত কুশান-বীরের বা শাক-সত্রপের ভগ্ন মূর্তি

১৭। কুশান-যুগের টাকার থলি ও লগুড় হস্তে বৌদ্ধদিগের কুবের মূর্তি

১৮। কুশান-যুগের বুদ্ধরক্ষিতার মাতা আমহাসি প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্তি

১৯। কুশান-যুগের অভয়মুদ্রায় বুদ্ধমূর্তি

২০। „ উপদেশমুদ্রায় দণ্ডায়মান হাস্যবদনবুদ্ধমূর্তি

২১। „ বৃক্ষতলে শিশুক্রোড়ে নারীমূর্তি

২২। „ বেণুবাদিনী

২৩। „ বামহস্তে দর্পণ ও দক্ষিণ হস্তে বরদান-মুদ্রায় বৌদ্ধদিগের ভাগ্যদেবী

২৪। কুশান-যুগের বাম হস্তে পানপাত্র ও দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রায় কোন বৌদ্ধ দেবতা বা শাক-সত্রপ

২৫। কুশান-যুগের স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ নারীমূর্তি বা দিব্যাঙ্গনা

২৬। „ বৌদ্ধ-শয়তান মার-পৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা যক্ষিণী বা দিব্যাঙ্গনা

২৭। „ স্তম্ভগাত্রে অঙ্কিত গ্রীক্-প্রভাব-পরিস্ফুট কিশোর-মূর্তি

২৮। অশোকযুগের বোধিদ্রুমের উভয় পার্শ্বে হস্তী অঙ্কিত করিয়া বুদ্ধদেবের প্রতীক্ (Symbol)

২৯। মথুরার দক্ষিণে মধুবনে প্রাপ্ত, গ্রীক্-প্রভাব-পরিস্ফুট তিনটি মূর্তি, মধ্যে তপঃক্লিষ্ট বুদ্ধদেব, দক্ষিণে বিতর্ক-মুদ্রায় বুদ্ধদেব ও বামে ধ্যানমুদ্রায় বুদ্ধদেব

৩০। গুপ্তযুগের বা তৎপরের বিষ্ণুমূর্তি (উপেন্দ্র বা ত্রিবিক্রম) পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী

৩১। গুপ্তযুগের চক্রহস্তা বৈষ্ণবী শক্তি, পদতলে গরুড়, উভয় দিকে সহচরী

৩২। „ প্রত্যালীঢ়মুদ্রায় উপবিষ্ট দুর্গামূর্তি, দক্ষিণে গণেশ, বামে কার্তিক, শিরোদেশে শিব বা জৈন তীর্থঙ্কর, পদনিম্নে ভক্তগণ

৩৩। গুপ্তযুগের হরপার্বতী

৩৪। „ ভগ্ন গণেশমূর্তি

৩৫। „ শক্তিক্রোড়ে শঙ্কর

৩৬। গুপ্তযুগের বেণুবাদিনী

৩৭। গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তি

৩৮। গ্রীকদিগের বিদ্যাদেবী (Pallas)

৩৯। " সুরাদেব Silenus (পানারম্ভে)

৪০। " " Silenus (পানান্তে বিহ্বল)

৪১। যশোদার পিত্রালয় কাম্যবনে চৌষট্‌খাম্বা

৪২। মহাবনে নন্দভবন, ছয়টি পালন বা যশোদার সূতিকাগার (আশীখাম্বা)

৪৩। গোবর্ধনে মানসী-গঙ্গা

৪৪। মাধবেন্দ্র পুরী কর্তৃক আবিষ্কৃত গোপালজি বা শ্রীনাথজি

৪৫। বল্লভাচার্য, পুত্র পক্ককেশ বিট্‌টলনাথ ও তাঁহার সাত পুত্র

৪৬। মাধ্বাচারী গৃহে উডুপী নামক আদি কৃষ্ণমূর্তি

৪৭। বৃন্দাবনে গোমা বা গৌতম টিলার সর্বোচ্চ স্থানে গোবিন্দজির মন্দির

৪৮। বাঙালীদের অপর আড্ডা, রাধা ও শ্যামকুণ্ড। ইহার তীরে বসিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ "চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন

৪৯। গোবর্ধনে কুসুম-সরোবর তীরে জাঠ-সর্দার সূরযমল্লের সমাধি

৫০। শৃঙ্গারবেশে ভূতেশ্বর শিবলিঙ্গ

৫১। ভূতেশ্বরের মন্দির

৫২। মহাবিদ্যাটিলা—উপরে মন্দির, নীচে কুণ্ড

৫৩। কংস-টিলা

৫৪। গোকর্ণেশ্বর শিব নামে পূজিত কোন কুশান-সম্রাটের মূর্তি

৫৫। রঙ্গেশ্বর শিবলিঙ্গ

৫৬। ক্ষীরসাগর-তীরে সপ্তফণামণ্ডিত বলদেবের শেষমূর্তি

৫৭। মথুরার রাজঘাটে প্রাপ্ত, বুদ্ধদেবের জীবনের পাঁচটি ঘটনা অঙ্কিত শিলাপট

৫৮। সতী-বুরুজ

৫৯। নবী-মস্‌জিদ্

৬০। বীরসিংহ-অঙ্কিত কেশবজির মন্দিরের তোরণে সূর্য-মূর্তি অঙ্কিত কপালী (lintel)

৬১। যমুনার বক্ষ হইতে মথুরার কেল্লা

৬২। মথুরার বিশ্রান্তি ঘাট

৬৩। " কৃষ্ণঘাট

৬৪। হার্ডিঞ্জ-গেট বা হোলি-দরওয়াজা

৬৫। মথুরার যাতুঘরে সংগৃহীত বিভিন্ন যুগের বিচিত্র ধ্বংসাবশেষসমূহ

এই গ্রন্থরচনায় পুলিন বাবু যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সুন্দর ও সুসম্বদ্ধ। মহাভারতের যুগে মথুরার কথা যাহা পাওয়া যায় গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রথমাংশে তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ইহার পর স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও বরাহপুরাণে মথুরার বিবরণ যাহা আছে, তাহাও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ইহার পর "জৈনযুগে মথুরা" আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে নিম্নের ছয়টি বিষয় আছে—

১। জীবহিংসা

২। শ্রীকৃষ্ণের ভোজন (হরিবংশে)

৩। জৈনধর্ম (মহাবীর)

৪। চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর

৫। নেমিনাথ

৬। চিত্র-পরিচয়

ইহার পর

১। বৌদ্ধযুগের মথুরা

২। গুপ্তযুগের ও তৎপরবর্ত্তী যুগের মথুরা

৩। মুসলমান যুগের মথুরা

৪। বর্তমান যুগের মথুরা

এই চারিটি অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায়েরই অনেকগুলি করিয়া শাখা-অধ্যায়ও বর্তমান। এতদ্ব্যতীত "চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণিত মথুরা" শীর্ষক অধ্যায়ে ফাহিয়ান ও উয়াংচুয়াং এই তুইজনের প্রদত্ত বিবরণ আছে।

মথুরার ধর্মেতিহাস ও স্থাপত্য আদির বিবরণ পুরাণ ও চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ ও বাংলা কিম্বদন্তী হইতে সংগ্রহ করিয়া এবং মথুরার চিত্রশালা হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি অবলম্বনে পুলিন বাবু তাঁহার এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্নযুগের ধর্মপ্রবর্তক, ভক্ত, সম্রাট্ প্রভৃতির জীবনচরিতও পুস্তক মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

মথুরা এক সময়ে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রধান কেন্দ্র ছিল। মূল্যবান্ স্থাপত্যের নিদর্শন জন্য মথুরা বিখ্যাত। বৌদ্ধ ও জৈনদিগের বহু স্থাপত্য-শিল্পের পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

'মাথুর-কথা' সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমত

আলোচ্য গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদপত্রের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

BENGALEE: "It is a valuable contribution to Bengali Literature, and although written according to a modest plan is full of scholarly work. * * * We have nothing but praise for the skilful way in which the author has handled his theme and the reverent manner in which he has discussed the numerous controversial topics."

AMRITABAZAR PATRIKA: "We do not say that the work, as it is, is complete in itself. But is is certain that it will prove to be a great help to future historians of the City. He is in a sense a pioneer in the field."

বঙ্গবাণী—"যে সমস্ত উপাদান নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ছিল, সেগুলি একত্র করিয়া, বিচার-নৈপুণ্য সহকারে ঝুটামেকী বাদ দিয়া এই যে অপরূপ মাল্য-রচনা ইহা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়।"

প্রবাসী—"এই পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও বিন্যাসকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।"

পুলিন বাবুর নাটকের পরিচয়

পুলিন বাবুর প্রেমের ফাঁদ নাটকখানি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার শেষ গ্রন্থ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে ১৪৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত। "বিনীত নিবেদনে" গ্রন্থকার এই সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন—

"আনন্দ-বিষাদ-মালা স্মৃতি অতীতের
কত কথা মিশাইয়া আছে গ্রন্থ মাঝে,
জানে যারা, গেছে তারা মহাসিন্ধুপারে।"

গ্রন্থখানি মিলনান্ত নাটক। ইহাতে দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্বময়ী লীলার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। দৈব ও পুরুষকার—ইহাদের মধ্যে কে বড়? তাহারি আলোচনা প্রসঙ্গে পুলিন বাবু লিখিতেছেন—

"দৈব ও পুরুষকার দু'টো শক্তিবশে
এ জগতে মানবের উত্থান পতন।
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে যত মহাপণ্ডিতেরা
তাই লয়ে করিতেছে আদিকাল হ'তে
কত তর্ক, কত যুক্তি, বাদপ্রতিবাদ,
আজিও মীমাংসা তার হয়নি, হবে না;
কভুও এ প্রহেলিকা হবে না পূরণ।" উৎসর্গ, পৃঃ ⁄০

লেখক আলোচ্য গ্রন্থে দৈবকেই প্রধান স্থান দিয়াছেন। তাঁহার মতে পুরুষকার দৈবকে সাহায্য করে।

নাটকখানি পাঁচটি অঙ্কে সমাপ্ত। প্রথম অঙ্কে তিনটি, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি, তৃতীয় অঙ্কে পাঁচটি, চতুর্থ অঙ্কে পাঁচটি এবং পঞ্চম অঙ্কে পাঁচটি গর্ভাঙ্ক আছে। নাটকের পাত্রপাত্রীগণ প্রায় সকলেই বাঙালী হইলেও, ইহার সংযোগস্থান হইয়াছে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। প্রতি অঙ্কের নিম্ন-লিখিতরূপ সংযোগস্থান দেখিতে পাওয়া যায়—

প্রথম অঙ্কের সংযোগস্থল আগ্রা
দ্বিতীয় " " ঐ

তৃতীয় অঙ্কের	সংযোগস্থল	লক্ষ্নৌ, মথুরা ও বৃন্দাবন
চতুর্থ অঙ্কের	,,	বিন্ধ্যাচল ও চূনার
পঞ্চম অঙ্কের	,,	কাশী

'প্রেমের ফাঁদ' নাটকের গল্পাংশ

নাটকখানির উপাখ্যানভাগ এইরূপ—

গ্রন্থের প্রধান নায়ক সনাতন রায় চৌধুরী যশোহরের অন্তর্গত মহিমাপুরের জমিদার, শৈশবে পিতৃহীন। তাঁহার সেই গ্রামেরই একটি ননীবালা নাম্নী বালিকার সহিত প্রণয় হয়। বালিকাদের অবস্থা ভাল ছিল না, তাহার মাতা সনাতনদের গ্রামে নিজ পিত্রালয়ে বাস করিত। সনাতনের মাতার সাহায্যে তাহাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হইত। বালিকাটি সনাতনকে ভালবাসিত। সে সনাতনকে পতিরূপে পাইবার জন্য একান্তভাবে কামনা ও আগ্রহ করে। সনাতনের মায়েরও ইচ্ছা ছিল, এই সুন্দরী বালিকাটির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। কিন্তু কালক্রমে সনাতনের মায়ের মৃত্যু হওয়ায় এবং বালিকাটি নিরুদ্দেশভাবে সে স্থান হইতে চলিয়া যাওয়ায়, বিবাহের ব্যাপার স্থগিত থাকে। সনাতনও বিবাহ করিবেন না, ইহাই স্থির করিয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হন।

ননীবালার এক পিতৃব্য দিনাজপুরের জমিদার। ননীবালার মাতার মৃত্যুর পর তিনিই ননীবালাকে দিনাজপুরে লইয়া যান এবং তাহার পূর্ব নাম পরিবর্তিত করিয়া অনুপমা নাম রাখেন। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর সে তাঁহার বিস্তৃত জমিদারীর উত্তরাধিকারিণী হয়। সনাতন ব্যতীত অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না স্থির করিয়া সে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হয়।

সর্দার দেবীদয়াল বাহাদুর যোধপুরের মহারাজার এডিকং। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর ইনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এই দ্বিতীয়া পত্নীর নাম রমাসুন্দরী; রূপে ও গুণে ইতি অতুলনীয়া। দেবীদয়ালের প্রথম পক্ষের উমাসুন্দরী নামে একটি মাত্র অনূঢ়া কন্যা বর্তমান। সম্পর্কে দেবীদয়াল বাহাদুর অনুপমার মেশোমশাই। ইহাই নাটকের পূর্বাভাস। নাটকের আরম্ভ আগ্রায়। যমুনাতীরে সনাতন তাঁহার বহু দিনের পুরাতন বন্ধু

হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখা পান। হৃষীকেশ চিত্রকর, অবিবাহিত কিন্তু দরিদ্র।

আগ্রায় এক ধর্মশালার বাহির মহলে হৃষীকেশ বাসা লয়েন এবং ভিতর মহলে সর্দার দেবীদয়াল বাহাদুর তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী রমাসুন্দরী, কন্যা উমাসুন্দরী ও অনুপমা সহ থাকিতেন। কোন বিষয় লইয়া স্বামীর সহিত ঝগড়া হওয়ায় রমাসুন্দরী পীড়িতা জননীকে দেখিবার জন্য ভ্রাতার সহিত বাংলায় যান। যাইবার প্রাক্কালে তিনি নিজ কন্যা উমাসুন্দরী ভ্রমে হৃষীকেশের ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া যান। সে সময় হৃষীকেশ আধজাগরণ-আধতন্দ্রায় আচ্ছন্ন ছিল। হৃষীকেশ দেখিতে উমাসুন্দরীর মতন এবং তাহার মাথায় স্ত্রীলোকের ন্যায় লম্বা ও সুন্দর কুঞ্চিত কেশ ছিল। এই ঘটনার কথা হৃষীকেশ তাঁহার বন্ধু সনাতনকে বলেন। অল্প আলোকে হৃষীকেশ রমাসুন্দরীকে চকিতের জন্য দেখিলেও, সেই ক্ষণিক দর্শনের স্মৃতি লইয়া তাঁহার একখানি সুন্দর তৈলচিত্র অঙ্কিত করেন।

সনাতন অনুপমার সন্ধান জানিতেন না। কিন্তু অনুপমা তাঁহার সন্ধান রাখিত। অদৃষ্টসূত্রে জড়িত হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিত। এক কৌশলে স্বীয় পরিচারিকা জানকীর সাহায্যে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণপূর্বক সে সনাতনকে অনেক অতীত ও ভবিষ্য কথা এবং ছয়মাস পরে যে তাঁহার পরিণয় হইবে তাহাও জানাইয়া দিল।

পরে বৃন্দাবনে ঘটনাক্রমে সনাতন ও হৃষীকেশের সহিত অনুপমা ও উমাসুন্দরীর পরিচয় হয়। সনাতন কিন্তু অনুপমাকে ননীবালা বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। অনুপমার যত্ন, গুণ ও সেবাস্নেহে মুগ্ধ হইয়া সনাতন তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। অনুপমা প্রত্যাখ্যান করে। প্রথম বারের ন্যায় দ্বিতীয়বারও প্রস্তাব করিয়া সনাতন প্রত্যাখ্যাত হন। কাশীতে অনুপমার ওড়নায় আগুন লাগে, সনাতন তাহাকে রক্ষা করেন। এখানে তৃতীয়বার প্রস্তাব করায়, অনুপমা আনুপূর্বিক সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া সনাতনের প্রস্তাবে সম্মতি দেয় ও তাঁহাকে বিবাহ করে।

সর্দার দেবীদয়াল বাহাদুরের পত্নী রমাসুন্দরী চলিয়া যাইবার পর তিনি নানা স্থানে পত্নীর অনুসন্ধান করেন। কিন্তু সকল স্থানেই বিফলমনোরথ

হইয়া, দেবীদয়াল কাশীর শিল্প-প্রদর্শনীতে তাঁহার পত্নীর একখানি সুন্দর চিত্র দেখিতে পান, চিত্রের নিম্নে নাম ছিল "স্বপ্নসুন্দরী।" সন্ধান লইয়া তিনি চিত্রকর হৃষীকেশের বাসায় যান। ঘটনা-চক্রে রমাসুন্দরীও সেই সময় সেখানে উপস্থিত হন। তখন সকল রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। রমাসুন্দরীর ও অনুপমার চেষ্টায় হৃষীকেশের সহিত উমাসুন্দরীর বিবাহ হয়। পূর্ব হইতেই উমাসুন্দরী হৃষীকেশের প্রতি অনুরাগিণী ছিল। সুতরাং এ বিবাহে মণিকাঞ্চন সংযোগ হইল।

গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল। ইহাতে কয়েকখানি বাংলা ও ব্রজভাষায় রচিত গান আছে। সে সমস্ত গানে পুলিন বাবুর নিপুণ হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রজভাষায় রচিত একখানি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"যশোমতি কোলে কনক কমল সম
খেলত নন্দ-দুলালা।
উঠত বৈঠত গল-বেড়ি বাঁধত
সুললিত বাহু মৃণালা!
লঘু লঘু হাসত গদ গদ ভাষত
বিগলিত জননী পরাণা।
স্তন বহি ক্ষীর ঝরু তিতি গই অঞ্চল
আঁখি-লোরে আঁধা নয়ানা॥"

মৃত্যু

১৩৪১ সালের ১৮ই কার্তিক সুসাহিত্যিক ও দুঃস্থ সাহিত্যিকের বন্ধু পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় পরলোক গমন করেন।

৺রাধাবল্লভ দাস

৺রাধাবল্লভ দাস

'মনস্তত্ত্ব-সারসংগ্রহ'

বাংলা ১২৫৬ সাল বা ইংরেজী ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে 'মনস্তত্ত্ব-সারসংগ্রহ'১ নামক একখানি অপূর্ব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডাক্তার জে স্পার্জাইম২ (J. Spur-

১ গ্রন্থে 'মনতত্ত্ব' আছে।

২ ডাঃ গল (Franz Joseph Gall, M. D.) এই বিদ্যা উদ্ভাবন করেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ তিনি জার্মান দেশে (in a village of the Grand Duchy of Baden) জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি Joseph Fr. De Retzerকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন, ঐ পত্রে তিনি "all the principles of the Physiology of the brain" সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। তাঁহার এই পত্র জার্মান দেশীয় সাময়িক পত্রিকা 'Deutscher Merkur'-এর ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহাই তাঁহার মনস্তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট ৭২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি ফরাসী ভাষায় On the Origin of the Moral Qualities and Intellectual Faculties of Man, and the Conditions of the Manifestation নামক ছয় খণ্ডে সমাপ্ত সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইয়াছিল এবং তাহা সাধারণ্যে যথেষ্ট আদৃত হইয়াছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার স্পার্জাইম ডাক্তার গলের এই মনস্তত্ত্ববিদ্যাসম্বন্ধীয় আলোচনা ও অনুসন্ধানে যোগদান করেন এবং "he was simply a hearer of Dr. Gall till 1804"—Biography of Dr. Gall by Winslow Lewis Jr., M. D., M.M., S.S., p. 20.

ডাঃ স্পার্জাইম ফরাসী ভাষায় মনস্তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থ কয়খানি রচনা করেন :—

1. Phrenology or the Doctrine of the Mind; and of its Relations between its manifestations and the body.
2. Philosophical Principles of Phrenology.
3. Outlines of Phrenology.
4. Elementary Principles of Education.
5. Observation of Insanity.
6. Examination of the Objections made in Great Britain against Phrenology.

জর্জ কোম্ব (George Combe) ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর এডিন্‌বরার সন্নিকটে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ডাক্তার স্পার্জাইমের বক্তৃতা শুনিয়া এই মনস্তত্ত্ববিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই ঘটনা ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্বে ঘটে। কারণ তাঁহার জীবনী-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় (Life of George Combe, vol. I., p. 98 by Charles Gibbon)—"The year 1817 was a busy and happy one to Combe. He was at the inquiring stage of his study of phrenology." ইনি ইংরেজী ভাষায় Phrenology বা মনস্তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থ কয়খানি রচনা করেন—

1. The Constitution of Man.
2. On the Relation between Science and Religion.
3. Elements of Phrenology.

zheim M. D. of the Universities of Vienna and Paris and Licentiate of the Royal College of Physicians of London) এবং জর্জ কোম্ব (George Combe) এর মনস্তত্ত্ব-বিদ্যাসম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলম্বনে সুপণ্ডিত রাধাবল্লভ দাস মহাশয় এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

রাধাবল্লভ বাবুর মাতৃ-বংশের পরিচয়

ইনি আমড়াতলার আঢ্য বংশের দৌহিত্র-সন্তান। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার সম্পাদক অদ্বৈত বাবুর পিতামহ বৃন্দাবনচন্দ্র আঢ্যের দুই পুত্র ও দুই কন্যা।
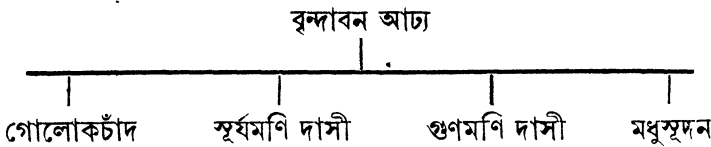
বৃন্দাবনচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা গুণমণির চুণাগলি নিবাসী গোপীনাথ দাস মহাশয়ের সহিত বিবাহ হয়। রাধাবল্লভ বাবু তাঁহাদেরই পুত্র।

বাল্য-জীবন

আনুমানিক ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সিংহ রাশিতে ইঁহার জন্ম। বাল্যকালে ইনি বহু কষ্ট পান। ইনি পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। পড়াশুনায় ইঁহার অসাধারণ অনুরাগ ও আসক্তি পরিলক্ষিত হইত; সেজন্য স্বর্গীয় মহাত্মা হেয়ার ইঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং ইঁহার যত্ন লইতেন। পঠদ্দশায়ই ইঁহার গবেষণা ও অনুসন্ধান-শক্তির বিকাশ হইয়াছিল।

মনস্তত্ত্ববিদ্যাসম্বন্ধীয় সমিতি প্রতিষ্ঠা

ইঁহার যখন ২০।২১ বৎসর বয়স, তখন কলিকাতায় ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন "Calcutta Phrenological Society" স্থাপিত হইল। এই

4. The Life and Correspondence of Andrew Combe.
5. Outlines of Phrenology.
6. Phrenology applied to Printing and Sculpture.
7. Moral Philosophy. 8. Notes on the United States of North America.

(Encyclopædia Britannica—১১শ সংস্করণ হইতে গৃহীত)

স্থাপয়িতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। ইহার তৎকালীন পরিচালন-সমিতি ও কর্মকর্তাগণের নাম এইখানে প্রদত্ত হইল :—

President— Babu Cally Coomar Doss
Vice-President— ,, Neel Comul Mitter
Secretary— ,, Nobin Chunder Bose
Treasurer— ,, Neel Comul Mitter

Managing Committee

The above named officers and Babus Raj Coomar Doss and Radhabullub Doss.

এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল :

The object of the Society is to investigate Phrenology by means of meetings, at which Phrenological discussions may take place and communication be made, and by the collection of Phrenological Works, Sculls, Casts, etc., and every kind of Phrenological Document and illustration.

তাঁহাদের এই সমিতি হইতে কালীকুমার দাস (সমিতির সভাপতি) কর্তৃক "The Pamphleteer" নামক একখানি মনস্তত্ত্ববিদ্যাসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা বাহির হইতে থাকে। ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥০ ছিল। রাধাবল্লভ বাবু ইহার একজন লেখক ছিলেন।

রাধাবল্লভ বাবুর কর্মজীবন

প্রথমে তিনি কলিকাতায় কয়েকটি সওদাগরী অফিসে বুক-কিপার-এর কাজ করেন। তৎপরে কলিকাতার সৈন্যবিভাগীয় হিসাবের অফিসে (Office of the Millitary Accounts) কর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এই সরকারী কর্মে নিযুক্ত হন। তাঁহার কর্মকুশলতা ও হিসাবে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাইয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে উচ্চবেতনে রেঙ্গুনের Accountant General অফিসের বুক কিপার নিযুক্ত করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রেঙ্গুনে বদলী হন। ১৮৬৬ খৃঃ হইতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের মধ্য-ভাগ পর্যন্ত প্রায় চারি বৎসর কাল তিনি রেঙ্গুনে কিরূপ দক্ষতার সহিত কার্য করেন, তাহা নিম্নলিখিত অংশগুলি পাঠ করিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে।

রেঙ্গুনের সরকারী হিসাবসম্বন্ধীয় অফিসসমূহের পরিদর্শক জি ডব্লিউ কেল্‌নার সাহেব ব্রিটিশ বর্মার Accountant General-এর অফিস সম্বন্ধে যে বিবরণ ভারত গভর্ণমেণ্টের আয়ব্যয়সম্বন্ধীয় অস্থায়ী সেক্রেটারীর নিকট পাঠান, তাহাতে রাধাবল্লভ বাবু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উচ্চ প্রশংসার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে :—

"Baboo Radhabullub Dass is an excellent Book-keeper, and on public grounds, I have recommended that he be transferred for employment wherever his services are more urgently needed than in his present Office. * * * *

It must be admitted that, on the whole, the work of this branch has been very well done. But now that the checks and books have been established on an efficient footing, there is no further need of the services of a Book-keeper with the pay and standing of Baboo Radhabullub Dass. He might be altogether spared, and his experience and skill far more usefully employed in a larger Account Office. I had formed this conclusion before receipt of the orders of the Government of India, conveyed in letter from the Financial Department No. 1098, dated the 17th ultimo, and have no hesitation in recommending that Radhabullub Dass be transferred to an Office where his services are really needed."

এই বিবরণ ১৬ই মার্চ তারিখে (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের) সিমলায় পাঠান হয়। তাহার ফলে ১৩ই এপ্রেল তারিখে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিম্নলিখিত মন্তব্য গৃহীত হয় :—

"This report from Mr. Kellner establishes the practicability of reducing the cost of the Accountant General's office by transferring the Book-keeper to a large office of Account."

গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক এই মন্তব্য গৃহীত হইবার পর রাধাবল্লভ বাবু ঐ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দেই First Grade Superintendent of Accountant

General's Office of North Western Province and Oudh হইয়া এলাহাবাদে বদলী হন।

এলাহাবাদে ১২ বৎসর কার্য করিবার পর তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়—এ কারণ তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পেন্‌সন গ্রহণ করিতে হয়। তিনি সতের বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল মাত্র কার্য করিয়া ছিলেন বলিয়া পূরা পেনসন পাইলেন না, মাসিক ১৬০৲ টাকা পেন্‌সন লইয়া ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হইল। বলা বাহুল্য, তিনি এলাহাবাদে ৫০০৲ শত টাকার উপর বেতন পাইতেন।

রাধাবল্লভ বাবু কলুটোলার কৃষ্ণমোহন মল্লিকের বাড়ী বিবাহ করেন। তাঁহার মাণিকলাল ও পান্নালাল নামে দুই পুত্র এবং এক কন্যা হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পান্নালাল বাবু এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাণিকলাল বাবুর দুই পুত্র বর্তমান। মাণিক বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দেবদুর্লভ বাবু সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ট্রেল এণ্ড কোম্পানির ক্যাশিয়ার।

১৩০৬ সালের ১৯শে পৌষ (১৯০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে) রাধাবল্লভ বাবু ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

মনস্তত্ত্ববিদ্যার গবেষণা

পেন্‌সন গ্রহণের পর তিনি গৃহে বসিয়া মনস্তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা ও অনুশীলন করিতে লাগিলেন। মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা, এবং দেশীয় ও বিদেশীয় নানা ব্যক্তির মস্তক পরীক্ষা প্রভৃতি কার্যে তাঁহার শেষ জীবনের ঊনবিংশ বর্ষ ব্যাপৃত ছিল।

চুণাগলিতে নিজ গৃহে তিনি The Calcutta Phrenological Institute স্থাপন করিয়া সকাল ছয়টা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত লোকের মস্তক পরীক্ষা করিতেন। এই পরীক্ষাসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী এবং মনস্তত্ত্ব-বিদ্যাবিষয়ক পুস্তকাদির বিজ্ঞাপন-সম্বলিত একখানি পুরাতন মুদ্রিত কাগজের (১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ প্রকাশিত) নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

"Phrenological Examination

The charge for Verbal Explanations of the manifesta-

tions of the Leading Organs of the Brain at the 'Calcutta Phrenological Institute.'

Lady or Gentleman ...	...	Re.	1	0	0
Marked Chart Full ...	...	Rs.	4	6	0
Consultation	...	Re.	1	0	0

To Beginners

The study of the following Books, aided by a Phrenological Bust, will give some idea of what Phrenology is and of its use.

Familiar Lessons on Phrenology	...	Re	0	9	0
Familiar Lessons on Physiology	...	,,	0	4	6
How to learn Phrenology ...	...	,,	0	9	0
Synopsis of Phrenology ...	...	,,	0	2	0
Utility of Phrenology ...	...	,,	0	2	0
Phrenological Bust ...	...	,,	2	4	0
		Rs.	3	14	6

Premium

The purchaser of the above can have his head examined free.

Catalogue of Books, Busts, etc., and all other informations can be had on application.

Out-of-door—double the above and conveyance hire extra Rs. 2-0-0."

প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য

তাঁহার পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া বহু লোক তাঁহাকে স্বহস্তে বহু প্রশংসাপত্র লিখিয়া দিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে নিম্নে মাত্র সাতখানি প্রকাশিত হইল :—

নাম	পরিচয়	পরীক্ষাকালীন পরীক্ষার্থীর বয়স	পরীক্ষার তারিখ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর		৬৪ বৎসর	৩রা মার্চ, ১৮৮৪

নাম	পরিচয়	পরীক্ষাকালীন পরীক্ষার্থীর বয়স	পরীক্ষার তারিখ
কৃষ্ণদাস পাল		৪৪ বৎসর	২৮শে জানুয়ারী, ১৮৮৪
নরেন্দ্রনাথ সেন	"ইণ্ডিয়ান মিররের" সম্পাদক	৪২ বৎসর	১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪
মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর		বয়সের কোন উল্লেখ নাই	২৯শে জানুয়ারী, ১৮৮৫
মাণিকলাল দত্ত	Gilchrist Scholar for 1884 and Bar-at-Law	১৯ বৎসর	১৯শে আগষ্ট, ১৮৮৪
মাণিকজি রস্তমজি	সওদাগর	৬৮ বৎসর	১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৪
দেওয়ান গোবিন্দ সহায়	Confidential Agent to H. H. the Maharaja of Cashmere	৪৩ বৎসর	৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫

পরীক্ষার্থীর মন্তব্য ও স্বাক্ষর নিম্নে দেওয়া হইল :—

The Examination of my head, as noted within, is, in my opinion, very correct.

Iswara Chandra Sarma

The Examination of my head, as noted within, is, in my opinion, very Correct—

Iswara Chandra Sarma

14.3.84.

(বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত)

The Notes, as far as I can now judge, are correct.

K. D. Pal

Notes pretty correct.

Narendra Nath Sen

The Notes, as far as I can judge, are generally correct and I have reason to be satisfied.

J. T.

I am surprised at the reading of my character and find them all correct.

Manik Lal Dutta

The Notes within are generally correct.

M. Rustomjee

ইনি পার্শিতে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করেন, এখানে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—ইনি সুদক্ষ পরীক্ষক।

Gobind Sahai

ব্রিটিশ ফ্রেনোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের প্রশংসা-পত্র

লণ্ডনের "ব্রিটিশ ফ্রেনোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন" হইতে রাধাবল্লভ বাবু ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে যে প্রশংসা-পত্র পান, নিম্নে তাহার একখানি প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল :—

"No. 9.

'HONORIS CAUSA'

British Phrenological Association Established 1886

This is to certify that

Radha Bullub Dass

Member of this Association

has been awarded this

Certificate of Proficiency

in Phrenology.

L. N. Flowler—President
James Webb—Vice-President
W. R. Warren—Secretary
London, 8th March, 1887"

আমেরিকার পত্রিকায় রাধাবল্লভ বাবুর জীবনী-প্রকাশ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রান্তর্গত নিউ ইয়র্ক সহর মনস্তত্ত্বালোচনার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল; এই স্থান হইতে "Phrenological Journal and Science of Health" নামক মনস্তত্ত্বসম্বন্ধীয় একখানি পত্রিকা বহুবর্ষাবধি প্রকাশিত হইতেছিল। সময়ে সময়ে সেই পত্রিকায় মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতবর্গের সচিত্র জীবন-চরিত প্রকাশিত হইত। উহাতে রাধাবল্লভ বাবুর সচিত্র জীবন-চরিত এবং তাঁহার মস্তকের বিচার-ফল বাহির হয়; নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা গেল ঃ—

"এই প্রতিকৃতি দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যে ইহা যাঁহার প্রতিকৃতি তিনি যথাসম্ভব সুখে ও আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেন। কোন বিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত আতিশয্য নাই। যখন তাঁহার কাজ করিতে হইবে, তখনই তিনি কাজ করেন, এবং অধিকাংশ সময় আমোদ-আহ্লাদে কাটাইয়া দেন। যেরূপ জীবনীশক্তির দ্বারা লোক বড় বড় কাজ করিতে পারে, তাঁহার সেইরূপ জীবনীশক্তি ছিল, কিন্তু তাঁহার স্নায়বিক ভাব তেমন তেজাল ছিল না, সেই জন্য তাঁহাকে কোন কার্যে প্রবৃত্ত করিতে হইলে কিঞ্চিৎ প্রতিকূলতার বা বাধার প্রয়োজন হইত। তিনি যখন কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রবুদ্ধ হইতেন, তখন তিনি বিশেষ শক্তি ও উদ্যমশীলতার পরিচয় দিতেন। অনাগত বিষয় চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইবার মত তরল প্রকৃতি ও উদ্যমশীলতা তাঁহার ছিল না। বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে তাঁহার চিন্তা করিবার শক্তিই প্রবল, সেই জন্য তিনি অনেক বিষয়ে মৌলিক চিন্তা করিতে সমর্থ। কথাবার্তায় সুন্দরভাবে বক্তব্যগুলি গুছাইয়া বলিবার শক্তি তাঁহার আছে, এবং যখন কোনরূপে উত্তেজিত হইতেন, তখন সুন্দর বক্তৃতাও করিতে পারিতেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার বাগ্মিতা

আছে, তবে সেই বাগ্মিতার প্রকর্ষ-প্রকটনের জন্য অনুকূল উত্তেজনার প্রয়োজন। তাঁহার কথা স্মরণ রাখিবার শক্তি প্রখর, কিন্তু সমষ্টি হিসাবে ঘটনার পারম্পর্য স্মরণ রাখিবার শক্তি বিশেষ প্রবল নহে। ইঁহার মস্তিষ্ক বিশেষ সুস্থ থাকায় ইনি অর্জিত জ্ঞান বহুদিন স্মরণ রাখিতে সমর্থ। ইনি অন্যের অনুকরণ করেন না; নিজের মতেই ইনি কার্য করিয়া যান, অন্যে কি ভাবে কার্য করে, সে বিষয় বিশেষ সন্ধান লয়েন না। ইঁহার সঙ্গীতপ্রিয়তা যত প্রবল, সঙ্গীতবিষয়িণী প্রতিভা তত প্রবল নহে,— সেই জন্য তিনি সঙ্গীত শ্রবণে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। ঐকান্তিকতা এবং চিত্তের সরলতাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ। তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত ভঙ্গী তিনি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার কার্যের কোন ভাবই তিনি প্রচ্ছন্ন বা রহস্যময় রাখেন না; তিনি কুচক্রী, কূটবুদ্ধি ও 'খেলোয়াড়' রকমের লোক নহেন। যদি তিনি ব্যবহারাজীবের শিক্ষা পাইতেন, তাহা হইলে তিনি একজন সুদক্ষ বিচারপতি হইতে পারিতেন। যদি তিনি ব্যবসায় শিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে যে ক্ষেত্রে কথাবার্তা কহিবার প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে তিনি সাফল্য লাভে সমর্থ হইতেন। নিলামের কাজেও তিনি কতকটা কৃতকার্যতা লাভ করিতেন। কিন্তু তিনি যে কাজেই থাকুন না কেন, সেই কাজেই তাঁহার স্বাভাবিক উপস্থিত-বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় দিতে পারেন। তাঁহার এমনই একটি শক্তি আছে, যাহার দ্বারা তিনি কার্যকে সহজ এবং জীবনকে বিড়ম্বনাময় না করিয়া আনন্দময় করিতে পারেন। তিনি স্বভাবতই বিশ্বাসপরায়ণ এবং সেই জন্য অন্যকে আপনার মত ন্যায়বান্ ও সাধু বলিয়া মনে করেন। তাঁহার অধিকতর সাবধানতার ও সতর্কতার অনুশীলন করা প্রয়োজন, নতুবা স্বার্থপর লোক দ্বারা তাঁহার প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা। তিনি শারীরিক অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রমই অধিক করিতে পারেন। তাঁহার কোন ব্যবসায় বিশেষে (যথা ওকালতী, ডাক্তারী ইত্যাদি) আত্মনিয়োগের অথবা কোন কারবারের পরিদর্শন ও পরিচালন-কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার যোগ্যতা আছে। ইহা ভিন্ন তিনি নিজের জ্ঞান দ্বারা অন্যের চিত্তবিনোদনে সমর্থ। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে কথাবার্তা দ্বারা আলাপ

করিবার ক্ষমতা, স্বাভাবিক উপস্থিত-বুদ্ধি, সত্যনির্ধারণ-শক্তি, মনুষ্যচরিত্র-জ্ঞান এবং অন্যের প্রতি প্রবল সহানুভূতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"মিষ্টার রাধাবল্লভ দাস এক অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিত সম্পৃক্ত বা সম্পর্কযুক্ত। বাল্যাবস্থাতেই ইনি বিদ্যার্জনে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাবকের প্রচণ্ড প্রহারই তাঁহাকে প্রথমে এই বিষয়ে অভিনিবিষ্ট করিয়াছিল। প্রহৃত হইবার পর হইতেই তিনি সর্বদা পুস্তক লইয়া থাকিতেন,—এবং কখনই সময় বৃথা নষ্ট করিতেন না। হিন্দু কলেজেই তিনি তাঁহার অধ্যয়ন শেষ করেন, তখন ঐ কলেজই হিন্দু বালকদিগের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভাল কলেজ ছিল। বাল্যকালে তিনি তাঁহার মানসিক শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং যখন তিনি উক্ত কলেজ পরিত্যাগ করেন, তখন উহার প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাঁহার মানসিক উন্নতির পরিচয়-জ্ঞাপক একখানি বিশেষ প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। তিনি বুককিপার বা হিসাবরক্ষকের কাজ করেন এবং সেই কাজে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি অনেক সওদাগরী অফিস, ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে কাজ করিয়াছেন এবং যখনই তিনি যে অফিসের কার্য পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, তখনই সেই অফিসের কর্তা তাঁহাকে কার্যদক্ষতার জন্য প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন। পরিশেষে তিনি ভারতেশ্বরীর এবং দেশের কার্যে সতের বৎসরের অধিক কাল প্রশংসার সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার স্বাস্থ্যহানি হয়,—সেই জন্য তিনি অগত্যা সরকারের পেন্সনভোগী হইতে বাধ্য হন। যদিও তিনি অন্যান্য কার্যে নিযুক্ত আছেন,—তথাপি মস্তিষ্কতত্ত্ববিজ্ঞানে তাঁহার অনুরক্তি হ্রাস পায় নাই। এই বৈজ্ঞানিক সত্য সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার জন্য এবং ইহার সুদৃঢ় ভিত্তি বুঝিবার উদ্দেশে, ইনি ইঁহার অবকাশের সমস্ত সময় মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের আলোচনায় ও এতৎ-সম্পর্কিত প্রাকৃতিক ব্যাপার পর্যবেক্ষণে নিয়োগ করিয়া থাকেন।

"তিনি কয়েকজন ছাত্রকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি একটি সমিতি সংস্থাপনের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অনেকে তাঁহার সহিত যোগ দিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাঁহারা স্কুল কলেজের ছাত্র

সুতরাং এই কার্য-সংসাধনে অর্থ সাহায্য করা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এক সময় আশী জনেরও অধিক যুবক ইহার সদস্য হইবার জন্য নাম লেখাইয়া ছিলেন। স্বর্গীয় মহাত্মা কালীকুমার দাসের সভাপতিত্বে খৃষ্টীয় ১৮৪৫ অব্দের ৭ই জুন তারিখে 'কলিকাতা ফ্রেনলজিক্যাল সমিতি' সংস্থাপিত হইয়াছিল; আর বি দাস মহাশয় উহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে সদস্য এবং অন্যান্য সদস্য কর্তৃক ঐ সমিতির কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেশের লোককে ফ্রেনলজি বা মস্তিষ্ক-স্থান-বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য ইনি উক্ত বিজ্ঞানের এক পুস্তক ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেন। ইহাতে কলিকাতায় এই বিষয় লইয়া বিলক্ষণ আলোচনাও হয়। তিনি মস্তিষ্ক-স্থান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত পত্রিকাদিতে সন্দর্ভ লিখিতেন এবং এই বিষয়ে বক্তৃতাও দিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের লোক জ্ঞানার্জনের জন্য কোন বিজ্ঞানই পড়িতে চাহে না; সুতরাং তিনিও এই শাস্ত্রে তাঁহার ইচ্ছামত জ্ঞান বিস্তার করিতে পারিলেন না।

"যাহা হউক কলিকাতায় তাঁহার একটি ফ্রেনলজির অফিস, ঐ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বহুমূল্যবান্ পুস্তক সম্বলিত একটি পুস্তকালয় এবং একটি ছোট চিত্রশালিকা (museum) আছে। তিনি মধ্যে মধ্যে এই বিষয়ে বক্তৃতা দেন এবং উক্ত বিজ্ঞানানুযায়ী চরিত্র বিবৃত করেন। দাস মহাশয়ের মস্তিষ্ক-স্থান-বিজ্ঞান বিষয়ক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরর' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। কার্যক্ষেত্রে ইনি নানা জাতির ও নানা ব্যবসায়ীর সংস্রবে আসিয়াছেন। ভারতবাসী, ইয়োরোপীয়, চীনা, মার্কিণ প্রভৃতি জাতি, জজ, ব্যারিষ্টার, এটর্ণি, এঞ্জিনিয়ার, সওদাগর, সম্পাদক, ধর্মযাজক প্রভৃতি নানা ব্যবসায়ীই তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ইঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। এমন কি বড়লাট, ছোটলাট প্রভৃতির ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরাও মস্তিক-স্থান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার মত লইয়া থাকেন। যাঁহাদের এই বিষয়ে তাঁহার গুণ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আছে,—তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকেন।"

'মনস্তত্ত্বসার-সংগ্রহে'র আলোচনা

ডিমাই ১২ পেজী আকারে ৯৩ পৃষ্ঠায় রাধাবল্লভ বাবুর "মনস্তত্ত্বসার-সংগ্রহ" গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে ৪ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা ও ৫ পৃষ্ঠাব্যাপী সূচীপত্র আছে।

গ্রন্থখানি তিনি তাঁহার অন্যতম প্রতিবেশী ও আত্মীয় কেশবলাল মল্লিক মহাশয়কে উৎসর্গ করেন। কেশব বাবু রাধাবল্লভ বাবুর জ্যেষ্ঠা মাতৃস্বসা সূর্যমণি দাসীর পুত্র। ইতি সুবিখ্যাত সওদাগর রেলী ব্রাদার্সের গুদাম-সরকার ও বেশ অবস্থাপন্ন ছিলেন। ইঁহারই উদ্যোগ, চেষ্টা ও মনোযোগে বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথমে মনস্তত্ত্বসম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত হয়, তাহা গ্রন্থোৎসর্গ হইতে জানিতে পারা যায়।

"সকল মন ইন্দ্রিয়ের নাম এবং যে ইন্দ্রিয়ের যে স্থান মনস্তত্ত্বসম্বন্ধীয় মূর্তিতে অঙ্ক দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে, তাহার একটি নির্ঘণ্ট" গ্রন্থ মধ্যে দেওয়া হইয়াছে ; ইহা ডাক্তার Spurzheimএর 'Phrenology or the Doctrine of the Mental Phenomena" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের Powers and Organs of the Mind শীর্ষক তালিকার পর্যায়ে সন্নিবেশিত। আমাদের কর্মেন্দ্রিয়কে দুই ভাগে (ইচ্ছা-ইন্দ্রিয় ও চিন্তা-ইন্দ্রিয়) এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়কে দুই ভাগে (বোধনেন্দ্রিয় ও অনুমান-ইন্দ্রিয়) বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের অন্তর্গত বৃত্তিনিচয়ের স্থান নির্দেশিত হইয়াছে। বিষয়টি স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য চারিখানি চিত্র দ্বারা তিনি গ্রন্থখানি শোভিত করিয়াছেন।

চিত্র চারিখানির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তন্মধ্যস্থ সংখ্যার সহিত লিখিত তালিকা মিলাইয়া লইলেই মস্তকের কোথায় কোন্ প্রবৃত্তির স্থান—তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় ;—

কর্মেন্দ্রিয়

(ক) ইচ্ছা-ইন্দ্রিয়

১। রতিপ্রবৃত্তি

২। শিশুপ্রবৃত্তি
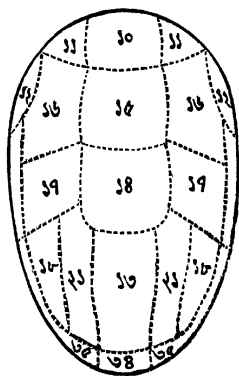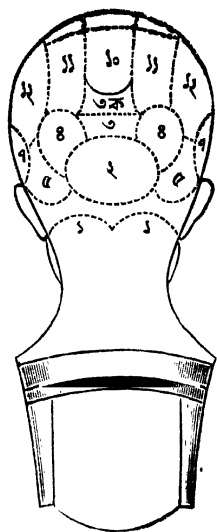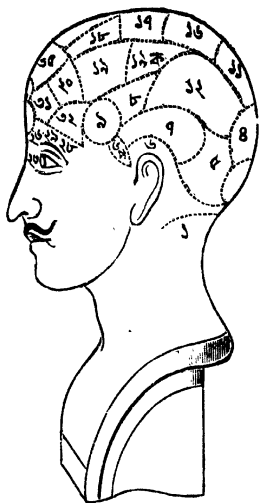
৩। সংযোগপ্রবৃত্তি

৩ ক। স্বস্থানানুগত-প্রবৃত্তি

৪। বন্ধুত্বপ্রবৃত্তি

৫। বিপদ্‌ভঞ্জনপ্রবৃত্তি

৬। নাশকপ্রবৃত্তি

৬ ক। খাদ্যপ্রবৃত্তি

৭। গোপনপ্রবৃত্তি

৮। উপার্জনপ্রবৃত্তি

৯। নির্মাণপ্রবৃত্তি

(খ) চিন্তা-ইন্দ্রিয়

১০। আত্মাদরপ্রবৃত্তি

১১। আত্মযশঃ-প্রবৃত্তি

১২। সতর্কতাপ্রবৃত্তি

১৩। দয়াপ্রবৃত্তি

১৪। ভক্তিপ্রবৃত্তি

১৫। দৃঢ়তাপ্রবৃত্তি

১৬। হিতাহিত-বিবেচনা-প্রবৃত্তি

১৭। প্রত্যাশাপ্রবৃত্তি

১৮। আশ্চর্যপ্রবৃত্তি

১৯। কবিতাশক্তি বা সৌন্দর্যপ্রবৃত্তি

১৯ ক। অদ্যাপি স্থির হয় নাই

২০। পরিহাসপ্রবৃত্তি

২১। অনুকরণপ্রবৃত্তি

জ্ঞানেন্দ্রিয়

(ক) বোধনেন্দ্রিয়

২২। পার্থক্যবৃত্তি

২৩। আকৃতিবৃত্তি

২৪। পরিমাণবৃত্তি

২৫। ভাবিত্ববৃত্তি

২৬। রণবৃত্তি

২৭। স্থানবৃত্তি

২৮। অঙ্কবৃত্তি

২৯। শ্রেণীবৃত্তি

৩০। ঘটনাবৃত্তি

৩১। কালবৃত্তি

৩২। স্বরবৃত্তি

৩৩। শব্দবৃত্তি

(খ) অনুমান-ইন্দ্রিয়

৩৪। উপমাবৃত্তি

৩৫। হেতুবৃত্তি

গ্রন্থখানিকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে—আদ্যপ্রকরণ; দ্বিতীয় খণ্ডে—ইচ্ছা-ইন্দ্রিয়ের বিবরণ, চিন্তা-ইন্দ্রিয়ের বিবরণ, বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের বিবরণ, বোধনেন্দ্রিয়ের বিবরণ, অনুমান-ইন্দ্রিয়ের বিবরণ এবং তৃতীয় খণ্ডে—মনঃ-শক্তি সকলের ক্রিয়ার ধারা, ইচ্ছা-ইন্দ্রিয় ও চিন্তা-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার ধারা, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার ধারা, প্রত্যক্ষ, অন্তর্বোধ, অনুভব, স্মরণ, ইতর-বিশেষ-বিবেচনা, মানসিক চৈতন্য, মনোযোগ, অনুরাগ, সুখ ও দুঃখ, ধৈর্যাধৈর্য, আনন্দ ও নিরানন্দ, স্বভাব, পছন্দ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য ও মোহ, মনস্তত্ত্ববিদ্যার ব্যবহার্যতা ও পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন—আছে।

গ্রন্থের ভাষা বেশ সরল; নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদত্ত হইল;—

"মনস্তত্ত্ববিদ্যাভ্যাস করিলে মনের গুণসকল এবং যে যে ইন্দ্রিয় * হইতে ঐ সকল গুণের প্রকাশ হয়, তাহা নির্ধারণ করা যায়, কিন্তু ইহাতে ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পারা যায় না।

* "এই গ্রন্থে যে সকল ইন্দ্রিয় শব্দ ব্যবহার করা গিয়াছে, তাহা সমুদয়ই মস্তিষ্কশক্তির আধার বুঝাইবেক, ইংরেজীতে যাহাকে অরগ্যাণ (Organ) বলিয়া থাকে।"—গ্রন্থনিহিত প্রথম পৃষ্ঠার ফুট্‌নোট।

এই বিদ্যার আবশ্যকতা ও ব্যবহার জানিবার পূর্বে ইহার বীজের স্বভাব সীমা জ্ঞাত হওয়া উচিত। এই বিষয় পর খণ্ডে বর্ণিত হইবে। সম্প্রতি মনুষ্যমাত্রের স্বভাবের উপাদান স্বরূপ কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার চিহ্ন কেবল ব্যক্ত করিলাম।”

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র” হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়—বর্তমানে এই গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। এই মূল্যবান গ্রন্থের একটি সংস্করণ হওয়া অতীব প্রয়োজন।

গ্রন্থের “ভূমিকা” ও “পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন” শীর্ষক অংশ দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকের আলোচনা সমাপ্ত হইল ;—

“ভূমিকা।

এই আশ্চর্য বিদ্যা নানা দেশীয় ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে, সম্প্রতি এতদ্দেশীয় জনগণের উপকারার্থে এই গ্রন্থ বহু ক্লেশে, ইংরেজী নানা ফ্রেনলজী অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব-পুস্তক হইতে সারসংগ্রহ করিয়া গৌড়ীয় সাধু-ভাষায় অনুবাদিত হইল, প্রার্থনা করি পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্বক এই পুস্তক পাঠ করিলে আমার গুরুতর পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে। ইহা পাঠ করিলে কি উপকার হয় তাহা কথনাতীত, তথাপি এই পুস্তকের মধ্যে মধ্যে ও শেষাংশে তদ্বিষয়ক কতিপয় পংক্তি লিখিলাম। যদি এই পুস্তকের মধ্যে কোন অংশে কোন ভ্রম হইয়া থাকে, তবে পাঠক মহাশয়েরা শোধন করিয়া গ্রহণ করিলে চিরবাধিত হইব।

এই মহোপকারিণী বিদ্যা চারি বৎসর হইল এতদ্দেশস্থ অত্যল্প ব্যক্তির জ্ঞাত ছিল, কিন্তু ইংরেজী ১৮৪৫ সালের ৭ই জুন তারিখে কতিপয় বিদ্বান্ সভ্য ব্যক্তির দ্বারা কলিকাতা ফ্রেনলজীকেল সোসাইটি স্থাপিত হওয়া পর্যন্ত এতদ্দেশে বিশেষরূপ প্রকটিত হইতে আরব্ধ হইয়াছে।

প্রায় ৫০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইল, ইয়োরোপের অন্তঃপাতি হ্বায়না দেশস্থ ডাক্তার গল্ সাহেব এই বিদ্যা প্রথমে প্রকাশ করেন, তৎপরে তাঁহার শিষ্য ডাক্তার ইশ্পর্জিম সাহেব উক্ত বিদ্যার অধিক প্রচার ও বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং তদুত্তর শ্রীযুক্ত কোম্ব সাহেব ও অন্যান্য জ্ঞানী মহাশয়েরা অধিক পরিশ্রম করিয়া ঐ বিদ্যাকে উত্তর উত্তর সুপ্রসিদ্ধ

করিয়াছেন, সম্প্রতি ইয়োরোপে ও আমেরিকার স্থানে স্থানে ঐ বিদ্যার অধিক চর্চা হইতেছে।

ডাক্তার গল্ সাহেব এই বিদ্যার আদ্যোৎপত্তির কারণ। তিনি আপন বাল্যাবস্থা পর্যন্ত দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনী সকলের চরিত্র ও ব্যবহার তুল্য নহে, এবং পাঠশালার সঙ্গী বালকেরাও বিদ্যা-ভ্যাসের বিষয়ে সকলে সমান নহে, কেহ উত্তম লিখিতে পারে, কেহ বা অঙ্ক প্রশ্ন দেখিয়া বা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিতে পারে, এবং কেহ বা তর্ক করিতে ও নানা প্রকার অলঙ্কারাদি দিয়া আপন কথা সুশোভিত করিতে পারে, কিন্তু তিনি স্বয়ং উত্তমরূপে পাঠ অভ্যাস করিতে পারিতেন না, তাঁহার চক্ষু ক্ষুদ্র ছিল এবং পাঠশালার যে যে বালক উত্তমরূপে পাঠ অভ্যাস করিতে পারিত তাহারা সর্বদাই তাঁহা হইতে মান্য হইত, ঐ সকল উত্তম বালকের চক্ষু বড় ছিল।

প্রথমে তিনি এমত বোধ করেন নাই, যে চক্ষু বড় হইলেই উত্তমরূপ পাঠ অভ্যাস করিতে পারে। কিন্তু পাঠশালার সকল শ্রেণীতে বড় চক্ষুযুক্ত বালকেরা অতি উত্তমরূপে পাঠ অভ্যাস করিতে পারিত, আর তিনি যে বন্ধুর সমভিব্যাহারে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে যাইতেন সে ব্যক্তি পথহারা হইত না, কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রত্যাবর্তন সময়ে পথভ্রান্ত হইতেন, এমত ঘটনা সর্বদাই ঘটিত, এবং যাহাদের এই প্রকার যোগ্যতা ছিল তাহাদের উভয় ভ্রূ-মূলোপরি স্থান অতি উচ্চ ছিল, এই মত দেখিয়া বিশেষরূপে বিবেচনা করিলেন, যে এই স্থান উচ্চ হইলেই স্থান স্মরণ রাখিতে পারে। এবম্প্রকার চিহ্ন দেখিয়া আপন মনে স্থির করিলেন, যদ্যপি চিহ্ন দ্বারা অন্তরস্থ ইন্দ্রিয়সকলের গুণ জানিতে পারা যায়, তবে মনের অন্যান্য গুণেরও অবশ্যই বাহ্য চিহ্ন আছে ও তদ্দ্বারা নানা প্রকার মনঃশক্তি জানা যাইতে পারিবেক।

তৎকালাবধি ডাক্তার গল সাহেব যে সকল মনুষ্যের কোন বিশেষ স্বাভাবিক গুণ দেখিতেন, তাহাদের ব্যবহার ও রীতি মনঃসংযোগপূর্বক দেখিতে আরম্ভ করিলেন, এইরূপ অনেক উদাহরণ দর্শন করিয়া পরিশেষে নির্ধারণ করিলেন যে, মনের শক্তি সকল মস্তিষ্কের পরিমাণানুসারেই প্রকাশ

হয়। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে নানা দেশীয় নানা জাতীয় নানাপ্রকার বাহ্য ব্যবহার ও রীতিনীতি দর্শন করিয়া এবং তদনুসারে তাহাদিগের মস্তিষ্কের পরিমাণ ও বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়া, যে স্থান হইতে যে গুণ উৎপন্ন হয় তাহা নির্ণয় করিলেন, এবং অবশেষ এতদ্বিষয়ে বিবিধ প্রকার গ্রন্থ রচনাও করিয়াছেন।"

"পাঠক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন

হে মহাশয়গণ! আপনারা সানুগ্রহ চিত্তে এই পুস্তক পাঠ পূর্বক ইহার গুণ দোষ বিবেচনা করিয়া আমার অসীম পরিশ্রম সফল করিবেন। এই বিদ্যা সত্য কি মিথ্যা তাহা মনুষ্যজাতির মস্তক পরীক্ষা করিলেই অবগত হইতে পারিবেন, এবং এই পুস্তক পাঠ করিয়া ইহার ভাবার্থ অবগত হইয়া তৎপরে এই পুস্তকে লিখিত প্রণালী অনুসারে মস্তক পরীক্ষা করিবেন। এ বিষয়ে আমার অধিক বাক্যব্যয় করা বৃথা।

অনেকে কহিয়া থাকেন ইহা মিথ্যা, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা এই বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্রও না জানিয়া এমত উক্তি করেন; অতএব আমি আকাঙ্ক্ষা করি বিজ্ঞবর পাঠক মহাশয়েরা তদ্রূপ না করিয়া, অগ্রে পূর্বোক্ত প্রণালী অনুসারে এই পুস্তকের মর্মবোধ করিয়া পশ্চাৎ সত্য মিথ্যা বিবেচনা করিবেন।

কোন প্রকার নূতন বিষয় প্রকাশ হইলে, অবিজ্ঞ লোকেরা নানাপ্রকার বিদ্রূপাদি দ্বারা তাহা নষ্ট করিতে যথোচিত চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের দুরভিপ্রায় উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশহিতৈষী বিজ্ঞবর মহাশয়দিগের তদ্বিষয়ের উন্নতি বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত, এবং যে নূতন বিষয় বিবিধ লোকের বিবিধ প্রকার প্রতিবন্ধকতায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশ দেশবিদেশে প্রচলিত ও আদরণীয় হইতে থাকে, তাহাকে অবশ্যই সত্য বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

যৎকালে ডাক্তার গল্ সাহেব প্রথমে এই বিদ্যা প্রচারিত করিয়া অনবরত ইহার চালনা করিতে লাগিলেন, তৎকালে তদ্দেশীয় মহারাজা তাঁহার এই নূতন বিষয় প্রচারকে অপরাধ গণনা করিয়া তাঁহাকে কারাগারে রুদ্ধ করেন, আর আত্মীয় বন্ধুবর্গেরাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, এবং সংবাদপত্রের

সম্পাদক মহাশয়েরা সাধ্যমতে এই নবোৎপন্ন বিদ্যার হ্রাস করণে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে সকলেরই সমুদয় প্রতিবন্ধকতা বিফল হইল কারণ এই মনস্তত্ত্ববিদ্যা আপন গুণে প্রশংসিত হইয়া লোকসমাজে ক্রমশ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং তদবধি অনেক দেশে সমাদরণীয় হইয়া আসিতেছে, বোধ হয় আমাদিগের দেশেও শীঘ্র সকলের আনন্দ বৃদ্ধি করিবেক সন্দেহ নাই। হে পাঠক মহাশয়গণ! বিবেচনা করুন মিথ্যা বিষয় কি এতকাল পর্যন্ত প্রবল থাকিতে পারে।

এই মহোপকারিণী বিদ্যা প্রচার হইবার পূর্বে কোন দেশের ব্যক্তিরা মনের বিষয় কিছুমাত্র জানিত না, কিন্তু এক্ষণে এই বিদ্যার আলোচনা দ্বারা অনেক অনেক মানসিক ব্যাপার অবগত হইয়াছেন। ইহা অভ্যাস করিলে মন কি পদার্থ ও তাহার কিরূপ শক্তি, তদ্দারা ব্যক্তিসকল কি কি কর্ম করিতে সমর্থ হয়, এবং মনের শক্তি অনুসারে কিরূপ দোষগুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে ও কি উপায়েই বা দোষ নিবারণ এবং গুণ বৃদ্ধি হইতে পারে, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে মনুষ্যেরা জানিতে সমর্থ হয়, সুতরাং মনস্তত্ত্ব-বিদ্যা যাঁহার মনে অধিষ্ঠিতা হয়, তাঁহাকে ধর্মপথের পথিক করে এবং সর্বদা ধৈর্যগুণ ও পরস্পর সহ্যতা শক্তি প্রদান করে। এই বিদ্যা শিখিলে সমুদয় লোকের আন্তরিক ব্যাপার ও ইচ্ছা এবং স্বভাব নিশ্চয়রূপে অনুমান করা যায়, তাহা হইলে দোষী ব্যক্তির দোষ দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ উৎপন্ন হয় না, বরং দয়াই জন্মিতে পারে। এতাদৃশ ফলজনক বিদ্যা শিক্ষা করা ও দেশবিদেশে ইহার গুণ প্রচার করা, মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্যকর্তব্য কিমধিকমিতি।"

নাট্যকার বিনোদবিহারী মল্লিক

১২৮৭ সালে (ইং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে) "যুধিষ্ঠির রাজ্যাভিষেক অথবা ভারতসার নাটক" প্রকাশিত হয়। এই নাটকখানির রচয়িতা বিনোদ-বিহারী মল্লিক। ইনি বড়বাজারের সুবর্ণবণিক্-কুলগৌরব নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের প্রপৌত্র এবং রামতনু মল্লিক মহাশয়ের পৌত্র। রামতনু বাবু নিমাইবাবুর তৃতীয় পুত্র। রমানাথ ও লোকনাথ নামে রামতনু বাবুর দুইটি পুত্র ছিল। এই রমানাথ বাবুই বিনোদবিহারী বাবুর পিতা।

বিনোদ বাবুরা তিন সহোদর, জ্যেষ্ঠ কালীচরণ, মধ্যম ভগবতীচরণ ও কনিষ্ঠ .বিনোদবিহারী। বিনোদ বাবুর কোন পুত্র হয় নাই, তাঁহার দুইটি মাত্র কন্যা হয়। ১৩০৯ সালে (১৯০২ খৃঃ অঃ) তিনি পরলোক গমন করেন।

মহাভারত অবলম্বনে তিনি এই নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ৯০।৩ নং ক্রস ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যে অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল, সেই রঙ্গমঞ্চে ইহা অভিনীত হয়। নিজ গৃহে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই তিনি এই নাটকখানি রচনা করেন। নিম্নে গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্র ও ইংরেজীতে লিখিত ভূমিকাটি উদ্ধৃত হইল।

'যুধিষ্ঠির রাজ্যাভিষেক' নাটকের প্রচ্ছদপত্র

"যুধিষ্ঠির রাজ্যাভিষেক

অথবা

ভারতসার নাটক।

Yudistheer Rajyavisake

or

The Installation of Yudistheer.

দয়াবন্তঃ সদা সন্তঃ সততং সারভাগিনঃ।

গুণং গৃহ্ণন্তি ন দোষান্ হংসাঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ॥

কলিকাতা।
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।
১২৮৭ সাল।"

নাটকের ভূমিকা

গ্রন্থের ভূমিকা এইরূপ ঃ

"Preface

It hardly requires any apology to place before my countrymen a subject with which every man, woman and child in Bengal is thoroughly familiar. The present work is only a dramatised version of that portion of the Mahabharata which is listened to with tears of joy, reverence and pity when narrated by our gifted *kathaks* and bards. This subject is the reinstatement of Yudhisthira on the royal throne and his coronation at Hastinapura. After long years of sanguinary warfare, during which there was immense loss of life, the *Kurus* were annihilated and the victorious *Pandava* princes found rest and peace. Draupadi, the beloved, was avenged, the honor of the *Pandavas* had been upheld, their prowess proved, his lost kingdom recovered, his brothers, the flowers of the kingdom and the pride of his heart, were safe around him, Yudhisthira, the just, had time to mourn for the dead, which he sincerely did, specially for the good and gallant Karna who had fallen in battle. Neither the pomp and splendour of the coronation ceremony nor the affection of his subjects could wean him from the melancholy mood into which he had fallen, and which at last led him to withdraw himself altogether from the world. The whole story is full of interest and pathos, and is dear to the children of the soil. To dramatise it is to give it another attractive garb. When this drama was written, it was with the view of having it acted on the boards of the private family theatre at my resi-

dence. Its publication is owing to the desire of myself and my relations that it should be a memorial in our family of the honor done to our house by the Honorable Sir Richard and Lady Garth and His Excellency General Sir Frederick Paul Haines, who were kind enough to be present on the night of the first representation.

Cross Street, Calcutta B. B. Mullick"

যে দিন প্রথম মল্লিক মহাশয়দিগের ক্রশ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে এই নাটকখানির অভিনয় হয়, সেদিন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থ ও লেডী গার্থ এবং ভারতবর্ষের কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ ফ্রেডরিক পল হেন্স্ দর্শকরূপে ঐ অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন, তাহা উপরিলিখিত ভূমিকা হইতেই জানা যায়।

নাটকের উৎসর্গ-পত্র

গ্রন্থকার বিনোদ বাবু তাঁহার এই নাটকখানি সার রিচার্ড গার্থের নামে উৎসর্গ করেন। নিম্নে উৎসর্গ-পত্রখানি উদ্ধৃত হইল—

"To

The Hon'ble Sir Richard Garth, KT., Q.C.

Hon'ble Sir,

With your kind permission I beg most respectfully to dedicate to you this humble addition to our Vernacular literature,—a drama, based on an episode of that magnificent Indian epic, the Mahabharata,—at the first representation of which, on the private stage in my family residence, you did us the honor to be present. I also take this opportunity to acknowledge with gratitude the kindness which I and my family have invariably received at your hands.

I have the honor to remain,
Hon'ble Sir,
Your most obedient servant,
Benod Behary Mullick"

90-3, Cross Street,
1st August, 1880

'যুধিষ্ঠির রাজ্যাভিষেক' নাটকের আলোচনা

পুস্তকখানি ডিমাই আটপেজী আকারে ৫৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত ভূমিকা, উৎসর্গ-পত্র, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের তালিকা প্রভৃতিতে আরও তিনচারি পৃষ্ঠা আছে।

এই নাটকে পাঁচটি অঙ্ক আছে। অন্যান্য নাটকাদির ন্যায় গ্রন্থকার ইহাতে কোন গর্ভাঙ্কের সমাবেশ করেন নাই। এই পাঁচটি অঙ্কে নিম্নলিখিত পাঁচটি দৃশ্যস্থলের অবতারণা করা হইয়াছে—

প্রথম অঙ্ক—শিবির সন্নিকট পটগৃহ
দ্বিতীয় ,, —পুষ্পোদ্যান
তৃতীয় ,, —রণস্থল সমীপ
চতুর্থ ,, —রাজগৃহ মধ্যে
পঞ্চম ,, —হস্তিনাপুরীর নিকট

যখন পঞ্চপাণ্ডবের জন্য পাঁচখানি গ্রাম চাহিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের নিকট গমন করেন, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার অবলম্বনে এই নাটক বিরচিত হইয়াছে। নাটকের ভাষার নমুনার জন্য নিম্নে প্রথম অঙ্ক হইতে সহদেব ও ভীমের কথোপকথনের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"সহদেব। দুর্যোধন কৃষ্ণকে বাঁধিতে চায়। কৃষ্ণ যে কে, সে দুরাত্মা তাও জানে না।

ভীম। সে কি করে জান্‌বে ভাই, কত শত যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র জীর্ণতর-তপঃশরীর হয়েও যে পরম পদার্থ পুরুষোত্তমকে জানিতে পারেন না, সেই ভগবান্‌কে কি সামান্য পামর চিন্‌তে পারে? তা সে যাই হৌক, তোমাদের রাজা এক্ষণে কি স্থির করলেন? আর কি সন্ধির মানস আছে?

নেপথ্যে—ওহে সেনাপতিসকল শুন তোমরা, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ বস্ত্রাকর্ষণ সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের যে ক্রোধ হয়েছিল, নরশোণিতে অবনী অভিষিক্ত হবে বলে যে ক্রোধানল সন্ধিসলিলে শীতল কর্‌তে অভিলাষ করেছিলেন, কৃষ্ণের অপমানে আজ সে ক্রোধানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো।

ভীম। (পরমাহ্লাদে) উঠুক উঠুক, মহারাজের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেই ভাল। এমন দিন হবে মনে ছিল না, তবে আর কি প্রিয়ে তুমি শিবিরে যাও, আমরা কুরুকুল নির্মূলে দীক্ষিত হলেম, চল ভাই সহদেব, যুদ্ধের আয়োজন করা যাক্‌গে।" পৃঃ ৭

গ্রন্থমধ্যে ছয়খানি গান আছে। এখানে একখানি গান উদ্ধৃত হইল—

"কেন রে কঠিন প্রাণ, এখনো আছ দেহেতে,
প্রাণেশ্বর বৃকোদর, শশধর বিরহেতে।
তুমি করেছিলে পণ, নাশিয়ে সে দুর্যোধন,
রুধিরে কেশ বন্দন, করিব প্রিয়ে তুষিতে॥
সে আশা হলো নিরাশা, শুনি তব হত ভাষা,
গেল সে আশা ভরসা, ভাষা সরে না তুণ্ডেতে॥"

পৃঃ ৪৬ ও ৪৭

পুস্তকখানির প্রচ্ছদপত্রে মূল্যের কোন উল্লেখ নাই।

রায় ব্রজমোহন মল্লিক বাহাদুর

বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত বাঙালী মনীষী বাংলায় জন-সাধারণের শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ছিলেন, স্বর্গীয় রায় ব্রজমোহন মল্লিক বাহাদুর তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন কলিকাতা মহানগরীতে সুবর্ণবণিক্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মল্লিকদের আদি নিবাস হুগলী। ব্রজমোহনের পিতা ৺মথুরামোহন মল্লিক মহাশয় কার্যোপলক্ষে হুগলী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে থাকেন।

পারিবারিক বিবরণ

মথুরামোহনের ৫টি পুত্র ও ২টি কন্যা ছিল, তন্মধ্যে ব্রজমোহন সর্ব-কনিষ্ঠ। তাঁহার উপার্জন খুব বেশী ছিল না; সেইজন্য তাঁহাকে এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণ অতিকষ্টে নির্বাহ করিতে হইত।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺রাধামোহন মল্লিক, ১৮নং সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেনে বাস করিতেন। তিনি কোন ব্যবসায়ী ফার্মে চাকুরী করিতেন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। মৃত্যুকালে তিনি দুইটি কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

দ্বিতীয় পুত্র অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন।

তৃতীয় পুত্র ৺ক্ষেত্রমোহন মল্লিক, তাঁহারও কোন পুত্র ছিল না। তাঁহার ৭টি কন্যা ছিল।

চতুর্থ পুত্র ৺মণিমোহন মল্লিক। ইনি মার্চেন্ট অফিসে চাকুরী করিতেন। ইঁহার ৪টি পুত্র—আশুতোষ মল্লিক, রসিকলাল মল্লিক, প্রিয়লাল মল্লিক ও অমৃতলাল মল্লিক। ইঁহার কন্যা দুইটি।

পঞ্চম বা কনিষ্ঠ স্বর্গীয় রায় ব্রজমোহন মল্লিক বাহাদুর। ব্রজমোহনের ৭টি পুত্র ও ৪টি কন্যা। ব্রজমোহন দুইবার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের ৪টি পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺কেশবলাল মল্লিক, তিনি বি এল্ পাশ করিয়া মজঃফরপুরে ওকালতী করিতেন। অল্প বয়সে অবিবাহিত অবস্থায় তিনি পরলোক গমন করেন।
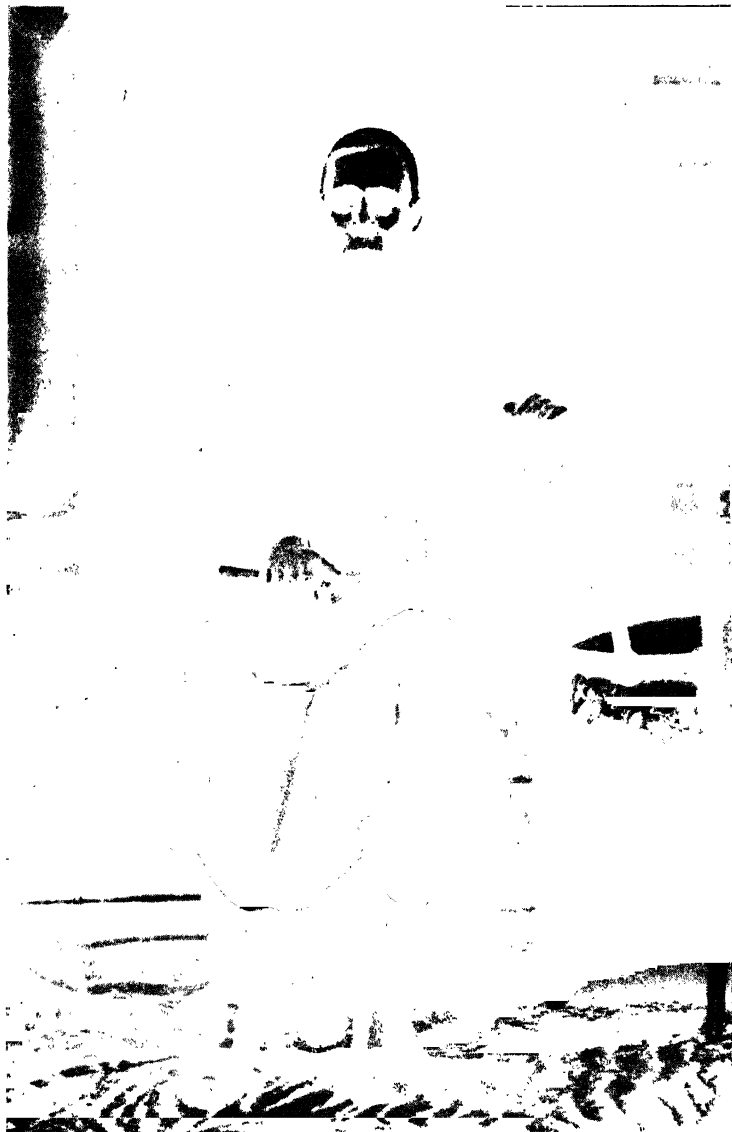
রায় ৺ব্রহ্মমোহন মল্লিক বাহাদুর
(১৮৩২—১৯১৯)

দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল মল্লিক এল্ এম্ এস্ অদ্যাবধি জীবিত আছেন। তিনি ১৮নং ব্রজনাথ দত্ত লেনে বাস করিতেছেন।

তৃতীয় পুত্র ৺মতিলাল মল্লিক। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা সমাপনান্তে কটক র‍্যাভেন্সা কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি মাত্র ৫ বৎসর অধ্যাপনা করার পর অকালে অবিবাহিত অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন।

চতুর্থ পুত্র ৺ফণিলাল মল্লিক বি ই, পাবলিক ওয়ার্কসের এসিষ্ট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মমোহন কলুটোলানিবাসী ৺শ্যামসুন্দর দে মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় পক্ষে ব্রহ্মমোহনের তিনটি পুত্র ও চারটি কন্যা।

প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত চুণিলাল মল্লিক বি এ। ইনি বর্তমানে ৪নং অভয় হালদার লেনে বাস করিতেছেন।

দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত জহরলাল মল্লিক। ইনি বাদুড়বাগান ষ্ট্রীটে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি ইনি ইঁহার পিতার লিখিত বাংলা ইউক্লিডের জ্যামিতির একটি নূতন সংস্করণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সিলেবাস অনুসারে প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি বহুবিধ ব্যবসা-কার্যে লিপ্ত।

তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত মোহনলাল মল্লিক এম্ এস-সি, বি এল। ইনি কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টে ওকালতী করেন এবং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে বাস করিতেছেন।

ব্রহ্মমোহনের প্রথমা কন্যার নাম শ্রীমতী সুশীলা দেবী নেবুতলা রো নিবাসী শ্রীযুক্ত পান্নালাল বড়ালের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত কনকচন্দ্র বড়াল এম্ বি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ও ৺চণ্ডীচরণ লাহা মহাশয় প্রতিষ্ঠিত ললিতকুমারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিফ্ মেডিকেল অফিসার। কিছুদিন পূর্বে ইঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত কলিকাতার ভূতপূর্ব সেরিফ ডক্টর সত্যচরণ লাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হইয়াছে। শ্রীমতী সুশীলা দেবীর দ্বিতীয় পুত্র কবি শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াল বি এল, বাণীকণ্ঠ, রেকর্ড-গায়ক এবং বাংলাদেশে সুপরিচিত।

দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর সহিত বহুবাজার নিবাসী ৺নবীনচন্দ্র ধরের বিবাহ হয়। ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ধর কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট।

তৃতীয়া কন্যার নাম শ্রীমতী চারুশীলা দেবী, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ বড়ালের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বড়াল মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। ইনি প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে বাস করেন।

চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী শান্তশীলা দেবী। ইঁহার স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত বি দে আই সি এস্, সি আই ই। শ্রীযুক্ত বি দে বেরারের কমিশনার ছিলেন, সম্প্রতি তিনি রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত দেবীচরণ দে। শ্রীযুক্ত দেবীচরণ কেম্ব্রিজের সেণ্ট জন কলেজ হইতে বি এ উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছেন।

বিদ্যাশিক্ষায় ব্রহ্মমোহন

৺মথুরামোহন অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য পুত্রগণকে উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারেন নাই ; এমন কি, যখন ব্রহ্মমোহনের বয়স ৮ বৎসর তখনও তাঁহাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু তিনি পল্লীর অন্যান্য বালকগণকে বিদ্যালয়ে যাইতে দেখিয়া লেখাপড়া শিখিবার জন্য অনুরাগ প্রকাশ করেন। ইহাতে মথুরামোহন অতি কষ্টে বার্ষিক দুই টাকা বেতনে তাঁহাকে বহুবাজার বাংলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্রহ্মমোহন শিক্ষকগণের প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ছিলেন এবং তাঁহার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি অখণ্ড মনোযোগ সহকারে পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন করিতেন। ফলে বহুবাজার বাংলা বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি বাংলা বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিলেন।

আবার নূতন সমস্যা দেখা দিল। তৎকালে মহামতি ডেভিড হেয়ারের বিদ্যালয় দরিদ্র ছাত্রগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু উক্ত বিদ্যালয়ে বার্ষিক বেতন চারি টাকা। বার্ষিক চারি টাকা বেতন প্রদানের মত অবস্থা মথুরামোহনের ছিল না,—তিনি দুই

টাকাই অতি কষ্টে প্রদান করিতেন। মথুরামোহনের কয়েকজন বন্ধু ব্রহ্মমোহনের বিদ্যাশিক্ষায় তীব্র অনুরাগ দেখিয়া নিজেরা চাঁদা তুলিয়া দুই টাকা প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট দুই টাকা মথুরামোহন দেন। এইরূপে ব্রহ্মমোহনের উচ্চশিক্ষার পথ খুলিয়া গেল এবং তিনি ডেভিড হেয়ারের বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন।

বিদ্যালয়ে ভর্তির প্রথম দিন ব্রহ্মমোহনের পরিধেয় বস্ত্রাদি অত্যন্ত মলিন ছিল। তাহা দেখিয়া হেয়ার সাহেব ব্রহ্মমোহনকে বলিলেন—"এই রকম ময়লা কাপড় পরিয়া স্কুলে আসিলে স্কুল হইতে তাড়াইয়া দিব।"

ইহাতে বালক ব্রহ্মমোহন নিজের দুর্বলতা উপলব্ধি করিলেন এবং বিদ্যালয় হইতে বাড়ী ফিরিয়া নিজ হস্তে সমস্ত জামা-কাপড়ে সাবান লাগাইয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেন। হেয়ার সাহেবের এই বাক্য তাঁহার জীবনে মন্ত্রশক্তির মত কাজ করিয়াছিল ; পরবর্তী জীবনে কোন দিন তিনি অপরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করেন নাই। যখন তিনি ইন্সপেক্টর অফ্ স্কুল্স্ পদে সমাসীন, তখনও দরকার হইলে নিজ হস্তে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিয়া লইতেন—ভৃত্য বা অন্য কাহারো উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতেন না। এইরূপে বালক ব্রহ্মমোহন মহামতি ডেভিড হেয়ারের বাক্যের মধ্যে স্বাবলম্বনের গুপ্ত শক্তি আবিষ্কার করেন।

এই বিদ্যালয়েও শিক্ষকগণের দৃষ্টি ব্রহ্মমোহনের উপর নিপতিত হইল। কিন্তু এই স্থানে অন্য দুইটি বালক তাঁহার প্রতিযোগী ছিল ; তন্মধ্যে একজন বঙ্গবিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম্ ডি, সি আই ই ; অন্য জন রাধাগোবিন্দ দাস। প্রথমে ব্রহ্মমোহন প্রতিযোগিতায় এই দুই জনের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক পরীক্ষায় এই দুইজনের একজন প্রথম ও অপর জন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন ; ফলে ব্রহ্মমোহনের তৃতীয় স্থান লাভ ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না।

ইহাতে ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত ব্রহ্মমোহন নিজের দুর্বলতা কোথায় তাহা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, ক্লাসে উড্ সাহেবের বীজগণিত হইতে অঙ্ককষা হইয়া থাকে, কিন্তু অর্থাভাবে তিনি উক্ত পুস্তক

ক্রয় করিতে পারেন নাই, এই জন্য প্রত্যেকবারই অন্যান্য বিষয়ে উভয় প্রতিযোগী অপেক্ষা বেশী নম্বর পাইলেও অঙ্কে তিনি কম নম্বর পাইয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহাতে ব্রহ্মমোহনের সুপ্ত শক্তি জাগরিত হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, যেরূপেই হউক, উক্ত পুস্তকের বিষয়বস্তু আয়ত্ত করিতে হইবে। এই সঙ্কল্পের বশবর্তী হইয়া তিনি একদিন বিদ্যালয়ের ছুটির পর একটি সহাধ্যায়ীর বাড়ী গিয়া উড্ সাহেবের বীজ-গণিতখানি নকল করিয়া রাত্রি ৮টার সময় বাড়ী ফিরিলেন। এদিকে তাঁহার পিতা মথুরামোহন ও অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁহাকে নির্ধারিত সময়ে বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে না দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং দুই তিনজন তাঁহার অন্বেষণে বাহির হন। তখন বৃষ্টি পড়িতেছিল। তাঁহারা কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, গায়ের জামা খুলিয়া তাহা দ্বারা পুস্তকটি জড়াইয়া খালি গায়ে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ব্রহ্ম-মোহন বাড়ী ফিরিতেছেন।

ব্রহ্মমোহনের কঠোর পরিশ্রম অচিরে ফলপ্রসূ হইল। তিনি পরবর্তী পরীক্ষায় স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন এবং বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে পরিগণিত হইলেন। শিক্ষকগণের সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। ফলে দ্বিতীয় বৎসর হইতে তিনি বিনা বেতনে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উপস্থিত হন।

উক্ত পরীক্ষায় তিনি স্বীয় পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও বুদ্ধিমত্তার গুণে সমগ্র পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং মাসিক ৪০৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। বৃত্তিলাভ করায় তাঁহাকে আর পুস্তক ক্রয় বা বিদ্যালয়ের বেতনের জন্য কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। অতঃপর তিনি সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন।

এই সময় ডি এল রিচার্ডসন ইংরেজী ও মিঃ হ্যারিসন অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। উভয় অধ্যাপকই ব্রহ্মমোহনকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন।

যথাসময়ে তিনি সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উপস্থিত হইলেন। সকলে আশা করিয়াছিল, তিনিই শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন। কিন্তু

ফল বাহির হইলে দেখা গেল তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন রাধাগোবিন্দ দাস এবং তৃতীয় স্থানে বঙ্গগৌরব ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নাম রহিয়াছে।

সিনিয়ার স্কলারশিপ পাশের পর ব্রহ্মমোহনের বিদ্যালয়ের পাঠ পরিসমাপ্ত হইল।

এই সময়ে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের তিনজনকে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য আহ্বান করেন। এই আহ্বানে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইলেন এবং চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ব্রহ্মমোহন এই আহ্বানের কথা তাঁহার পিতার নিকট নিবেদন করিলেন। তাহাতে মথুরামোহন উত্তর দিলেন—"চিকিৎসা-ব্যবসায় গুরুতর দায়িত্ব —লোকের প্রাণ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়, আর নিজের শরীরের উপরও অত্যন্ত অত্যাচার হয়। সুতরাং তোমাকে ডাক্তারিতে দিতে আমার ইচ্ছা হয় না।"

পিতৃভক্ত ব্রহ্মমোহন পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্যই করিতেন না। তিনি পিতার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া মেডিকেল কলেজের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন এবং চাকুরীর জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মমোহনের শিক্ষাবিভাগীয় কর্ম

অধ্যাপনা ও অঙ্কশাস্ত্রের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিবেন—এই ছিল তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ। সেই জন্য তিনি গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে কর্মপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। তাঁহার মত উদ্যমশীল পুরুষের চেষ্টা ব্যর্থ হইল না। তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে "ডেপুটি ইন্সপেক্টর অফ্ স্কুলস্" পদলাভ করিয়া শিক্ষাবিভাগে প্রবিষ্ট হইলেন।

তাঁহার প্রথম কর্মস্থল বাঁকুড়া। এই সময় হইতেই তিনি শিক্ষা পরিচালনার বিষয়ে কুশলতার পরিচয় প্রদান করিতে থাকেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া স্কুল পরিদর্শন করিতেন। স্কুলের শৃঙ্খলাবিধান, ছাত্রদের নৈতিক আচরণ, শিক্ষকবর্গের শিক্ষা-দানপ্রণালী প্রভৃতি তিনি

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেন, এবং বিদ্যালয়ের দোষ-ত্রুটি প্রভৃতি সংশোধনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় মিষ্টবাক্যে কর্মপন্থা নির্দেশ করিতেন। ইহাতে বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র তিনি জনপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং গভর্ণমেণ্টও তাঁহার কার্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। অতঃপর যে জেলা শিক্ষায় পশ্চাদপদ, তাঁহাকে সেই জেলায় স্থানান্তরিত করা হইত এবং তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ কর্মদক্ষতা গুণে তিনি সেই জেলায় শিক্ষার উৎকর্ষ-বিধানে সমর্থ হইতেন। এইরূপে তিনি বাংলার অনেকগুলি জেলায় ডেপুটি ইন্সপেক্টর অফ স্কুল পদে কার্য করেন। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি আই ই প্রভৃতি উর্ধ্বতন কর্মচারী তাঁহার কার্য-প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তৎকালে স্কুল পরিদর্শন বর্তমান কালের মত সুখ-সাধ্য ছিল না। বাংলার সর্বত্র রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই, রাস্তাঘাটও বর্তমান সময়ের মত সুগম ছিল না। অনেক সময় গরুর গাড়ীতে ১২।১৪ মাইল গভীর শাল-বনের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইত। তথাপি দিনের পর দিন ব্রহ্ম-মোহন এই ক্লেশকর ভ্রমণে কোনরূপ কষ্ট অনুভব করিতেন না।

ডেপুটি ইন্সপেক্টরের শ্রমসাধ্য কঠোর কর্তব্য সম্পাদন করিয়াও তিনি স্বীয় জ্ঞানচর্চায় নিরত থাকিতেন। এই জ্ঞানচর্চার ফলস্বরূপ এই সময় তিনি পাঞ্জাব-কেশরী "রণজিৎ সিংহের জীবন বৃত্তান্ত" নামক সুবৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশিত করিলেন। এই পুস্তকে তিনি তৎকালে নূতন এবং অপ্রকাশিত অনেক তথ্য সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ফলে তৎকালীন সুধীসমাজে এই পুস্তক আদৃত হইয়াছিল।

১৮৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে প্রায় দ্বাদশ বর্ষ ডেপুটি ইন্সপেক্টর অফ্ স্কুলস্ এর পদে কাজ করার পর হুগলী নর্মাল স্কুলের হেড মাষ্টারের পদে ব্রহ্মমোহনকে নিযুক্ত করা হইল। এইবার তিনি চিরাভিলষিত অঙ্কশাস্ত্রের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইবেন ভাবিয়া আনন্দে উক্ত পদ গ্রহণ করেন এবং স্বয়ং অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিলেন।

মধ্য বাংলা বা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে যাঁহারা হেডপণ্ডিতের কার্য করেন, তাঁহারা এই নর্মাল স্কুলসমূহে তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন। এই

সমস্ত ছাত্র প্রায়ই ইংরেজী ভাষা জানিতেন না। সুতরাং ইংরেজীতে জ্যামিতি শিক্ষা দেওয়া ব্রহ্মমোহনের পক্ষে সুসাধ্য ছিল না। তৎকালে অন্য কোন লেখক বাংলাভাষায় জ্যামিতি প্রকাশ করেন নাই; সুতরাং ইংরেজী জ্যামিতিই একমাত্র পাঠ্য ছিল। দ্বিতীয়ত ছাত্রেরা ইংরেজী জ্যামিতি ঠিক বুঝিতে পারিত না। তাহাতেও অনেক অসুবিধা হইত। তিনি শিক্ষক-ছাত্র—উভয়েরই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য বাংলাভাষায় জ্যামিতি প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কঠোর পরিশ্রমে ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ৬ অধ্যায় ও ১১শ ও ১২শ অধ্যায় বাংলায় ভাষান্তরিত করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইবার পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইংরেজী জ্যামিতির পারিভাষিক শব্দগুলিকে বাংলায় অনুবাদ করিবার সময় তাঁহাকে বহু গবেষণা করিতে হইয়াছিল।

Trigonometry পড়াইতে গিয়াও তিনি জ্যামিতির অনুরূপ অসুবিধা বোধ করিলেন এবং উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পথ সুগম করিবার জন্য "ত্রিকোণমিতি" নামে উহাও বাংলাভাষায় অনুবাদ করেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলসের পদ সৃষ্টি হইলে তাঁহাকে হুগলী নর্মাল স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ হইতে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর অফ্ স্কুলসের পদে নিযুক্ত করা হইল। এই পদেও তিনি দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন।

এই সময় কুচবিহার রাজ্যে শিক্ষা-প্রণালীর সুশৃঙ্খল নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একজন শিক্ষাবিভাগীয় কর্মচারী প্রেরণ করিতে উক্ত রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগ গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। এই কার্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্মমোহনকেই উপযুক্ত ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে কুচবিহার রাজ্যে প্রেরণ করেন। তিনি উক্ত রাজ্যের শিক্ষাসম্বন্ধীয় নিয়ম-প্রণালী পর্যালোচনা করত নব নিয়ম প্রণয়নের জন্য যে রিপোর্ট দান করেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার সহিত গৃহীত হয় এবং তদনুসারে কুচবিহারের শিক্ষা-প্রণালী আমূল পরিবর্তিত করিয়া নব প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ব্রহ্মমোহনেরই উক্ত পদ লাভের সর্বোচ্চ দাবী ছিল; কিন্তু ভারতবাসীকে তৎকালে শিক্ষা-বিভাগীয় উচ্চশ্রেণীর পদে নিযুক্ত না করিয়া বিলাতী ডিগ্রিধারী ইংরেজগণকে নিযুক্ত করার রীতি থাকে। সেই জন্য ব্রহ্মমোহন বাংলার তদানীন্তন ছোট লাট সার রিভার্স টমসনের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

কথোপকথনে সন্তুষ্ট হইয়া লাট সাহেব তাঁহাকে ভূদেব বাবুর পরবর্তী কর্মচারী হিসাবে শিক্ষাবিভাগীয় পদের উচ্চ স্তরে উন্নীত করেন এবং Inspector of Schools of the Western Circle পদে নিযুক্ত করিলেন।

ব্রহ্মমোহন এই দায়িত্বপূর্ণ পদে দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া ভারতবাসী উচ্চপদে সমাসীন হইলে যে সেই পদের সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ, তাহা প্রতিপন্ন করেন। দীর্ঘ ৩৪ বৎসরব্যাপী কার্যের অবসানে ৬০ বৎসর বয়সে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তিনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে ব্রহ্মমোহন

শিক্ষা-বিভাগে কার্য করিয়াও ব্রহ্মমোহন বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ১৮৮৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন এবং আমরণ প্রায় ৩২ বৎসর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন।

Central Text Book Committeeতেও তিনি প্রায় ১০ বৎসর সদস্য ছিলেন। এই সময় বিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্বাচনার্থ যে সমস্ত পুস্তক প্রেরিত হইত, তিনি সেই সব আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তবে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করিতেন, এবং যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে সহজ ও সরল উপায়ে বালকগণ অধিক শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হয়, সেই উদ্দেশ্যের অনুকূল পুস্তক মনোনয়নে পরামর্শ দিতেন।

তিনি তিনবার ষ্ট্যাটুটারি সিবিল সার্ভিসের পরীক্ষক হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে কয়েকবার পরীক্ষক নিযুক্ত করেন।

ইন্‌স্‌পেক্টর অফ্ স্কুলস্ পদে কাজ করার সময় তিনি প্রায় ৬ বৎসর হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

তিনি ২৫ বৎসর কাল হুগলী পাবলিক লাইব্রেরীর সেক্রেটারী ছিলেন। এই সময়ে তিনি জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া লাইব্রেরীর যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন।

এতদ্ভিন্ন বহু সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সমিতির সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ব্রহ্মমোহন সুবর্ণবণিক্ ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। যদি কোন সুবর্ণবণিক্ ছাত্র অর্থাভাবে ভর্তি হইতে অসমর্থ হইত, তবে তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষকে সুপারিস্ করিয়া ছাত্রটিকে বিনা বেতনে বিদ্যালয়ে ভর্তি করাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। যদি কোথাও উহা স্কুলের নিয়মে সম্ভব না হইত, তবে তিনি নিজের পকেট হইতে ছাত্রটির বেতন দিতেন। এইরূপে বিভিন্ন জেলায় তিনি বহু সুবর্ণবণিক্ ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

'ব্রহ্মমোহন মল্লিক সুবর্ণপদক' প্রতিষ্ঠা

"ব্রহ্মমোহন মল্লিক সুবর্ণ পদক" প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম কীর্তি। তিনি এম্ এ পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ২৫০০৲ টাকা উইলের দ্বারা দান করিয়া যান। এই সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"Brahmamohan Mallick Gold Medal

The late Rai Brahmamohan Mallick Bahadur, Inspector of Schools of the Western Circle and Fellow of the University, bequeathed to the University securities of Rs. 2500/- for creating an endowment for the annual award of a gold medal to the best of the M. A. and M. Sc. graduates in alternate years. The medal is to bear the inscription 'Brahmamohan Mallick Gold Medal awarded to......'on one side and the University Arms on the other.

The bequest was thankfully accepted by the Syndicate on the 13th February 1920 and on the 16th February 1921 it was decided by the Syndicate that the medal for 1920 should be awarded on the results of the M.A. Examination 1920, and that the competition for the medal be limited to those who submitted thesis at the examination and obtained a first class, securing the highest marks in the aggregate."

University Calendar, 1837, p. 426

'ব্রহ্মমোহন মল্লিক সুবর্ণ পদক'-প্রাপ্ত ছাত্রের তালিকা

১৯২০ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত ছাত্র "ব্রহ্মমোহন মল্লিক সুবর্ণপদক" লাভ করিয়াছে নিম্নে তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল।

বৎসর	নাম	কলেজ
১৯২০	শ্রীনরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়	ইউনিভার্সিটি
১৯২১	শ্রীনরেন্দ্রকুমার কারফরমা	" (প্রেসিডেন্সী)
১৯২২	শ্রীকালীপদ বটব্যাল	"
১৯২৩	শ্রী এন্ হরিয়াও	"
১৯২৪	শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ	" (প্রেসিডেন্সী)
১৯২৫	শ্রীনির্মলকুমার বসু	"
১৯২৭	শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাস	"
১৯২৮	শ্রীহেমন্তকুমার চক্রবর্তী	"
১৯২৯	শ্রীতারাপ্রসাদ বরাট	"
১৯৩১	শ্রীগোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	"
১৯৩২	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	"
১৯৩৩	শ্রীশান্তিরঞ্জন পালিত	"
১৯৩৫	শ্রীনারায়ণচন্দ্র সেনগুপ্ত	"

সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্বের প্রমাণ-সংগ্রহ

বাংলার বহু স্থানে কর্মোপলক্ষে গমন করিয়া তিনি সুবর্ণবণিক্গণের হীনাবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হন এবং বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ জাতি যে প্রকৃত বৈশ্য

তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টিত হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, আনন্দ ভট্ট কৃত "বল্লাল চরিত" গ্রন্থে বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ যে প্রকৃত বৈশ্য তাহা শাস্ত্রোদ্ধৃত বচন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি ঐ পুস্তক সংগ্রহার্থ সচেষ্ট হইলেন।

তিনি জানিতেন ঐ পুস্তকের একখণ্ড হস্তলিখিত পুঁথি বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরীতে ছিল। কিন্তু যখন তিনি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তখন ঐ কপি পাওয়া যায় নাই। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে গুজরাট হইতে একখণ্ড হস্তলিখিত পুঁথি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সংগ্রহ করেন এবং বর্ধমান জেলার নেমারী হইতেও অন্য একখণ্ড পুঁথি সংগৃহীত হয়।

উভয় খণ্ড পুঁথি সংগ্রহ করিয়া তিনি নৈহাটি হইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই মহাশয়কে আনাইয়া তাঁহার হস্তে পুঁথি দুইখানি প্রদান করেন। ইহাতে শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন; কারণ ইতিপূর্বে চীনাবাজারে পুস্তক ব্যবসায়ী "নাথ এণ্ড কোং" ঐ নামের একখণ্ড পুস্তক প্রকাশিত করেন এবং শাস্ত্রী মহাশয় ঐ পুস্তককে কৃত্রিম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বল্লাল চরিতের Prefaceএ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল—

"At the request of an esteemed friend* I undertook the editing and translating of the Sanskrit Work, entitled Vallala Charita by Ananda Bhatta. Before I took up the work in right earnest, I was not without doubts as to its authenticity and genuineness. A Sanskrit work of that name was published some years ago by the Nathas, the well-known booksellers of Chinabazar in Calcutta. I pronounced it to be spurious and unrealiable and I have had since no reasons to change my opinion. * * * * On a careful examination, however, of the manuscripts in the possession of my friend, my doubts were removed and I found them to be genuine. * * * * The manuscripts also were obtained from different parts of the country."

* স্বর্গীয় রায় ব্রহ্মমোহন মল্লিক বাহাদুর

এইরূপে ব্রহ্মমোহনের ঐকান্তিক চেষ্টায় আনন্দ ভট্ট কৃত বল্লাল চরিত অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

ব্রহ্মমোহনের পুস্তকাবলী

জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি ব্যতীত ব্রহ্মমোহন পাঞ্জাবকেশরী মহারাজ "রণজিৎ সিংহের জীবন বৃত্তান্ত" নামক পুস্তকখানি রচনা করিয়াছিলেন। বর্তমানে এই পুস্তক দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ লাইব্রেরীতে এই পুস্তকের একখণ্ড আছে, উহা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত।

'রণজিৎ সিংহের জীবন বৃত্তান্তে'র আলোচনা

এই পুস্তকের প্রচ্ছদ-পত্র নিম্নরূপ ঃ—

"রণজিৎ সিংহের জীবন বৃত্তান্ত
শ্রীব্রহ্মমোহন মল্লিক কর্তৃক
প্রণীত।
হুগলী
বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত।
সংবৎ ১৯১৯।
মূল্য দশ আনা মাত্র।"

প্রচ্ছদ-পত্রের পর দুই পৃষ্ঠা ভূমিকা আছে, ভূমিকায় তিনি এই পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিয়াছেন ঃ—

"ইদানীন্তন কালের মধ্যে মহারাজ রণজিৎ সিংহ ভারতবর্ষের একজন প্রধান ও পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। অতএব তাঁহার রাজ্যাধিকার লাভ, তাঁহার চরিত্র ও তাঁহার রাজ্য-শাসনপ্রণালী অবগত হইতে অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে * * * উক্ত মহারাজের জীবনবৃত্ত লিখিয়া এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত করিয়াছিলাম। * * * আমি ইহাকে পুনর্বার পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম।

হুগলী নর্মাল বিদ্যালয়
২৫শে অগ্রহায়ণ, ১২৬৯

শ্রীব্রহ্মমোহন মল্লিক"

পুস্তকখানি ৭টি অধ্যায়ে সমাপ্ত ; তদ্ভিন্ন কয়েক পৃষ্ঠা পরিশিষ্ট আছে। মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারের ১৩০ পৃষ্ঠা।

প্রথম অধ্যায়ে গুরু নানকের জীবনী ও শিখদিগের পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রণজিতের জন্ম, রাজ্যভার গ্রহণ ও নানাস্থান জয় সম্বন্ধীয় বিবরণ স্থান পাইয়াছে। তৎকালে পাঞ্জাব প্রদেশের শিখসম্প্রদায় দ্বাদশ মিশলে বিভক্ত ছিল; রণজিতের পিতামহ চরৎসিংহ শুকর-চক মিশলের অধিপতি ছিলেন। রণজিতের পিতার নাম মহাসিংহ ; রণজিতের ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে মহাসিংহ পরলোক গমন করেন। তাহাতে রণজিৎ পিতৃমিশলের অধিপতি হন ও স্বীয় প্রতিভা-বলে বহু স্থান জয় করিয়া বহু মিশল নিজ মিশলের অন্তর্ভুক্ত করেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে রণজিতের রাজস্ব-সংগ্রহের উপায়, পাতিয়ালা দেশ আক্রমণ, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। তাঁহার রাজস্ব-সংগ্রহের উপায় বর্ণনায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন—

"যাঁহারা সর্বাপেক্ষা অধিক কর আদায় করিয়া দিতে সম্মত হইলেন, তিনি তাঁহাদের হস্তে বিভিন্ন প্রদেশ সমর্পণ করিলেন। এই প্রকারে নিয়োজিত ব্যক্তিদিগের উপর বিচার-কার্যের ও প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ ভার ছিল। এতদ্ব্যতীত রাজস্ব-সম্পর্কীয় অন্য কোন নিয়ম রণজিৎ সিংহ কখনো করেন নাই।" পৃঃ ২৬

চতুর্থ অধ্যায়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা-পত্র, গভর্ণর জেনারেলের উপঢৌকন স্বরূপ রণজিৎকে একখানি শকট প্রেরণ, শিখ-সৈন্যগণকে পাশ্চাত্য যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করিবার চেষ্টা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। শকট প্রেরণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিতেছেন—

"(১৮১১ খৃষ্টাব্দে) রণজিৎ লাহোরে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর লর্ড মিণ্টো উপঢৌকন স্বরূপ কলিকাতা হইতে একখানি শকট প্রেরণ করিয়াছেন।" পৃঃ ৫০

সন্ধির জন্য ইংরেজ দূত মেটকাফ লাহোরে অবস্থানকালে মহরমের সময় মুসলমান সিপাহীগণ মহরমের উৎসবে মত্ত হওয়ায় একদল শিখ-সেনা

মেটকাফের শিবির আক্রমণ করিয়াছিল। তৎকালে মেটকাফের সঙ্গে মাত্র ২০০ শত পদাতিক সৈন্য ছিল। উহারা অনায়াসে বহুগুণ বেশী আক্রমণকারী শিখ-সৈন্যকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয়। উহা দেখিয়া রণজিৎ ইংরেজদের যুদ্ধ-প্রণালীর পক্ষপাতী হন এবং স্বীয় সৈন্যদলকে পাশ্চাত্য রণপ্রথায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"* * রণজিৎ সৈন্যগণকে যুদ্ধবিদ্যায় ইংরেজ সেনাগণের ন্যায় সুশিক্ষিত করিতে অভিলাষ করিলেন এবং এই অভিলাষ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত 'পুরুরী' নামধেয় কিয়ৎসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দলভুক্ত করিয়া রাখিলেন। প্রত্যেক দলে তিন চারি শত লোক নিযুক্ত হইল। ইহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করাইবার জন্য ইংরেজদিগের সৈন্যদল হইতে কতিপয় শিপাহীকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। 'অশ্বারোহী' সৈন্যদলকে তিনি দুইভাগে বিভক্ত করেন; তন্মধ্যে একদল বেতন ও অপর দল জায়গীর-ভোগী ছিল।" পৃঃ ৫২-৫৩

পঞ্চম অধ্যায়ে রণজিতের জ্যেষ্ঠপুত্র খড়্গ সিংহের বিবাহ, কোহিনুর হীরক লাভ ও রণজিতের স্বাস্থভঙ্গ প্রভৃতির বিবরণ উল্লেখিত হইয়াছে।

সম্রাট্ সাজাহানের সুবিখ্যাত কোহিনুর হীরক নাদির শা লইয়া যান ও উহা কালক্রমে আহম্মদ্ শা আবদালীর হস্তগত হয়। পরে উহা আফ্গানাধিপতি শা সুজার হাতে আসে।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে আফ্গানাধিপতি শা সুজা লাহোরে আসিবামাত্র রণজিৎ তাঁহাকে কোহিনুর হীরক প্রদান করিতে বলেন। শা সুজা অস্বীকৃত হইলে রণজিৎ তাঁহার শিবিরের চতুর্দিকে সৈন্য মোতায়েন করিয়া তাঁহাকে নজরবন্দী করেন। তাহাতেও শা সুজা হীরক প্রদান না করায় রণজিৎ তাঁহাকে অত্যাচারের ভয় প্রদর্শন করেন ও হীরক লাভ করেন। এই সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"জুন মাসের প্রথম দিবসে রণজিৎ কতিপয় সৈন্যের সহিত শাহের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, তথায় তিনি দুই ঘণ্টাকাল অবস্থিতি করিলে পর শা সুজা সজল নয়নে হীরকখণ্ড প্রদান করেন।" পৃঃ ৭১

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে কাশ্মীরের প্রতিকূলে দ্বিতীয়বার যাত্রা ও জয়, সুবিখ্যাত পর্যটক মুর ক্রফ্‌ট্‌ সাহেবের আগমন, দুইজন ফরাসী সেনাপতির লাহোরে আগমন ও ইংল্যাণ্ডেশ্বরের নিমিত্ত উপঢৌকন প্রেরণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

ইংল্যাণ্ডেশ্বরের নিমিত্ত উপঢৌকন প্রেরণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিতেছেন—"১৮২৭ অব্দের গ্রীষ্মকালে গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর লর্ড আমহার্ষ্ট সাহেব শিমলা পর্বতে উপনীত হওয়াতে তাঁহার অভ্যর্থনায় রণজিৎ সম্মানসূচক পত্র ও উপহারাদি পাঠাইয়াছিলেন। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের নরপতির নিমিত্ত কাশ্মীর দেশীয় শালের এক শিবির প্রেরিত হইয়াছিল।" পৃঃ ৯২

সপ্তম অধ্যায়ে গভর্ণর জেনারেলের সহিত লাহোরাধিপতির সাক্ষাৎকার, গোলাব সিংহের লুডাক প্রদেশ জয়, ইংল্যাণ্ডেশ্বর কর্তৃক রণজিৎকে উপঢৌকন প্রেরণ ও রণজিতের মৃত্যু প্রভৃতি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

শালের শিবিরের পরিবর্তে ইংল্যাণ্ডেশ্বরের রণজিৎকে উপঢৌকন প্রেরণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিতেছেন—

"রাজা চতুর্থ উইলিয়াম উহা (শালের শিবির) প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও রণজিতের নিমিত্ত কতিপয় বীর্যবান ও বলিষ্ঠ অশ্ব পাঠাইয়া দিলেন।" পৃঃ ৯৮

অতঃপর রণজিতের মৃত্যু সম্বন্ধে পুস্তকে লিখিত আছে—

"১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন ঊনষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করেন।" পৃঃ ১২৩

পরিশিষ্টে রণজিতের শিক্ষা, চরিত্র ও রাজনীতির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। রণজিতের শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিত আছে—"তিনি বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করেন নাই ও কোন ভাষাতেই তাঁহার কোন ব্যুৎপত্তি ছিল না। * * তিনি অত্যন্ত সুবুদ্ধি ছিলেন। কেহ কোন বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে স্বল্পকাল মধ্যে সংক্ষেপে এ প্রকার সদুত্তর প্রদান করিতেন যে, তাহা এককালে হৃদয়গ্রাহী হইত। * * * তাঁহার অদ্ভুত স্মরণ-শক্তি ছিল। কি সামান্য, কি মহৎ সকল কথাই তাঁহার মনোমন্দিরে

জাগরূক থাকিত। * * * তিনি এরূপ প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন যে অনুদ্ধার্য বিপজ্জাল হইতেও অতি সহজে মুক্ত হইতে পারিতেন।" পৃঃ ১২৫-১২৭

রণজিতের পোষাক-পরিচ্ছদ ও দৈনিক কার্যাবলীর বিবরণ নিম্নরূপ :—

"* * তিনি সর্বদা সামান্য পরিচ্ছদে থাকিতেন কিন্তু কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সুদৃশ্য বস্ত্র পরিধান ও কোহিনুর প্রভৃতি মহামূল্য হীরকখণ্ড বক্ষোদেশে ধারণ করিতেন। * *

"রণজিৎ অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অশ্বারোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেন। তৎপরে তিনি প্রাতর্ভোজনীয় দ্রব্যাদি আহার করিতেন। * * * নির্ধারিত সময়ে তিনি প্রতি দিবস আহার করিতেন। কখনই ইহার অন্যথা হইত না। * * * প্রাতর্ভোজনের পর দরবারে গমন পূর্বক তিনি বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। * * * অপরাহ্নে পুষ্পোদ্যানে অবস্থিতি করিতেন। এই সময় তিনি ধর্মালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন ও ধর্মোপদেশকেরা তাঁহার নিকট নানা গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন।" পৃঃ ১২৮-১২৯

রণজিতের মৃত্যুকালে তাঁহার রাজস্ব ও সৈন্য-সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল—

"তাঁহার মৃত্যুকালে ২৫,৪০৯,৫০০ টাকা রাজস্ব আদায় হইত ও ৮২৪১৫ অশ্বরোহী ও পদাতিক সৈন্য ছিল।" পৃঃ ১৩০

এই পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী।

ব্রহ্মমোহনের পুস্তকাবলীর প্রশংসা-পত্র

ব্রহ্মমোহনের জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি তৎকালীন সংবাদপত্র ও শিক্ষা-বিভাগের কর্মচারিবৃন্দ কর্তৃক কিরূপ সমাদরে গৃহীত হইয়াছিল নিম্নে তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই লিখিয়াছেন—

"Babu Brahma Mohan Mallick has just published an edition of Euclid's Elements in Bengali. It is an excellent work."

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখের ইংলিশম্যান পত্রিকা বলিতেছেন—

"Altogether this is as perfect an edition of the great geometer as we have seen in any language."

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তারিখের হিন্দু প্যাট্রিয়ট লিখিতেছেন—

"We owe an apology to our author for over-looking so long his excellent little work. This is the first book on Trigonometry in Bengali. * * * The work has been done carefully and intelligently."

ওয়েষ্টার্ণ সার্কেলের ইন্সপেক্টর অফ্ স্কুলস্ মিঃ জে এ হপ্‌কিন্‌স লিখিয়াছেন—

"It is undoubtedly the best Bengali Trigonometry out and is very cheap."

উইলে দরিদ্র সুবর্ণবণিক্ ছাত্রের জন্য ব্যবস্থা

ব্রহ্মমোহন ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তাঁহার উইল ও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে কডিসিল সম্পাদন করেন। এই উইলে তিনি ১১,০০০৲ হাজার টাকা (পরে কডিসিলে উহা ৯০০০৲ টাকা করা হয়), তাঁহার পত্নীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া একটি ট্রাষ্ট গঠন করিয়া যান। যদি তাঁহার পাঁচ কন্যার কাহারও কখনো কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে উক্ত ট্রাষ্ট হইতে সেই সাহায্য করা হইবে। উক্ত টাকার সুদ হইতে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, বা যদি উহা আদৌ কন্যাদের প্রয়োজনে না লাগে, তবে সমস্ত অর্থই দরিদ্র সুবর্ণবণিক্ ছাত্রের পাঠের সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে। নিম্নে উইলের অংশ উদ্ধৃত হইল :—

"Of the Securities to be disposed of under the provisions of this will, Securities of Rs. 11000/- (reduced to Rs. 9000/- in a codicil dated 23. 6. 1917) are to be placed in the hands of my living wife as Trustee in consultation with my son Chunilal, to enable her out of accrued interest to render help to such of her five daughters as may stand in need of her help. To any one of these five daughters, nothing needs necessarily

to be given as a monthly payment. Payments may be made to any one or two or proportionately to all, if necessity really arises. Savings of the interest of this fund or ultimately the entire accrued interest may be contributed to help one or more poor boys of good conduct of the Subarnabanik caste to prosecute their studies in schools or colleges."

১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই উইলের প্রোবেট গ্রহণ করা হইয়াছে।

মৃত্যু

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই ভোর বেলা ৫-২৮ মিনিটের সময় শিক্ষাব্রতী ব্রহ্মমোহন পরলোক গমন করেন।

ভক্তকবি বিশ্বম্ভর পানি

(২)

ভক্তকবি বিশ্বম্ভর শৈশবেই পিতৃহীন হন। একারণে তাঁহার কনিষ্ঠ পিতৃব্য রামসুন্দরই তাঁহাকে পুত্রভাবে লালন পালন করেন। এই রামসুন্দর একজন ধার্মিক ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন।

বিশ্বম্ভরের পিতামহ নীলাম্বরের ছয় পুত্রের মধ্যে চারিজন—কিশোরীমোহন (প্রথম), গোপীমোহন (দ্বিতীয়), মোহনলাল (পঞ্চম) ও রামসুন্দর (কনিষ্ঠ) নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র রামচরণ পানির দুই কন্যা ও চতুর্থ পুত্র কানাইচরণের এক পুত্র হয়। কানাইচরণের এই পুত্রই বিশ্বম্ভর।

বিশ্বম্ভরের দুই বিবাহ, তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, যশোদাকুমার, নবকুমার ও তারাকুমার নামে পাঁচটি পুত্র এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে মহেন্দ্র ও গোপেন্দ্র নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের অন্তর্গত এই পানি বা পাইন বংশের ইতিহাস কৌতূহলপূর্ণ। এই ধর্মশীল ও পরোপকারী সুবর্ণবণিক্ পরিবারের ইতিহাস গৌরবরাগে সমুজ্জ্বল।

'পুরোহিত' পত্রিকায় প্রকাশিত পানিবংশের ইতিহাস

পরলোকগত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় তৎসম্পাদিত "পুরোহিত" পত্রের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "সামাজিক ইতিহাস" নাম দিয়া ইঁহাদের যে বিবরণ প্রকাশ করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। এই উদ্ধৃতাংশে বিশ্বম্ভরের প্রপিতামহ হরিচরণ বাবু, পিতামহ নীলাম্বর বাবু এবং তাঁহার পুত্রগণের (বিশ্বম্ভরের পিতা ও পিতৃব্যগণের) অনেক কথা জানিতে পারা যাইবে।

"প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ বঙ্গীয় ৯৫০ অব্দে, পানিরা হেলান গ্রাম হইতে সেনহাটে উঠিয়া আইসেন। সেই সময়ে ইঁহারা পানি বলিয়া অভিহিত হইতেন। পরে ইঁহারা 'পাইন' উপাধিতে পরিচিত হন।

শোনা যায় বর্গীর ভয়ে ইঁহারা বাসস্থান ত্যাগ করেন। হেলানে এখন ইঁহাদের কুলদেবতা রাধাদামোদর জিউর মন্দির অতি ভগ্নাবস্থায় বর্তমান। বংশের কোন্ ব্যক্তি যে হেলান পরিত্যাগ করিয়া সেনহাটে আগমন করেন, তাহা জানিতে পারি নাই। হেলান গ্রামও খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের সীমাস্থিত।

"সেনহাটে আসিয়া ইঁহারা হেলান অপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ হইলেন। বহুকাল হইতেই ইঁহারা জমিদারী করিতেন, বংশের কেহ কেহ বিদেশে যাইয়া বাণিজ্যও করিতেন; কিন্তু সকলেই বিদ্যাচর্চা করিতে বড় ভালবাসিতেন। প্রাচীন কাল হইতে সেনহাটে পানিগোষ্ঠীর সহিত ওলন্দাজদিগের নানারূপ বাণিজ্য ছিল। যতদূর আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে অবধারিত হইয়াছে ইঁহাদের রেশমের কারবারই খুব বিখ্যাত ছিল। এমন কি ওয়াটসন সাহেব যখন ঘাটালে রেশমের প্রকাণ্ড কুঠী খোলেন, তখন এই বংশের সনাতন পাইনকে লইয়া তিনি কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন।

"বংশের প্রথম ব্যক্তির নাম মথুরামোহন। মথুরামোহন ভুরসুটের সুবর্ণবণিক্। তাঁহার পুত্রের নাম হরিচরণ। পিতাপুত্রে পূর্বপুরুষের উপার্জিত জমিদারীর অনেকাংশ বৃদ্ধি করেন। পুত্র ওলন্দাজ বণিক্গণের সহিত বাণিজ্য করিয়া অনেক অর্থ উপার্জন করেন। সেই সময় কলিকাতার বিশেষত্ব ছিল না। তখন সপ্তগ্রাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ওলন্দাজদিগের জাহাজ তখন সপ্তগ্রাম পর্যন্ত যাইতে পারিত না। হাওড়ার নিকটে ব্যাতোড় গ্রামের নিম্ন দিয়া সরস্বতী তখন তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইত। হরিচরণ বাণিজ্য-সূত্রে এই ব্যাতোড়ে থাকিতেন। ইনি অতি সুপুরুষ ছিলেন; পরিশ্রমে কখনও কাতর হইতেন না; বিদ্যাচর্চায় আমোদিত হইতেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে জীবন-মধ্যাহ্নেই ইঁহার প্রাণসূর্য অস্তমিত হয়। ইঁহার পুত্র নীলাম্বর তখন নাবালক। হরিচরণ যে প্রভূত জমিদারী এবং অগাধ সম্পত্তি রাখিয়া যান, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার কতকগুলি কর্মচারীর উপর পড়িল। তাহাদের লোভ ও বিশ্বাসঘাতকতায় হরিচরণের অগাধ সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেল। নীলাম্বর দারিদ্র্য ও কণ্টকাকীর্ণ কিরীট শিরে পরিয়া অল্প বয়সে সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কত সুখে, কত যত্নে লালিত-পালিত

লক্ষপতির সন্তান পথের কাঙ্গাল সাজিলেন। তাঁহার মনস্তেজ ছিল, কিন্তু হৃদয়ে বৃথাভিমানের লেশমাত্র ছিল না। যখন সংসার-সংগ্রামে তিনি অগ্রসর তখন তাঁহার দুইটি পুত্র হইয়াছে। তিনি তাঁহাদের স্নেহ-মমতা ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু কোথায় যাইবেন ? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি ব্যাতোড়ে আসিলেন। তখন সেখানে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ওলন্দাজ ছিল না। তিনি নিরাশহৃদয়ে কলিকাতায় আসিলেন, তখন কলিকাতা ধীরে ধীরে উন্নত হইতেছে। তখন সপ্তগ্রাম হইতে দু'এক ঘর সুবর্ণবণিক্ কলিকাতায় আসিতেছেন, নীলাম্বর অযথা অভিমান ত্যাগ করিয়া স্বজাতির নিকট স্বীয় দুঃখবার্তা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি হরিচরণ পানির পুত্র ইহা শুনিয়া তাঁহারা তাঁহাকে যত্ন-সমাদর করিলেন ; তিনি সর্বস্ব-হীন হইয়াছেন শুনিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া নীলাম্বরের স্ত্রীপুত্রের অন্ন-বস্ত্রের জন্য মাসহারা ধার্য করিয়া দিলেন। নীলাম্বর এইরূপে অনেকদিন কাটাইলেন ; তৎপরে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র বয়স্থ হইবামাত্র তিনি তাঁহাদিগকে কলিকাতায় আনিলেন এবং ইংরেজ সওদাগরের অফিসে দুইটি চাকুরী করিয়া দিলেন। নীলাম্বর যেমন মানসিক শক্তিবিশিষ্ট তেমনি ধার্মিক ছিলেন। তিনি বলিতেন—বৈষ্ণব ধর্ম ই জগতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কুলদেবতা রাধাদামোদরের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি পারসী বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগুলিও তাঁহার ন্যায় সরল-চিত্ত, অমায়িকস্বভাব এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ক্রমে ক্রমে নীলাম্বরের ছয় সন্তান জন্মে। প্রথম কিশোরীমোহন, দ্বিতীয় গোপীমোহন, তৃতীয় রামচরণ, চতুর্থ কানাইচরণ, পঞ্চম মোহনলাল, ষষ্ঠ রামসুন্দর। যখন নীলাম্বরের দুই পুত্র কিশোরীমোহন ও গোপীমোহন কলিকাতায় চাকুরী করেন তখন রামসুন্দর পানি একবার সম্ভবতঃ (১৮৮০ বা ৮১ সাল) কলিকাতায় আইসেন। কেবল গঙ্গাস্নান মানসে ও কলিকাতা দর্শনে তিনি আসেন, তখন তাঁহার বয়স অনুমান ১৫।১৬ বৎসর। এই অল্প বয়সেই তিনি পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। ইহা ব্যতীত তিনি অল্পমাত্র সংস্কৃতও শিখিয়াছিলেন। দশ বৎসরের সময় তিনি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন, গুরুমন্ত্র পাইয়া তিনি একান্ত ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত

বৈষ্ণবধর্মের গ্রন্থসকল পড়িতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তিনি আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই চৈতন্যচরিতামৃতের যে সুন্দর ব্যাখ্যা করিতেন বিদ্বানেরা তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি ছয় মাস থাকিতেন, এই সময়ের ভিতর তিনি স্বীয় অধ্যবসায়-গুণে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত হন। তিনি কলিকাতায় আসিবার পর তাঁহার পিতা নীলাম্বর স্বদেশে গমন করেন। রামসুন্দর কলিকাতায় বিদ্যাচর্চা ও ধর্মচর্চা লইয়াই কাল কাটাইতেন।

"একদা তিনি গঙ্গাস্নান করিয়া বড়বাজারের ভিতর দিয়া বাসায় যাইতেছেন, এমন সময় তিনি একস্থানে জনতা দেখিয়া দাঁড়াইলেন; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন মাড়োয়ারীরা আফিমের 'তেজীমন্দী' খেলা খেলিতে-ছেন। 'তেজীমন্দী' খেলা কি তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার বড় কৌতূহল হইল, অবশেষে তিনি বুঝিলেন এ একরূপ স্ফূর্তি খেলা, তাঁহারও খেলিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু হাতে একটিও পয়সা নাই। দালালেরা জিজ্ঞাসা করিল তোমার কাছে কোন দ্রব্য নাই? তিনি হাতের একটি ছোট অঙ্গুরীয় দেখাইলেন। দালালেরা স্থির করিল উহার মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা হইবে। রামসুন্দর আংটীটি বিক্রয় করিয়া টিকিট কিনিলেন। জানি না কোন্ সুকৃতির ফলে রামসুন্দরের ভাগ্যগগন সুপরিষ্কৃত হইয়াছিল। অজ্ঞ মানব আমরা কি করিয়া বুঝিব কোন্ অলক্ষ্য সূত্রে বিধাতা কাহার কি ঘটাইতেছেন! হরিচরণ পানির মৃত্যুর পর ধনবান্ পানিবংশ একেবারে নিঃস্ব হইয়া গিয়াছিল। কে জানিত আবার এত শীঘ্র তাঁহারা পূর্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন? খেলায় রামসুন্দরের জয়লাভ হইল। তিনি এক লক্ষ তেইশ হাজার টাকা পাইলেন। সে সময়ে তাঁহার বয়স অনুমান ২৪।২৫ বৎসর। জন্মভূমিতে এ সংবাদ গেল। সকলেই যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। কিন্তু হর্ষে বিষাদ ঘটিল। নীলাম্বরের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া আসিয়াছিল। তখন তিনি শয্যাগত। কলিকাতা হইতে কিশোরী-মোহন, গোপীমোহন, রামসুন্দর সেনহাটে গেলেন। নীলাম্বর মৃত্যুশয্যার চারিদিকে পুত্রগণকে দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি মৃত্যুশয্যাতে শুইয়া রামসুন্দরকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—'রামসুন্দর

তোমাকে বলিবার আমার কিছু নাই ; তথাপি আমার কর্তব্য যাহা করি। সৌভাগ্যবলে তুমি এখন প্রভূত ধনৈশ্বর্যের অধিকারী। তোমার এ ধন যেন সৎকার্যে নিয়োজিত হয়। তুমি সর্বকনিষ্ঠ, তোমার অগ্রজগণ যেন সদা তোমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। তুমি কোন কার্য ইঁহাদের বিনানুমতিতে করিবে না। আমি এই মহৎ বংশের অকৃতি সন্তান। আমাদ্বারা কোন কার্য হয় নাই ; আমার কুলদেবতা রাধাদামোদরের প্রতি যেন তোমার অচলা ভক্তি থাকে। তোমার মঙ্গল হইবে।' দরবিগলিত ধারায় নীলাম্বরের অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কিছু পরে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

"নীলাম্বরের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে কিশোরীমোহন ও গোপীমোহন প্রাণত্যাগ করিলেন। রামচরণ ও মোহনলাল বাটিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কানাইচরণ ও রামসুন্দর উভয় ভ্রাতা ব্যবসায়োপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করিলেন। বড়বাজারের ময়দাপটির যে স্থান দিয়া বাঁশতলা ষ্ট্রীট চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারা সেই স্থানে কুঠী ক্রয় করিয়া হুণ্ডী কেনাবেচার কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে রেশমের ব্যবসাও চলিতে লাগিল। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই ইঁহাদের ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি হইল। কলিকাতার বড় বড় ইংরেজ সওদাগরেরা ইঁহাদের সহিত কাজ করিতে লাগিলেন। নিজেদের বিশেষ ক্ষতি হইলেও, ইঁহারা চুক্তিভঙ্গ করিতেন না। এই জন্য অল্পকাল মধ্যেই তাঁহারা ইংরেজ-মহলে বিলক্ষণ বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। সওদাগর ব্যতীত অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ, জজ, কালেক্টর প্রভৃতি ইঁহাদের কারবারের খরিদ্দার ছিলেন।

"কয়েক বৎসর কার্য করিবার পর কানাইচরণ পরলোক গমন করিলেন। দেখিতে দেখিতে অল্পকাল মধ্যে রামচরণ এবং মোহনলালও তাঁহার অনুবর্তী হইলেন,[১] তখন কয় ভ্রাতার মধ্যে একমাত্র রামসুন্দরই জীবিত রহিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তিনটি ভ্রাতুষ্পুত্রকে[২] তিনি পুত্রবৎ

১ চিন্তামণি ও জয়মণি নামে রামচরণের দুই পুত্র হইয়াছিল। চিন্তামণি অপুত্রক, জয়মণির তিনটি সন্তান। প্রথম ও তৃতীয়টির নাম জানিতে পারা যায় নাই। দ্বিতীয়টির নাম সনাতন।

২ চিন্তামণি, জয়মণি ও বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভর কানাইচরণের পুত্র।

স্নেহ করিতেন। সকলের অনুরোধ ও আগ্রহে তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জয়মণির মধ্যম পুত্র সনাতন পানিকে যথাশাস্ত্র পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। চিন্তামণি ও বিশ্বম্ভরকে কলিকাতায় আনাইয়া রামসুন্দর কুঠীর কাজ শিখাইতে লাগিলেন।

"কুঠীর কাজ ব্যতীত রামসুন্দর বহু জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দয়ালু জমিদার ছিলেন। প্রজারা যাহাতে সুখে ও শান্তিতে থাকিতে পারে, তাহার জন্য তিনি বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতেন। এক সময়ে তাঁহার দক্ষিণাঞ্চলের জমিদারী প্রবল বন্যায় হাজিয়া যায়। নায়েব ও গোমস্তারা সংবাদ পাইতে লাগিল প্রজার যথাসর্বস্ব গিয়াছে, দেশে হাহাকার উঠিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহাদের ঘরে গরু আছে, এখনও চেষ্টা করিলে খাজনা আদায় হইতে পারে। খাজনা আদায়ের কথায় দৃক্‌পাত না করিয়া রামসুন্দর সেই দিনই জমিদারীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রজাগণকে ডাকাইয়া তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন কোন প্রজারই দুই বৎসরের খাজনা লওয়া হইবে না; তাহারা কেহ যেন গৃহবাস পরিত্যাগ না করে। তাঁহার ঘোষণা শ্রবণে প্রজারা তাঁহাকে দুইহাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিল। এই খাজনা রেহাই ব্যাপারে তিনি ত্রিশ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হন। তৎপরবর্তী বৎসর তিনি সেই জমিদারীতে একটি প্রকাণ্ড বাঁধ প্রস্তুত করাইয়া দেন। উহা 'পান-বাঁধ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া এখনও বর্তমান রহিয়াছে।

"বাল্যকাল হইতেই রামসুন্দর পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, স্বীয় ইষ্টদেব ও কুলদেবতার প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। দেবসেবা ও দেবকার্যে তিনি বহু মুদ্রা ব্যয় করিতেন। তিনি কুলদেবতার ঘর, নাট-মন্দির, রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, তুলসীমঞ্চ প্রভৃতি নূতন করিয়া প্রস্তুত করাইয়া দেন। সম্প্রতি এগুলি পড়িয়া গিয়াছে; এগুলিতে শিল্প-নৈপুণ্যের বহু পরিচয় ছিল। তিনি রাজপ্রাসাদতুল্য বাসগৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। কেহ কোন প্রকারে দায়গ্রস্ত হইয়া আসিলে, তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিত না।

"যথা সময়ে পুণ্যবান্ রামসুন্দরের কালপূর্ণ হইল। তাঁহার ন্যায় জনপ্রিয় জমিদারের পরলোক-গমনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হাহাকার করিতে লাগিল। অগ্নিতে দগ্ধ না করিয়া, তাঁহার দেহ বৈষ্ণব-শাস্ত্র মতে কুলদেবতার মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হইল। এই সমাধির উপর একটি মঠ স্থাপিত হইল এবং ইহার নামকরণ হইল—'রামসুন্দরের মঠ'। ইহার চূড়া এখনও মহাত্মা রামসুন্দরের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বহুদিন হইয়া গেল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই বহু পুরাতন মঠের সামান্য অংশও ভগ্ন হয় নাই। তাঁহাকে সমাধিস্থ করিবার সময়, তাঁহার যে খড়ম, ছড়ি ও জপের মালা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এখনও ঠিক সেইখানে অবিকৃতভাবে রহিয়াছে।

"সেনহাটের পাইন-বংশোদ্ভূত এই পরম ভাগবত সম্বন্ধে একটি কাহিনী এখনও খানাকুল-কৃষ্ণনগর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। রামসুন্দরের মৃত্যুর পর বৃন্দাবন হইতে গ্রামস্থ একজন কর্মকার সেনহাটে ফিরিয়া আসে। কর্মকার বড় বিষ্ণুভক্ত ছিল। সেই কারণে রামসুন্দরের সহিত তাহার বড় প্রণয় হয়। গ্রামে প্রবেশ করিয়াই সে প্রথমে রাধাদামোদর জিউর মন্দির দর্শন করিতে গেল। সেখানে রামসুন্দরের পোষ্যপুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের সহিত তাহার দেখা হইল। দেখা হইবামাত্র, সে সকলকে অতি আগ্রহের সহিত বলিল—'কর্তা মহাশয় (অর্থাৎ রামসুন্দর পানি) নিরাপদে শ্রীবৃন্দাবনে পৌছিয়াছেন। তাঁর জন্য আপনাদের কোনও চিন্তা নাই।' তাহার কথা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত ও আশ্চর্যান্বিত হইল। সকলের আগ্রহ দ্বিগুণতর হইল। সকলেই সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি ঘটিয়াছে, আদ্যোপান্ত বল।' কর্মকার তখন বলিতে লাগিল,—'যখন আমি বাটী আসিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিলাম, সেই সময় দেখিলাম যে, পান মহাশয় ডোর-কৌপীন-বহির্বাস পরিধান করিয়া, হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া অতি প্রীতমনে ব্রজের পথে গমন করিতেছেন, তৎপশ্চাতে তাঁহার তুল্লে চাকর। দুইজনে অতি হৃষ্টমনে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছেন। দেখিতে পাইয়া আমি তাঁহাদের নিকটবর্তী হইলাম। তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়া আমার

কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। তৎপরে আমি বলিলাম—'কর্তা মহাশয়, শ্রীধামে আপনার কতদিন থাকা হইবে?' তিনি তাহার উত্তরে বলিলেন,—'কি করিয়া তাহা জানিব ভাই? শ্রীরাধারাণী যতদিন দয়া করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে স্থান দিবেন, ততদিন থাকিব।' বাটীতে কোন কথা বলিতে হইবে কি না, তাহা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন,—'বলিবার কিছু নাই।' অতঃপর কর্তা মহাশয় ছুল্লের সহিত শ্রীধামের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। আমি পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার শরীরে কি অপরূপ জ্যোতিঃ,—কি অপূর্ব কান্তি! দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। কর্তা বুঝি এবার শ্রীবৃন্দাবন বাস করিলেন—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি সে স্থান ত্যাগ করিলাম।' কর্মকারের মুখে এই অভূতপূর্ব কাহিনী শুনিয়া উপস্থিত সকলেই পুলকিত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে কর্মকার রামসুন্দরের আত্মীয়গণ-প্রমুখাৎ শ্রবণ করিল যে, কর্তা দেহত্যাগ করিয়াছেন। এ সংবাদ শ্রবণে, সে যেমন বিস্মিত, তেমনই আনন্দে বিভোর হইল। হিসাব করিয়া তারিখ মিলাইয়া সকলেই দেখিলেন যে, বৃন্দাবনের পথে যেদিন রামসুন্দর ও ছুল্লে চাকরের সহিত কর্মকারের সাক্ষাৎ হইয়াছে, সেদিন তাঁহার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিবস। রামসুন্দরের মৃত্যুর তিন দিবস পরেই তাঁহার প্রিয় ভৃত্য ছুল্লে প্রাণত্যাগ করে।

"রামসুন্দরের মৃত্যুর পর, বিশ্বম্ভর ও চিন্তামণি উভয়ে মিলিয়া বিষয়কার্য এবং জমিদারী প্রভৃতি দেখিতে লাগিলেন। কার্য-পরিচালনা-বিষয়ে উভয় ভ্রাতার মধ্যে এই নিয়ম হইল যে, প্রত্যেকে বৎসরের মধ্যে ছয়মাস করিয়া কলিকাতায় বাস করিবেন এবং ছয়মাস কাল সেনহাটে থাকিবেন।

"খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট পোল নামে একটি ভয়ানক গ্রাম আছে, উহাতে অধিকাংশই পাঠানের বাস। এখনও যে সব পাঠান আছে, তাহারা অতিশয় দুর্দান্ত। পূর্বকালে পোলে হিন্দুর তিষ্ঠান বড় কষ্টকর ছিল; সর্বদাই * * পাঠানের হস্তে তাঁহাদিগকে নিগৃহীত হইতে হইত। একবার বিশ্বম্ভর বাবু সেনহাটে গিয়াছিলেন, তখন হিন্দুরা বলিল—'পোলের

মুসলমানের হস্ত হইতে আমাদিগকে বাঁচাও, বর্তমান জমিদার দুর্বল, তিনি কিছুই করিতে পারেন না, তোমার বাহুবল বিস্তার কর। তোমার দ্বারা ভগবানের আদেশ প্রতিপালিত হউক, তোমার মঙ্গল হইবে।' হিন্দুর প্রতি অত্যাচার দেখিয়া বিশ্বম্ভরের হৃদয় গলিল। তিনি চিন্তামণির মত লইয়া পোল ক্রয় করিলেন। তিনি প্রথমে গায়ে হাত বুলাইয়া পাঠানগণকে বশীভূত করিবেন ভাবিলেন, কিন্তু দুরাত্মা পাঠানেরা কিছুতেই বশীভূত হইল না। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া শেষে ঘোষণা করিয়া দিলেন,—যে পাঠান বশীভূত না হইবে, তাহার বাসগৃহ জ্বালাইয়া দিয়া তাহাকে গ্রামের বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে পাঠানেরা একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল—সহস্রাধিক পাঠান একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইল। তখন অস্ত্র-আইনও ছিল না, এত কঠোর শাসনও ছিল না। বিশ্বম্ভর বাবু এ সব শুনিলেন, তিনি গুপ্তচর দ্বারা সন্ধান লইলেন, পাঠানদের কেহ দলপতি নাই। তিনি অনতিবিলম্বে তিনশত লাঠিয়াল ও দুইশত হিন্দুস্থানী সংগ্রহ করিলেন। ইহার মধ্যে ৫০ জন ধানুষ্ক ছিল। বিশ্বম্ভরবাবু স্বয়ং পরিচালক, তিনি হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চলিলেন। ঠিক সন্ধ্যার সময় তাঁহারা পোলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, অজ্ঞাতভাবে যাইয়া একেবারে দলবদ্ধ পাঠানগণকে বন্দী করিবেন। কিন্তু গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্বেই দেখিলেন, দুরাত্মাগণ এক হিন্দুর গৃহে আগুন লাগাইয়া আনন্দে বড়ই হাল্লা করিতেছে। বিশ্বম্ভর বাবু পাঠানগণকে একেবারে আক্রমণ করিতে বলিলেন। তাঁহার পাঁচশত লোকের মধ্যে তিনশত জন লোক ভীষণ বিক্রমে অগ্রসর হইয়া ঘোর সিংহনাদ করিয়া একেবারে পাঠানগণকে আক্রমণ করিল। সমস্ত রাত্রি দাঙ্গা হইয়াছিল। আমরা দাঙ্গা বলিলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাকে যুদ্ধ বলা যাইতে পারে। প্রাতঃকালে বিশ্বম্ভর বাবু জয়লাভ করিলেন! পাঠানেরা বশীভূত হইল—গ্রামে শান্তি স্থাপিত হইল। কিন্তু খাজনা আদায়ের সময় আবার গোলমাল বাধিল; পাঠানেরা বলিল—'পোলের পয়সা কেহ লইতে পারে না; বিশ্বম্ভর পানির সাধ্য কি খাজনা আদায় করে? বশীভূত হইয়াছি ইহাই যথেষ্ট, পোলের

একতিল মাটী লইয়া যাইতে দিব না।' বিশ্বম্ভর বাবু আবার প্রবল লাঠিয়াল সজ্জীভূত করিলেন; আবার পোল আক্রমণ করা হইল; এবার বিশ্বম্ভর বাবু বলিলেন,—'পাঠানেরা যেমন একাতল মাটি দিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তেমনই পোলে ইট প্রস্তুত করিয়া সেনহাটে লইয়া যাইয়া তোষাখানা করিব।' বাস্তবিক তাহাই হইল; এখন সে বালাখানা-তোষাখানা ধূলিসাৎ হইয়াছে; কেবল বালাখানার চারিটি প্রকাণ্ড স্তম্ভ অনেক প্রাকৃতিক অত্যাচার সহিয়াও একাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিয়া মনুষ্যের অহঙ্কারকে উপহাস করিতেছে। এই পোল-শাসন-ব্যাপার, ঐ অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জানে; এই ব্যাপারে বিশ্বম্ভর বাবু ৫১০০০৲ হাজার (একান্ন হাজার) টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন!

"এই পোল শাসনের দশ বৎসর পরে বিশ্বম্ভর বাবু স্বগ্রামের ৪ ক্রোশ দক্ষিণে হুর্মো নামে একটি গ্রাম ক্রয় করেন। ইহাতে কেবল মুসলমানের বাস—এক ঘরও হিন্দু নাই। প্রায় ৭০০ ঘর মুসলমান প্রতিজ্ঞা করিয়া বিশ্বম্ভর বাবুকে দুই বৎসরের খাজনা দিল না; এই গ্রাম বর্ষাকালে একবারে বন্যায় ডুবিয়া থাকে; লোকের বাস্তু ভদ্রাসন ১২।১৪ হস্ত উচ্চ দ্বীপের উপর। বিশ্বম্ভর বাবু এই বর্ষাকালের সুযোগ পাইয়া একদিন রাত্রিতে ঐ গ্রাম আক্রমণ করিলেন। প্রায় ৪০০।৫০০ লোক, সকলের হাতেই বন্দুক। সেই নিশাকালে নিস্তব্ধ সময়ে বিশ্বম্ভর বাবুর লোকেরা অগণ্য নৌকার উপর উঠিয়া মুহুর্মুহু বন্দুকের আওয়াজ করিতে লাগিল। বন্দুকে গুলি ছিল না। চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত, ভীত, কম্পিত হইতে লাগিল; মুসলমানদের আগ্নেয় অস্ত্র ছিল না, তাহারা ভয়ে প্রাতঃকালে বিশ্বম্ভর বাবুকে আত্মসমর্পণ করিল। সেই অবধি সেই গ্রামে আর কোন গোলযোগ রহিল না।

"বিশ্বম্ভর বাবুর যেমন দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল, প্রজাবৃন্দের উপর তেমনি স্নেহ ও দয়া ছিল। অধিক কথা না লিখিয়া সংক্ষেপে আমরা এইমাত্র বলি, তাঁহার খুল্লতাত রামসুন্দর বাবু জমিদারী ও বিষয়-কার্য যে রীতি ও নিয়মে চালাইতেন, তিনিও সেই সেইরূপে ঐ সকল চালাইতেন।

"বিশ্বম্ভর বাবুর আর একটি প্রধান গুণ ছিল,—বাটির প্রত্যেক নরনারী কে কি খাইল, না খাইল, এটি আগে দেখিতেন, শুধু তাই নয়,—

গ্রামের কেহ নিরন্ন থাকিত না, তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া ইতর, ভদ্র সকল লোকের সংবাদ রাখিতেন, গরিব মজুরের ঘরে অন্ন না থাকিলে, সে যদি সমর্থ হইত, তাহাকে কাজে নিযুক্ত রাখিয়া পয়সা দিতেন; আর ভগ্ন, রুগ্ন অসমর্থকে তিনি বিনা কাজে পয়সা দিতেন। অনেক ভদ্র ঘরের বিধবা রমণীকে তিনি লুকাইয়া সাহায্য করিতেন; তাঁহার গুপ্তদান মাসে অনেক ছিল। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, তাঁহার সময়ে ৩৲ তিন টাকায় একমাস চলিত। তাঁহার গুপ্তদানের কথা কেহ কস্মিন্ কালে জানিতে পারে নাই। স্ব-বর্ণের প্রতি তাঁহার বড়ই অনুরাগ ছিল।

"একদিকে যেমন বিষয়-কার্য-জমিদারীতে তাঁহার সবিশেষ নিপুণতা ছিল, অপরদিকে বিদ্যাচর্চাতেও তাঁহার তেমনই কৃতিত্ব ছিল। তাঁহার বিদ্যালোচনার ফল, তাঁহার রচিত গ্রন্থনিচয়। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রবন্ধ লিখিতেন। প্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় বিশ্বম্ভর বাবুর সকল দিকে গুণপনা দেখিয়া তাঁহাকে প্রধান বন্ধুরূপে গণ্য করেন। কোন সময়ে ইনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া, উক্ত ঠাকুর বাবুকে এক নিদারুণ বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন। সেই অবধি ঠাকুর মহাশয় ইঁহাকে নিজের অকৃত্রিম হিতৈষী বলিয়া স্বীকার করেন। ইহাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় একবার বিশ্বম্ভর বাবুর যথাসর্বস্ব রক্ষা করিয়াছিলেন; এজন্য এখনও ইঁহার বংশ ঠাকুর-গোষ্ঠীর নিকট বিশেষ ঋণী; সে উপকার চিরকালের জন্য অপরিশোধনীয়। বিশ্বম্ভরের কৃতজ্ঞ বংশধরেরা এখনও শতমুখে এ উপকার স্বীকার করেন এবং তাঁহারা যে যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ঋণপাশে আবদ্ধ থাকিবেন, তাহাও প্রকাশ করেন।

"এ পর্যন্ত সেনহাটের পাইন বংশ—মর্যাদার, গৌরবের, প্রতাপের উচ্চশীর্ষে অবস্থান করিত, কোন অংশে, কোন পক্ষে তাঁহারা হীন ছিলেন না; অগাধ ধনসম্পত্তি, অসংখ্য দাসদাসী, অনুচরবৃন্দ, মান, যশঃ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, বিদ্যাচর্চা, ধর্মানুষ্ঠান, কিছুতেই তাঁহারা কম ছিলেন না। বংশের পুরুষেরা ও স্ত্রীগণ, এক অচ্ছেদ্য একতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ। কেহ কাহারও দোষ ধরে না, কেহ কাহারও নিন্দা করে না; কেহ কাহারও প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করে

না; কেহ কাহারও চক্ষুঃশূল নয়। কিন্তু এইবার সে একতাহার ছিঁড়িল—অমৃতে গরলরাশি উঠিল।

"উক্ত পোল-শাসনের পর বিশ্বম্ভর কলিকাতায় আসিলেন। তিনি এতদ্ব্যাপারে ৫১০০০৲ একান্ন হাজার টাকা খরচ করিয়াছেন শুনিয়া চিন্তামণি তাঁহাকে অত্যন্ত ভৎর্সনা করিলেন; অপর লোকের কাছেও তাঁহাকে অপদস্থ করিলেন। বিশ্বম্ভরের গম্ভীর প্রকৃতি চঞ্চল হইল। তিনি বলিলেন—'পোল আমার অংশে পড়ুক, একান্ন হাজার টাকা আমার অংশে খরচ পড়ুক।' এইবার বিষয় ভাগ হইতে চলিল—অটল প্রতিজ্ঞা এইবার টলিল।

"চিন্তামণি সেনহাটে গেলেন। বিশ্বম্ভর ও রাধামোহন দত্ত বিষয়কর্ম্মের ভার লইলেন। এই রাধামোহন তড়া-আঁটপুর-নিবাসী। ইনি পানিদের একজন অংশীদার; বিষয়-কার্য ইনি সর্বাপেক্ষা ভাল বুঝিতেন। বিশ্বম্ভর বাবু পারিবারিক ভাণ্ডারের জন্য আট্‌কিন্‌সন্ কোম্পানীর কোন দালালকে তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা দেন। দালাল টাকা পাইয়াই চম্পট দেয়। তখন পথঘাট সুগম ছিল না; সুতরাং তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না। সেই সময় আর এক দুর্ঘটনা ঘটিল। বিশ্বম্ভর বাবু একটি জাহাজের মাল না দেখিয়াই, রেশমের দরুণ দুই লক্ষ টাকা হুণ্ডী পরিশোধ করেন, পরে সেই জাহাজে উপযুক্ত মাল পাওয়া গেল না! এক সপ্তাহের ভিতর প্রায় ৫৷৷০ সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইল। জনরব উঠিল—'পানিদের কুঠী ফেল হইবে' অমনই হু হু করিয়া টাকার জন্য মহাজনেরা আসিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর ও রাধামোহন যুক্তি করিলেন, টাকা দেওয়া বন্ধ করা হইবে না। তাহা হইলে বাজারে মিথ্যা জনরব সত্য হইবে। চারি দিনে ২১ একুশ লক্ষ টাকা দেওয়া হইলেও তহবিলে এক লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা মজুত। চিন্তামণি পাল্কী করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। বিশ্বম্ভর টাকা শোধ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি তাঁহার উপর মহা ক্রুদ্ধ হইলেন; মুখে যা আসিল, বলিলেন। বিশ্বম্ভর বাবু সৎকার্য করিয়াও অবমানিত হইলেন। দুই ভায়ে আর মিল হইল না।

* * * *

"পাঁচ বৎসরে ইঁহাদের পরস্পরের মীমাংসা হয়; এই পাঁচ বৎসরের ঘটনা আদ্যোপান্ত লিখিতে গেলে প্রায় এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ হয়। বিশ্বম্ভর বাবু রাজোপম প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া, তাহার ৫০০ পাঁচ শত হস্ত উত্তরে ১২২৯ সালে নূতন ভদ্রাসন নির্মাণ করিলেন। ঐ ভদ্রাসন পঁয়ত্রিশ বিঘা জায়গায় চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর ঘেরা; প্রাচীরের নিম্ন দিয়া গড়কাটা। ঐ ৩৫/০ বিঘার ভিতর দুইটি বড় বড় পুষ্করিণী; তিনটি বাগান; পাঁচ মহলা বাড়ী, ঠাকুর বাড়ী, কুঠীবাড়ী, বৈঠকখানা বাড়ী ইত্যাদি। বিশ্বম্ভর বাবুর প্রকাণ্ড নূতন বাড়ী দেখিয়া চিন্তামণি হিংসায় জর্জরিত হইলেন।

"বিশ্বম্ভর পানি পরম ধার্মিক ছিলেন; সে পরিচয় আর দিতে হইবে না। তাঁহার গুরুদেব ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায় সর্বদা তাঁহার সন্নিধানে অবস্থিতি করিতেন। বিশ্বম্ভর নানা বিষয়ের নানা সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন'। তিনি পরম বৈষ্ণব হইয়াও কালীপদ ধ্যান করিতেন। তাঁহার রচিত 'কন্দর্পকৌমুদী' গ্রন্থে তাঁহার কালী-ভক্তির পরিচয় পাই।"

বিশ্বম্ভর বাবুর রচনায় বাংলার ও অন্যান্য স্থানের দেবদেবীর পরিচয়

"জগন্নাথ-মঙ্গল" গ্রন্থের "গুর্বাদি বন্দনা" অধ্যায়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি পাঠে বাংলা দেশের ও বাংলার বাহিরের বিশিষ্ট দেবমন্দির ও তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুপ্রাচীন ভক্ত গ্রন্থকারদিগের ন্যায় কবি বিশ্বম্ভরও গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁহার পরিচিত ও বিভিন্ন স্থানের বিগ্রহগুলির বন্দনা করিয়াছেন,—

"কুলের দেবতা বন্দ রাধা দামোদর।
শ্রীরাধা মাধব আর মম প্রাণেশ্বর॥

* * *

শ্রীকৃষ্ণনগরে বন্দ প্রভু গোপীনাথ।
বলরাম অভিরাম মালিনীর সাথ॥
গৌরাঙ্গপুরেতে বন্দ গৌরাঙ্গ-চরণ।
বালসি গ্রামেতে বন্দ লক্ষ্মীনারায়ণ॥

অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ বন্দ সাবধানে।
কলসাতে বন্দ গোপীনাথের চরণে॥
বন্দিব শ্রীগোপীনাথ বড় বেলুনেতে।
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বন্দ রেমুণাতে॥
বগড়ির কৃষ্ণরায়ে করিনু প্রণাম।
অঙ্গেতে চুয়ায় ঘর্ম যাঁর অবিরাম॥
বিষ্ণুপুরে বন্দিলাম মদনমোহন।
এবে গঙ্গাতীরে যাঁর করহ দর্শন॥
চন্দ্রকোণা গ্রামে বন্দ প্রভু রঘুনাথ।
পুষ্যাযাত্রা হয় যাঁর ভুবনে বিখ্যাত॥
খড়দহে বন্দিলাম শ্রীশ্যামসুন্দরে।
মদনগোপাল-পদ বন্দ শান্তিপুরে॥
কাঁচড়াপাড়ায় বন্দ প্রভু কৃষ্ণরায়।
গৌরাঙ্গ-নিতাই তবে বন্দ অম্বিকায়॥
বোড়োরের বলরাম বন্দিনু সাদরে।
শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ তড়া আঁটপুরে॥
শ্রীসাক্ষীগোপাল বন্দ সত্যবাদী ভূমে।
বরাহ নৃসিংহ বন্দ জাজপুর গ্রামে॥
বৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দ গোপীনাথ।
মদনমোহন পদে করি প্রণিপাত॥
অযোধ্যায় বন্দ তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ভরত শত্রুঘ্ন আদি করিয়ে বন্দন॥
প্রয়াগে বন্দিব প্রভু মাধব-চরণে।
গদাধর পাদপদ্ম বন্দ গয়াভূমে॥

*　　*　　*

*　　*　　*

খানাকুলে বন্দিব স্বয়ম্ভু ঘণ্টেশ্বর।
তারকেশ্বর-পাদপদ্মে প্রণতি বিস্তর।

ধর্মঠাকুরের মন্দির—সেনহাট
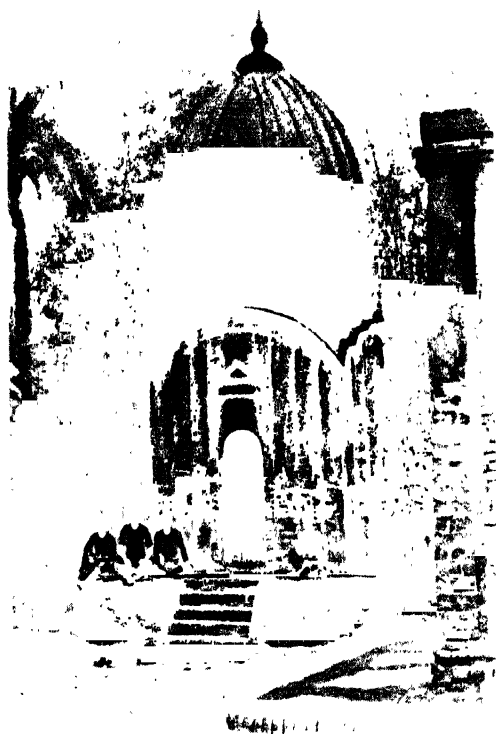
বৈদ্যনাথ-চরণে করিয়া নমস্কারে।
কায়িত্তিতে বাণেশ্বর বন্দিনু সাদরে॥
শ্রীনরমাধব বন্দ মাণিকারা গ্রামে।
সেতুবন্ধ রামেশ্বরে বন্দিনু যতনে॥
লক্ষ্মণপুরেতে বন্দ শ্রীলক্ষ্মণেশ্বর।
ডোঙ্গল গ্রামেতে বন্দ শ্রীহটনাগর॥
কাশীতে বন্দিব প্রভু দেব বিশ্বেশ্বর।
অন্নপূর্ণা সহিত বিহরে নিরন্তর॥
সেনহাট গ্রামে বন্দ দেবী সিদ্ধেশ্বরী।
রাজহাটে বিশালাক্ষী পদে নমস্করি॥
জেড়ুর গ্রামেতে বন্দ দেবী ভগবতী।
বাঙলায় শারদার চরণে প্রণতি॥
কালীঘাটে কালী বন্দ ব্রহ্ম সনাতনী।
ত্রৈলোক্যতারিণী মহাকালের মোহিনী॥
তমলুকে বর্গভীমা, কামরূপে কামাক্ষ্যা।
বরদার বিশালাক্ষী মোরে কর রক্ষা॥
বর্ধমানে বন্দ সর্বমঙ্গলা-চরণে।
আমতায় মেলাই বন্দিব সাবধানে॥
বন্দিনু শীতলা ধর্ম মনসা চরণে।
নির্বিঘ্ন হইবে সবে পুস্তক রচনে॥"

সেনহাটের বিগ্রহের বর্ণনা

উদ্ধৃতাংশের ৫১ পংক্তিতে লিখিত "ধর্ম" ঠাকুরের প্রাচীন মন্দিরটি এখনও সুসংস্কৃত অবস্থায় সেনহাট গ্রামে বিদ্যমান রহিয়াছে। মন্দিরের মধ্যে ধাতুনির্মিত ধর্মমূর্তি বিরাজিত। বহুকাল হইতে হাড়িজাতি কর্তৃক এই ধর্ম ঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে। চৈত্রমাসে চড়কের সময় খুব ধুমধাম হয় এবং একটি মেলা বসে। বিশ্বম্ভর বাবুর ঠাকুরবাড়ী হইতে এই মন্দির ৮।১০ মিনিটের পথ; ইহা সেনহাটের হাটতলায় অবস্থিত।

সেনহাটের শ্রীশ্রী৺ সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দিরটিও খুব প্রাচীন। গড়গড়ি-বংশীয় জনৈক সিদ্ধ তান্ত্রিক কর্তৃক এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। মূর্তিটি মৃত্তিকা-নির্মিত কালীমূর্তি। দ্বাদশ বৎসর অন্তর এই বিগ্রহের নবকলেবর হয়। বিগ্রহের মুকুট ও সাজ সমস্তই মৃত্তিকায় নির্মিত। সাধারণ কালী মূর্তি হইতে এই মূর্তিটির কিছু বিশেষত্ব আছে। এই মূর্তির দুই কর্ণ হইতে দুইটি অসুর নির্গত হইতেছে। বিশ্বম্ভর বাবুর পৌত্র (যশোদাকুমার পাইনের জ্যেষ্ঠ পুত্র) রসিকলাল পাইন মহাশয়ের ব্যয়ানুকূল্যে এই মন্দির দ্বিতীয়বার সুসংস্কৃত হয়।

নাটকাকারে গ্রথিত 'জগন্নাথমঙ্গলে'র অভিনয়

সেনহাট গ্রামের আচার্যপাড়া সে সময় সঙ্গীত চর্চায় দ্বিতীয় বিষ্ণুপুর স্বরূপ ছিল। বিশ্বম্ভর বাবু যখন জগন্নাথমঙ্গলকে নাটকাকারে গ্রথিত করিয়া অভিনয়ার্থ দল গঠন করেন, তৎকালে এই আচার্যপাড়ার বহু আচার্যবংশীয় ব্যক্তি বিশ্বম্ভর বাবুর অভিনয়-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বিশ্বম্ভর বাবু নিজে সুগায়ক ছিলেন। নৃত্য-বিদ্যাতেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং তাঁহার সহিত আচার্যগণের মিলনে মণিকাঞ্চন যোগ হয়। সেনহাটে বহুবার নাটকাকারে গ্রথিত জগন্নাথমঙ্গলের অভিনয় হইয়াছিল। কলিকাতায় প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের পাথুরিয়াঘাটার বাড়ীতেও একবার ইহার অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে বিশ্বম্ভর বাবু চণ্ডালের অংশ গ্রহণ করিয়া এমনভাবে নৃত্যগীত করেন যে, প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় মুগ্ধ হইয়া বিশ্বম্ভর বাবুর সহিত আলাপ করেন এবং তাঁহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন।

জগন্নাথমঙ্গলের সুখ্যাতি তখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। হিন্দুগণের ত কথাই নাই, সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণও সাগ্রহে এই অভিনয় দর্শন করিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব-প্রাসাদে জগন্নাথমঙ্গল অভিনয়ের নিমন্ত্রণ হয়, কিন্তু এই অভিনয়ই শেষ অভিনয়। ইহার পর আর কোথাও জগন্নাথমঙ্গলের অভিনয় হয় নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, এই নাটকে যিনি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের অংশ অভিনয় করিতেন, তাঁহাকে লইয়া কোন গোলযোগ হওয়ায় অভিনয় বন্ধ

হইয়া যায়। এই নাটকাকারে গ্রথিত জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই।

বাংলা সঙ্গীত-রচনায় বিশ্বম্ভর পানি

জগন্নাথমঙ্গলের কোন কোন গান এখনও সেনহাট অঞ্চলের প্রবীণ লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পাইন মহাশয়ের নিকট হইতে জগন্নাথমঙ্গল নাটকের নিম্নলিখিত গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছে ;—

(১)

দেখরে নীলমাধবে।
নীলগিরি পর, কিবা মনোহর
বিহরতি রমা সঙ্গে।
কি নীলবদন শারদশশী,
ঝরিত অমৃত ঈষৎ হাসি,
তৃষিত চকোরী কমলার আঁখি
পিবতি পীযূষ রঙ্গে।
কিবা নীলমণি কনকে জড়িত,
অনিমিখে দোঁহে দোঁহারে হেরে,
আনন্দের অবধি অঙ্গে না ধরে—
ভাবিয়ে অন্তরে দাস বিশ্বম্ভরে
ডুবিল সুখ তরঙ্গে।

(২)

(রাগিণী—টোরি, তাল—আড়া)

কি আর ভাবনা মন নীলাচলে চল রে।
নীরদ হরি মূরতি, হেরিবে হরষে মাতি
প্রাণ নয়ন তব শীতল হবে রে॥

*   *   *   *

রূপ আনন্দধাম,   ত্রিজগতে অনুপাম

লাবণ্য * * *

দীন (বিশ্বম্ভরে) অকিঞ্চনে কয়,

ত্বরিতে কর বিজয়

সে আনন্দ-জলধি-নীরে ডুবিবে রে ॥

(৩)

(রাগিণী—কেদারা, তাল—আড়া)

মন, ত্যজ অনুতাপ * প্রতাপ মন-রথ রথে

চল লীলা-জলধিকূলে।

সে পদ সারথি করে চল সে * * *

প্রাণ-তুরঙ্গ বাহন কর বলে॥

সুদৃঢ় করিয়া আশা-পাশ বাঁধ তায়,

ভুলনা রে * * কাহারও কথায়,

সে লীলা-রস-অর্ণবে, সারথি লইয়া যাবে,

ডুবিলে সে তরঙ্গে * * * (বিশ্বম্ভর) অকিঞ্চন বলে

(৪)

(রাগিণী—সোহিনী, তাল—মধ্যমান)

কি প্রকাশিত জলনিধি-তীরে।

নবঘন নামিল কি নীলগিরি-শিরে॥

লীলামৃত বরিষয়ে জগত উপরে,

* * তাপিতের তাপত্রয় হরে ;

কহে দীন বিশ্বম্ভরে * * *

* * * ভাবের তরঙ্গ ॥*

---

* উপরিলিখিত গানগুলির তারকা-চিহ্নিত অংশ কীটদষ্ট।

(৫)

(রাগিণী—বেহাগ, তাল—আড়া)

অপরূপ নীলগিরি শিখরে বিহরে।
ললিত চিকণ রুচি ললনা-নিকরে॥
নাচে পুরত দেব কামিনী কত শত,
মোহে মনমথ মন নয়নের শরে॥
বিধু্ বৃষবাহন শেষ বিরিঞ্চি হেরত রঙ্গে,
দরশন রসে মজি অকিঞ্চন (বিশ্বম্ভর) ঝুরে।

(৬)

(রাগিণী—সোহিনী, তাল—আড়া)

করিতে নিস্তার
দীন দুরজনে জগন্নাথ বিনে
ত্রিভুবনে কেবা আছে আর।
সাধন ভজন বিহীন (জনে) হতে ভবে পার।
নহি নহি কোন স্থ্ এমন উপায় সার।
বিতরি নির্মাল্য, কৈবল্য দেয় জগজনে,
অগতি জন আশ্বসে, ভুজযুগ পসারণে,
বিশ্বম্ভর দাসে, অতি আশে করে নিবেদন,
সে রূপ নয়ন ভরি হেরিব কবে আর॥

বৈরাগ্য-সঙ্গীত

তিনি যেমন সুকবি ছিলেন, সঙ্গীত রচনায়ও তাঁহার তেমনি দক্ষতা ছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি রচনা করেন—

কি কর—উঠরে মন, ঘুমায়োনা আর।
কালের দামামা বাজে নাহিক নিস্তার॥
কালের বাহিনী এল, লুকাবে ত উঠে চল,
হরিপুরে নাহিক কালের অধিকার।

সংগ্রাম করিবে যদি, শুনহ তাহার বিধি,
গুরুপদরজ কর কবচেরই সার।
ধনু তুলসীর মাল, হরিনাম মন্ত্রজাল,
নিক্ষেপ করিয়ে সদা বল মার্ মার্!

বিশ্বম্ভর বাবুর শ্যামা-সঙ্গীত

বিশ্বম্ভর বাবুর ধর্ম্মভাব খুব উদার ছিল, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী কোনদিনই তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই, তিনি শ্যাম শ্যামা উভয়েরই সেবা ও পূজায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, উভয়েরই উদ্দেশ্যে সঙ্গীত এবং কবিতা রচনা করিয়া ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার শ্যামা-বিষয়ক গান নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

(১)

(রাগিণী—মুলতান, তাল—কয়ালি)

তারা কি হইবে গতি গতিবিহীনে।
ত্রিগুণধারিণি, ত্রিগুণপ্রসবিনী, ত্বং হি ত্রিতাপহারিণি,
তারিতে হবে এ দীনে॥
জঠর-যন্ত্রণাকালে, ডেকেছিলাম "মা" "মা" ব'লে,
এখন ভুলালে ভুলালে, যোগমায়া-ছলে,
অজ্ঞানেতে কণ্ঠে নিলে সুখে যুবাকালে,
দিন গেল অকারণে।
"শিশৌ নাসীদ্‌বাক্যং জননি তব মন্ত্রং ন জপিতং
কিশোরে বিদ্যায়াং বিষমবিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ!
ইদানীঞ্চেদ্ ভীতো মহিষগলঘণ্টাঘনরবা-
ন্নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণং॥"
রিপুবশে তব মন্ত্র, না জপিলাম পুত্র ভ্রান্ত,
এ ভয়ে নির্ভয় কর, বিশ্বম্ভরে রাখি চরণে॥

(২)

(রাগিণী—টোড়ি, তাল—কাওয়ালি)

তারিণি, আমারে কবে তারিবে আর।
রহিলাম কলুষ জড়িত হয়ে, কে তারে তারিণী বিনে
তারা মোরে কর মা নিস্তার॥
ওমা জানি নাই শুনি নাই তারা নাম, শিব নাম,
শুধু রহিলাম ভুলিয়ে, বিষয়ে আবৃত হ'য়ে,
ব্রহ্মময়ী না ভজিয়ে, সদা ফিরি আমোদে মাতিয়ে
ওমা সংসার অসার—সার, দুর্গা যদি কর পার।
(উপায় না দেখি মা তোমা বিনে)
শুন বিশ্বম্ভরের বাণী, তুমি যা ইচ্ছা কর জননি,
কিন্তু এ দীনের কি হবে বিচার॥

১নং গানখানির অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃত চারিটি পংক্তি "লম্বোদরজননী স্তব" হইতে গৃহীত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত গানখানি ষট্‌চক্রভেদের গান।

(রাগিণী—টোড়ি, তাল—মধ্যমা)

মূলাধারে কুলদ্বারে সার্ধ ত্রিবলয়াকারা।
কুলকুণ্ডলিনী ত্বং হি মূলাশক্তিঃ পরাৎপরা।
অন্তর্যোগে মহাযোগে যে তোমারে সদা সেবে,
পরম ব্রহ্মধাম তারে দাও তুমি ভবদারা॥
সুষুম্নার মধ্যে চিত্রা ষড়চক্র পথে গাঁথা।
পঞ্চাশৎ বর্ণ তার হয় দলাকার,
তার ঊর্ধ্বে সহস্রারে, কমল কর্ণিকান্তরে,
বিরাজে পরম শিব পদে বহে সুধাধারা॥
চতুর্বিংশ তত্ত্ব সনে, জীবের সঙ্গ লয়ে ক্রমে,
কুলপথ চক্র ভেদি গিয়া নিজ পুরে॥
বিহর পরম রঙ্গে, সে পরম ব্রহ্ম সঙ্গে
সে আনন্দ অনুভব বিশ্বম্ভরে দেহ তারা॥

তাঁহার রচিত অন্য গানখানি নিম্নরূপ ;—

মন, চিন্তয় বিরলে নবীন নীরদ-রুচি শ্যাম
দ্বিভুজ মুরলীধর চারু পীতাম্বর অঙ্গে,
শিরে শিখিচূড়া তাহে গুঞ্জাদাম,
বামে শোভিত রমণী-শিরোমণি,
জলদে জড়িত যেন সৌদামিনী
করেতে কমল নীল, দুকূল পরিহিত রঙ্গে।
অপরূপ রূপ দোঁহে রসধাম ॥

এ গানখানিতে বিশ্বম্ভর বাবুর নাম-সংযুক্ত কোনরূপ ভণিতা নাই।

মনঃশিক্ষামূলক সঙ্গীত

নিম্নের ছয়খানি গান মনঃশিক্ষামূলক ঃ—

(১)

(রাগিণী—ভৈরবী, তাল—একতালা)

মন রে, এ অসার প্যায়া তুমি সার ভুলিলে।
বিপুল ভব-জলধি-জলে ডুবিলে ॥
অজ্ঞান-তিমিরে, হায় জ্ঞান হারাইলে।
সতত অসত পথে রত হইলে ॥
এখন উপায় যদি শুন রে আমার।
তবু পার তরিতে এ জলধি অপার ॥
সে নাম তরণী কর, শ্রীগুরু কাণ্ডরী,
কহে অকিঞ্চনে, ভাব হবে ভাবিলে ॥

(২)

(রাগিণী—ছায়ানট, তাল—আড়া)

মন, তুমি কার বচনে পড়ে * * ফেরে।
হারালে পরম লাভ রে ॥
অ-ধনে ভাবিয়া ধন, সার ধনে অযতন,
অবোধ তোমার সম ভবে নাহি রে ॥

না জানি ভকতি মর্ম, যত কর কর্ম ধর্ম
সকলি বৃথায় ভ্রম রে ॥
একা মাত্র হরি সার, * * কেহ নাহি আর,
কহে বিশ্বম্ভর সেই পদ ভাব রে ॥

(৩)

(রাগিণী—*, তাল—ঝাঁপতাল)

মন রে, মনের মত না হ'লে আমার।
হইল জপের অন্ত না ভাবিলে সার ॥
ভুলিয়া পরম তত্ত্ব, হয়ে বিষয়েতে মত্ত,
কেবল জীবন বর্ত তুমি দুরাচার ॥
ত্যজি সাধু-সঙ্গ যত, কুপথে হইয়া রত,
হইলে সুবোধে হ'ত, কেন রে অসার ॥
বিশ্বম্ভর বারে বারে, * * * *
মন রে সুপথে তুমি চল এইবার ॥

(৪)

(রাগিণী—সিন্ধু, তাল—মধ্যমানের ঠেকা)

মন, সকল ত্যজিয়া তুমি, হরিপদ কর সার।
ভবার্ণব তরিতে (ইহা বিনা) গতি নাহি আর ॥
ভাবিয়া দেখরে মন সকলি অসার।
জায়া, সুত, সহোদর বন্ধু, কেবা কার ॥
গুরুদত্ত মহামন্ত্র কর রে সাধন।
সাধু সঙ্গে রহ রঙ্গে করিয়া যতন ॥
নাম নৌকা কর, গুরু কাণ্ডারী তাহার,
কহে বিশ্বম্ভর রে উপায় নাই আর ॥

(৫)

(রাগিণী—আলিয়া, তাল—কয়ালি)

সব ত্যজিয়া হরি ভজ মন।
ভ্রমে ভুল না কাহারও কথায়, ভ্রমে ভুল না
হরি ভজ মন ॥

দু'টি নয়ন মুদ্রিত করে,
হৃদি পঞ্চ কোষাগারে,
হের দোঁহা রূপ নব নীরদ চপলা,
দেখে জুড়াও নয়ন !
সে লীলা-সিন্ধুর রে, তরঙ্গ অপার,
রূপাদি পাঁচের সনে, তাহে হও নিমগনে,
ভাবিলে সে ভাব লাভ হইবে,
মন, ভয় কি পাইবে সে ধন ॥

(৬)

(রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—মধ্যমান্)

গুরুপদ কমল শিরসি সরোজে ।
দিবানিশি ভজ না রে,
পড়ো না ভব-তরঙ্গ মাঝে ॥
আপন * * * ভ্রমে * ।
ভাব দেখি কে তব, তুমি বা বট কার,
ভ্রমণ কর না রে কুসঙ্গ-কুকাজে ॥
সে পদ কমল-মধু প—ত্যজিয়া,
কি সুখে বিষয়-বিষে রহিলে মজিয়া ।
বিশ্বম্ভর কহে মন দুরাচার,
আপনার হিত না কর বিচার ।
গ্রাসিবে তোমারে কাল-ভুজঙ্গ-রাজে ॥*

প্রার্থনা সঙ্গীত

বিশ্বম্ভর বাবুর নিম্নলিখিত গান কয়খানি প্রার্থনামূলক ।

(১)

(রাগিণী—খট, তাল—ঝাঁপতাল)

কর গো * * করুণা করুণাময়ী ।
দেহি তব পদে শরণ, শমনভবনজয়ী ॥

* গানগুলির তারকা-চিহ্নিত অংশ কীটদষ্ট ।

ত্বং হি তারিণী, বিপদ-বীজ-নাশিনী,
সুপথ সুখদায়িনী, নাহি তোমা বই ॥
এ ভব-জল (-ধি) দুস্তরে, পতিত এ বিশ্বম্ভরে,
* * * * *
ও পদ-তরণী মেলি, কিঙ্করে লহ মা তুলি,
তবে ত তারিণী বলি, শুনিয়াছি নাম যেই ॥

(২)

(রাগিণী—টোড়ি, তাল—কাওয়ালি)

আমারে কবে আর, চাহিবে করুণ নয়ন-কোণে,
পতিততারণ হরি, তোমা বিনে কে করে নিস্তার।
হ'ল না হ'ল না সাধন-ভজন কিছু,
রহিলাম বিষয়ে মজিয়ে,
মায়ায় মোহিত হ'য়ে, তব পদ পাশরিয়ে,
দিন গেল বৃথা কাজে বহিয়ে।
ত্রিতাপে তাপিত আমি,
যা কর যা কর তুমি,
আর কেহ নাহি তোমা বিনে।
দীন (বিশ্বম্ভরে) অকিঞ্চনে যদি না তারিবে,
দয়ানিধি এ বিপদে কে করে উদ্ধার ॥

(৩)

(রাগিণী—আড়ানা বাহার, তাল—সওয়ারি)

কোরো না কোরো না হরি, আর বঞ্চন।
হ'য়ে আমি জ্ঞানহারা, তোমার চরণ-ধন,
তাহে না করিলাম মন ॥
হে নাথ, আহে আহে ঘুচাও আমার ভ্রম,
দিন হারাইয়ে বৃথা মধুসূদন।
দীন বিশ্বম্ভর অতি কাতরে ভাবে
ও চরণ চরম ধন ॥

(৪)

(রাগিণী—বাহার, তাল—তেওট)

বৃন্দাবন-চন্দ্র বিহরতি, ব্রজযুত-সংহতি
তপন-তনয়া-তীরে।
সারিশুকগণ গাওয়ে মনোরম
পিক কুহু কুহু বোলত রে।
বিকশিত কুসুমকলি, মধুগন্ধিত ঝঙ্কৃত
অলি মকরন্দ লোভে।
বিশ্বম্ভর মন সেরূপ দরশন
আশ করত অতি সত্বরে॥

দুইখানি গানের পর্যায়ক্রমে মাত্র এক ও দুই পংক্তি করিয়া পাওয়া গিয়াছে, সে কয় পংক্তি নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

(১)

(রাগিণী—মুলতান, তাল—কাওয়ালী)

অভয়া অভয় পদ ভাবনা রে আরে মন।
তুমি, সে পদ স্মরণে—
* * * *

(২)

(রাগিণী—বাগেশ্রী, তাল—একতালা)

তার তার ও মা জগত-তারিণী তারা।
শুভকরা * * *

গ্রন্থ-রচনায় উপকরণ-সংগ্রহ

ভক্তকবি বিশ্বম্ভর পানি-রচিত "জগন্নাথমঙ্গল" শ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য-বিষয়ক গ্রন্থ হইলেও, ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনীও বিবৃত হইয়াছে। কেবল সংস্কৃত উৎকলখণ্ড গ্রন্থ অবলম্বনে এই পুস্তক রচিত হয় নাই ; শ্রীমদ্ভাগবত, পদ্মপুরাণ এবং অন্যান্য পুরাণের সার সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থখানিকে সুসজ্জিত করা হইয়াছে। সুনিপুণ মাল্যকরের ন্যায় ভক্তিমান্

গ্রন্থকার বিবিধ ভক্তি ও লীলামূলক উপাখ্যান সাজাইয়া ভক্তজনমনোহারী এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন।

উপনিষৎ বলেন, দুই প্রকার বিদ্যা মানবের শিক্ষণীয়,—একটি পরা এবং অপরটি অপরা ;—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে, পরা চৈবাপরা চ।"

মুণ্ডক, ১।৪

অপরা বিদ্যা তাহাই, যাহা সংসারের সর্ববিধ প্রয়োজনে মানুষকে সাহায্য করে, এক কথায় যাহাকে অর্থকরী বিদ্যা বলা যায় বা যে বিদ্যার প্রয়োজন এই জগৎ বা স্বর্গলোক পর্যন্ত গিয়াই পর্যবসিত হয়। আর পরা বিদ্যা—

"যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

মুণ্ডক, ১।৫

অপরা বিদ্যার অনুশীলনে মানুষ মৃত্যু বা পরিণামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। অপরা বিদ্যার অধিকার বড় জোর স্বর্গলোক পর্যন্ত ; কিন্তু স্বর্গে গিয়াও মানুষ পরিণামের হাত হইতে অব্যাহতি পায় না, শাশ্বত আত্মার সন্ধান লাভ করিতে পারে না। অথচ পরা বিদ্যার অনুশীলনে মানব সৃষ্টি, স্থিতি, লয় বা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই ত্রিবিধ অবস্থার অতীত শাশ্বত পুরুষ আত্মার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অক্ষর অর্থাৎ পরিণামহীন অবস্থা লাভ করিতে পারে। এই জন্য বেদের অব্যবহিত পরবর্তী হিন্দুগণের যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রে আচার্যগণ অপরা বিদ্যার সহিত মূখ্যভাবে পরাবিদ্যার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আলোচ্য "জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থ প্রধানত যে "উৎকলখণ্ড"কে অবলম্বন করিয়া বিরচিত, সেই উৎকলখণ্ড গ্রন্থে মুখ্যভাবে এই বিদ্যাই প্রচারিত হইয়াছে ঃ—

"যয়া বেত্তি জগন্নাথং সা বিদ্যা পরিকীর্তিতা।"

দশমোঽধ্যায়ঃ, ৯১শ শ্লোকঃ

অর্থাৎ যে বিদ্যাবলে জগন্নাথকে জানিতে পারা যায়, তাহাই বিদ্যা বলিয়া কথিত হয়।

উৎকলখণ্ড স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত একটি খণ্ড। এই উৎকলখণ্ড গ্রন্থেই কাক-চতুর্ভুজের বৃত্তান্ত, মার্কণ্ডেয় হ্রদের কথা, পুরী-পরিমাণ ও সীমা-নির্দেশ,

পুণ্ডরীক ও অম্বরীষের উপাখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বৃত্তান্ত, ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্রীশ্রী৺ক্ষেত্রমাহাত্ম্য-শ্রবণ, ইন্দ্রদ্যুম্নের উৎকল-যাত্রা, শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তমের অন্তর্ধান, তৎশ্রবণে ইন্দ্রদ্যুম্নের পরিতাপ ও নারদের কৃত সান্ত্বনা, ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তমের পুনরাবির্ভাব-বিষয়ে দৈববাণী, ইন্দ্রদ্যুম্নের নৃসিংহমূর্তি স্থাপনা, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ, অক্ষয় বটে জগন্নাথদেবের দারুমূর্তিতে আবির্ভাব, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-নির্মাণ, রথপ্রতিষ্ঠা, দারুমূর্তি-প্রতিষ্ঠা, দারুময় শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের নিকট ইন্দ্রদ্যুম্নের বরলাভ, স্নানযাত্রাবিধি, পঞ্চতীর্থ-বিধি, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, দক্ষিণায়ন-কৃত্য, উত্তরায়ণ-কৃত্য, সংবৎসর-ব্রত, দমনভঞ্জিকাদি যাত্রা, অর্ধোদয়-যোগ-মহাত্ম্য-কীর্তন, ভগবানের বিবিধ মূর্তি-উপাসনার ফল-কীর্তন প্রভৃতি উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। উৎকলখণ্ড গ্রন্থখানি পাঠ করিলে ভক্ত পাঠক পুরীধামের বহু তথ্য জানিতে পারিবেন, পুরীধামে গিয়া কোন্ কোন্ ক্রিয়া করিতে হয়, তাহাও বিশেষভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন।

সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকায় এবং নিজে ভক্তিমান্ বলিয়া কবি বিশ্বম্ভর পানি মহাশয়ের রচিত এই জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থ কোথাও বিকৃত হয় নাই। উৎকলখণ্ড, শ্রীমদ্ভাগবত, পদ্মপুরাণ—যে কোন গ্রন্থ হইতে তিনি যখন যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই অবিকৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা যে কেবল তাঁহার সংস্কৃত ভাষা ও পুরাণশাস্ত্র-সমূহে বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে, তাহা নয়—তিনি যে কিরূপ সুদক্ষ সম্পাদক ছিলেন—ভক্তিগ্রন্থ-সঙ্কলনে তাঁহার যে কিরূপ অনন্যসাধারণ শক্তি ছিল, তাহাও স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেয়।

ভক্তকবি বিশ্বম্ভরের 'গুরুবন্দনা'

জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থ খুলিয়া প্রথমেই তাঁহার "গুরুবন্দনা" পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। কবি বিশ্বম্ভর যে উপনিষদের পরা বিদ্যা বা ভগবদ্‌শক্তি লাভ করিবার অধিকারী হইয়া নিজের জীবন ধন্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গুরুবন্দনা দেখিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। উপনিষদ্ বলেন,—ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহারই নিকট আবির্ভূত হন, যাঁহার গুরু ও দেবতাতে সমান পরা ভক্তি।

কবি বিশ্বম্ভরের গুরুবন্দনা পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি উপরি উক্ত শাস্ত্রবাক্যের মর্ম প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বীয় গুরুদেবকে জগদ্‌গুরুর সহিত অভিন্নভাবে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখানে তাঁহার গুরুবন্দনাটি উদ্ধৃত হইল,—

"প্রণমামি গুরুদেব তোমার চরণে।
হর মম তাপ কৃপাসুধা বরিষণে ॥১

কত গুণ পদ-নখ-চন্দ্রের কিরণে।
কণায় অজ্ঞানতম করয়ে নাশনে ॥২

ভাবিলে বিকশে ভাব-কুমুদিনীদাম।
যাহার তুলনা ত্রিভুবনে অনুপাম ॥৩

কি স্থল-কমল জিনি ও চরণ-তল।
অনুপম অঙ্গুলি শোভিত দশ দল ॥৪

* * * *

সে রূপ বর্ণিতে হয় শকতি কাহার।
বেদাগমে নিরূপণ না হয় যাঁহার ॥৮

রসে আনন্দিত পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
যাঁহার বিগ্রহ পূর্ণানন্দ সর্বক্ষণ ॥৯

সচ্চিৎ-আনন্দময় স্বরূপ মাধুরী।
সর্বদেবময় সর্ব আত্মাময় হরি ॥১০

করুণা আলয় গুরু সর্বতত্ত্বপর।
স্মরণে তারয়ে দীন অজ্ঞান পামর ॥১১

অপার মহিমা যাঁর সমুদ্র গম্ভীর।
সেই কিছু বুঝে তাঁর সেই ভক্ত ধীর ॥১২

ভকতি বিহনে শত কোটি সম্বৎসর।
অন্বেষিলে নহে কভু নয়নগোচর ॥১৩

ভকতি-নয়নে মাখি প্রেমের অঞ্জন।
শিরসি কমলে তদা হেরে সাধুগণ ॥১৪

শ্রীগুরু গোবিন্দ এই বেদের বচন।
গুরু বিনা তারিতে নাহিক অন্য জন ॥১৫

শ্রীগুরু উচ্ছিষ্ট-সুধা আর পদজল।
ভোজনে শমন কান্দে হইয়া বিকল ॥১৬

করুণা করহ প্রভু আমা অতি দীনে।
ক্রিয়াহীনে তারিতে নাহিক তোমা বিনে ॥১৭

দগধে সংসার ঘোর মহাদাবানল।
কৃপা-বারি বরিষণে করহ শীতল ॥১৮

মনোমত্ত বারণ না মানয়ে বারণ।
আরোহিল তাহে গন্ধ আদি পঞ্চজন ॥১৯

নিজ নিজ বশে তারা সবাই চালায়।
পাপ-বনে লয়ে সদা ভ্রমণ করায় ॥২০

দলন করহ পদাঙ্কুশ নিক্ষেপণে।
বান্ধিয়া রাখহ প্রভু ও রাঙ্গা চরণে ॥২১

দীন বিশ্বম্ভর দাস ডাকয়ে কাতরে।
শ্রীগুরু করুণা করি তার এ পামরে ॥২২" পৃঃ—২

কবি বিশ্বম্ভরের এই অসাধারণ গুরুভক্তি তাঁহাকে এই "জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থ রচনায় জয়যুক্ত করিয়াছে। স্বীয় কুলগুরু শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুরের দৌহিত্রবংশাবতংস ব্রজনাথ চট্টরাজ প্রভুর শ্রীপদযুগলকে একমাত্র সম্পদ্ করিয়া তাঁহারই কৃপায়—তাঁহারই আশীর্বাদের বৈভবকে সম্বল করিয়া তিনি এই গ্রন্থ-রচনায় সফলকাম হইয়াছেন। বিশ্বম্ভরের গুরুভক্তির নন্দন-সৌরভে গ্রন্থখানি আমোদিত; গ্রন্থের বহু স্থানে তাহার পরিস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের "গ্রন্থারম্ভ" অধ্যায়ে দেখিতে পাই, শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর, শ্রীলোকনাথ প্রভু ও শ্রীচৈতন্যভক্তবৃন্দের করুণা ভিক্ষা করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"করুণা করিয়া লীলা করাহ স্ফূরণ ॥ পৃঃ—৭

কারণ আমি অতি মূর্খ, বুদ্ধিও আমার শিশুবুদ্ধি, আমার কি শক্তি আছে যে,

আমি শ্রীজগন্নাথমঙ্গল বর্ণনা করিতে পারি ?" এত বড় কার্য করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন, সে শক্তি আমার কই ? কিন্তু গুরুভক্তিতে যিনি তন্ময়—নিজের দেহ ও মন যিনি গুরুর পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার আবার শক্তির অভাব ? শ্রীগুরু তাঁহাকে গ্রন্থ রচনার আজ্ঞা দান করিলেন, শ্রীগুরুর সেই আজ্ঞা বিশ্বম্ভরের দেহে অধিষ্ঠান হইয়া তাঁহাকে এই অসাধ্যসাধনে ব্রতী করিল ;—

"শ্রীগুরু গোঁসাই মোরে কৈল আজ্ঞা দান।
সেই আজ্ঞা শক্তি হৈল দেহে অধিষ্ঠান॥" পৃঃ—৭

বিশ্বম্ভরের আর ভাবনা কি ? তাই তিনি গ্রন্থরচনা-প্রারম্ভে নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে লিখিলেন ;—

"যাহা লিখি ভালমন্দ কিছু নাহি জানি।
সেই প্রভু যে লিখান সেই লিখি বাণী॥ পৃঃ—৭

নিজের ভাল-মন্দ, গৌরব-অগৌরব সমস্তই সেই নারায়ণরূপী গুরুদেবে অর্পণ করিয়া তিনি যন্ত্রবৎ কার্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর জানিতেন, কেবল জানিতেন নয় মনে প্রাণে স্থির বিশ্বাস করিতেন—তিনি মাত্র যন্ত্র, আর তাঁর ভরসা এই যে তিনি উপযুক্ত যন্ত্রীর হাতে পড়িয়াছেন। যন্ত্রী যখন যে সুরে আলাপ করিবেন, সেই সুরই তখন মূর্ত হইয়া আপনার অপরূপ ধ্বনিতে বিশ্ববাসীর মনোপ্রাণ হরণ করিবে। এ বিশ্বাস যাঁহার, সিদ্ধি ত তাঁহার করতলগত। তাই বিশ্বম্ভর "জগন্নাথ-মঙ্গল" রচনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

কবি বিশ্বম্ভর কর্তৃক উৎকলখণ্ডের তত্ত্ব বাংলায় প্রকাশকরণ

স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত "উৎকলখণ্ডে" নানা তীর্থপ্রসঙ্গ এবং জগন্নাথ চরিত বর্ণনা ও সেই পুরাণ পুরুষের প্রতি মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য মুখ্যভাবে যেমন পরা বিদ্যাই প্রচারিত হইয়াছে, ভক্তকবি বিশ্বম্ভর কৃত "জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থেও সেই উদ্দেশ্যের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই ; বরং সাধারণের অনবগম্য সংস্কৃত ভাষা হইতে সেই তত্ত্বটিকে তিনি

সরল ও সুখবোধ্য বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। নিম্নলিখিত অনুবাদাংশ পাঠ করিলে ইহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে ঃ—

"নম তুমি ত্রিগুণ অতীত মহেশ্বর।
তিন গুণ বিভাগ কর নিরন্তর॥
চারি বেদময় তুমি ত্রিকালের পার।
তিনকাল তত্ত্বজ্ঞ তোমারে নমস্কার॥
শশী সূর্য্য অনল তোমার তিন আঁখি।
বিপ্রের হিতৈষী তুমি বিপ্রসুখে সুখী॥
তুমি শ্রেষ্ঠ আত্মা অষ্ট ঐশ্বর্য নিধান।
তুমি অষ্ট মূর্তিধারী তোমারে প্রণাম॥
যে তোমার রূপ দেব হয় মায়াপার।
অব্যয় সে রূপ নাশ করে অন্ধকার॥
অজ্ঞান জনেতে তোমা না জানে মায়ায়।
সেই মায়াপার তুমি প্রণাম তোমায়॥
এইরূপ আপন স্বরূপ মহেশ্বরে।
আপনি করিলা স্তব জগত ঈশ্বরে॥" পৃঃ—৪৭

কবি বিশ্বম্ভরের ধর্ম্মমত ও উপাসনা-পদ্ধতি

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এই ত্রিবিধ পন্থা আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও, বস্তুত এই তিনটি পন্থাই পরস্পরে পরস্পরের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যাঁহার সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নাই, তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি আসিতে পারে না, ভক্তি না হইলে তদুদ্দেশ্যে কোন প্রকার কর্মের অনুষ্ঠান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। পক্ষান্তরে কোনও মহানুভব ব্যক্তির বিশেষ গুণের কথা জ্ঞানগোচর হইলে আমার অন্তঃকরণ তাঁহার প্রতি স্বতঃই ভক্তিবিনত হইবে এবং ক্রমশ তাঁহার প্রিয় সাধনোদ্দেশ্যে আমার কর্মযোগ আরম্ভ হইবে। কিন্তু মানবের ভাগ্যবশে এমন শুভদিনও আসিয়া উপস্থিত হয়, যেদিন ভক্তির প্রাবল্যে কর্ম নিরুদ্ধ হইয়া যায়। প্রকৃত ভক্তি লাভ করিলে, মানুষের আর কর্মযোগ বা

জ্ঞানযোগের জন্য সাধনা করিবার দরকার হয় না। জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসিগণ যে জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিতেন, সেই ব্রহ্মকেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের ছটা বলা হইয়াছে। এই সত্যকে আশ্রয় করিয়া কবি বিশ্বম্ভর নিরাকার ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের জ্যোতিঃ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

"যাহার কিরণে নিরাকার ব্রহ্ম মানে।
তাঁহার অঙ্গের ছটা ইহা নাহি জানে॥
ছটারে বলয়ে ব্রহ্ম নহে অপ্রমাণ।
বস্তু বিনে কিরণ না হয় উপাদান॥" পৃঃ—৪৫

সাধকগণ দুইটি পন্থা অবলম্বন করিয়া সাধনা করেন—একটি সাকার, অপরটি নিরাকার। সাধক কবি বিশ্বম্ভর প্রথম শ্রেণীর সাধক ছিলেন; সাকার উপাসনার পন্থা অবলম্বন করিয়া তিনি জীবনে সার্থকতা লাভ করেন। তিনি বলিতেছেন;—

"যোগিগণ দুইরূপ ভাবয়ে তাহারে।
কেহ বা সাকার ভাবে কেহ নিরাকারে॥" পৃঃ—৪৪

কিন্তু এই বিভিন্ন ভাবে ভাবনার (সাধনার) ফল—

"ভাব্য অনুরূপ হরি দেন দুহুঁাকারে।"

কবি ইহার পরে আরও একটু বিস্তারিতভাবে এই দুই প্রকার উপাসনা ও তাহাদের ফলশ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন;—

"জ্যোতির্ময় নিরাকার ভাবয়ে যে জন।
তেজোময় হৈয়া ছয় তেজেতে মিলন॥
যদ্যপিও সেই ব্রহ্ম-সাযুজ্য পাইল।
সেবানন্দ সুখ বোধ তাহার না হইল॥
অতএব সুখময় আনন্দ ভকতি।
সাকার ভাবনে হয় তাহার সঙ্গতি॥
আনন্দ ভকতি করে সেই ভক্তজন।
দাস্যভাবে সদাই সেবয়ে শ্রীচরণ॥" পৃঃ—৪৪

কবি বিশ্বম্ভরের ধর্মমত ও উপাসনাপদ্ধতির পরিচয় উপরি উদ্ধৃত অংশ

হইতে জানিতে পারা যায়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপাস্য দেবতার মূর্তি, রূপ ও গুণের পরিচয় নিম্নলিখিত রচনাংশ হইতে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে—

"সচ্চিৎ আনন্দ তনু প্রভু ভগবান্।
অপ্রকৃত হয় সেই রূপ অনুপম॥
শ্যামল সুন্দর অঙ্গ প্রসন্ন বদন।
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন॥
পদ-নখ-চ্ছটা কোটি সূর্য তিরস্কারী।
অগাধ অপার যাঁর করুণার বারি॥
কোটি জগদণ্ডে হয় যাঁহার প্রকাশ।
অশুভ তিমির যাঁর কিরণে বিনাশ॥
যাঁর প্রভাবলে দীপ্ত কোটি ভানুগণ।
তাঁর রূপ নিরূপিতে শক্তি কোন জন॥" পৃঃ—৪৫

বিশ্বম্ভর বাবুর বাংলা কবিতা রচনা-পদ্ধতি

বিশ্বম্ভর বাবুর বাংলা রচনা-পদ্ধতি 'জগন্নাথমঙ্গলে' সুপরিস্ফুট। এই কাব্যের অধিকাংশই পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে রচিত। মাঝে মাঝে লঘু ত্রিপদীও আছে। নিম্নে লঘু ত্রিপদীর দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত হইল—

"সমুদ্রের তীরে ক্ষেত্রশোভা করে
সুবর্ণ বালুকাময়।
নীলগিরি শিরে, অল্প তরুবরে
হেরিতে আনন্দময়।" পৃঃ—২৭

"শ্যামের বাম ভিতে, রুক্মিণী শোভে রথে,
দুজনে ভাল শোভা পায় গো।
অসত নৃপ যত, হইয়া চমকিত,
'কে নিল বলি' সবে চায় গো॥" পৃঃ—৮৫

"কহ শিবা, হেতু কিবা, করিলা স্মরণে।
কহ তূর্ণ, আশা পূর্ণ, করিব এক্ষণে॥" পৃঃ—১৪১

বিশ্বম্ভর বাবুর রচনায় অলঙ্কারাদি সৌন্দর্য

বিশ্বম্ভর বাবুর রচিত কাব্যের বহু স্থানে অলঙ্কারাদি সৌন্দর্যেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে সেই সৌন্দর্য বুঝাইবার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল—

"চরণের তুলনা ভুবনে নাহি হেরি।
ভকতে ভাবিতে জানে তাহার মাধুরী ॥" পৃঃ—৩

"পান করি রূপের মাধুরী নিরবধি।
নিগমন তনু মম বহে প্রেমনদী ॥" পৃঃ—৪৫

"পাকিলে ফাটয়ে যেন কর্কটীর ফল।
দুইখান হইয়া তেন পরে মহাবল ॥" পৃঃ—৬৯

"অতি কৃশ কটি পাছে ভাঙ্গে অঙ্গভরে।
বিধি বাঁধিয়াছে তাহা ত্রিবলীর ডোরে ॥" পৃঃ—৬৯

"সেরূপ তুলনা নাহি এ তিন ভুবনে।
রূপ রূপ পায় সেই রূপ দরশনে ॥"

শেষোক্ত পংক্তিতে 'রূপ' শব্দের তিনবার প্রয়োগ কবির কবিত্বশক্তির পরিচায়ক।

বঙ্গীয় প্রাচীন কবিগণ তাঁহাদের রচিত কাব্যে অনুপ্রাসের ঘটা দেখাইয়া পাঠককে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন। কবি বিশ্বম্ভরের প্রণীত "জগন্নাথ-মঙ্গল" কাব্য মধ্যেও অনুপ্রাসের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপে একটি মাত্র স্থান নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

"বিধির বাসনা পূর্ণ কর অনিবার।
শরণ্যে শুভদ শান্তিদাতা শিবাকার ॥
ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণময় ষোড়শ কৈশোর।
সর্বশেষ সর্বসিদ্ধি স্বভক্ত গোচর ॥
হরিপ্রিয় হবির্ভোক্তা হব্যবাহ রূপ।
ক্ষীণ জনে ক্ষম দোষ না হও বিরূপ ॥" পৃঃ—৯৩

বিশ্বম্ভর বাবুর রচনায় তৎকালীন সামাজিক বিবরণ

বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিলে বাংলার প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের ভিতরে দেশের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বম্ভরের এই "জগন্নাথমঙ্গল" কাব্যের মধ্যে দেশের ও সমাজের তাৎকালিক বহু খুঁটিনাটির বিবরণ বিদ্যমান। সে সময়ে দেশে কি কি ফল ও মিষ্টান্নের প্রচলন ছিল, কিরূপ অন্নব্যঞ্জন লোকে সে সময়ে ব্যবহার করিত,—তাহার পরিচয়ার্থ গ্রন্থ-মধ্য হইতে নমুনাস্বরূপ তিনটি স্থান উদ্ধৃত হইল।

ফলের নমুনা

"সুপক্ক সুস্বাদু নানাবিধ ফলগণ।
আম্র জম্বু পনস খর্জুর মনোরম॥
কামরাঙ্গা নারঙ্গ কেশর পানিফল।
বাদাম ছোহারা দ্রাক্ষা দাড়িম্ব শ্রীফল॥
ইক্ষু শশা আদ্রক কমলা মিষ্টপুর।
বাতাবী জম্বীর রম্ভা স্বাদু সুমধুর॥" পৃঃ—১৩৫

মিষ্টান্নের নমুনা

"নানাবিধ মিষ্টান্ন দেখয়ে থরে থরে।
অমৃত কর্পূর কেলী আর ক্ষীর সরে॥
চন্দ্রকান্তি কদম্ব অমৃত মৃদু ফেণি।
খাজা ধনু সর ছানা সমিশ্র নবনী॥
মতিচূর মনোহরা ঘৃতে ভাজা চিঁড়া।
সরভাজা সরপুলি পেড়া চন্দ্রচূড়া॥
জিলিপী রসকরা তিললাড়ু ঝুরি।
বহুবিধ মিষ্টান্ন দেখয়ে দণ্ডধারী॥" পৃঃ—১৩৪

অন্নব্যঞ্জনের নমুনা

"সাদরে শ্রীহরিপ্রিয়া করিছেন পাক।
অমৃতনিন্দিত স্বাদু নানাবিধ শাক॥
মানকচু কুষ্মাণ্ডবটিকা আলু দিয়া।
সুক্তা রান্ধিয়াছে দেবী সাদর করিয়া॥

অমৃতলাল পানি

বিশ্বম্ভর পানির ঠাকুরবাড়ী
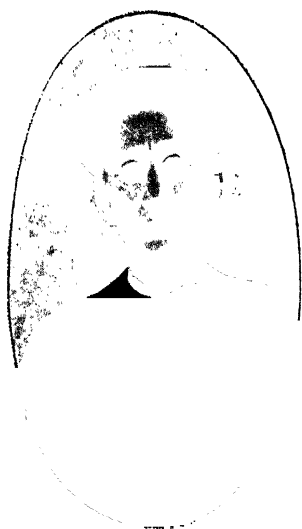
সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির—সেনহাট

দুগ্ধ নারিকেল কুষ্মাণ্ডের সম্মিলন।
কাঁচাকলার গর্ভথোড়ে আলু কচু মান॥
রান্ধিয়াছে রমা সুখে ব্যঞ্জন প্রধান।
বহুবিধ ব্যঞ্জন সে কত কব নাম॥
মুদ্গস্সূপ মাষস্সূপ অনেক প্রকার।
ভৃষ্ট নারিকেলপুষ্প বটিকাদি আর॥
অম্ল মধুরাম্ল আদি অনেক প্রকার।
আম্রতক আম্র আর জম্বীরি আচার॥
লবণ-মিশ্রিত লেবু তিন্তিড়ীর রসে।
রুচি হেতু দিলা দেবী হৃদয় উল্লাসে॥
মাষবড়া মুদ্গবড়া গোধূমের রুটি।
সারি সারি শোভিত পরিপাটি॥" পৃঃ—১৩৫

'বৃন্দাবন-প্রাপ্ত্যুপায়'

১৩০৬ সালের ১৫ই ফাল্গুন বিশ্বম্ভর বাবুর সুযোগ্য দৌহিত্র, হাওড়ার প্রবীণ উকীল স্বর্গীয় অমৃতলাল পানি মহাশয় তদীয় পিতামহ-রচিত এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের ৯৯ হইতে ১০৮ অধ্যায় অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। ডিমাই আট পেজী আকারের ২৪৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত; সমগ্র গ্রন্থখানি কবিতায় রচিত, মধ্যে মধ্যে রসসৌকর্যের জন্য সংস্কৃত শ্লোকও সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে এক পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন আছে, কিন্তু কোন সূচীপত্র দেওয়া হয় নাই।

'বৃন্দাবন-প্রাপ্ত্যুপায়' গ্রন্থের বিষয়-বিভাগ

দশটি সোপান বা অধ্যায়ে গ্রন্থখানিকে বিভক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থের প্রত্যেক সোপান কত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং উহাতে কি কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল ঃ—

প্রথম সোপান—১ হইতে ১৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, ইহাতে চন্দ্রকান্তি বিবরণ ও পারায়ণ-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সোপান—১৯ হইতে ৪৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, ইহাতে বৃন্দাবন বিস্তার ও শ্রীগোবিন্দরূপাদি বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় সোপান—৪৪ হইতে ৬৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, ইহাতে শ্রীরাধার রূপাদি বর্ণনা ও শ্রীগোবিন্দের অনুগামী দেবতাদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে।

চতুর্থ সোপান—৬৬ হইতে ৯০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, ইহাতে নারদের ব্রজ-ভূমিতে আগমন এবং রাধাকৃষ্ণের বাল্যরূপ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চম সোপান—৯০ হইতে ১২৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, ইহাতে উগ্রতপা প্রভৃতি মুনিগণ তপস্যা দ্বারা কিরূপে গোপীদের লাভ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ সোপান—১২৪ হইতে ১৩৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, ইহাতে ব্যাস এবং অম্বরীষ এই উভয় ঋষির পরস্পর আলাপপ্রসঙ্গে বৃন্দাবন-তত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণের বেণুর জন্মাদি বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম সোপান—১৩৯ হইতে ১৭৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, ইহাতে অর্জুনীয়া দমন।

অষ্টম সোপান—১৭৯ হইতে ১৯১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, ইহাতে নারদের প্রকৃতিরূপ ধারণ বর্ণিত হইয়াছে।

নবম সোপান—১৯১ হইতে ২০৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, ইহাতে নন্দাদির পরম ধামে গমন বর্ণিত হইয়াছে।

দশম সোপান—২০৩ হইতে ২৪৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, ইহাতে কৃষ্ণ ধ্যানাদি ও দৈনন্দিন কৃষ্ণলীলা কথন।

পুস্তকখানির প্রচ্ছদ-পত্র ও "বিজ্ঞাপনের" প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

'বৃন্দাবন-প্রাপ্ত্যুপায়' গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্র

"বৃন্দাবন প্রাপ্ত্যুপায়।

—:•:—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।

চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী ॥
—বিদগ্ধমাধব ১ অঙ্ক, ৩৩ শ্লোকঃ

৺বিশ্বম্ভর পানি প্রণীত।

—•—

শ্রীঅমৃতলাল পানি প্রকাশিত।

—*—

কলিকাতা।
৮নং জ্যাকসন্ লেন, ক্রাইটিরিয়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্ক যন্ত্রে
শ্রীনন্দলাল দত্ত দ্বারা মুদ্রিত
সন ১৩০৬"

'বৃন্দাবন-প্রাপ্ত্যু-পায়' গ্রন্থের বিজ্ঞাপন

"বৃন্দাবন-প্রাপ্ত্যুপায় শ্রীপদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের মূল হইতে ভাষায় পদ্যানুবাদ। মুনি ঋষিগণ যে উপায়ে গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবন প্রাপ্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্ম অনুশীলন করিতে হইলে এইরূপ গ্রন্থ সতত পাঠ করা ও তাহার মর্ম্মাবগত হওয়াই এই ঘোর কলিতে একমাত্র উপায় বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে; কারণ বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রাণসর্বস্ব যে ভক্তিমার্গ তাহা অভ্যাসমূলক। ভক্তগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে কৃতার্থ হইবেন স্বর্গীয় পিতামহ মহাশয় গ্রন্থের স্থানে স্থানে এইরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই আশায় এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত ও সর্বসাধারণের গোচরার্থ প্রকাশিত হইল। এই কার্যে আমার পরম আত্মীয় রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ মল্লিক মহাশয় বিশেষ উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে সকলে পাঠ করিলেই অভিলাষ পূর্ণ হয়।

হাওড়া
১৫ই ফাল্গুন, ১৩০৬ সাল

শ্রীঅমৃতলাল পানি"

'বৃন্দাবন-প্রাপ্ত্যুপায়ে'র আলোচনা

বৃন্দাবন-প্রাপ্ত্যুপায় গ্রন্থখানি পয়ার, লঘুত্রিপদী ও দীর্ঘত্রিপদী ছন্দে রচিত। কবি বিশ্বম্ভর যে বিশেষ গুরুভক্ত ছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রথম পৃষ্ঠায়ও তাহারই পরিচয় পরিস্ফুট রহিয়াছে;—প্রথমেই তিনি "শ্রীগুরুবে নমঃ"—লিখিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন,—তাহার পর তিনি "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণে প্রণাম জানাইয়াছেন। একটি পংক্তিতে এই দুইটি কথা স্থান পাইয়াছে, ইহার পরেই নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি আছে;—

"গুরুং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঞ্চ নত্বা
তথা রাধিকেয়স্য পদারবিন্দম্।
ব্রজে রাধিকাকৃষ্ণলব্ধেরুপায়ং
প্রবক্ষ্যামি পাদ্মানুসারেণ তত্ত্বং॥
বৃন্দারণ্যে কল্পতরোর্মূলে চ যোগপীঠকে।
রত্নসিংহাসনে রাধাগোবিন্দোঽবতু বঃ সদাঃ॥"

এই শ্লোকটির পরে বাংলায় দীর্ঘত্রিপদী ছন্দে কবি শ্রীগুরু, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীনিবাস, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদবন্দনা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের নিগূঢ় লীলাতত্ত্ব বর্ণনা করিতে তাঁহার যে ইচ্ছা হইল তাহা তিনি জানাইতেছেন;—

"বৃন্দাবন সুমহত্ত্ব, নিগূঢ় সে লীলাতত্ত্ব
বোধাগম্য বুঝিতে দুষ্কর।
জীব প্রতি কৃপা করি হরি ব্যাসরূপ ধরি
প্রকাশ করিলা কৃপাকর॥
ব্রজলীলা সুনির্যাস শ্রীপদ্মপুরাণে ব্যাস
পাতাল খণ্ডেতে বর্ণিলেন।
তথা আছে সুবিস্তার সেই গুরু লীলাসার
যে রূপে যে জন পাইলেন॥

শ্লোক দৃষ্টি করি তথি, লালসা রইল অতি
ভাষারূপে করিতে বর্ণন।"

ভাষারূপে অর্থাৎ বাংলা ভাষায় পদ্যে এই বিস্তৃত ও নিগূঢ় লীলা রচনা করিতে কবি বিশ্বম্ভরের অত্যন্ত লালসা হইল। তাঁহার গুরু শ্রীনিবাস আচার্য-সুতাবংশোদ্ভূত ব্রজনাথ চট্টরাজ প্রভুর চরণতলে তিনি "আজ্ঞা" প্রার্থনা করিলেন।

অনুরক্ত ও ভক্তিমান্ শিষ্যের প্রার্থনানুসারে চট্টরাজ প্রভু—

"কহিলা পণ্ডিত স্থানে, শ্লোক পঠি একমনে
কর এই গ্রন্থ সুখধাম।
রাধাকৃষ্ণ লীলাময়, হবে গ্রন্থ সুখোদয়,
বৃন্দাবন-প্রাপ্ত্যুপায় নাম॥"

গ্রন্থ রচনায় অনুমতি প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তিনিই বৃন্দাবন-প্রাপ্ত্যুপায় নামে এই গ্রন্থের নামকরণ করিয়া দিলেন। বিশ্বম্ভর তখন পণ্ডিতের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। শ্রীগুরুর কৃপায় গঙ্গাতীরে পণ্ডিতের সন্ধান মিলিল।

"সেই আজ্ঞা অনুসারে, আইলাম গঙ্গাতীরে,
দয়াময় শ্রীরাজকুমার।
বিপ্র বিদ্যাবাগীশাখ্য, মহা কবিবর দক্ষ,
পুরাণার্থ জানাইলা সার॥"

রাজকুমার বিদ্যাবাগীশ নামক এক ব্রাহ্মণ বিশ্বম্ভরকে দয়া করিলেন। তিনি সুকবি ও দক্ষ পুরাণবিদ্; তাঁহার কৃপায় বিশ্বম্ভর পুরাণার্থ জ্ঞাত হইলেন। এই ভাবে পুরাণের মর্ম অবগত হইয়া তিনি "বৃন্দাবন-প্রাপ্ত্যুপায়" গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। কবি বিশ্বম্ভর একজন ভক্ত। ভক্তজনসুলভ ছবি কিভাবে গ্রন্থ রচনা প্রারম্ভে তাঁহার ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়—

"আমি অতি নীচ দীন, অর্থবোধে বুদ্ধিহীন,
তথাপি লালসা অতিশয়।

শুদ্ধাশুদ্ধ নাহি জ্ঞান, নাহি কিছু অনুমান,
তবু লিখি এ অতি বিস্ময়॥
অতএব বুঝি তথ্য, গুরু আজ্ঞা বলে সত্য,
অক্ষরের হইল যোটন।
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরিবরে, মূক বেদ ব্যাখ্যা করে,
সেইরূপ আমার বর্ণন॥”

তিনি মনে প্রাণে স্থির জানিতেন যে, শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার অভিলাষেই তাঁহার এই গ্রন্থ রচনা।

“শ্রীগুরু পদারবিন্দ, আর রাধা শ্রীগোবিন্দ,
পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ।”

গ্রন্থের প্রথম সোপানের প্রারম্ভে বিবিধ পুরাণের শ্লোকসংখ্যার পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে। ইহার শেষে কবি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। এই সহজ ও সরল বর্ণনা পাঠ করিলে কবির ভাগবতপ্রীতির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়—

“শ্রীপদ্মপুরাণ ব্যাস প্রথমে করিয়া।
তবে ক্রমে ষোড়শ পুরাণ সমাপিয়া॥
সপ্তদশ হইতে তুলিয়া সার ভাগ।
ভাগবত কবি ব্যাসদেব মহাভাগ॥
নিজ সুত শুকে করাইলা অধ্যয়ন।
ভাগবত দ্বাদশ স্কন্দেতে যুক্ত হন॥
ব্রহ্মবিদ্যান্বিত বেদ বেদান্তের সার।
সর্ব পুরাণের শ্রেষ্ঠ মহিমার পার॥
যাতে পদে পদে কৃষ্ণসংকীর্তন হয়।
অতএব সর্বোৎকর্ষ ভাগবত কয়॥
কেহ যদি ভাগবত কদাচিত স্মরে।
কৃষ্ণ নাম সম সর্ব পাপ হ’তে তরে॥
পর্বতগণের মধ্যে সুমেরু যেমন।
দেবতার মধ্যে যেন শ্রেষ্ঠ নারায়ণ॥

কামধেনু মধ্যে যেন সুরভিরে গণি।
ঊর্বশী যেমন অপ্সরার শিরোমণি॥
কৃষ্ণভক্তগণ মধ্যে যেমন শঙ্কর।
নৃপ মধ্যে যেমন শ্রীরাম নৃপবর॥
শক্তি মধ্যে রাধা, গঙ্গা নদীতে যেরূপ।
পুরাণের শ্রেষ্ঠ ভাগবত সেইরূপ॥"

ভক্ত কবি বিশ্বম্ভর রচিত বৃন্দাবনপ্রাপ্ত্যুপায় গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় দুইটি,—একটি শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনেশ্বর, বৃন্দাবনই তাঁহার একমাত্র বিহারভূমি ও লীলাস্থল, বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি এক পদও সহজে গমন করেন না; যথা—

"এক কৃষ্ণ দুই নয়, একমাত্র ধাম হয়,
তাঁর লীলা বুঝে কোন জন।
বৃন্দাবন ছাড়ি প্রভু কোথাহ না যান কভু
সর্বত্র প্রসিদ্ধ এ বচন।

*　　*　　*　　*

বিনা বৃন্দাবন হরি নাহি কিছু বিশ্ব ভরি
অন্য ভ্রম মাত্র মায়াগতি॥
বৃন্দাবন পরিত্যাগ কৃষ্ণের না হয়।
কদাচ না হয় ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
অন্য স্থানে বপু যেই তাঁহার ধারণ।
সেই সব ক্রীড়া ব্রহ্মা মোহাদি কারণ॥"

অপরটি এই যে, এই বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমা শ্রীমতী রাধিকার কৃপালাভ করিতে হইলে, তাঁহাদের নারীভাবে ভজনা করিতে হইবে;—

"কহিলেন মর্ম তায়, রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যুপায়
নাহি হয় বিনা নারীরূপ।
অতএব অনুরাগে, মম শরীরাংশ ভাগে,
হও তুমি গোপীর স্বরূপ॥"

"বৃন্দাবন প্রাপ্ত্যুপায়" গ্রন্থের একখানি হস্তলিখিত পুঁথিও কবির পৌত্র হাওড়ার প্রবীণ উকীল অমৃতলাল পাইন মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিখানির প্রতিলিপি আনুমানিক একশত হইতে দেড়শত বৎসরের উপর হইবে। ৭৩ পৃষ্ঠায় পুঁথিখানি সমাপ্ত। সাদা ও পীতবর্ণের তুলোট কাগজের উপর লেখা—এখনও বেশ স্পষ্ট রহিয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকগুলি লাল কালীতে, বাংলা পদ্যগুলি কাল কালীতে লেখা। পুঁথিখানির দক্ষিণাংশ খণ্ডিত। উহার ছিন্ন পত্রের অসম্পূর্ণ পংক্তি দুইটি হইতে এইরূপ অনুমান করা হয় যে, গঙ্গাতীরে পূর্ণিমার দিনে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।

ভক্তকবি বিশ্বম্ভররচিত সাতখানি গ্রন্থের মধ্যে তাঁহার রচিত চারিখানি গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। সে চারিখানি গ্রন্থের নাম এই—

১। কন্দর্পকৌমুদী ৩। ভক্তরত্নমালা
২। প্রেমসম্পুট ৪। রজনীকান্ত

'কন্দর্পকৌমুদী' গ্রন্থের পরিচয়

ভক্তকবি বিশ্বম্ভর পানি রচিত "কন্দর্পকৌমুদী" গ্রন্থখানি পদ্যে রচিত। ইহা আদিরসাত্মক কাব্য। কামরূপ অঞ্চলের একটি রাজপরিবারের কল্পিত বিবরণ অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। ইহা কবি ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" ধরণের গ্রন্থ। তারাকুমারের জন্মের (১২৩০ সাল) অব্যবহিত পরে এই "কন্দর্পকৌমুদী" গ্রন্থ রচিত হয়। আদিরসাত্মক কাব্য হইলেও, "কন্দর্পকৌমুদী"র মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—তারাভক্তি ও তারামাহাত্ম্য প্রচার। কবির গৃহে (সেনহাটে) একখানি তাম্রফলক আছে, সেই ফলকে "কন্দর্প-কৌমুদী" গ্রন্থোক্ত পাত্রপাত্রীগণের নাম ও পরিচয় খোদিত আছে।

'ভরদ্বাজ গোত্র'-প্রবন্ধে বিশ্বম্ভর বাবুর গ্রন্থ-পরিচয়

"অনুশীলন ও পুরোহিত" পত্রে প্রকাশিত (৪৭ পৃষ্ঠা), স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধিলিখিত "ভরদ্বাজ গোত্র" শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকা হইতে তিনখানি গ্রন্থের নিম্নরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"প্রেমসম্পুট গ্রন্থখানি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত গ্রন্থের অনুবাদ। ভক্তরত্নমালা ভক্তগণের জীবনবৃত্তান্ত। কন্দর্পকৌমুদী গ্রন্থখানি ১৭৪৯ শকে রচিত এবং ১৭৫৬ শকে বা ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞান যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত। এই গ্রন্থ ১৩৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পূর্বে (পৃঃ—৪০১)

"মূলাধারে কুলদ্বারে সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা।
কুলকুণ্ডলিনী ত্বং হি মূলাশক্তিঃ পরাৎপরা॥"

শীর্ষক যে গানখানি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা এই পুস্তকেরই অন্তর্গত একখানি গান।

লং সাহেবের তালিকায় 'রজনীকান্তে'র উল্লেখ

তাঁহার রচিত "রজনীকান্ত" নামক গ্রন্থখানির উল্লেখ Rev. J. Long সাহেবের Register of Bengali Authors, Editors, Translators etc. which have issued from the press from the year 1818 to 1855 নামক তালিকার ১২৪ পৃষ্ঠায় বর্তমান। লং সাহেব এই গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন—ইহা একটি গল্প (a tale)।

বিশ্বম্ভর বাবুর অপ্রকাশিত গ্রন্থ

বিশ্বম্ভর বাবুর আর একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা কাল কালীতে সাদা তুলোট কাগজে (অর্দ্ধ ফুলস্কেপ সাইজ) লিখিত। ইহার তারিখ ১২৪৯ সাল বা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ। এই গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় ইংরাজীতে লিখিত আছে—

"Composed
By the Late Baboo Beeshum Bhur Pyne
Calcutta"

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত ইহল—

"মপশ্বল চাকলাহায়ে
প্রচলিত
ভূমি পরিমাণ বিষয়ক পুস্তক রিবিনিউ বোর্ডের
কাগজ দৃষ্টে

এবং
তৎ অনুমতি দ্বারা
সিক্রেটোরির দ্বিতীয় এসিষ্টেন্ট
মেঃ জেঃ ডবলিউঃ পোউএল কর্তৃক
যে সংগ্রহীত হয়
তদনুবাদ পূর্বক
বঙ্গীয় পরিমিত পরিমাপ সম্বলিত
প্রকাশিত হইল
ইতি ॥
সন ১২৪৯ সাল ইস্বীয় ১৮৪২ সাল
কলিকাতা”

পুস্তকখানি সর্বসমেত ৬৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। নিম্নে পুস্তকে লিখিত বিষয়ের এবং তাহাদের প্রত্যেকের পৃষ্ঠার পরিমাণ প্রদান করা হইল ;—

১।	অঙ্ক কসিবার উপায় জ্ঞাপন	১	পৃষ্ঠা ব্যাপী
২।	ইংল্যণ্ডীয় ও বঙ্গীয় মাপের পরিমাণ ও আখ্যা	১	ঐ
৩।	মাপের অঙ্ক কসিবার প্রকার—প্রথম নিয়মানুসারে	৫	ঐ
৪।	ঐ—দ্বিতীয় নিয়মানুসারে	১	ঐ
৫।	মপশ্বল চাকলাহায়ে ভূমি পরিমাপের নিয়ম	৫৫	ঐ

এই পুস্তকখানিতে বাংলা ও বিহারের অনেকগুলি পরগণার স্থানীয় মাপ (standard of measurement) অর্থাৎ প্রচলিত রাশি, শিকলি, হাত বা নলের পরিমাপে বিঘার (unit of area) ও ইংল্যণ্ডীয় একর রুডে আমাদের দেশীয় প্রচলিত মাপ বিঘাকাঠায় রূপান্তরিত করিয়া তাহার পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে।

পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত অঙ্ক কসিবার উপায়জ্ঞাপক প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়ম দুইটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল ;—

“প্রথম নিয়ম

এই মাপের পুস্তক মধ্যে লিখিত অঙ্ক সকল কসিবার উপায় এই যে, যে স্থলের যত ফুট এবং ইঞ্চের মাপ লিখিত তাহাকে চতুরস্র করিয়া তদ্দ্বারা

তৎস্থলের চতুরস্র পরিমিত মাপের অঙ্ককে পূরণ করিলে যত সংখ্যক হইবেক তাহাতে ইংলন্দীয় এবং বঙ্গীয় পরিমিত মাপের পরিমাণ পশ্চাল্লিখিত পত্রে বিদিত হইয়া ইঞ্চ আদি একর এবং হস্ত আদি বিঘা পর্যন্তের অঙ্ক কসিতে সক্ষম হইবেক। ইতি"

"দ্বিতীয় নিয়ম

অথবা যে যে সংখ্যাঙ্ক দীর্ঘ প্রস্থ পূরণ দ্বারা চতুরস্র হইয়াছে তাহাতে যে স্থলের যত সংখ্যক মাপ তদ্দ্বারা সেই দীর্ঘ এবং প্রস্থের সংখ্যকাঙ্ককে পৃথক্ পৃথক্ রূপে পূরণ করিয়া যাহা হইবেক তৎ উভয় অঙ্ককে পুনরায় পূরণ করিলে নিশ্চয়াঙ্ক লব্ধ হইবেক। শেষের লিখিত এই যে দ্বিতীয় নিয়ম ইহাই মাপের প্রতি যদিও যথার্থ তাৎপর্য তথাচ অঙ্ক কসিবার সুগম জন্য প্রথমের নিয়ম লিখিত হইল। ইতি"

বিশ্বম্ভর বাবুর বংশলতিকা

ভক্তকবি বিশ্বম্ভর পানি মহাশয়ের প্রথমা পত্নীর গর্ভে চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, যশোদাকুমার, নবকুমার ও তারাকুমার নামে পাঁচ পুত্র এবং দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রগণ প্রায় সকলেই সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং পাখোয়াজ, বীণ, সেতার প্রভৃতি বাজাইতে পারিতেন। কন্যা দুইটিও সুশিক্ষিতা ছিলেন।

বিশ্বম্ভরের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে মহেন্দ্রকুমার ও গোপেন্দ্রকুমার নামে দুই পুত্র এবং দুই কন্যা হয়।

বিশ্বম্ভরের জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রকুমার পূর্ণযৌবনেই লোকান্তর গমন করেন। ইনি বিদ্বান্ ও পরমবৈষ্ণব ছিলেন, ইঁহার দুই কন্যাও বিদুষী ছিলেন। কবির দ্বিতীয় পুত্র নন্দকুমার সঙ্গীতবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি প্রভৃতি সঙ্গীতের সমস্ত বিভাগেই কৃতিত্ব দেখাইয়া ইনি সুপ্রসিদ্ধ হন। পিতার রচিত "জগন্নাথমঙ্গল" গ্রন্থে সঙ্গীতসমূহের সুরসংযোগ-কার্যে ইনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহার স্বরচিত তানলয়শুদ্ধ রাধাকৃষ্ণলীলা-সম্পর্কিত বহু গান ও কীর্তনের পদ এখনও ঐ দেশে প্রচলিত আছে।

যশোদাকুমার পানি

কবির তৃতীয় পুত্র যশোদাকুমারের জীবন বহু ঘটনাবহুল। ইঁহারই যত্ন ও ব্যয়ে কবির "সঙ্গীত মাধব" গ্রন্থ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বাল্যকাল হইতেই ব্যায়াম চর্চার দিকে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। সেকালে সকল লোকেই অল্পবিস্তর ব্যায়াম চর্চা করিত। গুল্‌তি, বর্শা, ঢাল, তলোয়ার, বন্দুক ও অশ্বপরিচালনায় ইনি বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন। সুকুমার কলাবিদ্যায় ইনি অনুরাগী ও উৎসাহদাতা ছিলেন। সেতারে ইনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

ভুলুয়া পরগণা শাসন

জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কাঁদির প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী কাত্যায়নীর নোয়াখালির অন্তর্গত ভুলুয়া পরগণায় বিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল। সুশাসন ও সুবন্দোবস্তের অভাবে প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল সেই জমিদারীর খাজনা আদায় হয় নাই। রাণী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে একজন কর্মদক্ষ বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রার্থনা করেন। মহর্ষি তাঁহার প্রিয়বন্ধু যশোদাকুমারকে এই কার্যের জন্য পাঠাইয়া দেন। নিয়োগপত্র পাইয়াই যশোদাকুমার স্বজাতীয় কয়েকজন কর্মকুশল ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া ভুলুয়া গমন করেন। সেখানে পৌছিয়াই তিনি বিনা দাঙ্গাহাঙ্গামা ও বিনা রক্তপাতে ভুলুয়াতে শৃঙ্খলা স্থাপন করেন এবং বিশ বৎসরের বাকী খাজনা আদায় করিতে সমর্থ হন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। এখানে নোয়াখালী হইতে প্রকাশিত "নোয়াখালী" পত্রের প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত "নোয়াখালী—সেদিন আর এদিন" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া যশোদাকুমারের অখণ্ড প্রতাপের পরিচয় প্রদত্ত হইলঃ—

"১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পরগণা ভুলুয়ার কলিকাতাস্থ সদর কাছারীর হর্তাকর্তা বিধাতা ছিলেন, কর্ম্মবীর ৺যশোদাকুমার পানি। সে সময়ে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা সদর নায়েব যশোদাকুমারের দোর্দণ্ড প্রতাপ কোন অংশে ন্যূন ছিল না। তাঁহার ভয়ে জমিদারীর প্রকৃতিপুঞ্জ সর্ব্বদা তটস্থ থাকিত।"

সিপাহী-বিদ্রোহে যশোদাকুমার

যে সময়ে তিনি ভুলুয়া পরগণা শাসনে নিযুক্ত, ঠিক সেই সময়ে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভীষণ সিপাহী-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। নোয়াখালীতে তৎকালে কয়েকজন ইংরেজ রাজপুরুষ ও মহিলা অবস্থান করিতেন। দেশের চারিদিক্ব্যাপী অশান্তি ও গোলযোগে ভীত হইয়া তাঁহারা যশোদাকুমারের আশ্রয়প্রার্থী হন। উদারহৃদয় যশোদাকুমার নির্ভীকচিত্তে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করেন। যশোদাকুমারের এই অসমসাহসিক কার্যে তাঁহার সহকর্মিগণ ভয়গ্রস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু যশোদাকুমার আশ্রয়প্রার্থিগণকে ত্যাগ করেন নাই। তিনি বিপদাশঙ্কায় শঙ্কিত সহকর্মিগণকে দৃঢ়ভাবে বুঝাইলেন যে, বিপদ্ যতই ভীষণ হোক্, তিনি প্রাণ ও সর্বস্ব পণ করিয়াও এই আশ্রিত নরনারীগণের প্রাণরক্ষা করিবেন। তাঁহার এই অসমসাহসিক কার্যের কথা উল্লেখ করিয়া, "নোয়াখালী" পত্রের পূর্বলিখিত প্রবন্ধের ৩০১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে;—

"সিপাহী-বিদ্রোহরূপ ভারতব্যাপী অশান্তির সময় চট্টগ্রামের সরকারী ধনাগার লুণ্ঠিত হইবার পর, যখন বিদ্রোহিগণের নোয়াখালী নগরীতে আপতিত হইবার আশঙ্কায় নোয়াখালীবাসী আকুল ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল, সে সময়ে ভুলুয়া জমিদারীর সর্বপ্রধান কর্তৃপক্ষ সদর নায়েব যশোদাকুমার পানি জমিদারীর জায়গীরভোগী বহু জায়গীরদারকে একত্রিত করিয়া বিদ্রোহিগণের পথরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তৎপ্রযুক্ত সরকার বাহাদুর তাঁহাকে যথাযোগ্যরূপে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।"

গভর্ণমেণ্টের নিকট পুরস্কার-লাভ

যশোদাকুমার পানি মহাশয় সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে নোয়াখালীতে সরকার বাহাদুরের কার্যে সাহায্য করায় যে পুরস্কার পান, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর তারাকুমার পানি মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ জানিতে পারা যায়—

"শ্রীযুক্ত তৃতীয় দাদা মহাশয়, রাজবিদ্রোহের শাসন-পক্ষে গবর্ণমেণ্ট সহায়তায় সাহায্য করণার্থ গবর্ণমেণ্ট হইতে যে স্বর্ণ ঘড়ি মায় স্বর্ণ চেন

পুরস্কার প্রাপ্ত হন, তাহার অর্থাৎ ঘড়ির ডায়েলের উপরিভাগে যে নাম আদি খোদিত আছে, তাহা নিম্নলিখিত ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

Presented
to
Baboo Joshodah Coomar Pyne
of Bhullooah
For loyal services rendered to
Government in
1857

এই পুরস্কৃত ঘড়ি ভুলুয়া কালেক্টরীর কাছারীতে শ্রীযুক্ত মেজেষ্টর সাহেব প্রদান করেন। তারিখ সন ১২৬৫ সাল, ২৩শে শ্রাবণ, ইং ১৮৫৮, ৭ই আগষ্ট।"

'সংবাদ-প্রভাকরে' যশোদাকুমারের কৃতিত্বের উল্লেখ

এই সম্বন্ধে ১৮৫৮ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদ প্রভাকরে "কস্যচিৎপাঠকস্য" আখ্যায় একখানি পত্র"—প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

"সম্পাদক মহাশয়!

এক্ষণকার বিদ্রোহঘটিত ব্যাপার * * * (কীটদষ্ট) পদাতিকদের আশঙ্কায় অত্র জিলা নওয়াখালিস্থ কি প্রবাসি কি স্বদেশি সকল লোকই মহাভয়যুক্ত ছিলেন, কিন্তু আমারদিগের বিচক্ষণ মহাসাহসী জাইন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সিম্‌সন্ সাহেব এবং ভুলুয়া পরগণা প্রভৃতির বিখ্যাত জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ তথা শ্রীল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়দ্বয়ের পক্ষে প্রধান কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু যশোদকুমার পানি মহাশয় সর্বদাই একপরামর্শ ও একবাক্য হইয়া নানা কৌশলে আমারদিগের এই দেশটিকে যে প্রকারে শান্তভাবে রাখেন তাহাতে প্রশংসিত সাহসী সাহেব ও রাজাবাহাদুরদিগের নিকট আমরা যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞপাশে বদ্ধ আছি,

চট্টগ্রামের মহাপাপপরায়ণ সিপাহিরা যৎকালে বিদ্রোহি হয়, তৎকালে অত্র জিলাস্থ প্রজাবর্গ প্রভৃতি তাবল্লোকই মহাভয়ে ভীত ও বিচলিত হওয়াতে মহাপুরুষ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও রাজাবাহাদুরদিগের কর্মাধ্যক্ষগণ যেরূপ অসমসাহসের সহিত এই জিলাটিকে স্থিরভাবে রাখেন, তত্তাবৎ বৃত্তান্ত তৎকালেই মহাশয়কে গোচর করিয়াছি সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজনাভাবে, ফলত আমরা নিশ্চয়রূপে অবগত আছি যে, এই বিদ্রোহে দয়াবান রাজাবাহাদুরেরা প্রশংসিত কর্মাধ্যক্ষের এইরূপ আদেশ প্রদান করেন, যে জিলার প্রজাবর্গ রক্ষণার্থে যত * (কীটদষ্ট) * পদাতিকাদি নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হয়, তাহা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত ঐক্যভাবে ও তদর্থে অর্থ ব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হয়। মহাশয় এই অনুজ্ঞাটির ভাবেই মহাত্মা রাজাবাহাদুরদিগের দয়া ও রাজভক্তি বিষয়ের পরিসীমা বিবেচনা করিবেন এবং উক্ত আদেশানুসারে তদ্বিষয়ের সম্যক্ কার্য যে সুচারুরূপে নিষ্পাদন হইয়াছে, প্রশংসিত সাহেব অধুনা কথিত কর্মাধ্যক্ষ মহাশয়কে যে একখানি প্রকাশ্য প্রশংসালিপি প্রদান করিয়াছেন, তদ্দারাই তাহার প্রমাণ প্রচুর করিবেক, অতএব ইউরোপীয় ভাষায় উক্ত প্রশংসাপত্রের অনুলিপি বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহিত মহাশয়ের সমীপে প্রেরণ পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিতেছি যে মহাশয়ের অভিপ্রায় সহিত জগদ্দীপক প্রভাকর দ্বারা ইহা জনগণের নয়নগোচর করত চিরবাধিত করিবেন।

নওয়াখালি	কিমধিকং নিবেদনমিতি
১২৬৪ সাল, ১৮ই মাঘ	কস্যচিৎ পাঠকস্য।"

যশোদাকুমারকে লিখিত জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পত্র

নোয়াখালীর তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট সিম্‌সন সাহেব যশোদাকুমারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করা হইল—

"No. 13 of 1858

To

Babu Jashoda Kumar Pyne,
Naib of Bhooluah

Sir,

You requested from me some notice of your conduct with reference to the Mutinies and some expression of my opinion of your behaviour.

2. I have much pleasure in certifying that your conduct during all the troublous year 1857 was, beyond my expectation, excellent.

3. The manner in which you behaved towards your ryots and tallookdars, when uneasiness was felt in the district, showed much tact and loyalty to the State, and demands the expression of my approval. But as Magistrate of this district, when the 34th N. I. mutinied at Chittagong, I called upon you to assemble what force you could and to exert yourself to get the Rajbari put into a proper state of defence and provisioned, you answered my requisition with alacrity and good will and I consider that the Community of Noakhally, European and Native, is much indebted to you for the way in which you cordially tendered the assistance, which your influence as the head representative of the largest landed proprietors in this district enabled you to command, and I return you sincere thanks.

I am, Sir,
Your obedient servant
Sd. W. S. Simson,
Offg. Joint Magistrate

Noakhally,
Joint Magistrate Office,
The 20th January, 1858"

গভর্ণমেণ্ট কর্মচারীর পত্রে যশোদাকুমারের প্রশংসা

এই সম্পর্কে নোয়াখালীর তৎকালীন ডেপুটি কলেক্টার সাহেবের সহিত চট্টগ্রামের কমিশনার বাহাদুরের যে পত্র-ব্যবহার হয়, তাহার মধ্য হইতে দুইখানি উদ্ধৃত হইল—

(১)

"No. 77 of 1858/59

From

The Offg. Deputy Collector of Bhulooah

To

The Commissioner of Revenue, 16th Division,
Chittagong

Sir,

I have the honour to submit for the consideration of His Honour the Lieutenant Governor of Bengal a report on the conduct of Babu Jashoda CoomerPyne during the mutinies and especially about the time when the three Companies of the late 34th N. I. Regiment revolted at Chittagong.

The Baboo is the Naib of Rajas Protap Chunder and Issur Chunder Sing, who own the Bhulooah Zamindery and other Zamindery property in this district. The Bhulooah Rajas are by far the largest proprietors in the Zillah, their headman possesses much influence with a large mass of the population. During the mutinies the Naib put all this influence at my disposal and exerted himself to the utmost to render every assistance which I could require. He kept up a careful enquiry as to the movements of the Musalmans in all parts of his Jurisdiction and watched for every sign of uneasiness or discontent keeping me informed of all matters when the detachment of the 34th Regiment revolted. At my desire, he gathered together a very large body of his tenantry, he gave up the Neelam Cutchery as a place of retreat, if necessary, laid in store provisions and water, and arrayed it so that with a very little addition it would have been

secure from anything but artillery and would have afforded shelter to all requiring protection in the station for a considerable time; his behaviour and demeanour had the very best effect on the people, whereas any show of fear or uneasiness might have occasioned much difficulty. Though there are some natives of equal influence resident in the district and though none are to be blamed, yet Babu Jashoda Coomar Pyne was the only one in a high position who came forward prominently to tender his services and if for this conduct the Government should think fit to bestow some public mark of their approval on the Baboo, I think the effect would be great on the district and the compliment a deserved one.

I have etc.,
Sd/- W. S. Simson,
Offg. Deputy Collector

Bhulooah,
Deputy Collector's Office,
The 18th June, 1858"

(২)

"No. 103 of 1858

From

The Commissioner and Circuit, 16th Division

To

The Offg. Joint Magistrate of Noakhally,

Dated, 19th July, 1858

Sir,

I have much pleasure in sending you a copy of the Government letter No. 2825 dated 19th instant, intimating that the Lieutenant Governor has been pleased to present a watch and a chain to Babu Jashoda Coomar Pyne in acknowledgment of the zeal and loyalty displayed by him during the Mutiny of the detachment of the 34th Regiment N. I. stationed at Chittagong.

2. The watch and the chain will be sent to you as soon as they are received by me and I request you will present them to the Babu in as public a manner as the occasion requires.

I have etc.,
Sd/- C. Steer,
Commissioner of Revenue and Circuit,
16th Division

Commissioner's Office,
Chittagong"

শিকারে প্রীতি

সে সময়ে ভুলুয়া পরগণা নিবিড় বনাকীর্ণ প্রদেশ এবং নদীবহুল স্থান ছিল; জলে কুমীরের ভয় ও ডাঙ্গায় ব্যাঘ্রের উৎপাত অধিবাসিগণকে দিনরাত্রি সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিত। প্রজার জীবন নিরাপদ্ ও শঙ্কাহীন করিবার জন্য যশোদাকুমার জমিদারী কার্য হইতে অবসর পাইলেই ব্যাঘ্র ও কুমীর শিকারে বহির্গত হইতেন। তাঁহার দুর্ভেদ্য লক্ষ্যে বহু ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর প্রাণ হারাইয়াছে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও তাঁহাকে তাঁহার এই কার্যে বিশেষভাবে সহায়তা করিতেন। জনসাধারণের প্রাণ নিরাপদ্ করিবার প্রচেষ্টায়, তিনি শত্রু মিত্র সকলের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সাহিত্যিক জীবন

যশোদাকুমারের সাহিত্যিক জীবনও বড় মধুময় ছিল। পিতার ন্যায় তিনি সংস্কৃত ভালরূপ জানিতেন না, কিন্তু ফারশী, উর্দু ও আরবী ভাষায় ইঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার রচিত উর্দু ও ফারশী ভাষার কয়েকখানি গ্রন্থ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার রচিত কয়েকটি মধুর ভাবপূর্ণ উর্দু কবিতা এখনও বর্তমান আছে। একটি কবিতার ভাবার্থ এইখানে প্রদত্ত হইল—ফুল না ফুটিলে যেমন বাগানের শোভা হয় না, তেমনি প্রেম ও দয়া না থাকিলে মানবহৃদয়ের কোন সৌন্দর্য বিকশিত হয় না।

'সঙ্গীত-মাধব' মুদ্রণ

বিশ্বম্ভরের জীবদ্দশায় তাঁহার রচিত সঙ্গীতমাধব গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। যশোদাকুমার তাঁহার বাল্যবন্ধু সুপ্রসিদ্ধ রমাপ্রসাদ রায় (যশোদকুমারের জন্মভূমি সেনহাটের নিকটেই রাধানগরে রমাপ্রসাদ রায়ের বাড়ী; ইনি রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র) ও প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উৎসাহে কলিকাতা "সংস্কৃত যন্ত্র" হইতে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশ করেন। এই সূত্রে মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়।

সামাজিক জীবন

সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চা তাঁহার কর্মকোলাহলময় জীবনের প্রধান শান্তিধারা ছিল। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সকল জাতির লোকেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত, ভালবাসিত এবং তাঁহার বন্ধুত্ব কামনা করিত। এইজন্য তাঁহার সামাজিক জীবন মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার একজন বিশিষ্ট সুহৃদ্ ছিলেন।

তিনি বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই তিনি সমাজের হিতসাধনে এবং দীনদরিদ্রের সাহায্যের জন্য ব্যয় করিয়া যান। পিতার ন্যায় যশোদাকুমারের অদ্ভুত লোকানুরাগ ছিল। তিনি সেনহাট, রাজহাট প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণের প্রত্যহ সংবাদাদি লইতেন, তাহাদের বিপদাপদে ও আধিব্যাধিতে সাধ্যমত সাহায্য করিতেন।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরগোষ্ঠীর সহিত এই পানি বংশের বহুকালাবধি সৌহার্দ ছিল। এই ঘনিষ্ঠতাসূত্রে যশোদাকুমার যৌবনে আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন।

রসিক ও হেম নামক দুই পুত্র রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন।

নবকুমার পানি

কবির চতুর্থ পুত্র (প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত) নবকুমার অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করেন। ইনি বিশেষ বলশালী ছিলেন। ইঁহার সঙ্গীতপ্রিয়তা

ও পরোপকারিতা গুণের জন্য সকলেই ইঁহাকে ভালবাসিত। প্রিয়লাল ও বিনোদলাল নামে তুই পুত্র রাখিয়া ইনি পরলোক গমন করেন।

প্রিয়লালও পিতার ন্যায় বলশালী ছিলেন। বিনোদলাল শিক্ষকতা করিতেন। আমেরিকান ধর্মপ্রচারক (মিশনারী) C. H. A. Doll এম এ সাহেব বিনোদলালকে লইয়া ৭৭নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটে বালক ও যুবকদিগের নৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য একটি উপাসনা ও বক্তৃতা-সভা স্থাপন করেন। বিনোদলাল এই সভার একজন নিয়মিত বক্তা ছিলেন।

তারাকুমার পানি

বিশ্বম্ভরের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পঞ্চম বা কনিষ্ঠ পুত্র তারাকুমার ১২৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তারাকুমার তাঁহার তৃতীয় অগ্রজ যশোদাকুমারের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং প্রতি কার্যে তিনি ছায়ার ন্যায় যশোদাকুমারের অনুগামী হইতেন। আকৃতিগত সাদৃশ্যে তুই ভ্রাতা তুল্য ছিলেন। বিষয়কর্ম-পরিচালনায়, শারীরিক পরাক্রম-প্রদর্শনে, লোকের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনে বা সামাজিক অনুষ্ঠানাদির সুসাধনে তিনি যশোদাকুমার অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিলেন না।

যশোদাকুমার যখন ভুলুয়া পরগণার কার্যভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি নিজ কনিষ্ঠ সহোদর তারাকুমারকে এবং সেই সঙ্গে কয়েক-জন স্বজাতীয় কর্মকুশল বিশ্বাসী ব্যক্তিকেও ভুলুয়ায় লইয়া গিয়া নিজ অধীনে কর্মভার প্রদান করিয়াছিলেন। যশোদাকুমারের দেহান্তরের পূর্বে অনেকেই পরলোক গমন করেন; সুতরাং যখন যশোদাকুমার দেহত্যাগ করিলেন, তখন ভুলুয়ায় যাইতে তারাকুমারের আর প্রবৃত্তি হইল না। তারাকুমারের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনও তাঁহাকে ভুলুয়া যাইতে বিশেষভাবে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় বিশ্বাসী ও কর্মদক্ষ কর্মচারীকে কর্মে যোগদান করিবার জন্য পাইকপাড়ার রাজপরিবার হইতে বিশেষ অনুরোধ আসিতে লাগিল; কিন্তু ভ্রাতৃশোকবিহ্বল তারাকুমার আর কিছুতেই কর্মে যোগদান করিলেন না। যশোদাকুমারের জ্যেষ্ঠ জামাতা যতুনাথ দত্তের ভুলুয়ায় যাইবার অস্বীকৃতি তারাকুমারকে

বিশেষভাবে প্রতিনিবৃত্ত করিল। ভুলুয়ায় জমিদারী কার্য-পরিচালনায় এই যতুনাথ তারাকুমারের ন্যায় যশোদাকুমারের প্রধান সঙ্গী ও সাহায্যকারী ছিলেন।

তারাকুমারের স্বগ্রাম-ত্যাগ

নিজ জন্মভূমি সেনহাটে অবস্থান করিয়া তারাকুমার স্বজাতি ও স্বগ্রামবাসীর উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু যশোদাকুমারের মৃত্যুর পর, পানিবংশের উপর কালের কুটিল দৃষ্টির গাঢ় ছায়া পড়িতে আরম্ভ করিল। সেই তুর্নিবার প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া, তারাকুমার স্বগ্রাম সেনহাট পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতার নিকটবর্তী গঙ্গাতীরস্থ রামকৃষ্ণপুরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

স্থানীয় সুবর্ণবণিক্গণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সম্মান দান করিলেন। সেই সময়ে হাওড়া, রামকৃষ্ণপুর, ব্যাঁটরা, পুরাতন সায়র প্রভৃতি স্থানে সুবর্ণবণিক্ অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। তারাকুমার রামকৃষ্ণপুরে আসিয়া দেখিলেন যে, ইঁহাদের মধ্যে বাদবিসম্বাদ ও কলহ প্রায় লাগিয়াই আছে। অতি তুচ্ছ কারণেই ইঁহাদের মধ্যে মনোমালিন্য এবং বাদবিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে। তিনি এই সমস্ত সামাজিক ব্যাধি দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ইহাতে বহুল পরিমাণে কৃতকার্যও হইয়াছিলেন।

তারাকুমার দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ ও ধার্মিক ছিলেন। শেষজীবন তিনি উপযুক্ত সঙ্গিগণের সাহচর্যে ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করেন। ১২৯১ সালে ৬১ বৎসর বয়সে উপযুক্ত তুই পুত্র রাখিয়া তারাকুমার দেহত্যাগ করেন।

বিশ্বম্ভরের জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রকুমার অপুত্রক ছিলেন। মধ্যম পুত্র নন্দকুমারের একমাত্র পুত্র পীতাম্বর বা প্রীতমলাল সঙ্গীতশাস্ত্রে সুনিপুণ হইয়াছিলেন। যশোদাকুমারের তুই পুত্র রসিকলাল ও হেমলাল।

রসিকলাল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহাধ্যায়ী ছিলেন।

৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত প্রবন্ধ মধ্যে ইঁহার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় ইঁহার কাপড়ের কারবার ছিল। ১২৯৮ সালে, ভাদ্রমাসে অনন্ত চতুর্দশীর দিন ইনি পরলোক গমন করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ পানি

রসিকলালের একমাত্র পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ। ১২৭৫ সালের ১৭ই আশ্বিন, কৃষ্ণাদ্বিতীয়ার দিন সত্যেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বম্ভর পানির প্রপৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্য-সেবায় মনোযোগ দেন। "পুরোহিত"-সম্পাদক পরলোকগত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ইঁহাকে সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত করিয়া দেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম রচনা "বঙ্গনিবাসী" পত্রে প্রকাশিত হয়। "বঙ্গনিবাসী," "পুরোহিত," "অনুশীলন," "জন্মভূমি" প্রভৃতি পত্রিকায় ইঁহার রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

১২৯৬ সালে ইঁহার রচিত "কণ্ঠহার" নামক একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ডিমাই ১২ পেজী আকারে ২৫৭ পৃষ্ঠায় পুস্তকখানি সমাপ্ত। এই পুস্তক ব্যতীত ইঁহার রচিত নিম্নলিখিত রচনাবলী সাধারণের মধ্যে এককালে সমাদর লাভ করে ;—

নির্দয় জগৎ	"অনুশীলনে"	প্রকাশিত
হিন্দু পুরোহিতের আত্মোৎসর্গ	"পুরোহিতে"	"
হিন্দু রাজার কর্তব্যনিষ্ঠা	"অনুশীলনে"	"
অদৃষ্ট	"জন্মভূমিতে"	"
দুইবন্ধু	ঐ	"
যোগিনী	ঐ	"
উষা ও যামিনী	ঐ	"
সতীনারী	ঐ	"

'কুরুপাণ্ডব-কাহিনী'

১৩২০ সালের ফাল্গুন মাস হইতে সত্যেন্দ্রনাথ "কুরুপাণ্ডব-কাহিনী" নাম দিয়া মহাভারত হইতে কুরু ও পাণ্ডববংশের উপাখ্যান বাহির করিতে

আরম্ভ করেন। রয়েল আট পেজী আকারের এক ফর্মা করিয়া "কুরুপাণ্ডব-কাহিনী" বাহির হইতে থাকে। ইহার দুইটি সংস্করণ হয়। একটি সাধারণ এবং অপরটি রাজসংস্করণ। সাধারণ সংস্করণের প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল অর্ধ আনা এবং রাজসংস্করণের মূল্য ছিল এক আনা। পাইকা অক্ষরে "কুরুপাণ্ডব-কাহিনী" ছাপা হইত।

"কুরুপাণ্ডব-কাহিনী"র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথের লিখিত "সমর্পণ" নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আকাশ ভেদ করিয়া একটা নিদারুণ আর্তনাদ উঠিয়াছে—'রক্ষা কর, রক্ষা কর, প্রাণে বাঁচাও।' আজ জগৎ জুড়িয়া এই কাতর ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইতেছে। সংসারক্ষেত্র কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ, কলহ, বিবাদ, রোগ, শোক, মৃত্যু এবং অভাবের তীব্র দংশন-জ্বালায় অস্থির। চারিদিকে অশান্তির অনল দাউ দাউ জ্বলিতেছে। জীবগণ আর্তনাদ করিতে করিতে শান্তির আশায় ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছে।

একটা নদী পার হইলে শান্তির রাজ্য পাওয়া যায়। সেই নদীর 'এ পারে' দাঁড়াইয়া দেখিলাম, পাপের কোয়াসাতে 'ও পার' দেখিতে পাওয়া যায় না। চক্ষুতে এমন দৃষ্টিশক্তি নাই, হৃদয়ে এমন আধ্যাত্মিক বল নাই যে কোয়াসা ভেদ করিয়া 'ও পারের' কিছু দেখিতে সমর্থ হই! উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ও পারে শান্তি আছে?' প্রতিধ্বনি গম্ভীরস্বরে উত্তর পাঠাইল—'আছে।'

এ পারে মর্ত্যভূমি—কর্মক্ষেত্র—সাধনের লীলাস্থলী। ও পারে স্বর্গরাজ্য—শান্তির শীতল মন্দির! মধ্যে মায়ার নদী উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া যাইতেছে। নদীর জলে রিপু এবং প্রবৃত্তিরূপী ভীষণ জলচরেরা বাস করিতেছে।

গুরুদেব! আপনার দয়ামাত্র ভরসা করিয়া এ কর্ম এবং সাধন ক্ষেত্রে আমি অগ্রসর হইলাম এবং ইহার জয়-পরাজয় ফলাফল সমস্তই আপনার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। ইতি—

দীনহীন গ্রন্থকার"

কুরুপাণ্ডব-কাহিনী সাধারণ্যে আদৃত হইয়াছিল। সংবাদপত্র ও পণ্ডিত-সমাজ ইহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী, আনন্দবাজার প্রভৃতি সংবাদপত্র এবং প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, স্বর্গীয় কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন প্রভৃতি ভক্ত ও পণ্ডিতমণ্ডলী "কুরুপাণ্ডব-কাহিনী" পাঠে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

ঊনবিংশ সংখ্যা পর্যন্ত বাহির হইয়া কুরুপাণ্ডব-কাহিনীর প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। প্রতি সংখ্যায় ৮ পৃষ্ঠা হিসাবে বাহির হইত, সুতরাং এই উনিশটি সংখ্যায় সর্বসমেত ১৫২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।

"কুরুপাণ্ডব-কাহিনী" শেষ হইলে, বঙ্গসাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদে পরিণত হইত। সত্যেন্দ্রবাবুর ভাষা প্রাঞ্জল, লিখন ও বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর। গ্রন্থের ভাষা ও বর্ণনা স্থানে স্থানে এমন কবিত্বময়ী যে, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া সে পরিচয় প্রদত্ত হইল ;—

"হস্তিনাপুরের নিকটবর্তী গঙ্গাসৈকতে নব ঊষা প্রকটিত হইতেছে। শুভ্রাকাশ! শুভ্র দিগ্বালাগণ! যে দুই একটি তারা প্রদীপ্ত ছিল, তাহারাও নিবিয়া গেল। ধীরে হাস্যময়ী প্রকৃতি তাঁহার নক্ষত্রখচিত নীলাম্বরী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া ধীরে ধীরে সুবর্ণমণ্ডিত বসনভূষণে সজ্জিত হইলেন। সীমন্তে উজ্জ্বল লোহিতবিন্দু সীমন্তিনীশিরে গাঢ় সিন্দূরবৎ শোভা পাইল। ধীরে বসন্তানিল প্রবাহিত হইল। গঙ্গাজলে ধীরে ধীরে তরঙ্গ উঠিল, সে তরঙ্গ বালার্কের কিরণ-সম্পাতে বড়ই সুন্দর দেখাইল। দেখিতে দেখিতে তরুণ অরুণ কিরণে দশদিক্ হাসিয়া উঠিল।"

সত্যেন্দ্রবাবু, The Indian Royal Chronicle নামক ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকার প্রবর্তক ও সম্পাদক আহিরীটোলা নিবাসী অমৃতলাল দে মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যাকে বিবাহ করেন।

সত্যেন্দ্রবাবুর কালীপ্রসন্ন ও দেবীপ্রসন্ন নামে দুই পুত্র ও চারিটি কন্যা। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কালীপ্রসন্ন পরলোক গমন করিয়াছেন।

সত্যেন্দ্র বাবু Agra Bank, Central Bank, Alliance Bank of Simla প্রভৃতিতে কার্য করিয়াছেন। যখন কলিকাতায় Tata Industrial Bank স্থাপিত হয়, সে সময়ে সত্যেন্দ্রবাবু ইহার বহু অংশ (share) বিক্রয় করাইয়া দেন। এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তিনি ইহার প্রধান লেজার কিপার রূপে কিছুদিন কার্য করেন। পাটনার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরের রাজা বাহাদুরের স্থাপিত Raikut Industrial Bank এ তিনি কিছুদিন General Assistant ও Accountant রূপে কার্য করিয়াছিলেন।

কালীপ্রসন্ন পানি

সত্যেন্দ্র বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র কালীপ্রসন্ন একজন সাহিত্যসেবী ও সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। কালীপ্রসন্নের সাহিত্যপ্রতিভা ও নাট্য-প্রতিভার যশঃসৌরভ বিকাশের প্রারম্ভেই কুটিল কাল তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। যৌবনের মধ্যাহ্ন পথেই কালীপ্রসন্নের জীবননাটকে যবনিকাপাত হইল।

১২৯৯ সালে (ইং ১৮৯২ খৃঃ) চৈত্র মাসে রামনবমীর দিন কালীপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোর হইতেই সাহিত্যসেবা ও নাট্যকলার দিকে কালীপ্রসন্নের আসক্তি ও অনুরাগ জন্মে। গল্প, কবিতা, গান ও নাটক রচনায় কালীপ্রসন্ন যে দক্ষতা ইতিমধ্যে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অকালে কালকবলিত না হইলে, তাহা বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে একটি অপূর্ব সম্পদের সমাবেশ করিতে সমর্থ হইত।

কালীপ্রসন্নের রচনাবলী

১৩১০ সালের পৌষ মাসের "জন্মভূমি" মাসিক পত্রিকায় কালীপ্রসন্নের প্রথম কবিতা "প্রার্থনা" প্রকাশিত হয়। স্বীয় পিতা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে কালীপ্রসন্ন সাহিত্য-সাধনায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। জন্মভূমি, সাহিত্য-সংহিতা, প্রবাহিণী, বিকাশ, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বিবিধ রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাঁহার কয়েকটি প্রকাশিত রচনার তালিকা প্রদান করা হইল ;—

প্রার্থনা (কবিতা)	জন্মভূমি
ঐ ঐ	প্রবাহিণী

সর্বজয়ী (কবিতা)	সাহিত্য-সংহিতা
বর্ণনা-বিভ্রাট ঐ	ঐ
পাঁচুবাবুর পরিণাম (সচিত্র গল্প)	ভারতবর্ষ
নূতন হাওয়া (সচিত্র নক্সা)	মানসী ও মর্ম্মবাণী
ভিক্ষুক ও কৃপণ ধনী (সচিত্র নক্সা)	ঐ
রূপের ফাঁদ (সচিত্র গল্প)	ঐ

শেষোক্ত গল্পটি তাঁহার মৃত্যুর চারিমাস পরে অর্থাৎ ১৩৩০ সালের পৌষ মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় (৪৪৩ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হয়। পাঁচুবাবুর পরিণাম, নূতন হাওয়া, ভিক্ষুক ও কৃপণ ধনীতে যে বারখানি একাত্মক বা উভয় ভূমিকা সম্বলিত ভাবাভিনয় চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, চিত্রে প্রকটিত সমুদয় ভূমিকার অংশ কালীপ্রসন্ন একা অভিনয় করিয়া যে ভাবাভিনয়দক্ষতা ও প্রসাধন-কলা-শিল্পের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, তাহা সুন্দর।

বহু সভা, সম্মিলনী, সান্ধ্য-সম্মিলন প্রভৃতিতে কালীপ্রসন্নের বহু কবিতা ও গান সাদরে পঠিত ও গীত হইয়াছে। ১৩২৭ সালে কলিকাতায়, জোড়াসাঁকো রাজবাটীতে যেবার বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর ষষ্ঠ অধিবেশন হয় * সেই অধিবেশন উপলক্ষে কালীপ্রসন্ন যে উদ্দীপনাপূর্ণ "আবাহন" কবিতা রচনা করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"আবাহন

(১)

স্বাগত ! হে বীর, কর্ম্মী, সাধক,
সুবর্ণবণিক্ স্বজাতি-প্রাণ।
ধন্য আমরা দরশে সবার,
রেখেছ জাতির গৌরব মান॥
এ নহে আমোদ, শুধু হাসি খেলা,—
জাতির গতি-নির্ণয়-দিন।

* ১১ই পৌষ, রবিবার ১৩২৭ সাল।

আর না জাগিলে, এ জাতি অকালে,
হয়ে যাবে যে গো জীবনহীন ॥
পূত হইল এ মহামিলনী
তোমা সবাকার চরণ-স্পর্শে।
বিভুর আশিসে মিলি যেন মোরা
হাসিমুখে পুন বর্ষে বর্ষে ॥

(২)

বঙ্গজননী মুকুটের মণি
অতীত যুগে ছিল এ জাতি
বাংলার এক প্রান্ত হ'তে
অপর প্রান্তে দানিত ভাতি ॥
আমরা যে সেই অতীত যুগের
মহাজনগণ বংশধর।
তাঁদের স্মরিয়া, চল হে চলিয়া,
স্থাপি হে কীর্তি ধরণী'পর ॥
পূত হইল এ মহামিলনী
তোমা সবাকার চরণ-স্পর্শে।
বিভুর আশিসে মিলি যেন মোরা
হাসিমুখে পুন বর্ষে বর্ষে ॥

(৩)

নহিক আমবা শূদ্র জাতি,
ইতিহাস কহে বৈশ্য আর্য।
কর্ম মোদের বণিক্-বৃত্তি,
ধর্মরক্ষা, কৃষির কার্য ॥
লঙ্ঘি সাগর অর্ণবপোতে,
ভ্রমিতাম মোরা করিয়া গর্ব।
অলস হইয়ে আপন গৌরব
করেছি আমরা আপনি খর্ব ॥

পূত হইল এ মহামিলনী
তোমা সবাকার চরণ-স্পর্শে।
বিভুর আশিসে মিলি যেন মোরা
হাসিমুখে পুন বর্ষে বর্ষে॥

(৪)

বাংলার মাঝে শিক্ষা লভিয়া
ছুটেছে যে সব জাতি।
তাহাদের মাঝে প্রথমের পাছে
আমাদের ধীর গতি॥
পশ্চাৎ হইতে চল ছুটে যাই
লভিতে প্রথম স্থান।
শিক্ষার তরে নিয়োজিত করি
ধন, জন, মন, প্রাণ॥
পূত হইল এ মহামিলনী
তোমা সবাকার চরণ-স্পর্শে।
বিভুর আশিসে মিলি যেন মোরা
হাসিমুখে পুন বর্ষে বর্ষে॥

(৫)

মধ্যবিত্ত, ধনী, দরিদ্র
ভেদাভেদ সব ভুলিয়া যাও।
ভাব, প্রাণ, মন করি বিনিময়
সবে আলিঙ্গন দাও॥
দীনের আননে দাও হে অন্ন,
পণপ্রথা দাও বলিদান।
সুপ্ত শক্তি জাগুক হৃদয়ে
বেদনা-মুক্ত হউক প্রাণ॥
পূত হইল এ মহামিলনী
তোমা সবাকার চরণ-স্পর্শে।

বিভুর আশিসে মিলি যেন মোরা
হাসিমুখে পুন বর্ষে বর্ষে।

(৬)

স্বর্গ হইতে পিতৃপুরুষ
আশিস্-বারি করুন দান।
জ্বলুক হৃদে বিবেক-বাতি
কণ্ঠে ফুটুক মিলন-গান॥
নিরাশ করে কে আমাদের,
শুনেছি মধুর অভয় বাণী।
হস্তে মোদের বিজয় শঙ্খ,
চালক মোদের চক্রপাণি॥
পূত হইল এ মহামিলনী,
তোমা সবাকার চরণ-স্পর্শে।
বিভুর আশিসে মিলি যেন মোরা
হাসিমুখে পুন বর্ষে বর্ষে।"

কালীপ্রসন্নের তরুণ হৃদয়ে স্বজাতি-প্রীতির যে অনাবিল ফল্গুধারা প্রবাহিত ছিল, তাহারই অভিব্যক্তি এই "আবাহন" কবিতার ভিতরে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত। স্বজাতির অতীত গৌরবের সমুজ্জ্বল রাগে তাঁহার হৃদয় দীপ্ত ছিল, তাই তাঁহাদেরই আদর্শ পন্থা অনুসরণ করিয়া লোক-সমাজে স্মরণীয় ও গণনীয় হইবার—নানা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে ধরণীর মাঝে কীর্তি স্থাপন করিবার জন্য তিনি আকুলকণ্ঠে তাঁহার প্রত্যেক স্বজাতি ভ্রাতাকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন ঃ—

আমরা যে সেই অতীত যুগের মহাজনগণ বংশধর।
তাঁদের স্মরিয়া, চল হে চলিয়া,
স্থাপি হে কীর্তি ধরণী 'পর।

কালীপ্রসন্নের প্রকৃতি

কাব্যের ভিতর দিয়া কবিকে চেনা যায়, বুঝা যায়; কি প্রকৃতিতে কি ধাতুতে তাঁহার হৃদয় গঠিত তাহাও উপলব্ধ হয়। কালীপ্রসন্ন শান্ত-

শিষ্ট ছিলেন, ধর্মপরায়ণ ছিলেন, ঈশ্বরে তাঁহার বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল। শান্তি তিনি বড় ভালবাসিতেন, শান্তিতেই জীবন কাটাইয়া গেলেন। ইহার প্রতিচ্ছবি তাঁহার একটি কবিতার ভিতরে বড় সুন্দরভাবে দেখিতে পাই। বিগত ইয়োরোপীয় মহাসমর-নিবৃত্তির জন্য তিনি "ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা" জানাইয়া যে কবিতাটি রচনা করেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলে, ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে—

"আর না, আর না দেব! নিবার এ রণ!
বৃথা এই নরক্ষয় কর নিবারণ॥
তোমার ধরার গায়,
রক্ত-নদী বহে যায়,
এ কেমন মহারণ দ্বন্দ্ব অকারণ।
সম্বর, সম্বর দেব, রুদ্র প্রহরণ॥
প্রতিহিংসা কিম্বা, এই সমর-পিপাসা
মিটায়ে দাও হে দেব! যার যাহা আশা॥
শক্তিতে অধীর যারা,
সুধীর হউক তারা
জগতে আসুক শান্তি সমরে নিরাশা।
পূর্ণিমা আন হে দেব! নাশি অমানিশা॥

*   *   *   *

*   *   *   *

এ মহাসংগ্রামে যদি নষ্ট হয় সব।
ধরাপৃষ্ঠে উঠিবেক হাহাকার রব॥
সাহিত্য-বিজ্ঞান আদি,
চিত্রশিল্প জ্যোতিষাদি,
মরুভূমি হবে ধরা নষ্ট হবে সব
এস প্রভু! কর তুমি শান্তিপূর্ণ সব॥"

হাস্যরসের অবতারণায় কালীপ্রসন্ন

গম্ভীর রসের ন্যায় হাস্যরসের রচনাতেও কালীপ্রসন্নের দক্ষতা ছিল।

তাঁহার লিখিত রচনা-বিভ্রাট কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া আমরা সে পরিচয় প্রদান করিতেছি :—

"যদি পটল-চেরা চোক হ'ত, আর বাঁশীর মত নাক।
দেখে সবার সুনিশ্চয়ই লেগে যেত তাক্॥
যদি লক্ষ সর্পশিশুর মত হ'ত মাথার চুল।
দেখে, আঁতকে উঠ্ত সবাই যে নাইক তাতে ভুল॥
যদি সোণার মত রং হ'ত আর চাঁদের মত হাসি।
অবাক্ হ'য়ে থাক্ত সবাই নিশ্চয় দিবানিশি॥
কাঁদিলে যদি চক্ষু হ'তে ঝরিত মুক্তাফল।
মুক্তায় ভরি' যাইত নিশ্চয় গরিবের গৃহতল॥
কোকিলেব মত হ'ত যদি কভু কাহারও কণ্ঠস্বর।
কুহু কুহু ধ্বনি উঠিত সদাই প্রতি দেশে ঘর ঘর॥

* * * *

* * * *

যদি করিবর সম গজেন্দ্রগমনে চলিত সুন্দরী নারী।
ঘর দ্বার সবই হ'ত কম্পিত শুধু পদভরে ওগো তারি॥"

কালীপ্রসন্নের রচিত 'হরিদাস' নাটক

১৩২৬ বঙ্গাব্দে কালীপ্রসন্নের "হরিদাস" নামক একখানি নাটক প্রকাশিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অকৈতব ভক্ত, সিদ্ধ সাধক হবিদাসের জীবন-কাহিনী লইয়া এই পঞ্চাঙ্ক নাটকখানি গ্রথিত। বাংলার সুপ্রসিদ্ধ নাট্যশালা "ষ্টার থিয়েটারে" এই নাটক অভিনীত হয়। ১৩২৬ সালের ২১শে চৈত্র—ইহার প্রথমাভিনয় রজনী। পুস্তকখানি ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে ১২৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহা ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায়ের তৎকালীন স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক মহাশয়ের নামে উৎসৃষ্ট। এই নাটকখানি অমিত্রাক্ষর গৈরিশী ছন্দ (পদ্য) ও গদ্য উভয়ের সংমিশ্রণে রচিত। ইহাতে সর্বসমেত ১৬ খানি গান আছে। তন্মধ্যে একখানি সংস্কৃতে ও বাকী ১৫ খানি বাংলায় রচিত। সংস্কৃত গানখানি লেখকের

বৃদ্ধ-পিতামহ ভক্তকবি বিশ্বম্ভর পানির "সঙ্গীত মাধব" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বাকী পনেরখানি গানই কালীপ্রসন্ন রচনা করিয়াছেন। রচনা সুন্দর ও প্রাঞ্জল, গানের ভাবও সহজে বেশ বুঝা যায়। একখানি মাত্র গান উদ্ধৃত করিয়া কালীপ্রসন্নের সঙ্গীত রচনাশক্তি কি সুন্দর ছিল, তাহা প্রদর্শিত হইল—

"দিনের আলো নিবে এল' আঁধার জমে আকাশে।
জীবন-দীপও নিবে বুঝি কালের প্রবল বাতাসে।
দাঁড়িয়ে জীবন-সিন্ধুতীরে, ভ্রমি একা ঘুরে ফিরে,
আশায় থাকি পারের তরী আসে বুঝি ঐ আসে।
আসে নাকো, কেমনে গো ফিরে যাব নিজ বাসে॥"

গানগুলির ভাব ও ভাষা উভয়ই সুন্দর।

গ্রন্থকার এই নাটকে "আনন্দ" নামক একটি পরোপকারী ব্রাহ্মণের চিত্র আঁকিয়াছেন। এ চরিত্রটি ঐতিহাসিক নয়, এটি গ্রন্থকারের কল্পিত। গ্রন্থকারের লেখার গুণে চরিত্রটি সুপরিস্ফুট ও সুচিত্রিত হইয়াছে। তাহার নামের সহিত তাহার কার্যের সামঞ্জস্য সর্বত্রই রক্ষিত হইয়াছে, আনন্দ যখন যেখানে গিয়াছে, সেইখানেই আনন্দ বিতরণ করিয়াছে।

নাটকখানি ভক্তিমূলক। গ্রন্থকার অতি সাবধানে, নিপুণতার সহিত নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। যাহাতে এই গ্রন্থের সহিত বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহের সঙ্গতি রক্ষিত হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত ভূমিকার অংশবিশেষ পাঠে জানিতে পারা যায়,—"আমি বৃন্দাবননিবাসী শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বংশধর শ্রীপাদ গৌরগোপাল গোস্বামী প্রভুর ও পুরীধামস্থ হরিদাস প্রভুর মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীশ্যামাদাস বাবাজী মহাশয়ের দর্শন ও উপদেশ লাভ করিয়া এই নাটকের সহিত বৈষ্ণব শাস্ত্রের সঙ্গতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

পুস্তকখানির দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকারের এই নাটক-রচনা-শক্তির পরিচয় প্রদত্ত হইল।

মায়া যে স্থানে সাধনা-নিরত হরিদাসকে মুগ্ধ করিতে আসিয়াছে,

যেখানে সে অপরূপ-রূপ-লাবণ্যময়ী রমণীর মূর্তি ধারণ করিয়া হরিদাসের প্রেম-ভিক্ষা করিতেছে, যেখানে সে বলিতেছে—

"তুমি মহাজন! তব তরে কষ্ট পায়
ললনা-রতন, ফিরেও চাহ না তুমি,
এ কেমন ধর্ম আচরণ? করিছ
অনেক সাধনা, পুরস্কার লবে নাকি
রূপসী ললনা?

* * *

সত্য কহি নাথ, বড় ভালবাসি তোমা
হের রূপের ভাণ্ডার চরণে তোমার,
ফিরে চাও একবার।

* * *

হেরিলে না প্রিয়তম?"

সেখানে হরিচরণ-ধ্যানরত হরিদাস কি উত্তর দিতেছেন? তিনি বলিলেন—

"মাগো! হেরিতেছি চারিদিকে
কৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণময়, আকাশ হইতে
ধরা কৃষ্ণ ভরা, জাহ্নবীর তরঙ্গে
তরঙ্গে নাচে কৃষ্ণ নীলমণি।
তরুলতা সবই কৃষ্ণভরা,
পাখী গায় কৃষ্ণনাম। আহা!
হের গো জননি,—নীলমণি
যশোদাদুলাল, কাঙ্গালশরণ
হরি, করে বংশী ধরি, দাঁড়ায়ে
কদম্বমূলে, বংশী-স্বরে উথলিছে
রাধানাম। যমুনায় বহিছে উজান,
নৃত্য করে ময়ুর ময়ুরী,
পুচ্ছ তুলি ধায় ধেনুকুল,
রাখাল বালকগণ গায় কৃষ্ণ নাম।

আহা ! প্রেমময় হরির নয়নে
ঝরে প্রেমবারি, মুখে মৃদু হাসি।"

আর এক স্থানে—যেখানে বৃদ্ধ হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ দর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়া, বিশেষ আর্তির সহিত জানাইতেছেন—

"আমি অভাজন, দীন, ভক্তিহীন,
নাহি জানি পূজা, জপ, ধ্যান,
নাহি জানি পূজিবারে তোমা।
দেহে নাহি বল, হইয়াছি বৃদ্ধ আমি।
ভাবি মনে হ'বে কত প্রভুর সেবার ত্রুটি।"

সেখানে শ্রীচৈতন্যদেব শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য—এই চারি অবস্থা সম্বন্ধে হরিদাসকে কি মধুর সান্ত্বনা দিতেছেন,—তিনি বলিতেছেন—

"হরিদাস ! কেন কর খেদ ! বৃদ্ধ কিহে
হয় আত্মা ? বৃদ্ধ হয় তুচ্ছ কলেবর,
পঞ্চভূতে গড়া তনু, পঞ্চভূতে যাইবে
মিশিয়ে, দণ্ডে দণ্ডে হয় ক্ষয় তনু,
নিত্য হয় নব কলেবর। ছিলে শিশু,
হইলে বালক, তারপর মধুর কৈশোর,
পরে নবীন যৌবন মধ্যাহ্ন তপন সম,
ক্রমে এল প্রবীণতা, এবে হইয়াছ বৃদ্ধ,—
অস্তগামী সূর্যসম। প্রাণ যাহা,
আছে তাহা—দেহ মাত্র হয়েছে
অপটু। পুনঃ হরিনামে পাবে নব বল।"

কালীপ্রসন্নের সাহিত্য-সাধনার চরমোৎকর্ষ—'হরিদাস' নাটক বঙ্গ সাহিত্যের সহিত তাঁহার স্মৃতি সুন্দরভাবে বিজড়িত করিয়া রাখিবে।

অভিনেতা ও নাট্যাচার্য কালীপ্রসন্ন

পূর্বেই বলিয়াছি, কালীপ্রসন্ন একজন সুদক্ষ নট ছিলেন (পৃঃ ৪৪২)। কেহ তাঁহাকে অভিনয়বিদ্যা শেখান নাই—তাঁহার ভিতরে এই বিদ্যার বীজ

প্রচ্ছন্ন ছিল; অদম্য অধ্যবসায় ও সাধনার বলে তিনি অভিনয়-বিদ্যায় সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল যে একজন সুদক্ষ নট ছিলেন—একজন ভাবাভিনয়দক্ষ কলাবিদ্ ছিলেন তাহা নহে, তিনি উপযুক্ত অভিনয়শিক্ষক ছিলেন। কলিকাতার বহু অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায়ের তিনি নাট্যাচার্য ও পরিচালক ছিলেন, নিম্নে কয়েকটি মাত্র সম্প্রদায়ের নাম উল্লিখিত হইল;—

আহিরীটোলা ফ্রেণ্ডস্ এসোসিয়েসন
কুমারটুলি রিক্রিয়েশন ড্র্যামাটিক ক্লাব
ফ্রেণ্ডস্ ড্র্যামাটিক ক্লাব
আনন্দ নাট্যকুঞ্জ
পারিজাত নাট্যকুঞ্জ (এই সম্প্রদায়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন)

কলিকাতা ব্যতীত মফস্বলেব—বর্ধমান জেলার বৈদ্যপুব নামক স্থানের "রাজরাজেশ্বর নাট্য সমাজের"ও তিনি নাট্যাচার্য ছিলেন। এখানে তাঁহার শিক্ষকতায় বিল্বমঙ্গল, বনবীব ও দুর্গাদাস নামক তিনখানি নাটক বেশ কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয়। তাঁহার অভিনয়-শিক্ষকতাব সুযশ এরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল যে, বাঙালী সমাজেব বাহিবে—হিন্দুস্থানী সম্প্রদায় স্থাপিত "ভারতীয় নাট্য-সঙ্ঘে"ব নাট্যাচার্য পদে তিনি বৃত হন। এখানে হিন্দী নাটকের অভিনয় হইত, কালীপ্রসন্ন বেশ হিন্দী জানিতেন,—তিনি এখানে হিন্দী নাটকেব মহলা দেওয়াইতেন। মনোমোহন নাট্যমন্দিবে যখন এই সম্প্রদায় কর্তৃক "ক্রুর-কেশবী" নামক নাটক অভিনীত হয়, তখন কালীপ্রসন্ন এই নাটকেব নায়ক রাজা "যুগলকিশোরের" অংশ নিপুণতার সহিত অভিনয় করেন।

১৩২৯ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতায় ও মফস্বলে অনেকানেক অবৈতনিক সম্প্রদায়ের সহিত নানা নাটকে বিভিন্ন ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হন, কিন্তু কোন সাধাবণ নাট্যসম্প্রদায়ে যোগদান করেন নাই। মধ্যে একবার তিনি বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত "তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী" নামক বায়োস্কোপ সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। এই সম্প্রদায় সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "চন্দ্রনাথ" উপন্যাসের ছায়াচিত্র

৺কালীপ্রসন্ন পানি (দ্রোণের ভূমিকায়)

তোলেন। এই পুস্তকে কালীপ্রসন্ন "মণিশঙ্করে"র ভূমিকা অভিনয় করেন। তাঁহার গৃহীত ভূমিকাটি সুপরিস্ফুট ও ভাবব্যঞ্জক হইয়াছিল।

১৩৩০ সালে যখন আর্ট থিয়েটার কোম্পানী বিশিষ্ট কলাবিদ্‌গণের সমবায়ে সুপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ মহাশয়ের "কর্ণার্জুন" নাটক অভিনয় করেন, তখন কালীপ্রসন্ন এই সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া উক্ত নাটকের "দ্রোণাচার্য" ভূমিকা গ্রহণ পূর্বক বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। মধ্যে তিনি দুইদিন এ নাটকে "অর্জুনের" ভূমিকাও অভিনয় করেন।

কালীপ্রসন্নের মৃত্যু

২৬শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "রাজারাণী" নাটক উক্ত থিয়েটারে অভিনীত হয়। এই নাটকে কালীপ্রসন্ন "দেবদত্তে"র ভূমিকা অভিনয় করেন। এই অভিনয়ই তাঁহার শেষ অভিনয়। অভিনয়ান্তে বাড়ী ফিরিয়া কালীপ্রসন্ন অসুস্থ হইয়া পড়েন। পরদিন লক্ষ্মীপূজা,—বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজার আয়োজন হইতেছে—আর বাড়ীর জ্যেষ্ঠপুত্র নিদারুণ টাইফয়েড রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। দশদিন রোগভোগের পর ৫ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার (১৩৩০ সাল) ত্রয়োদশীর দিন, পিতামাতা ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া মাত্র একত্রিংশ বৎসর বয়সে কালীপ্রসন্ন অকালে পরলোক গমন করিলেন। কালের প্রবল বাতাসে অকালে তাঁহার জীবনদীপ নিবিয়া গেল।

বিশ্বম্ভর বাবুর অন্যান্য বংশধরগণ

ভক্তকবি বিশ্বম্ভরের দ্বিতীয় পুত্র নন্দকুমারের একটি মাত্র পুত্র হয়। ইঁহার নাম পীতাম্বর। কন্দর্প, ললিত, মন্মথ ও প্যারীমোহন নামে পীতাম্বরের চারিটি পুত্র জন্মে।

কবির তৃতীয় পুত্র যশোদাকুমারের দুই পুত্র—রসিকলাল ও হেমলাল। রসিকলাল ও তাঁহার বংশধরগণের কথা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে (পৃঃ ৪৩৮)। হেমলালের দুই পুত্র, হরিহর ও শশধর। ইঁহারা দুইজনেই জীবিত আছেন।

হরিহর কর্মোপলক্ষে আসামে অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শশধর কবির জন্মভূমি সেনহাটে থাকিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন।

বিশ্বম্ভরের চতুর্থ পুত্র নবকুমারের তিন পুত্র—প্রিয়লাল, বেহারীলাল ও বিনোদলাল। প্রিয়লালের শরচ্চন্দ্র নামে এক পুত্র হয়। ইনি জীবিত নাই। বেহারীলালের দুইকন্যা। কনিষ্ঠ বিনোদলালের অমূল্য, পুলিন ও কৃষ্ণ নামে তিনটি পুত্র হয়। অমূল্য তালতলার সুপ্রসিদ্ধ হরিসেনা-সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ কর্মী ছিলেন। ইনি পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিতেন। ধর্মানুরাগ, পরোপকার, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণে ইনি ভূষিত ছিলেন। ইনি জীবিত নাই। ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা পুলিনবিহারী পানি। পুলিনবাবু বাঁকীপুরে ওকালতী করিতেছেন।

বিশ্বম্ভরের পঞ্চম পুত্র তারাকুমারের অমৃতলাল ও বেণীলাল নামে দুই পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ অমৃতলালই হাওড়ার সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ স্বর্গীয় উকিল অমৃতলাল পানি। অমৃত বাবু ১২৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১২৮২ সালে (১৮৭৫ খৃঃ) প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি এল পাশ করিয়া হাওড়া জেলা কোর্টে যোগ দেন। ইনি ফৌজদারী বিভাগে ওকালতি করিতেন। এই ব্যবসায়ে অমৃতবাবু সম্মান ও প্রতিপত্তি উভয়ই প্রাপ্ত হন।

প্রায় ৪২ বৎসরকাল দক্ষতার সহিত ওকালতি করিয়া তিনি গত ১৩২৩ বঙ্গাব্দে এই ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার অবসর গ্রহণের পর, হাওড়ার বার লাইব্রেরীতে তাঁহার সহকর্মী বন্ধুগণ কর্তৃক তাঁহার চিত্র রক্ষিত হইয়াছে।

অমৃতবাবু কিছুকাল অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কার্য করিয়াছিলেন। ছয়বার তিনি স্থানীয় (হাওড়া) মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত হন। যোগ্যতার সহিত মিউনিসিপ্যালিটির কার্য করায়, মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক স্থানীয় বেনিয়াপাড়া লেনটিকে তাঁহার নামে নামকরণ করা হইয়াছে। এখন উহার নাম অমৃত পাইন লেন। এই গলিতে (রামকৃষ্ণপুরে) অমৃত বাবু বাস করিতেন। তিনি নিজে একজন পরম বৈষ্ণব। অমৃত বাবুই

স্বীয় পিতামহ বিশ্বম্ভর পানি মহাশয়ের "সঙ্গীতমাধব" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং "বৃন্দাবন-প্রাপ্ত্যুপায়" এই গ্রন্থ দুইখানি প্রকাশ করিয়াছেন। অমৃত বাবুর হরিপ্রসন্ন, সারদাপ্রসন্ন, রমাপ্রসন্ন, বরদাপ্রসন্ন ও কালীপ্রসন্ন নামে পাঁচটি পুত্র ও ছয়টি কন্যা হয়।

অমৃতবাবুর চতুর্থ পুত্র বরদাপ্রসন্ন ১২৮৯ সালের ৮ই অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই হাওড়ার সুপ্রসিদ্ধ উকীল বরদাপ্রসন্ন পাইন (পানি)। বরদা বাবু ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে St. Xavier's College হইতে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবাসী কলেজ হইতে বি এল পাশ করিয়া হাওড়ার আদালতে যোগদান করেন। তিনি ফৌজদারী বিভাগের একজন সুদক্ষ ও যশস্বী উকিল। অল্প দিনের মধ্যে তিনি এই ব্যবসায়ে যে সুযশ অর্জন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ গৌরবের কথা। অনেকানেক কঠিন মোকদ্দমায় তিনি বড় বড় উকিল বা ব্যারিষ্টারের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াও জয়লাভ করিয়াছেন। গরিব বা অসমর্থের মোকদ্দমায় তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। তিনি স্বাধীনচেতা, তেজস্বী ও একজন দেশভক্ত। Empire নামক ইংরাজী দৈনিকখানি যখন বাহির হয়, তখন তিনি এক বৎসরকাল ইহার নিয়মিত লেখক ছিলেন।

তারাকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র বেণীলাল কাশীতে ব্যবসা করিতেছেন। উমাপ্রসন্ন, বামাপ্রসন্ন, রাধাপ্রসন্ন, ভবানীপ্রসন্ন ও দেবীপ্রসন্ন নামে বেণীলালের পাঁচটি পুত্র হয়। তাঁহার দুইটি পুত্র কাশীতে কয়লার ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন এবং বাকী তিনজন কলিকাতার নিউ মার্কেটে V. P. Stores নামে দোকান করিয়াছেন।

কবি বিশ্বম্ভরের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে মহেন্দ্র ও গোপেন্দ্র নামে দুইটি পুত্র হয়। হীরালাল ও পুলিন নামে মহেন্দ্রের দুই পুত্র জন্মে। হীরালাল বাবু কলিকাতায় City of Glasgow Life Insurance কোম্পানীর বড়বাবু। কনিষ্ঠ পুলিনচন্দ্র ব্যবসাকর্মে লিপ্ত।

বিশ্বম্ভর বাবুর জন্ম-পত্রিকা

"শুভমস্তু। শকাব্দা ১৭০৭।৬।০।১৬।৩০।০। এতচ্ছকাব্দীয়সৌরকার্তিকস্য প্রথমদিবসে শনিবারে শুক্লপক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ দিবা খরামপলাধিক-

ষোড়শদণ্ডমধ্যে শুভধনুর্লগ্নে গুরোঃক্ষেত্রে পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্রে কুম্ভরাশৌ চন্দ্রে নরগণে বৈশ্যবর্ণে শ্রীকানাইচরণপানিদাসস্য প্রথম পুত্রো জাতঃ। তস্য রাশ্যাশ্রিতং নাম শ্রীসিদ্ধেশ্বরপানিদাস ইতি। নিদ্রাভঙ্গনাম শ্রীবিশ্বম্ভরপানিদাসঃ।"

বিশ্বম্ভর বাবুর পূর্বপুরুষের নাম

কবির পৌত্র অমৃত বাবুর গৃহ হইতে কবির পঞ্চম পুত্র তারাকুমারের হস্তলিখিত একখানি খাতা (তুলোট কাগজ) হইতে কবির ঊর্ধ্বতন ছয় পুরুষের নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায়—

গোপালচবণ পানি
|
মথুবামোহন পানি
|
হরিচবণ পানি
|
রূপচবণ পানি
|
নীলাম্বব পানি
|
কানাইচবণ পানি

বিশ্বম্ভর বাবুর মৃত্যু

১৭৭৬ শকাব্দের (বাং ১২৬১ সাল) ২৭শে আষাঢ় (ইং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দেব ১০ই জুলাই) পূর্ণিমার দিন ভক্তকবি বিশ্বম্ভর পরলোক গমন করেন।

স্বর্গীয়া চুণিমণি দাসী

[এই ছবির ব্লক ডাঃ শ্রীযুক্ত রামদাস দে মহাশয়ের সৌজন্যে প্রা

স্বর্গীয়া চুণিমণি দাসী

স্বর্গীয়া চুণিমণি দাসী ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। এই মহীয়সী মহিলার পিতার নাম বদনচন্দ্র চন্দ্র। পরমভাগবত বৈদ্যনাথ দে মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বৈদ্যনাথ বাবু কাল্‌নার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ইঁহাদের চারি পুত্র ও তিন কন্যা। প্রথম পুত্র নরসিংহচন্দ্র দে; ইঁহারই পুত্র ডাঃ রামদাস দে; মধ্যম পুত্র গৌরমোহন দে; ইঁহাব পুত্র কৃষ্ণদাস দে; ইনি কলিকাতা সুবর্ণবণিক্-সমাজের একজন বিশিষ্ট কর্মী। বৈদ্যনাথ বাবুর তৃতীয় পুত্র সাতকড়ি দে ও কনিষ্ঠ পুত্র তিনকড়ি দে।

বৈদ্যনাথ বাবুব পিতাব নাম রাধাকান্ত দে। রাধাকান্ত বাবুর দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ বৈদ্যনাথ ও কনিষ্ঠ কাশীনাথ। বৈদ্যনাথ বাবুর প্রথমা কন্যা ব্রজেশ্বরী দাসী। ইঁহারই প্রথমা কন্যা সারদামণি দাসীর সহিত কবিবর অক্ষয়কুমাব বড়ালের বিবাহ হয়।

চুণিমণি ডাঃ চন্দ্রের অপেক্ষা বয়সে ৪।৫ বছবেব বড় ছিলেন।

বৈদ্যনাথ বাবু 'মধুসূদন মল্লিক এণ্ড কোং' নামক জুয়েলাবী প্রতিষ্ঠানের অংশীদাব ছিলেন। সংসারী হইলেও, তাঁহাব আদর্শ জীবন ছিল। ধর্মকর্ম, দানধ্যান, ও হরিকীর্তনাদিতে স্বামী স্ত্রী উভয়েই সর্বদা রত থাকিতেন। তাঁহাদের এই ধর্ম ও বৈষ্ণববিনয় আজিও তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে চুণিমণির স্বামী বৈদ্যনাথ বাবুর মৃত্যু হয়। ইহারই চারি বৎসর পরে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতে বিপত্নীক অবস্থায় ডাঃ চন্দ্র মারা যান।

সম্পত্তি লাভ ও ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠা

ডাঃ চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ (প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা) উত্তরাধিকাবসূত্রে চুণিমণি লাভ করেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে (১৩০৭ সালের ২১এ মাঘ) চুণিমণি তাঁহার বাসস্থানের (৭০ নং শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন) সন্নিকটে, ৬।১ নং গোবিন্দ সেনের গলিতে পাঁচ কাঠা জমির উপর একটি দ্বিতল ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুরবাড়ীর জমি ক্রয়ে ও বাড়ী তৈয়ারী বাবদ ৪০,০০০ হাজার টাকা খরচ হয় এবং ৭৫,০০০ হাজার টাকা ঠাকুরবাড়ীর সেবাদিকার্য পরিচালনার জন্য অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের নিকট জমা রাখেন। উক্ত ৭৫,০০০৲ টাকা বর্তমানে এক লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

ঠাকুরবাড়ীর দরজার পার্শ্বে শ্বেত প্রস্তরে নিম্নলিখিত ফলক উৎকীর্ণ আছে—

"শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেব জীউ ও শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দদেব জীউব
প্রীত্যর্থে পরম ভাগবত ৺বৈদ্যনাথ দের সহধর্মিণী
পরম ভক্তিমতী শ্রীমতী চুণিমণি দাসী কর্তৃক
এই দেবমন্দির
প্রতিষ্ঠাপিত হইল। ২২শে মাঘ সন ১৩০৭ সাল"

রাস, ঝুলন ও দোলের সময় উৎসব হয় কিন্তু রথযাত্রায় নয় দিন অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের সেবা হয়। রথের উৎসবে প্রতি বৎসর ৮০০৲ টাকা খরচ হয়।

ঠাকুরবাড়ীর কার্য-পরিচালনার জন্য একজন পুরোহিত, একজন পাচক, সরকার একজন, এবং একজন চাকর ও একজন ঝি নিযুক্ত আছে। ঠাকুরবাড়ীর বর্তমান সেবাইত শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দে; ইনি চুণিমণি দাসীর কনিষ্ঠ পুত্র ৺তিনকড়ি দের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীযুক্ত সাতকড়ি দে, শ্রীযুক্ত কানাইলাল দে ও শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দে—ইহারা ঠাকুরবাড়ীর বর্তমান ট্রাষ্টি।

চুণিমণি স্থাপিত ঠাকুরবাড়ীটি দ্বিতল। একতলায় বহির্বাটিতে বিস্তৃত উঠান, তিন ফুকুরে ঠাকুরদালান, ঠাকুর ঘর, এবং অতিরিক্ত তিনখানা ঘর; ভিতর বাটীতে ভোগের ঘর ও রান্নাঘর এবং দ্বিতলে তিনখানা ঘর আছে।
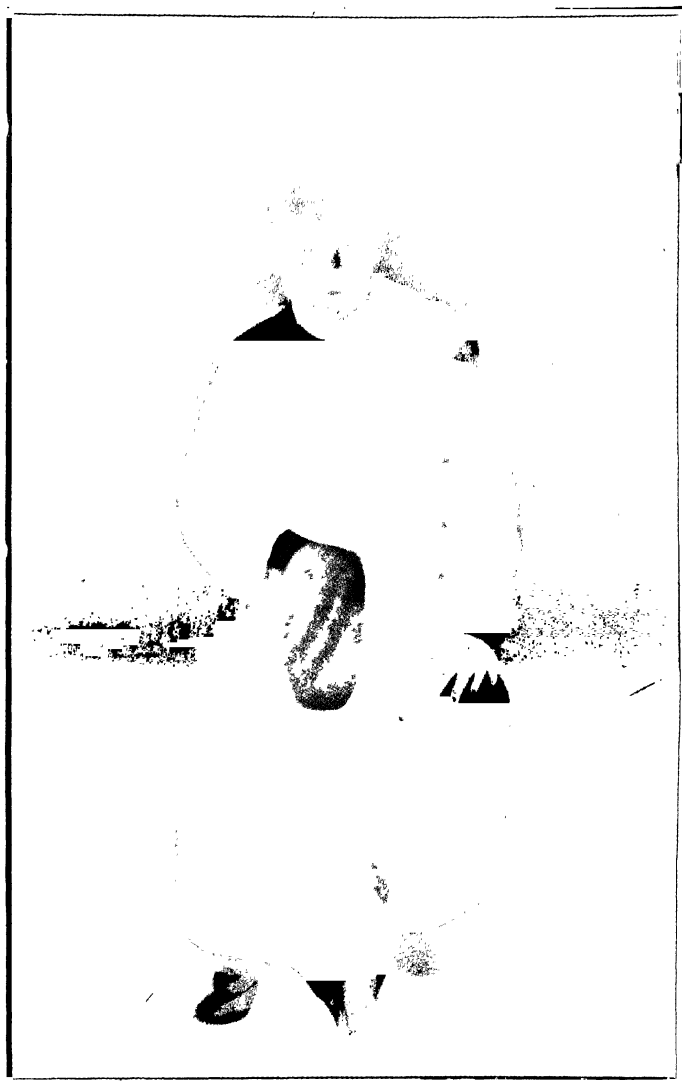
৺বৈদ্যনাথ দে

চুণিমণি ও মেরী চন্দ্র

ডাঃ চন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী চুণিমণিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। সার্কুলার রোডের বাড়ীতে থাকিবার সময় মাঝে মাঝে তাঁহার দিদি ও ভাগিনেয়দিগকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার পত্নী মেরী চন্দ্রও চুণিমণিকে খুব ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। পরস্পরের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিষের আদান প্রদান চলিত। নিম্নে মেরী চন্দ্রের প্রেরিত একখানি Christmas card ও দুইখানি পত্রের প্রতিলিপি প্রদান করা গেল। কার্ডের প্রতিলিপি নিম্নরূপ :—

"Christmas 1884

For dear sister with
love and best wishes for
the Happy Christmas
and New Year to her and
her husband
from her affectionate brother & sister
Rajendra & Mary Chandra
London
To Mrs. Buddee Nath Dey"

প্রথম পত্র নিম্নরূপ :—

"My dear Sister,

Thank you very much for your present of fruits and sweetmeats. Reggie * and I am both so much obliged.

Hope you are all quite well, always your affectionate sister

Mary Chandra

To Mrs. Buddee Nath Dey"

দ্বিতীয় পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

---

* মেরি চন্দ্র তাঁহার স্বামীকে রেজী বলিয়া ডাকিতেন।

"93 Lower Circular Road
Calcutta
November 13th/81

My dear Sister,

I send a present I brought for you from England and also a present for coats of your two boys as I promised. Your present is a white shawl. I hope you will find comfortable in the cold weather ; it is a very choice kind at home ; for the boys I have brought three yards of the best English cloth to make them cold weather clothes. I hope you will all like your presents ; I had a great deal of pleasure in getting them for you. I have come back. Much better for my trip to England and will come and see you all as soon as I can manage it. I hope your husband and all are quite well.

I must finish my letter now and good bye.
Always your affectionate sister
Mary S. Chandra"

সাতকড়ি দে

চুণিমণির তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সাতকড়ি দে মহাশয় Deputy Accountant General of Posts and Telegraphs ছিলেন। উপস্থিত তিনি পেন্‌সনভোগী। তিনি পরম বৈষ্ণব ও বহুসদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি।

সুবর্ণবণিক্-কথা ও কীর্তি
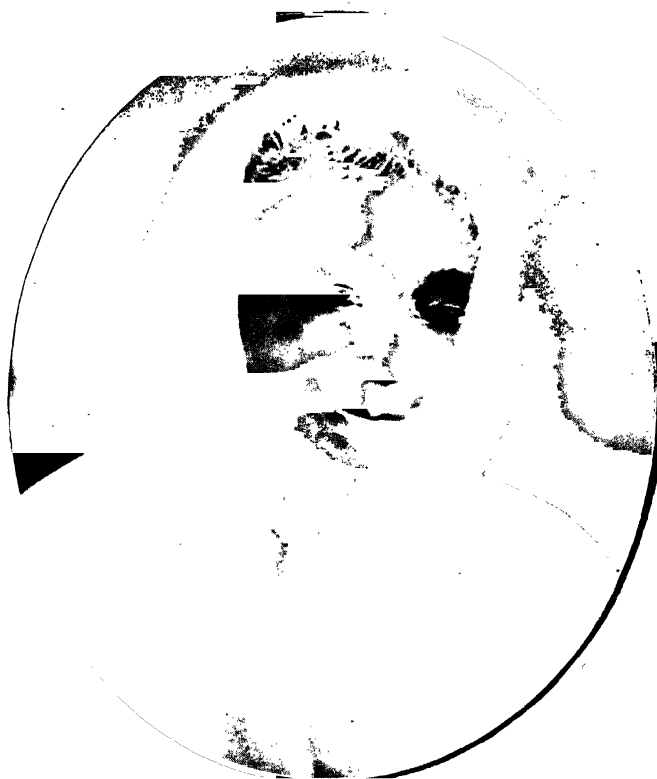
৺পুরসুন্দরী দাসী

৺পুরসুন্দরী দাসী

স্বর্গীয় মতিলাল শীল মহাশয়ের পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা। পাঁচ কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজরাণীর সহিত জোড়াসাঁকো নিবাসী শ্যামলাল মল্লিক মহাশয়ের বিবাহ হয়। ইঁহার তিন কন্যা, জ্যেষ্ঠা ব্রজসুন্দরী, মধ্যমা পুরসুন্দরী ও কনিষ্ঠা নিস্তাবিণী। জ্যেষ্ঠার সহিত শিক্‌দারপাড়ার সন্নিকটবর্ত্তী সুবলদাস সেন মহাশয়ের বিবাহ হয়। ইঁহারই পুত্র ডাক্তার রামলাল সেন। মধ্যমা পুবসুন্দরীর সহিত ২নং তারাচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট নিবাসী হৃষীকেশ মল্লিক মহাশয়েব বিবাহ হয়। কনিষ্ঠা নিস্তারিণীর স্বামী বলাইচাঁদ দত্ত। ইনি মধুপুরে দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং তৎপত্নী নিস্তারিণীও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দান কবেন (পৃঃ ২৯৬-৩০৯)।

স্বামীর মৃত্যু

পুরসুন্দরীর স্বামী হৃষীকেশ বাবুর পিতা শিবচন্দ্র মল্লিক মহাশয় শিক্‌দারপাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধনামা নিমাইচবণ মল্লিক মহাশয়ের খুল্লতাত-পুত্র। শিব বাবুর জীবদ্দশায় হৃষীকেশ বাবু ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যান। বিলাতে অবস্থান কালেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে পীড়াপীড়ি করেন। তদনুসারে তিনি প্রায়শ্চিত্তের দিন টালিগঞ্জের বাগানবাড়ীতে স্নান করিতে গিয়া, পুকুরে ডুবিয়া মারা যান। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। তখন পুরসুন্দরীব বয়স অনুমান ২০।২১ বৎসর। একটি মাত্র শিশু কন্যা লইয়া তিনি বিধবা হন।

কন্যা-জামাতার মৃত্যু এবং ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা

যথাসময়ে উক্ত কন্যা মনোমোহিনীর সহিত বহুবাজার নিবাসী শ্রীনাথ সেন মহাশয়ের বিবাহ হয়। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে প্রথমে

মনোমোহিনী এবং তৎপরে তাঁহার স্বামী মারা যান। কন্যা-জামাতার মৃত্যুর পর পুরসুন্দরী তাঁহার বাৎসরিক আয়ের সমস্ত অর্থ দেবসেবা ও জনহিতে নিয়োজিত করেন। ধর্মকর্ম ও জনসেবায় তাঁহার আগ্রহ ও নিষ্ঠা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকে। এই সময়ে তিনি আর একটি শোকের আঘাত পান। ১৩১০ সালের ২৭শে আষাঢ় তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী নিস্তারিণী পরলোক গমন করেন। এই সময় হইতে তাঁহার স্থায়ী কোন একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বাসনা হয়; এবং ইহার ফলে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তিনি এই ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মশালা প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন বৎসর পরে তিনি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁহার কিঞ্চিদধিক আশি বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

অভিভাবকহীন হিন্দু বিধবার কল্যাণে যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান দ্বারা বহুলোকের কল্যাণ সাধিত হইতেছে, তাহাই তাঁহার নামকে দেশের জনসাধারণের নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

পুরসুন্দরীর ট্রাষ্ট ডিড্

তিনি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে একখানি Trust Deed সম্পাদন ও স্বাক্ষর করিয়া, ৭৯০০০৲ উন আশি হাজার টাকা ব্যয়ে এই ধর্মশালা স্থাপন করেন। নিম্নলিখিত পাঁচজন ব্যক্তিকে ট্রাষ্টি করিয়া তিনি তাঁহাদের উপর এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার দেন—

১। ডাক্তার প্রভাতচন্দ্র হালদার
২। শ্রীযুক্ত গোপাললাল চক্রবর্তী
৩। " সতীশচন্দ্র সরকার
৪। " নিতাইচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায়
৫। ডাক্তার রামলাল সেন*

এবং এই ধর্মশালার পরিচালন-ব্যয় ও সংস্কারাদি কার্যের জন্য তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের শতকরা পাঁচ টাকা সুদের (Government Promis-

* ইনি পুরসুন্দরীর মধ্যমা ভগ্নীর পুত্র।

স্থবর্ণবণিক্-কথা ও কীর্তি

পুরসুন্দরী ধর্মশালা, কলিকাতা
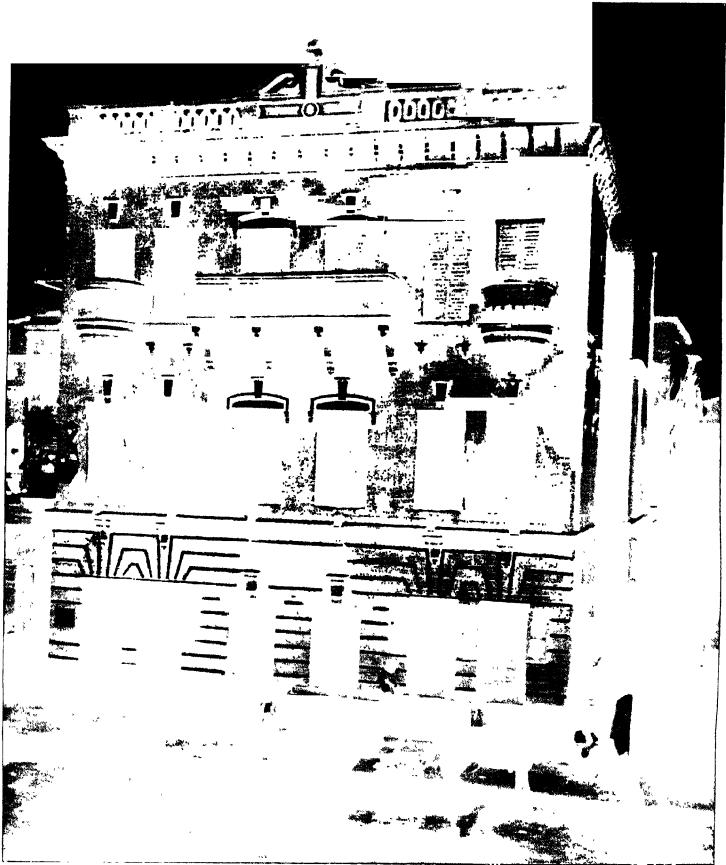
sory Notes of five per cent loan of 1939-1944) কোম্পানীর কাগজ পূর্বোক্ত ট্রাষ্টিগণের হস্তে অর্পণ করেন।

'পুরসুন্দরী ধর্মশালা'র পরিচয়

ধর্মশালার জমির পরিমাণ--৮ কাঠা পাঁচ ছটাক দশ বর্গ ফিট। রাস্তার উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায়, ইহার দক্ষিণ দিক্ খোলা রহিয়াছে। তিন ভাগে বা অংশে (block) এই বাড়ীটি তৈয়ারী। রাস্তার ধারের বা দক্ষিণ দিকের অংশ ত্রিতল, মধ্যের অংশ এক তল (ইহার উপরে কয়েকটি পাকের ঘর মাত্র অবস্থিত) এবং ভিতরের বা উত্তর দিকের অংশ ত্রিতল। ভিতরে দুইটি বিস্তৃত উঠান আছে।

ধর্মশালার ভিতরে অনেকগুলি জলের কল থাকা সত্ত্বেও একটি তিনশত ফিট গভীর নলকূপ আছে। সর্বসমেত ২৪ খানি ঘর রহিয়াছে, তন্মধ্যে ৪খানি ঘর কর্মচারী ও চাকর-দরওয়ান এবং কার্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট, বাকী ২০ খানি ঘর যাত্রীদিগের আবাসরূপে ব্যবহৃত হয়। এককালে একশত জন লোক এই ধর্মশালায় থাকিতে পাবে।

প্রথম অংশে (দক্ষিণ দিকে) একতলে তিনখানি, দ্বিতলে তিনখানি ও ত্রিতলে তিনখানি, মোট নয়খানি ঘর। দ্বিতল ও ত্রিতলের ঘরগুলির কোলে প্রশস্ত ঢাকা বারান্দা আছে। এই অংশ অন্যান্য অংশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ইহার সিঁড়িও আলাদা।

দ্বিতীয় বা মধ্যের অংশের নীচের তলায় কার্যালয় ও কর্মচারীর ঘর এবং ইহার দ্বিতলে আটখানি পাকের ঘর আছে।

তৃতীয় বা উত্তর দিকের অংশের উপর-নীচে সর্বসমেত ১২খানি ঘর আছে। সাধারণত মহিলা লইয়া কেহ আসিলে, এই অংশেই প্রথম তাঁহাকে স্থান দেওয়া হয়। এই অংশটি কতকটা অন্তঃপুরের মত। এই অংশে বাসের ঘর ছাড়া ৪খানি পাকের ঘরও আছে।

ধর্মশালায় তিনটি বাথরুম বা স্নানাদির ঘর ও নয়টি পায়খানা রহিয়াছে। ইহার বাসের জন্য নির্দিষ্ট ঘরগুলিতে আলোর ব্যবস্থা নাই। কিন্তু সিঁড়ি, বারান্দা ও উঠানে বৈদ্যুতিক আলো বর্তমান। বাসের ঘরের আলোর ব্যবস্থা যাত্রীদিগের নিজেদেরই করিতে হয়।

বাড়ীঘর পরিষ্কার রাখিবার ও ব্যবস্থাদির জন্য একজন দরওয়ান, একজন চাকর, একজন মেথর ও একজন কর্মচারী আছে।

রৌদ্র, বাতাস ও আলোকযুক্ত এই সুন্দর ধর্মশালাটি সহজেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুব্যবস্থা ও সুপরিচালনার গুণে ইহা বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং যাত্রীদিগের অবস্থানের পক্ষে ইহা সুবিধা ও আরামজনক। ট্রাম ও বাজার নিকটেই।

তিন দিন পর্যন্ত এখানে বিনা খরচে থাকিতে পারা যায়। তবে ট্রাষ্টিগণের অনুমতি পাইলে, যাত্রীরা ইহার অধিক দিনও থাকিতে পারেন।

ধর্মশালায় প্রবেশ করিবার দুইটি পথ আছে—একটি মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট। রাস্তার উপর ধর্মশালার গায়ে পাথরের ফলকে নিম্নলিখিত বাংলা কবিতাটি উৎকীর্ণ আছে :—

"শ্রীশঃ

গৌতমীয় শীল মল্লিক বংশ সমুদ্ভব
তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রিট বাসীর গৌরব ;
বিদ্যোৎসাহী সুবিদ্বান্—বাণিজ্যপ্রবীণ—
শিবসুত'ধর্মিণী শ্রীপুরসুন্দরী
স্থাপিলা এ ধর্মশালা হৃষীকেশে *স্মরি॥"

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা জে সি মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ধর্মশালার দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

ধর্মশালার ট্রাষ্টিদিগের মধ্যে বর্তমানে একজন চিকিৎসক আছেন। হঠাৎ কোন সহায়হীন যাত্রী অসুস্থ হইয়া পড়িলে, ইনি তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করেন।

আট বৎসর হইল, এই ধর্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; এই আট বৎসরের মধ্যে প্রথম সাত বৎসরে মোট ১৮৬৭৬ জন লোক ইহাতে বাস করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ধর্মশালার প্রকাশিত কার্য-বিবরণ হইতে নিম্নে সাত বৎসরের যাত্রি-সংখ্যার একটি বিস্তারিত তালিকা প্রদত্ত হইল :—

* মতী পুরসুন্দরীর স্বামী ৺হৃষীকেশ মল্লিক।

বৎসর	পুরুষ	স্ত্রী	বালক-বালিকা	মোট
১৩৩৬ সাল	৩৫৮	১৫৬	৭৭	৫৯১
১৩৩৭ ”	৬৯৩	৩৩৫	২১১	১,২৩৯
১৩৩৮ ”	৯১২	৪২৫	৩১০	১,৬৪৭
১৩৩৯ ”	১,৩০৬	৬৮১	৩৮৮	২,৩৭৫
১৩৪০ ”	২,৩৩৫	১,০৪১	৫৯৫	৩,৯৭১
১৩৪১ ”	২,৪৯২	১,১৯৫	৫৯৬	৪,২৮৩
১৩৪২ ”	২,৮৭৯	১,০৪৬	৬৪৫	৪,৫৭০
			মোট	১৮,৬৭৬

১৩৪২ সালে স্বর্গীয়া পুরসুন্দরীর ভগ্নী-পুত্র ও ধর্মশালার অন্যতম ট্রাষ্টি ডাক্তার রামলাল সেন এল্ এম্ এস্ মহোদয়ের মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় বি এ মহোদয় অন্যতম ট্রাষ্টি নির্বাচিত হইয়াছেন।

প্রতি মাসেই একবার করিয়া ট্রাষ্টিগণের সভা হয়! উক্ত সভায় আয়-ব্যয় ও অন্যান্য বিষয়-সংক্রান্ত কার্যাদির আলোচনা হইয়া থাকে।

পুরসুন্দরীর মৃত্যু

ধর্মশালা প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন বৎসর পরে, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর শ্রীমতী পুরসুন্দরী পরলোক গমন করেন।

ধর্মশালায় বাঙালী ছাড়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যভারত প্রভৃতি স্থান হইতেও বহু হিন্দু আসিয়া বাস করিয়াছেন। পরিচালকবর্গের সুব্যবস্থার গুণে তাঁহাদের অবস্থানের কোনই অসুবিধা হয় নাই।

ধর্মশালায় অবস্থানকারিগণের অভিমত

মন্তব্য-পুস্তক হইতে তিনখানি অভিমত উদ্ধৃত হইল।

(১)

"We, forty-one students and three professors of Bareily

College, put up in the Pur-Sundari Dharmashala for about a week. We were extremely comfortable and felt quite at home. Our best thanks to the management for their kindness and unfailing courtesy.

13th November, 1932 — Sd/. B. P. Sukshane M. Sc., L.L.B.
Professor-in charge of the tour"

(২)

"Certified that the arrangements of the Pur-Sundari Dharmashala are very nice and the treatment of the staff is very good.

Sd/. Har Krishna Lall Khettry
13th May, 1937 — 321 Janti Bhawan Allahabad".

(৩)

"I put up in the Dharmasala with my family. I found it neat and clean. The management is highly satisfactory. I am highly satisfied with the treatment of the manager and other staff.

Sd/. Ratan Lall Khanna
13. 5. 1937 — Buland Shahar"

ধর্মশালার নিয়মাবলী

এই ধর্মশালায় যাঁহারা বাস করিবেন, তাঁহাদের জন্য কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সময়ে সময়ে ট্রাষ্টিদিগের দ্বারা এই সমস্ত নিয়মের পরিবর্তনাদি হইয়া থাকে। নিম্নে ইহার কয়েকটি প্রধান নিয়মের উল্লেখ করা হইল :—

"১। হিন্দু ধর্মাবলম্বী মফস্বলবাসী জনগণ তীর্থযাত্রা ও গঙ্গাস্নানাদি কার্যব্যপদেশে কলিকাতা আসিয়া থাকিবার যোগ্যস্থানের অভাব অনুভব করত অনুকম্পাপূর্বক এখানে উপস্থিত হইলে, যত্নের সহিত স্থান দিবার চেষ্টা করা হইবে।

২। প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত জনগণ ইচ্ছা ও আবশ্যক বোধ করিলে একাদিক্রমে তিনদিন থাকিতে পারিবেন।*

৩। বাসস্থান, পাকশালা ও আবশ্যকীয় জলের বন্দোবস্ত ব্যতীত আলোক প্রভৃতি যাত্রিগণের অন্যান্য প্রয়োজনীয়-বস্তুর সরবরাহের ব্যবস্থা নাই।

৪। সংক্রামক-পীড়াগ্রস্ত কাহাকেও এখানে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না বা চিকিৎসিত হইবার জন্য কোন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি এখানে থাকিতে পান না।

৫। বারাঙ্গনা বা ভ্রষ্টা বা গৃহ হইতে পলায়িতা নারীর সহিত কেহ প্রবেশাধিকার পাইবেন না। তদ্রূপ নারীকে অন্যরূপে পরিচিত করিয়া কেহ প্রবেশাধিকার লাভ করিলে, কর্তৃপক্ষ জানিতে পারামাত্র তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গিনীকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে ও অভিযুক্ত করিতে বাধ্য হইবেন।

৬। দ্বারবান বা কর্মচারিগণ কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকার পারিতোষিক লইবে না। কেহ কিছু দাবী করিলে, তাহা যাত্রীরা কর্তৃপক্ষের গোচর করিবেন।

৭। যাত্রিগণ রেজেষ্টারি বহিতে নিজ নিজ নাম ও বাসস্থান অনুগ্রহপূর্বক লিখিয়া দিবেন। স্বহস্তে যাঁহারা লিখিতে অনিচ্ছুক বা অপারগ, কর্মচারী তাঁহাদের নাম ঠিকানা লিখিয়া লইবেন।”

চব্বিশটি নিয়মের মধ্যে উপরিলিখিত সাতটির উল্লেখ করা হইল।

গত ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে এখানে ৩১০২ জন পুরুষ, ১৩৩২ জন স্ত্রীলোক, ৭৫১ জন বালক-বালিকা—সর্বসমেত ৫১৮৫ জন লোক বাস করিয়াছেন; ইহার পূর্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে সর্বসমেত ৪৫৭০ জন লোক বাস করেন। উত্তরোত্তর এই ধর্মশালায় অধিবাসীর সংখ্যা বর্ধিত হইতেছে।

১৩৩৫ সাল হইতে ১৩৪২ সাল পর্যন্ত সাত বৎসরে কোম্পানীর

* পরিচালকবর্গ ইচ্ছা করিলে বা তাঁহারা অনুমতি দিলে এখানে তিন দিনের অধিকও থাকিতে পারা যায়।

কাগজের সুদ হিসাবে ১৩১৯৩৬/১০ আয় হইয়াছে এবং এই কয় বৎসরে পরিচালনাবাবদ ব্যয়াদি নির্বাহ করিয়া ৪৭২১৬৯/১০ উদ্বৃত্ত আছে।

নিম্নে ধর্মশালাপ্রতিষ্ঠাত্রী পুরসুন্দরীর ন্যাসপত্র (Trust Deed) হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

"Know all men by these presents that I Sreemutty Pura Sundari Dassi, widow of late Rishikesh Mullick, residing at *No. 2, Tara Chand Dutta Street* in the town of Calcutta by caste Subarnabanick, Hindu landlady, send greeting whereas by an Indenture of Conveyance bearing date the *First day of May, One-thousand Nine-hundred and Twenty-nine,* the said Sreemutty Pura Sundari Dassi out of her own money purchased the premises *No. 62/4, Beadon Street* in the town of Calcutta intended to be hereby conveyed and transferred; and whereas I.........am absolutely seized and possessed of the said premises; and whereas I......am desirous of establishing a Pilgrim House and creating a money endowment for the same; and whereas I.........do hereby transfer unto the Trustees hereinafter named *Five Government Promissory Notes* of five per cent loan of 1939-1944, Nos. T.001423 to T 001427 *for Rupees Ten-thousand each* for the purposes hereinafter expressed; and whereas I ......hereby freely and voluntarily grant and convey and transfer.........all that *three Blocks* of Buildings one *one-storeyed* and the other *two three-storeyed* with the land whereon the same are erected and built containing by estimation *Eight Cottahs, Five Chittacks and Ten Square-feet* be the same a little more or less situate lying at and being premises *No. 62/4, Beadon Street,* and the estimated value of the said premises for the purpose of stamp duty is *Rupees Fifty thousand* and all the estate, right, title, interest, claim and demand whatsoever of the said Sreemutty Pura Sundari

Dassi into and upon the said premises and every part thereof to have and to hold the said premises hereby granted and conveyed or expressed so to be unto......Provat Chandra Halder, son of Mohim Chandra Halder, deceased, residing at No. 29, Parbutty Ghose Lane in the town of Calcutta, by caste Brahmin, by occupation Medical Practitioner;...........Gopal Lall Chuckerbutty son of Chandra Kanta Chuckerbutty, deceased, residing at No. 12, Ram Kamal Sen Lane in the town of Calcutta, by caste Brahmin, by occupation Priest; .... Satish Chandra Sarkar, son of Prosonno Kumar Sarkar, deceased, residing at No. 13/4/A, Ram Kanto Bose Street, in the town of Calcutta, by caste Kayastha, by occupation Service;........Netai Chand Ganguly, son of Rajnarain Ganguly, deceased, residing at No. 111, Musjid Bari Street, in the town of Calcutta, by caste Brahmin, by occupation Priest; and...........Ramlal Sein, L.M.S., son of Subaldas Sein, deceased, residing at No. 3, Singhee Dutt Lane in the town of Calcutta, by caste Subarnabanik, by occupation Medical Practioner. In Trust to permit the same *to be used as a Hindu Pilgrim House for ever* for occupation by Bengalis and Hindus in general who have occasion to come to Calcutta from outside stations and who are in poor circumstances and have no place to live in Calcutta according and subject to the rules, regulations and provisions for the administration and management of the Trust intended to be hereby established which are hereinafter expressed and contained (that is to say): —

The Trustees or such of them as may be nominated by the whole body of Trustees at a Meeting to be held for the purpose shall for ever hereafter receive the interest on the Government Promissory Notes of the value of Rupees Fifty-thousand hereby transferred unto the Trustees by the said Sreemutty Pura Sundari Dassi and which Government Pro-

missory Notes shall remain in the custody of the Imperial Bank of India and shall with and out of the interest of the said Government Promissory Notes pay the maintenance and repair and re-construction as may from time to time be considered necessary of the aforesaid premises, the salaries and wages of establishments and staff to be kept by the Trustees, the supply and maintenance of furniture and other equipments as may be necessary for use in the premises and the provisions of any matters or things tending to the comfort convenience or well-being of the inmates of the said premises.

The said Trustees or much of them as may be appointed by such Trustees at a Meeting to be held for the purpose shall be entitled to select such person or persons to be inmates of the said Pilgrim House. The person so to be selected shall be Hindus preference and priority being given to Bengalis coming to Calcutta from outside Calcutta as they the said Trustees or Trustee shall consider deserving. The inmates so to be selected may be of either sex married or single. No inmates shall without the express permission of the Trustees be allowed to have any other person resident of Calcutta to live with him or her in the said premises it being the intention of the founder of the Trust to provide a home for persons professing Hindu religion preferably Bengalis coming to Calcutta and having no place to reside in Calcutta who would otherwise be probably compelled to spend their days and nights on the Streets.

The inmates of the premises shall be permitted to occupy premises subject to such rules and regulations as the Trustees may from time to time prescribe.

The Trustees may make such rules as to the conduct of the inmates and may at any time expel or remove any inmate either for misconduct or because in the opinion of the

Trustees he or she is no longer a proper object of the Trust or for any other reason.

6. The Trustees or such of them as may be appointed the Managing Trustees as aforesaid may let three rooms of the ground-floor of the premises opening on Beadon Street at such rent or rents as they or he may think proper and reasonable and fair and rent receipt granted by the said Trustees or the Managing Trustees as aforesaid shall be sufficient discharge to the tenants."

স্বর্গীয় গোষ্ঠবিহারী ধর

১২৭৭ সালের (১৮৭১) মাঘ মাসে গোষ্ঠবিহারী ধর মহাশয় চুঁচুড়ায়, তাঁহাদের পঞ্চাননতলাস্থিত গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীর সুবর্ণবণিক্।

পিতৃ-পরিচয়

গোষ্ঠ বাবুর পিতার নাম নসীরাম ধর। নসীরাম বাবুর তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ গোষ্ঠবিহারী, মধ্যম বিপিনবিহারী এবং কনিষ্ঠ বঙ্কুবিহারী। ধর মহাশয়দিগের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার অন্তর্গত হিরণ্যগ্রামে; উহা মেমারী ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। নসীরাম বাবু তিনবার বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রথমা ও দ্বিতীয়া পত্নী—উভয়েই পর পর নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৃতীয় বার তিনি চুঁচুড়ার বড় শীলের বাটীর বদনচন্দ্র শীল মহাশয়ের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার এই পত্নীর গর্ভেই গোষ্ঠবিহারী প্রভৃতি তিন ভ্রাতার জন্ম হয়।

অন্যূন ৬০।৬৫ বৎসর পূর্বে নসীরাম বাবু নিজের জাতীয় ব্যবসা-সম্পর্কিত একখানি সোনা-রূপার পোদ্দারী দোকান করেন। কলিকাতায় ৫নং রামচন্দ্র ঘোষ লেনে (ঢুলীপাড়ায়) তাঁহার নিজ বাসভবন ছিল। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে তিনি কলিকাতার বাড়ী বিক্রয় করিয়া, চুঁচুড়া পঞ্চাননতলায় একখানি বাড়ী খরিদ করেন; এবং সেইখানেই বসবাস-পূর্বক খড়ুয়া বাজারের সন্নিকটে একটি পোদ্দারী দোকান স্থাপন করেন। তিনি অতিশয় ধর্মভীরু লোক ছিলেন। মামলা-মোকদ্দমা করিবার জন্য তিনি কখনও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। সেই জন্য অনেকেই তাঁহাকে প্রবঞ্চনাপূর্বক ক্ষতিগ্রস্ত করে। অনুমান ৫৫।৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

পিতার মৃত্যুতে গোষ্ঠবিহারী

পিতার মৃত্যুকালে গোষ্ঠবিহারীর বয়স ১৬।১৭ বৎসর ছিল। শৈশবে চুঁচুড়ার বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতায় গৌরমোহন

৺গোষ্ঠবিহারী ধর

(১৮৭১—১৯২৫)

আঢ্যের স্কুলে (ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী) এণ্ট্র্যান্স ক্লাস পর্যন্ত পড়েন। এই সময়ে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁহার স্কন্ধে বিপুল সংসার-ভার পড়িল, সেইজন্য তাঁহাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হয়। বাধ্য হইয়া তিনি কলিকাতার কোন সওদাগরী অফিসে একটি কাজ জোগাড় করেন।

গোষ্ঠ বাবুর পিতা মৃত্যুকালে তেমন কিছু সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বিশেষত মৃত্যুর পূর্বে তিনি নানাবিধ জটিল রোগে বহুদিন পর্যন্ত চিকিৎসাধীন থাকায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে চুঁচুড়ার বাড়ী বিক্রয় করিতে হয়।

শৈশব হইতেই গোষ্ঠ বাবু বিশেষ মেধাবী ও পরিশ্রমী ছিলেন। অফিসের কাজ ছাড়া সকাল ও সন্ধ্যায় তিনি ছাত্র পড়াইয়াও কিছু উপার্জন করিতেন। এইভাবে দুই তিন বৎসর চাকুরী করিবার পর তিনি ঐ কর্মে ইস্তফা দেন। জ্যেষ্ঠতাত পুত্রের সহিত মিলিয়া তিনি পোদ্দারী কার্য শিক্ষা করেন। তখন জ্যেষ্ঠতাত পুত্রের দোকান ছিল—৩৫৬নং আপার চিৎপুর রোডে। এই সময় তিনি চুঁচুড়ার বাস তুলিয়া, ছোটভাই দুইটির সহিত কলিকাতায় আগমন করেন। পোদ্দারী দোকানের কার্য ব্যতীত তিনি ইমারতি সরঞ্জামের একটি দোকানও চালাইতেন।

একুশ বৎসর বয়সে গোষ্ঠ বাবু চুঁচুড়া নন্দীপাড়ার ব্রজনাথ নন্দীর কনিষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ কার্তিকচন্দ্র, মধ্যম নীলরতন ও কনিষ্ঠ গোপীনাথ।

নিজস্ব দোকান প্রতিষ্ঠা

জ্যেষ্ঠতাত পুত্রের নিকটে থাকিয়া কার্যশিক্ষার সময়ে গোষ্ঠ বাবু তাঁহার নিকট হইতে মাসিক ২০।২৫৲ টাকা হিসাবে পাইতেন। বিবাহের ২।৩ বৎসর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা গোষ্ঠ বাবুকে অন্যত্র চাকুরীর সন্ধান করিতে বলেন। মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া গোষ্ঠ বাবু তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ১৩০৩ সালে নিজে একটি পোদ্দারী দোকানের পত্তন করেন। এই সময় হইতেই গোষ্ঠ বাবুর সৌভাগ্যের সূচনা হয়। ক্রমে ক্রমে তিনি কনিষ্ঠ দুই সহোদরের সাহায্যে এই দোকানের বিশেষ উন্নতি করেন। সততা ও নিষ্ঠা তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল,—ইহারই সাহায্যে তিনি ব্যবসায়ে

অর্থ, প্রতিপত্তি ও সুনাম অর্জন করেন। ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়া তিনি ২২নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্তীর লেনে (গরাণহাটা) বসতবাটী, চুঁচুড়া কামার-পাড়া বাজারে ও খড়ুয়া বাজারে দুইখানি বাড়ী ও দমদমায় বাগজালা লেনে বাগান খরিদ করেন।

উন্নতির শীর্ষে উঠিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কেও তিনি নিকটে রাখিয়া আজীবন একান্নবর্তী ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ও তাঁহারই স্নেহসিক্ত ও অনিন্দ্য আচরণে প্রীত হইয়া, তাঁহার অনুগত থাকিয়া জীবনযাপন করেন।

১৩১০ সালে ৩৪।৩৫ বৎসর বয়সে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং তিনি ইহারই দুই বৎসর পরে ১৩১১ সালে জননী, পত্নী ও ভগ্নী প্রভৃতিকে লইয়া তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন।

'তীর্থভ্রমণ-কাহিনী' প্রকাশ

এই সময় হইতেই তাঁহার দেশভ্রমণে অনুরাগ জন্মে। ফলে ভারতের বহুতীর্থভ্রমণকালে তিনি প্রত্যেক তীর্থের ইতিহাস ও বিবরণ একখানি খাতায় লিখিয়া রাখেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বঙ্কুবাবুর অনু-রোধে প্রথমে তিনি কয়েকটি বিবরণ, তাঁহাদের বাড়ী হইতে প্রকাশিত ও বঙ্কুবাবুর সম্পাদিত 'বসুধা' নামক মাসিক পত্রে ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তৎপরে সাধারণের আগ্রহ ও উৎসাহে ১৩১৭ সালের আশ্বিন মাসে (১৯১০ খৃষ্টাব্দ) 'তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী"র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগের বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া তিনি পরে—

১৯১২ খৃষ্টাব্দে	দ্বিতীয় ভাগ
১৯১৩ ,,	তৃতীয় ভাগ
এবং ১৯১৪ ,,	চতুর্থ ভাগ

প্রকাশ করেন। ইহার পরে 'ত্রিতীর্থ' নামে তাঁহার আরও একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই শেষোক্ত পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য।

বঙ্কুবিহারী ধর

গোষ্ঠ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর মহাশয় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-সেবক। ১৩০৮ (১৯০১ খৃঃ) সালে তিনি 'বসুধা'

নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাইশ বৎসর সগৌরবে এই পত্রিকা বঙ্কু বাবুর সম্পাদনায় পরিচালিত হইয়া বন্ধ হয়। অক্ষয়-চন্দ্র সরকার, অক্ষয়কুমার বড়াল, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি দে, ব্রজবল্লভ রায় প্রভৃতি বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। এতদ্ব্যতীত বঙ্কু বাবু স্বয়ং বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার স্থাপিত 'বসুধা এজেন্সী' হইতেও অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য-সেবায় গোষ্ঠবিহারী

শেষ জীবনে স্বীয় ব্যবসা-কর্মে নিযুক্ত থাকিয়াও গোষ্ঠ বাবু সাহিত্য-সেবায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি একজন ধার্মিক ও আচারনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহার গ্রন্থসমূহ পাঠেও ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়।

পুস্তক চারিখানি প্রকাশের জন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম ও বহু অর্থ ব্যয় করেন। গ্রন্থে তাঁহার অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণের নিকট পুস্তকগুলি বিশেষ আদৃত হইয়াছিল।

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের অভিমত

বাংলার প্রবীণ সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই গ্রন্থ-কয়খানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন ঃ—

"কতকটা সখের খাতিরে, কতকটা স্বাস্থ্যের জন্য যৌবনে অনেক তীর্থেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, আজ আবার বৃদ্ধ বয়সে ঘরে বসিয়া আগ্রহের সহিত 'তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী' পড়িলাম।

দেখিলাম, এই নূতন লেখক এক নূতন পন্থায় তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের খাঁটি হিন্দুত্ব—প্রকাশ হইয়াছে। গ্রন্থের গুণপনা এই যে, ইহাতে সমাসের ছড়াছড়ি, অলঙ্কারের হুড়াহুড়ি নাই। ভাষাটি বেশ সরল, স্নিগ্ধ ও শান্ত—যেন বাঙালীরই ঘরের কথা, আর গ্রন্থকারের গুণপনা এই যে পরের মুখে ঝাল না খাইয়া ধর্মপ্রাণ হিন্দুর পবিত্র চক্ষে তীর্থ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি কথা কহিয়া সাধারণের অজ্ঞেয় বহু তত্ত্বই সংগ্রহ করিতে

পারিয়াছেন। এই গ্রন্থের এক খণ্ড সঙ্গে থাকিলে বিদেশে গিয়া সহচরের অভাবে কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হয় না; কেন না, কোন্ তীর্থে কি দর্শনীয়, কি করণীয়, কোন্ পূজায় কোন্ দ্রব্য প্রয়োজনীয়, স্থানের অধিবাসীরা কোন্ জিনিষকে কি নামে অভিহিত করে, এ সকল কথা বেশ নিপুণতার সহিত বিশদভাবে বোঝান হইয়াছে।"

গোষ্ঠবিহারীর মৃত্যু

কয়েক বৎসর ধরিয়া গোষ্ঠ বাবুর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, ১৩৩০ সালে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। বহু অর্থ ব্যয় ও নানাবিধ চিকিৎসা সত্ত্বেও তিনি আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে ১৩৩২ সালের (১৯২৫ খৃঃ) ১১ই অগ্রহায়ণ তিনি পরলোক গমন করিলেন।

'তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী'র প্রথম ভাগের আলোচনা

'তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনীর' প্রথম ভাগ ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে ১৭৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী* হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের মূল্য এক টাকা। গ্রন্থে বিষয়বস্তু ব্যতীত বিজ্ঞাপন ৪ পৃষ্ঠা, ভূমিকা তিন পৃষ্ঠা, পরিশিষ্ট (পশ্চিম তীর্থযাত্রার আবশ্যক দ্রব্যের তালিকা) এবং সূচীপত্র ৫ পৃষ্ঠা আছে।

প্রথম ভাগের চিত্র-তালিকা

প্রথম ভাগে নিম্নলিখিত ১৬খানি হাফ্‌টোন চিত্র আছে :—

১। গ্রন্থকার গোষ্ঠবিহারী বাবুর ছবি

২। বুদ্ধগয়া

৩। কাশীর বিশ্বনাথ ও অপরাপর মন্দির

৪। প্রয়াগের খসরুবাগের দৃশ্য

৫। হরিদ্বারে গঙ্গার সম্মুখের দৃশ্য

৬। দিল্লীর হুমায়ুন-মস্‌জিদ্

---

* বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের নাম "গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স"।

৭। মথুরার বিশ্রাম-ঘাট
৮। গিরি-গোবর্ধন
৯। গোবর্ধনের মানসী গঙ্গা
১০। শ্যামকুণ্ড
১১। শ্রীধাম বৃন্দাবনের শেঠজির মন্দির
১২। আগ্রা এম্‌দাদ্ উদ্যানের রামবাগের দৃশ্য
১৩। জয়পুরের শ্রীগোবিন্দ জিউ
১৪। কালীঘাট
১৫। শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর দেব জিউর মন্দির
১৬। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব জিউর মন্দির

প্রথম ভাগের বিষয়-তালিকা

তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনীর প্রথম ভাগ গ্রন্থকার স্বীয় মাতার নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই ভাগে বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, জয়পুর, পুষ্কর, বৈতরণী, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরী, দ্বারকা, কালীঘাট ও তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানের বিবরণ আছে। ১১৯টি বিষয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিভিন্ন তীর্থস্থানের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ, তাহাদের বৈশিষ্ট্য, সেখানে কি কি করণীয়, থাকিবার স্থান, খরচপত্র ও প্রণামী প্রভৃতির পূর্ণ পরিচয় ১১৯টি অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এক কথায় তীর্থযাত্রীর পক্ষে যাহা কিছু জানা দরকার, তাহা এই গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়।

গ্রন্থকারের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, বর্ণনাশক্তি পরিস্ফুট এবং গুছাইয়া বলিবার ভঙ্গীও সুন্দর। তিনি ভক্তিমান্ ও বিশ্বাসী, তাঁহার লেখার ভিতর ভক্তি ও বিশ্বাসের একটা ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই ফলে, গ্রন্থখানি ভক্ত তীর্থযাত্রীর নিকট আদরের বস্তু হইয়াছে।

'তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী'র দ্বিতীয় ভাগের আলোচনা

সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনীর দ্বিতীয় ভাগ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাহির হয়। এই খণ্ডের মূল্য পাঁচ সিকা। ২৪৬ পৃষ্ঠায় এই খণ্ড সমাপ্ত, ইহা ব্যতীত

মোট ১৭ পৃষ্ঠা আছে।

দ্বিতীয় ভাগের চিত্র-তালিকা

দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্নলিখিত ১৭ খানি ছবি আছে ঃ—

দ্বিতীয় ভাগের বিষয়-তালিকা

এই দ্বিতীয় খণ্ডে ওয়ালটেয়ার, প্রহ্লাদপুরী, গোদাবরী, মান্দ্রাজ সহর, কাঞ্চীপুর, বালাজী, জলকান্তীশ্বর, অরুণাচলম্, বৈদ্যেশ্বর, মায়াভরম্,

কুম্ভকোণম্, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপলী সহর, শ্রীশ্রীরঙ্গম জিউর দেবালয়, কাবেরী নদীর আদি বৃত্তান্ত, কিষ্কিন্ধ্যাপুরী, বিরূপাক্ষদেব, মহীশূর রাজের স্বাধীন রাজ্য ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত চামুণ্ডা দেবী, মাতুরা সহর, সেতুবন্ধে শ্রীশ্রীরামেশ্বর জিউ, হরিদ্বার, কনখল, লক্ষ্মণঝোলা, হৃষীকেশ, শ্রীশ্রীকেদারেশ্বর, শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম, এলাহাবাদ ও প্রয়াগতীর্থের কথা আছে।

প্রত্যেক তীর্থস্থানের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ লেখক যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সঙ্গে তিনি,—সেই সমস্ত তীর্থে কি কি করণীয় কার্য, কি কি দ্রব্য পাওয়া যায়, সেখানকার সুবিধা-অসুবিধা এবং বাসস্থানের কথাও বিস্তারিতভাবে লিখিতে বিস্মৃত হন নাই। এক কথায় এই গ্রন্থ একখানি কাছে থাকিলে তীর্থ-ভ্রমণ-কারীর কোন অসুবিধা হইবে না।

'তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী'র তৃতীয় ভাগের আলোচনা

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনীর তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই ভাগের মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। ডবলক্রাউন ২৪২ পৃষ্ঠায় তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত। ইহা ব্যতীত

বিজ্ঞাপন—	২ পৃষ্ঠা
ভূমিকা—	৪ ”
তীর্থ-সেবকদিগের কর্তব্য—	৬ ”
আবশ্যক দ্রব্যের জায়—	১ পৃষ্ঠা
সূচীপত্র—	৩ ”
চিত্রসূচী—	১ ”

মোট ১৭টি অতিরিক্ত পৃষ্ঠা আছে।

'তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী'র তৃতীয় ভাগের চিত্র-সূচী

এই ভাগেও মোট সতের খানি ছবি আছে। এই খণ্ডে বোম্বাই, এলিফ্যান্টা কেপ, পুণা সহর, দ্বারকাপুরী, গৌহাটি, কামরূপ, বশিষ্ঠাশ্রম,

উর্বশীকুণ্ড, চন্দ্রনাথ, বাড়বানল, আদিনাথ, দার্জিলিং, শ্রীশ্রীতুর্জয়লিঙ্গ, নেপাল, কাটামুণ্ড, শ্রীশ্রীপশুপতিনাথ, প্রভাস-ক্ষেত্র, নর্মদা, সোমনাথ প্রভৃতি স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

'তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী'র চতুর্থ ভাগের আলোচনা

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনীর চতুর্থ ভাগ বাহির হয়। চতুর্থ ভাগের মূল্যও পূর্ব পূর্ব ভাগের ন্যায় এক টাকা চারি আনা। ২৫১ পৃষ্ঠায় এই ভাগ সমাপ্ত, বিজ্ঞাপন, ভূমিকা, সূচীপত্র প্রভৃতিতে আরও অতিরিক্ত আট পৃষ্ঠা আছে। ইহাতে বার খানি ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। এই খণ্ডের প্রথমে লেখক 'তীর্থযাত্রা-পদ্ধতি' নামে একটি উৎকৃষ্ট অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কোন্ তীর্থে কি কি দ্রব্য সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়, লেখক তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। আলোচ্য খণ্ডে পুরী, বৈতরণী, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি, সাক্ষীগোপাল, পঞ্চতীর্থ, নরেন্দ্র-সরোবর, চক্রতীর্থ, চন্দ্রভাগা, পুষ্কর, আগ্রা, ভরতপুর, জয়পুর, আজমীর ও সাবিত্রী পাহাড় প্রভৃতির কথা আছে।

'ত্রিতীর্থ'

"ত্রিতীর্থ" বা "কালীঘাট, তারকেশ্বর ও বৈদ্যনাথ-তত্ত্ব-কাহিনী" পুস্তকখানিই গোষ্ঠ বাবুর শেষ গ্রন্থ। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। ১৪০ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থখানি সমাপ্ত। ইহার মূল্য ৸০ আনা মাত্র। ইহাতে মাত্র তিনখানি ছবি আছে।

গোষ্ঠ বাবুর পুস্তক সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমত

গোষ্ঠ বাবুর গ্রন্থগুলি ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্রসমূহ কর্তৃক উচ্চভাবে প্রশংসিত হয়। নিম্নে একখানি বাংলা ও একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রের অভিমত প্রদত্ত হইল :—

মেদিনীপুর হিতৈষী—"গ্রন্থকার বহুবার তীর্থ পর্যটন করিয়া যে সমুদয় জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে তীর্থযাত্রিবৃন্দ বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহাতে

সন্দেহ নাই। তীর্থে কত প্রকার চোর, জুয়াচোর, বদমাস ও প্রতারক আছে, ইহা পাঠে তাহা জানিতে ও সাবধান হইতে পারিবেন। ইহাতে তীর্থ-সমূহের বিশেষ বিবরণ ও কোন্ কোন্ তীর্থে কোন্ কোন্ দ্রব্য আবশ্যক ও দ্রষ্টব্য স্থান কি, তাহাদেরও বিশেষ উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থসমূহের বিবরণ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন প্রাচীন পুরাণকাহিনী—তীর্থের উৎপত্তি কথাও বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা লোকহিতৈষণাবৃত্তিই সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুটিত হইয়াছে, এজন্য তিনি অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র।"

The Indian Mirror—"*Sachitra Tirtha Bhraman Kahiny*—Babu Gosto Behary Dhur is a much travelled man. He has visited all the principal Hindu places of pilgrimage in India. What he has not, is not perhaps worth visiting. But he has done more. He has jotted down an account of the numerous shrines at which he has worshipped, such account including the Pauranic or legendary stories that are associated with the sites.

The number of Hindus who have visited the magnificent shrines in Southern India is less than those who have made pilgrimages in Upper India, and still less is the number of those who have written on them. The two out of the three volumes of his *Travels*, which Babu Gosto Behary Dhur has caused to be brought out are therefore of absorbing interest to pilgrims and tourists alike. The volumes are liberally embellished with appetizing illustrations of important shrines and striking views. The writer has shown much care and industry in the compilation of the volumes and he will undoubtedly feel amply rewarded if intending pilgrims make use of these for their guide. To the house-keeper too, they will not only furnish profitable reading, but will act as powerful incentives to travel."

শ্রীমতী জরৎকুমারীর কীর্তি

শ্রীমতী জরৎকুমারী দাসী সুবর্ণবণিক্ মহিলা। ইনি সিঁথি ফুলবাগান নিবাসী স্বর্গীয় গোপেশ্বর দত্ত মহাশয়ের বিধবা পত্নী।

স্বর্গীয় গোপেশ্বর দত্ত

৺গোপেশ্বর দত্ত মহাশয়ের পিতামহের নাম মধুসূদন দত্ত। তাঁহার দুই পুত্র হরিদাস দত্ত ও সিংহচরণ দত্ত। এই সিংহচরণ দত্ত মহাশয়ই গোপেশ্বর বাবুর পিতা। সিংহচরণ বাবুর তিন পুত্র—গোপেশ্বর, বিশ্বেশ্বর ও পরমেশ্বর—তিনজনই পরলোকগত। গোপেশ্বর বাবুব একটি কন্যা হইয়াছিল। কিন্তু শৈশবেই তাহার মৃত্যু হয়। মধ্যম বিশ্বেশ্বর দত্ত মহাশয়ের একটি পুত্র—নিতাইচরণ দত্ত। কনিষ্ঠ পরমেশ্বর দত্ত মহাশয়েব পুত্র কামিনীচরণ দত্তও জীবিত নাই। তাঁহার এক পুত্র (রাজেশ্বর দত্ত) ও তিন কন্যা। গোপেশ্বর দত্ত মহাশয়ের ভাগিনেয়ীকে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায় বিবাহ করিয়াছেন। সিংহচরণ দত্ত মহাশয়ের আদি বাড়ী কলিকাতাস্থিত আমড়াতলা পল্লীর ২৯নং মল্লিক ষ্ট্রীট।

১২৮৯ সালের (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের) ১লা মাঘ গোপেশ্বব বাবু জন্মগ্রহণ করেন।

জোড়াসাঁকো বলরাম দে ষ্ট্রীট নিবাসী উমাকান্ত সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী জরৎকুমারী দাসীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১৩১৫ সালের (১৯০৮ খৃঃ) ১৫ই আষাঢ় পত্নী শ্রীমতী জরৎকুমারীকে রাখিয়া গোপেশ্বর বাবু পরলোক গমন করেন।

স্বামীর মৃত্যুতে জরৎকুমারী

গোপেশ্বর বাবুর পরলোক গমনের পর অনেকে শ্রীমতী জরৎকুমারীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু এই মহীয়সী মহিলা পোষ্যপুত্র গ্রহণ না করিয়া স্বামীর পরিত্যক্ত বিপুল সম্পত্তির আয় হইতে নানাবিধ সৎকার্যের অনুষ্ঠান করেন। নিম্নে তাহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

সুবর্ণবণিক্-কথা ও কীর্তি

৺গোপেশ্বর দত্ত

গোপেশ্বর দত্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

সিঁথি ফুলবাগানে, ৫৭বি নং বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে এই বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইহা অবৈতনিক। শ্রীমতী জরৎকুমারী দাসী ইহার প্রতিষ্ঠাত্রী।

সিঁথির ফুলবাগানে অবস্থিত বাড়ীটির পরিধি প্রায় ১২৬ বিঘা। পূর্বে ইহাতে নানাবিধ পশুপক্ষী বাস করিত। তাই সে সময়ে ইহার নাম ছিল—চিড়িয়াখানা। এখনও দমদমার বাসে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড হইতে বাঁকিয়া দমদমা যাইবার মোড়টিকে লোকে চিড়িয়াখানার মোড় বলে।

বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড হইতে স্কুল-বাড়ী প্রবেশের পথের দুই পার্শ্বে দুইটি স্তম্ভ আছে। দুইটিতে প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ নিম্নলিখিত অংশ লিখিত রহিয়াছে। একটিতে ইংরেজীতে লেখা :—

"The Phoolbagan
Gopeshwar Free School
Estd. 1908"

অপবটিতে বাংলায় লেখা :—

"ফুলবাগান গোপেশ্বর
অবৈতনিক বিদ্যালয়"

এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের অর্ধেক পরিমাণ জমির অর্থাৎ ৬৩ বিঘা স্থানের অধিকারী গোপেশ্বর বাবু। এই অংশেই বিদ্যালয়-ভবনটি অবস্থিত। এই ভবনটি পূর্বে গোপেশ্বর বাবুর বাস-গৃহরূপে ব্যবহৃত হইত।

গোপেশ্বর বাবুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, এই বিদ্যালয়ভবনে তাঁহার পত্নীর ইচ্ছানুসারে একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপিত হয়। ইহার বার তের বৎসর পরে, এই পাঠশালা একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হইল। ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া এবং উচ্চশিক্ষা দানের প্রবৃত্তির প্রবোচনায়, গোপেশ্বর বাবুর মহাপ্রাণা পত্নী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইহাকে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। ইহার বিপুল ব্যয়ভার তিনি সম্পত্তির আয় হইতে প্রদান করিতে লাগিলেন। শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার বিশ্বাস মহোদয় (স্কুলের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক) এই বিদ্যালয়ের উন্নতির মূল; তিনিই ইহাকে উচ্চ ইংরেজী

বিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। বর্ত্তমান সময়ে সিঁথি অঞ্চলে ইহা একটি অবৈতনিক বৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

বিদ্যালয়-পরিচালনার ব্যয়

এই বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য শ্রীমতী জরৎকুমারী বাংলার অ্যাড্-মিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের হস্তে শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদের পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং কলিকাতার দুইটি বাড়ী (একটি ৭নং লিট্‌ল র‍্যাসেল ষ্ট্রীট এবং আর একটি ১০৪নং চীনা বাজার ষ্ট্রীট) প্রদান করেন। বাড়ী দুইটির মাসিক আয় ৭৬১৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের গৃহ ও তৎসংলগ্ন পাঁচ বিঘা জমি ছাড়া বার্ষিক প্রায় এগার হাজার টাকার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা স্থায়িভাবে করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ সমস্ত ব্যতীত বিদ্যালয়-ভবনের মেরামত প্রভৃতি কার্যেব জন্য মাঝে মাঝে যাহা প্রয়াজন হয়, তাহাও শ্রীমতী জরৎকুমারী নিজের আয় হইতে প্রদান করিয়া থাকেন।

গত ১৯৩৯ সালে বিদ্যালয়েব খরচা প্রায় ৬,৫০০৲ টাকা হইয়াছে। এই টাকা অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনাবেলের নিকট হইতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত বিদ্যালয়-ভবন মেবামত প্রভৃতির জন্য আরও ৪০০০৲ টাকা খরচ হয়। এই টাকা শ্রীমতী জবৎকুমাবী নিজে দান করেন।

বিদ্যালয়-গৃহ

দশ কাঠা জমির উপব বিদ্যালয়-ভবনটি অবস্থিত। ইহাব দ্বিতলে ও একতলে সর্বসমেত চৌদ্দটি বৃহৎ কক্ষ এবং ইহার দুই তলেই উত্তব ও দক্ষিণে দুইটি করিয়া ৪টি প্রশস্ত ঢাকা বাবান্দা বর্ত্তমান। বিদ্যালয়ের সম্মুখে (দক্ষিণ দিকে) বাঁধাঘাট সংযুক্ত একটি বিস্তৃত পুষ্করিণী, পূর্বদিকে ফুটবল খেলার মাঠ।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল

বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলও আশাপ্রদ। ১৯৩৬-৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বৎসরের পরীক্ষার ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সুবর্ণবণিক্-কথা ও কীর্তি

গোপেশ্বর দত্ত হাই স্কুল, সিঁথি

	ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়	পাশ হয়	১ম বিভাগে	২য় বিভাগে	৩য় বিভাগে
১৯৩৭	৩১	২৪	৫	১৫	৪
১৯৩৮	৩০	২৬	১৩	১১	২
১৯৩৯	৩১	২৬	৫	১৮	৩

এখানে সর্বজাতির বালকই বিনাবেতনে পড়িতে পায়।

বিদ্যালয়ের পরিচালনা

নিম্নলিখিত চারিজন এই বিদ্যালয়ের বর্তমান ট্রাষ্টি :—

১। শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ শীল, এটর্ণি

২। " সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অ্যাড্ভোকেট

৩। " কালাচাঁদ মল্লিক

৪। শ্রীমতী জরৎকুমারী দাসী

বিদ্যালয়ের কার্য-পরিচালনার জন্য একটি কার্য নির্বাহক-সমিতি আছে। তাহার সভ্য-সংখ্যা সর্বসমেত তের জন। এই তের জনের মধ্যে একজন সভাপতি, একজন সহকারী সভাপতি ও একজন সম্পাদক আছেন।

সভাপতি :—শ্রীযুক্ত নাবায়ণপ্রসাদ শীল, এটর্ণি

সহকারী সভাপতি :—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অ্যাড্ভোকেট

সম্পাদক :—শ্রীযুক্ত কালার্চাদ মল্লিক

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক :—শ্রীযুক্ত ননীলাল মণ্ডল, বিদ্যারত্ন, এম্ এ, বি এল্

প্রধান পণ্ডিত :—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রহ্মময় শাস্ত্রী, সাংখ্যতীর্থ

তত্ত্বাবধায়ক :—শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার বিশ্বাস

প্রধান শিক্ষক ও প্রধান পণ্ডিত ব্যতীত অধ্যাপনার জন্য নিম্নলিখিত ১৩ জন শিক্ষক ও পণ্ডিত আছেন :—

গ্রাজুয়েট শিক্ষক—৭জন

আণ্ডার-গ্রাজুয়েট শিক্ষক—৫জন (উহার মধ্যে একজন ব্যায়াম-শিক্ষক আছেন)

পণ্ডিত—১জন

বিদ্যালয়ে প্রাইজের ও রেডিওর ব্যবস্থা আছে। ছেলেদের খেলা-ধূলার জন্য প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে অবস্থিত সুবিস্তৃত মাঠও বর্তমান। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একটি নিজস্ব গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সাহিত্যালোচনার জন্য বিদ্যালয়ে তাহাদের একটি ডিবেটিং ক্লাবও (তর্কমূলক সভা) আছে।

গোপেশ্বর দত্ত দাতব্য চিকিৎসালয়

পরলোকগত স্বামীর পবিত্র স্মৃতিরক্ষার জন্য শ্রীমতী জরৎকুমারী দাসী ১৯২১ সালে "গোপেশ্বর দত্ত দাতব্য চিকিৎসালয়" নামে এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি সংস্থাপিত করেন। এই ঔষধালয়ে সমাগত রোগিগণকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা, ঔষধ প্রদান এবং অস্ত্রোপচার করা হয়। ৫৬ নং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে এই ঔষধালয় অবস্থিত।

ডাক্তারখানার প্রবেশমুখে ফটকের গায়ে দক্ষিণ পার্শ্বে ও হলঘরের বাহিরের দেওয়ালে মর্মর-ফলকে ইংরেজীতে নিম্নলিখিত কথা কয়টি উৎকীর্ণ আছে—

"Gopeswar Dutt Charitable Dispensary
Founded by
his widow
Jarat Kumari Dassi
1921"

ফটকের বামপার্শ্বে বাংলায় লেখা আছে—

"স্বর্গীয় গোপেশ্বর দত্তের দাতব্য চিকিৎসালয়
তদীয় সহধর্মিণী
জরৎকুমারী দাসী কর্তৃক
১৩২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

ডাক্তারখানা গৃহটি পাকাবাড়ী, একতলা, চতুর্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত। সম্মুখে ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। তাহার পর বাহিরের বারান্দা; তৎপরে হলঘর। ইহাতে ডাক্তার বাবুর বসিবার জন্য টেবিল-চেয়ার এবং সমাগত রোগিদিগের জন্য কয়েকখানি সুদীর্ঘ বেঞ্চি বর্তমান। ঘরের দুইপার্শ্বে খোলা বারান্দা।

ইহার সংলগ্ন দুইটি কক্ষ আছে; তাহার একটিতে ঔষধ ও সাজসরঞ্জাম রক্ষিত হয়; অপরটিতে অস্ত্রোপচার-কার্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

ডাক্তারখানা-গৃহ ব্যতীত প্রাঙ্গণের মধ্যে আরও ২।৩টি গৃহ বিদ্যমান। উহার একটি কম্পাউণ্ডারের বাসগৃহ ও অপরটিতে চাকর থাকে। ডাক্তার বাবুর জন্য দ্বিতলে বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

ডাক্তারখানার কার্যের জন্য একজন ডাক্তার, একজন কম্পাউণ্ডার, একজন চাকর ও একজন মেথর নিযুক্ত আছে।

ডাক্তারখানার ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্ মহাশয় সমাগত রোগিদিগকে অত্যন্ত যত্নসহকারে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করেন।

রোগীর সংখ্যা

নিম্নে তিন বৎসরের রোগীর ও অস্ত্রোপচারের সংখ্যা প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে এই দাতব্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারা স্থানীয় লোকের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

বৎসর	পুরুষ	স্ত্রী	বালক	মোট রোগী	অস্ত্রোপচার
১৯৩৬-৩৭	৯০১৩	৬০১৮	১৭২৫	১৬৭৫৬	২৭৭
১৯৩৭-৩৮	৯৯৪০	৭৩৪৭	২১৪২	১৯৪২৯	৩৮৫
১৯৩৮-৩৯	১০০২৬	৯১০৫	৩৫৫৬	২২৬৮৭	৪২৬

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, দিন দিন রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে।

পরিচালনা-ব্যয়

এই ঔষধালয়ের জন্য শ্রীমতী জরৎকুমারী দাসী নিজ তহবিল হইতে মাসিক প্রায় ৫০০৲ টাকা ব্যয় করেন। তন্মধ্যে এক শত টাকা ঔষধের জন্য ব্যয় হয়। অবশিষ্ট ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার প্রভৃতির বেতন, বৈদ্যুতিক আলোক, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতির জন্য খরচ হইয়া থাকে।

গোপেশ্বর দত্ত ঠাকুরবাড়ী

১৯১৫ সালে গোপেশ্বর বাবুর মৃত্যুর পর এই ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গোপেশ্বর বাবু এই ঠাকুর বাড়ীর পরিকল্পনা করিয়াছিলেন,

কিন্তু তিনি উহা কার্যে পরিণত করিবার পূর্বেই ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া যান।

তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিণী স্বামীর অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই ৫৭এ, ব্যারাকপুর ট্র্যাঙ্ক রোডে এই ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিগ্রহ সংস্থাপন করত পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঠাকুর বাড়ীটি পূর্বে একতলা ছিল; শরৎকুমারী উহাকে দ্বিতলে পরিণত করিয়াছেন এবং স্বয়ং এই ঠাকুরবাড়ীতেই বাস করিতেছেন।

ঠাকুরবাড়ীর বিবরণ

ঠাকুরবাড়ীর অবস্থিতি-স্থান বড়ই মনোরম। ইহার প্রবেশমুখেই গাড়ী-বারান্দা; তৎপরে একটি উন্মুক্ত বারান্দা ও তৎসংলগ্ন দুইপাশে তিনটি কক্ষ। এই কক্ষগুলি ঠাকুরবাড়ীর সেবকেরা ব্যবহার করে। এইগুলির পরে তিন দিকে প্রশস্ত বারান্দা; মধ্যে বিস্তৃত বাঁধান প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণের সম্মুখে ঠাকুর-দালান। বাড়ীর অভ্যন্তর চকমিলান; দোতলায়ও একতলার অনুরূপ দুই পাশে প্রশস্ত বারান্দা বিদ্যমান; আরতি বা পূজা-পার্বণোপলক্ষে মহিলারা দোতলার বারান্দা হইতে উৎসব দর্শন করিতে পারেন। ঠাকুর-দালানের পাশে দুই দিকে কয়েকটি কক্ষ আছে। এই সমস্ত কক্ষের একটিতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন; তাঁহারও নিত্য পূজা হয়। ঠাকুর দালানে কাঠের চৌকীর উপর কারুকার্যমণ্ডিত সিংহাসনে অষ্টধাতুনির্মিত প্রায় একফুট দীর্ঘ রাধারমণজির যুগল বিগ্রহ বিরাজিত। এতদ্ভিন্ন গোপাল, শালগ্রামশিলা প্রভৃতিও আছেন এবং তাঁহাদেরও পূজা হইয়া থাকে। ঠাকুরের ভোগ রান্না দ্বিতলে হয় এবং রন্ধনের পর নীচে আনিয়া ভোগ দেওয়া হয়।

ঠাকুরবাড়ীর কর্মচারী

ঠাকুরবাড়ীর কাজের জন্য নিম্নলিখিত লোকগুলি বাহাল আছে:—

২ জন পূজারী ও একজন পাচক

চাকর—৩ জন

ঝি—একজন

সুবর্ণবণিক্‌-কথা ও কীর্তি

গোপেশ্বর দত্ত ঠাকুরবাড়ী, সিঁথি

গোপেশ্বর দত্ত দাতব্য ঔষধালয়, সিঁথি

দরওয়ান—২ জন

বাবাজি (বৈষ্ণব)—২ জন

বাবাজি দুইজন ঠাকুরের আরতির সময় কীর্তন করিয়া থাকেন।

শ্রীমতী জরৎকুমারী ঠাকুরের প্রসাদ ভিন্ন অন্য কোন অন্ন গ্রহণ করেন না। অবশিষ্ট প্রসাদ পূজারী ও চাকর দরওয়ান প্রভৃতিকে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত কাঙালী এখানে আগমন করে, তাহাদিগকেও ঠাকুরের প্রসাদ দেওয়া হয়।

ঠাকুরবাড়ীর ব্যয়

ঠাকুরবাড়ীর আনুমানিক মাসিক ব্যয় প্রায় ৩০০৲ টাকা। এই ব্যয়ও শ্রীমতী জরৎকুমারী নিজ তহবিল হইতে করেন।

নিত্যভোগ ও দৈনিক সেবা ব্যতীত ঝুলন, রাস ও দোলপর্ব উপলক্ষে উৎসব হয়। এই সময় ঠাকুরকে ঠাকুরদালানের বাহিরে আনিয়া উল্লিখিত উৎসবগুলি সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঝুলন ও রাসের সময় ৪ দিন ও দোলের সময় দুই দিন বিশেষ উৎসব।

গোপেশ্বর দত্ত অতিথিশালা

"গোপেশ্বর দত্ত অতিথিশালা" স্থাপন শ্রীমতী জরৎকুমারীর অন্যতম কীর্তি। এই অতিথিশালার বিশেষত্ব এই যে, এই স্থানে বেলা সাড়ে বারটার মধ্যে যে সমস্ত অতিথি সমাগত হইবে, তাহাদের সকলকে আহার দান করা হইবে। উক্ত সময়ের মধ্যে কোন অতিথি আসিলে, তাহাকে কিছুতেই অভুক্ত অবস্থায় চলিয়া যাইতে দেওয়া হয় না। সাধারণত ১০।১২ জন লোক আহার করিয়া থাকে। তবে যদি বেশী লোকের সমাগম হয়, তাহা হইলে তাহাদেরও আহারের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

এই অতিথিশালা গোপেশ্বর দত্ত ঠাকুরবাড়ীর সংলগ্ন ; ৫৭এ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডেই অবস্থিত। বাড়ীটি একতলা, সম্মুখে প্রাঙ্গণ ; প্রাঙ্গণের পরই লাল-টালি-দেওয়া প্রশস্ত খোলা বারান্দা ; এই স্থানে অতিথিগণ বিশ্রাম করিয়া থাকে। ভিতরে ৩।৪টি কক্ষ। উহাদের একটিতে রান্না হয় ; একটি ভোজনের স্থান ও অপরগুলিতে ঠাকুর-চাকরেরা বাস করে।

অতিথিশালার আনুমানিক মাসিক ব্যয় প্রায় ১৫০৲ টাকা। উহা শ্রীমতী জরৎকুমারী নিজ তহবিল হইতে ব্যয় করিয়া থাকেন।

'গোপেশ্বর দত্ত ফ্রি স্কুল রোডে'র জন্য জমি দান

সাউথ সিঁথি রোড ও ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সংযোজক কোন সোজা রাস্তা নাই। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড হইতে সাউথ সিঁথি রোডে যাইতে হইলে অনেকটা ঘুরিয়া যাতায়াত করিতে হয়। ফলে যে সমস্ত বালক গোপেশ্বর দত্ত অবৈতনিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়ে, তাহাদের কিম্বা যে সমস্ত রোগী চিকিৎসার্থ সাউথ সিঁথি রোড হইতে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডস্থিত গোপেশ্বর দত্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে আসে তাহাদেরও অনেক অসুবিধা ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। জনসাধারণের এই কষ্ট নিবারণার্থ শ্রীমতী জরৎকুমারী ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড হইতে সাউথ সিঁথি রোড পর্যন্ত একটি প্রশস্ত পাকা রাস্তা নির্মাণে ইচ্ছুক হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের হস্তে আবশ্যকীয় জমিদানে ইচ্ছুক হইয়া স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করেন।

তাঁহার এই জনহিতকর সদিচ্ছার প্ররোচনায় কলিকাতা কর্পোরেশন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্করোড হইতে সাউথ সিঁথি রোড পর্যন্ত একটি ৩০ ফিট প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনার প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

এই অনুমোদনের ফলে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখের এক সভায় শ্রীমতী জরৎকুমারীর দানের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং ৫৭নং, ৫৭।৭নং, ৫৬।১নং, ৫৭।এ নং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্করোডস্থিত ও ১৫০নং সাউথ সিঁথিরোডস্থিত জমির অংশসমূহ, যাহা শ্রীমতী জরৎকুমারী জনসাধারণের হিতার্থ রাস্তা নির্মাণের জন্য সর্বস্বত্ব ত্যাগ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনকে দান করিতে ইচ্ছুক,—তাহা গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অবশেষে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তারিখে কর্পোরেশনের এক সভায় ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখে গৃহীত প্রস্তাব ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া কয়েকটি সর্তে পুনরায় গৃহীত হয়। নিম্নে উক্ত প্রস্তাব উদ্ধৃত হইল :—

"That the proposal of the owner Sreemoti Jarat Kumary Dassi of premises No. 57/7 Barrackpore Trunk Road for making over land measuring about 2¾Bighas free of cost for a 30 ft. road connecting South Sinthi Road with Barrackpore Trunk Road in Ward No. 31 be sanctioned, it being understood—

(1) That the low land to the north of the Jheel marked A in the plan and part of the Jheel marked B and C as well as two small tanks (dobas) marked D and E in the said plan are to be filled up by the Corporation.

(2) The road after construction be named as Gopeswar Dutt Free School Road.

(3) It should be constructed by the Corporation as soon as practicable."

কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় উপরি লিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে দানপত্র সম্পাদিত হইল। এই দলিলে দাতা শ্রীমতী জরৎকুমারী ও গ্রহীতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে সেক্রেটারী বি ভি রামিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই দলিল সম্পাদনের পর উহা জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাশীপুর দমদম রেজেষ্ট্রী অফিসে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ তারিখে যথারীতি রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে।

দলিলে জমির বর্ণনা নিম্নরূপ :—

জেলা—২৪ পরগণা

থানা—কাশীপুর

সাবরেজিষ্ট্রী অফিস—কাশীপুর দমদম

সাবডিভিশন—পঞ্চান্নগ্রাম

গ্র্যাণ্ডডিভিশন—১

হোল্ডিং নম্বর—২২১

৫৬।১ ও ৫৭।এ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্করোডের আংশিক ও ১৫০ নং সাউথ সিঁথি রোডের আংশিক—মোট জমির পরিমাণ কম বেশী দুই বিঘা তের কাঠা আট ছটাক।

জমির চৌহদ্দী—

উত্তরে—৫৬।১, ৫৭।এ, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ও ১৫০ নং সাউথ সিঁথি রোড

দক্ষিণে—৫৬।১, ৫৭।এ, ৫৭বি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্করোড ও ১৫০নং সাউথ সিঁথি রোড

পূর্বে—সাউথ সিঁথি রোড

পশ্চিমে—ব্যারাকপুর ট্রাঙ্করোড

গভর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প-শুল্কের জন্য এই জমির আনুমানিক মূল্য ৮০০০৲ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে এবং দলিলে উক্ত মূল্য ধরিয়া ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছে।

নির্মাণ-কার্য শেষ হইলে এই রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় এক ফার্লং হইবে। ইহা দ্বারা পল্লীস্থ জনসাধারণের যে মহদুপকার সাধিত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৺মধুসূদন দত্ত ঠাকুরবাড়ী

৺মধুসূদন দত্ত ঠাকুরবাড়ী ৩৫নং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে অবস্থিত। এই ঠাকুরবাড়ী গোপেশ্বর দত্ত মহাশয়ের পূর্বপুরুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমতী জরৎকুমারী ঠাকুরবাড়ীর একমাত্র মালিক না হইলেও, বর্তমানে তিনিই পূজার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন।

ঠাকুরবাড়ীর প্রবেশ-মুখে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্করোডের উপর দুইটি স্তম্ভ আছে। দক্ষিণদিকের স্তম্ভে ইংরাজীতে লেখা আছে—

"Thakur Bati
Late Madhusudan Dutt
Late Haridas Dutt
Late Sinha Charan Dutt."

উত্তর দিকের স্তম্ভে বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ রহিয়াছে—

"শ্রীশ্রীঠাকুর বাটী
৺মধুসূদন দত্ত
৺হরিদাস দত্ত
৺সিংহচরণ দত্ত"

ফটক পার হইয়া ক্ষুদ্র অনাবৃত স্থান। তৎপরে ঠাকুরবাড়ীর ভিতর মহলে প্রবেশের রাস্তা। বাড়ীটি একতলা; চক্‌মিলান। তিনদিকে প্রশস্ত বারান্দা; সম্মুখে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের পরে ঠাকুরদালান। ঠাকুর-দালানের পাশে কয়েকটি কক্ষ, তন্মধ্যে ভোগরান্নার স্থান, ভাঁড়ার ঘর ও পূজারী এবং সেবকদের থাকিবার স্থান।

ঠাকুরদালানে প্রধান বিগ্রহ রাধা-গোবিন্দ জিউর অষ্টধাতু-নির্মিত যুগলমূর্তি বিরাজিত। প্রধান মূর্তির পশ্চিমে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর এবং পূর্বদিকে গোপালজি, জগন্নাথজি, লক্ষ্মীনারায়ণ ও শালগ্রামশিলা বিরাজমান। প্রত্যেক বিগ্রহেরই পূজা হইয়া থাকে।

এই ঠাকুরবাড়ীর জন্যও—

পূজারী	...	২ জন
পাচক	...	১ জন
বাবাজী (বৈষ্ণব)	...	২ জন
ঝি	...	১ জন
দরওয়ান	...	২ জন
চাকর	...	৩ জন

মোতায়েন রহিয়াছে। ভোগের প্রসাদের দ্বারা এইখানেও প্রত্যহ সমাগত কাঙালী ভোজনের ব্যবস্থা আছে। উদ্বৃত্ত প্রসাদ পূজারী ও চাকর-বাকরদের বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

এই ঠাকুরবাড়ীর পরিচালনায় শ্রীমতী জরৎকুমারীর মাসিক আনুমানিক ৩০০৲ টাকা ব্যয় হয় এবং তিনি নিজ তহবিল হইতে উহা প্রদান করিয়া থাকেন।

প্রত্যহ পূজা ব্যতীত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজির বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, রাস, ঝুলন ও দোলের সময়। দোলের সময় নিতাই-গৌর বিগ্রহদ্বয়ের ও রথের সময় জগন্নাথদেবের বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে।

শ্রীমতী বিনোদিনী মল্লিকের দান

শ্রীমতী বিনোদিনী মল্লিক হুগলী ঘুটিয়াবাজার নিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার প্রসাদদাস মল্লিকের বিধবা স্ত্রী। তিনি কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার নন্দী মহাশয়ের ভগিনী। ১৯২৪ সালে তিনি ছয়টি সন্তান লইয়া বিধবা হন। হঠাৎ ১৯২৬ সালের ৩০শে জুলাই তাঁহার অবিবাহিত পঞ্চম পুত্র পরমেশচন্দ্র মল্লিক অকালে পরলোকগমন করেন। পরমেশচন্দ্র বি এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর শিক্ষালাভের ইচ্ছা সত্ত্বেও, শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন অসমর্থ হন। তিনি জীবিতাবস্থায় সময়ে সময়ে, পৈতৃক বিষয়ের স্বীয় অংশ শিক্ষা-বিস্তারে ব্যয়ের অভিলাষ জ্ঞাপন করিতেন। পুত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা পরমেশচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার্থ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পুত্রের সম্পত্তি নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক হন। তাঁহার এই মহদুদ্দেশ্যের কথা জানিতে পারিয়া অন্যান্য পুত্রেরা পরমেশচন্দ্রের সম্পত্তির উপর তাঁহাদের দাবী প্রত্যাহার করেন এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে জনহিতকর অনুষ্ঠানে বিনিয়োগ করিবার জন্য মাতাকে সম্মতি প্রদান করেন। শ্রীমতী বিনোদিনী মল্লিক কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে ৩৩,৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

তাঁহার বর্তমান বয়স ৭২ বৎসর। তিনি অদ্যাবধি জীবিত আছেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত গোপেশচন্দ্র মল্লিকের সহিত বাস করিতেছেন।

বিনোদিনী বালিকা-বিদ্যালয়

"বিনোদিনী বালিকা-বিদ্যালয়" বিগত ১৯২৮ সালে স্বর্গীয় ডাক্তার প্রসাদদাস মল্লিকের বসত বাড়ীতেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে বিদ্যালয়-নির্মাণার্থ ৩৫০০৲ ব্যয়ে তের কাঠা জমি ক্রয় করা হয় এবং আট হাজার টাকা ব্যয়ে ইষ্টক-নির্মিত গৃহাদি প্রস্তুত হইয়াছে। বিদ্যালয়-গৃহটি একতলা। বর্তমানে স্কুলে কলের জল ও বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীমতী বিনোদিনী মল্লিক

বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহার্থ দশ হাজার টাকার সাড়ে তিন টাকা সুদী কোম্পানীর কাগজের জন্য একখানি ট্রাষ্ট ডিড সম্পাদন করিয়া এই টাকা ট্রাষ্টীদের হাতে দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কোম্পানীর কাগজের সুদ বিদ্যালয়ের ব্যয়ার্থ নিয়োজিত হইবে। এই ট্রাষ্ট ডিডের ট্রাষ্টী স্বর্গীয় প্রসাদদাস মল্লিকের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মল্লিক, তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মল্লিক ও ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ধর বি এল্। তৃতীয় ট্রাষ্টী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ধর—স্বর্গীয় রায় নগেন্দ্রনাথ ধর বাহাদুরের পুত্র। ইনিই স্কুলের সম্পাদক এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত পরিচালনা-ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত।

বিদ্যালয়টিতে পূর্বে এম্ ই পর্যন্ত পড়ান হইত, এখন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং মাসিক সরকারী সাহায্য ৩০৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা করা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া বিদ্যালয়েব বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত ঃ—

রায় শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমাব বসু এম্ এ বাহাদুব,
বর্ধমান বিভাগের অবসব-প্রাপ্ত ইন্স্পেক্টর
সভাপতি

শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস মল্লিক বি এল্, অ্যাডভোকেট
সহঃ সভাপতি

" নৃপেন্দ্রনাথ ধব বি এল্
সম্পাদক ও দাতার প্রতিনিধি

ডাক্তাব শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র মল্লিক
" নগেন্দ্রকুমার দে
অভিভাবকগণেব প্রতিনিধি

মিস্ রেণু বাগচী বি এ—হেড্ মিষ্ট্রেস্
মিসেস্ সুবাসিনী দত্ত—সহকারী মিষ্ট্রেস্
শিক্ষয়িত্রীগণেব প্রতিনিধি

বিদ্যালয়ে ৭জন শিক্ষয়িত্রী আছেন। হেড মিষ্ট্রেস্ মিস্ রেণু বসু মহোদয়া এই বিদ্যালয়ে গত দশ বৎসব যাবৎ শিক্ষয়িত্রীর কার্য করিতেছেন।

তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য করিতে করিতে ম্যাট্রিকুলেশন, আই এ ও বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। শিক্ষয়িত্রীগণ সকলেই স্কুলের সংলগ্ন আবাসগৃহে থাকেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা গড়ে ১৫০ জন, সময় সময় ১৬০ জনও হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর যাবৎ ছাত্রীগণ এম্ ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। ১৯৩৬ সালে একটি ছাত্রী মাসিক ৪৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিল; ১৯৩৮ সালেও একটি ছাত্রী উক্তরূপ বৃত্তি পাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রতি বৎসরই ইউ পি ও এল্ পি পরীক্ষায় ছাত্রীবৃন্দ "উত্তরপাড়া হিতকরী সভা" হইতে সার্টিফিকেট ও বৃত্তি পাইয়া থাকে।

১৯৩৬ সালের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে ইন্সপেক্ট্রেস মহোদয়া পরিদর্শনের সময় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"I paid a surprise visit to Binodini Girls' School on the 4th August 1936, accompanied by the Assistant Inspectress of Schools, Hooghly, Burdwan and Birbhum.

* * *

"It has a well-lighted and well-ventilated pleasant-looking building and the Head Mistress tries her best to keep everything neat and tidy. Every teacher has her own note-book and personal time-table and on the whole teaching is fair throughout the school. I do hope other teachers will follow the instructions of the Head Mistress strictly and observe neatness in the class room and look after the personal cleanliness of the girls.

"On the whole I have heen pleased with what I have seen and wish the institution all success."

Sd./ S. B. Gupta,
Inspectress of schools

১৯৩৮ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে ও ৯ই নভেম্বর তারিখে স্কুল পরিদর্শন করিয়া বর্ধমান বিভাগের আসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্ট্রেস যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"All the Mistresses are resident teachers and I was very happy to find that they all mess together. The Secretary also tries his best to make them comfortable and contented."

* * * *

"I was very pleased to find that the mistresses have been all keeping their notes and syllabus up to date.... ....

"On the whole I was pleased with my inspection of the school and I hope it will gradually develope into a good high school in the near future."

Sd./A. Bhattacherjee,
Asst. Inspectress of Schools,
Burdwan Division

ডাক্তার প্রসাদদাস মল্লিক ওয়ার্ড

শ্রীমতী বিনোদিনী মল্লিক তাঁহার স্বামী ও পুত্রের স্মৃতিরক্ষার্থ হুগলী ইমামবারা হাসপাতালে ৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার দ্বারা ডাক্তার প্রসাদদাস মল্লিকের নামে সুবর্ণবণিক্ রোগীর জন্য একটি বেড্ ও পরমেশচন্দ্র মল্লিকের নামে হিন্দু ছাত্রের জন্য একটি বেড্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দুইটি বেড্ই একটি ঘরে অবস্থিত। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "ডাক্তার প্রসাদদাস মল্লিক ওয়ার্ড।"

পরমেশচন্দ্র মল্লিক বৃত্তি স্থাপন ও পুস্তক দান

শ্রীমতী বিনোদিনী মল্লিক তাঁহার স্বর্গীয় পুত্রের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এবং শিক্ষা-বিস্তারে পুত্রের যে অভিলাষ ছিল তাহা পূরণের জন্য হুগলী মহসীন কলেজে ৬০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে আই এস্-সি ক্লাসের দুইটি ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হয়। এই বৃত্তির পরিমাণ মাসিক ১৪৲ টাকা; উহা প্রথম বার্ষিক ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর দুইটি ছাত্রকে মাসিক ৭৲ হিসাবে প্রদত্ত হয়। মাসিক ১৪৲ টাকা বৃত্তি দিয়াও প্রায় বার্ষিক ৪২৲ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। সেই উদ্বৃত্ত টাকা বি এস-সি পরীক্ষার্থী নিঃস্ব ছাত্রের পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার সহায়তাকল্পে ব্যয়িত হয়।

তিনি ১৯২৮ সালে হুগলী কলেজ লাইব্রেরীতে রসায়ন ও ব্যাবহারিক রসায়ন সম্বন্ধে এক হাজার টাকার পুস্তক দান করিয়াছেন।

দানের পরিমাণ

শ্রীমতী বিনোদিনী মল্লিকের দানের পরিমাণ নিম্নরূপ—

(ক)	বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য জমি খরিদ ও বাড়ী নির্মাণ	১১,৫০০৲
(খ)	উক্ত বিদ্যালয়ের খরচ সরবরাহ করিবার জন্য ৩।০ সুদী কোম্পানীর কাগজ	১০,০০০৲
(গ)	ইমামবারা হাসপাতালে দুইটি বেডের জন্য	৫,০০০৲
(ঘ)	পরমেশচন্দ্র মেমোরিয়াল বৃত্তি স্থাপনার্থ হুগলী মহসীন কলেজে দান	৬,০০০৲
(ঙ)	হুগলী কলেজে পুস্তক দান	১,০০০৲
	মোট	৩৩,৫০০৲

৺পরেশচন্দ্র দত্ত
(১৮৬০—১৯৩৪)

ভক্তপ্রবর ৺পরেশচন্দ্র দত্ত

চরিত্র-মাধুর্য, ধর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে ভূষিত হইয়া পরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মধুর সংস্পর্শে যিনি আসিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। কলিকাতা ও কলিকাতার বাহিরে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের তিনি একজন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ছিলেন।

ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত মহাশয়ের বংশে তাঁহার জন্ম। তিনি ঠাকুরের দ্বাদশ অধস্তন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পিতা বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয়ও একজন পরম বৈষ্ণব। পদব্রজে তিনি বাংলার ও বাংলার বাহিরের বহু তীর্থ পর্যটন করিয়া দীর্ঘকালের পর গৃহে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার এই প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২০এ জানুয়ারী পরেশচন্দ্রের জন্ম হয়। বৈকুণ্ঠনাথ একজন প্রসিদ্ধ সূতাব ব্যবসায়ী ছিলেন এবং এই ব্যবসাতে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় নরসিংহ দত্ত বাহাদুর।

বিদ্যা-শিক্ষা

হাওড়া জিলা স্কুলে পরেশচন্দ্র তাঁহার শিক্ষা আবম্ভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্মভীরু ও মেধাবী ছিলেন। এই সময় হইতে সকলেই তাঁহার একটি বিশেষ গুণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতেন—সেটি তাঁহার সত্যপ্রিয়তা। যতই অপ্রিয় হউক, বালক পরেশচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে সত্য কথা বলিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি দশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

খেলাধূলায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ক্রীড়ামোদী ব্যক্তিমাত্রই তাঁহাকে একজন good athlete বলিয়া অভিহিত করিতেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ছাত্রাবস্থায় আহিরীটোলা নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র শীলের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কলেজ হইতে ফিরিবার পথে, যখন তিনি নৌকাযোগে হুগলী নদী পার হইতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ নৌকাখানি উল্টাইয়া যায়, কিন্তু ভগবানের দয়ায় তিনি এই বিপদ্ হইতে

রক্ষা পান। এই বৎসর তিনি ইচ্ছা করিয়াই বি এ পরীক্ষা দেন নাই। তৎপরে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বনামধন্য সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহপাঠিরূপে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি রসায়ন-শাস্ত্রে এম্ এ পড়িতে আরম্ভ করেন। পাঠ্যাবস্থায় তিনি তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ রসায়নাধ্যাপক পেড্‌লার সাহেবের একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি এম্ এ পরীক্ষা দেন নাই। এই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরসিংহ বাবু তাঁহাকে আইন পড়িবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু পরেশ বাবুর ওকালতী করিবার ইচ্ছা না থাকায়, কৃষিকার্য শিক্ষার জন্য তিনি আসাম গমন করেন। আসামে তিনি প্রায় দেড় বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার অসুখের সংবাদ পাইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। কিছুকাল গৃহে অবস্থানের পর, পরেশ বাবু প্রথমে আরা জিলায়, পরে হাওড়ায় রিপন কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

আইন অধ্যয়ন ও সংসারে বৈরাগ্য

পরেশ বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর নরসিংহ বাবু তাঁহাকে খুবই ভালবাসিতেন; তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁহার ছোট ভাই চাকুরী করেন। সুতরাং তিনি আইন পড়িবার জন্য পরেশচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে পরেশ বাবু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আগ্রহাতিশয্যে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আইন-পাঠে তিনি মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্বভাব-জাত বৈরাগ্য তাঁহাকে বাহিরে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সন্ন্যাস-গ্রহণে তিনি দৃঢ় সংকল্পিত হইলেন। অবশেষে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের রথযাত্রার দিন তিনি গৃহত্যাগ করিলেন।

ভ্রাতৃবৎসল অগ্রজ নরসিংহ বাবু অনেক অনুসন্ধান করিয়া বহু কষ্টে তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। এই সময় একজন সন্ন্যাসীর সহিত পরেশ বাবুর সাক্ষাৎ হয়। পরেশ বাবুর প্রীতি ও শ্রদ্ধার আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার গৃহ-সঙ্গী হইলেন। তিনিই পরেশ বাবুকে গৃহত্যাগের ইচ্ছা হইতে বিরত করেন।

ইহার কিছু পরে পরেশ বাবু প্রসিদ্ধ সাধক চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের (সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত ও কীর্তনীয়া রামদাস বাবাজী মহাশয়ের গুরু) নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। মন্ত্রগ্রহণের অব্যবহিত পরে, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বি এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরসিংহ বাবুর সহিত হাওড়া কোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। কিন্তু ওকালতীতে তাঁহার মন বসিল না; সংসারেও তিনি স্থির হইতে পারিলেন না। বাহিরের একটা প্রবল উন্মাদনা কেবলই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ইহার তাড়নায় তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে পলায়ন করিলেন। কুড়ি দিন অনুসন্ধানের পর, নরসিংহ বাবু বিল্বগ্রামের জঙ্গলে অবস্থিত এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে পরেশ বাবুর সংবাদ পান। এই সন্ন্যাসীর অনুরোধে পরেশ বাবু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করেন। প্রিয় পুত্রের এইরূপ বৈরাগ্য দর্শনে পিতা বৈকুণ্ঠনাথের মর্মে বিশেষ আঘাত লাগে এবং তিনি শোকাতুর হইয়া পীড়িত হন। এই পীড়াতেই অবশেষে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইহার পর তিনি আর একবার গৃহত্যাগ করেন। এবার তিনি পুত্রদের অনুরোধে গৃহে ফিরিতে বাধ্য হন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর তিনিই প্রথম সম্পাদক ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের শৈশবাবস্থায় তিনি ইহার উন্নতির ও পরিপুষ্টির জন্য অনেক কিছুই করিয়াছেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ভগবদ্-চিন্তায় একান্তভাবে আত্মনিবেশ করিবার জন্য তিনি নবদ্বীপে পলায়নপূর্বক সেখানে গুপ্তভাবে অবস্থান করেন। বাড়ীর লোক তাঁহার অবস্থিতির সন্ধান পাইলে, তিনি নবদ্বীপ হইতে পুরীধামে যান। কিছুকাল পুরীতে অবস্থান করিয়া তিনি রামদাস বাবাজী ও তাঁহার শিষ্যবর্গের সহিত মনের আনন্দে গুজরাট প্রভৃতি নানাস্থানে নামকীর্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

অনেকবারই তিনি আইন-ব্যবসা ছাড়িয়া দিবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের জন্য ছাড়িতে সমর্থ হন নাই। অবশেষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি আইন-ব্যবসা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন।

হাওড়া নিবাসী সুবর্ণবণিক্‌দিগের মধ্যে তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে একজন অন্তরঙ্গ ও হিতৈষী বন্ধুরূপে গণ্য করিতেন।

স্বজাতি-প্রীতি

স্বজাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ আন্তরিক প্রীতি ও মমত্ববোধ ছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের পৌষ মাসে হাওড়ায় যখন বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর নবম অধিবেশন হয়, তখন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহাতে এই প্রীতি ও মমতার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তিনি স্বদেশ ও বিদেশ—উভয় স্থানের সুবর্ণবণিক্‌গণকেই পরমাত্মীয় মধ্যে গণ্য করিতেন। তাই তিনি স্বীয় অভিভাষণের প্রারম্ভে করুণ ভাষায় মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করেন—"আজ আমাকে হাওড়ার সুবর্ণবণিক্‌গণের পক্ষ হইতে আপনাদের অভ্যর্থনা করিতে হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—যাঁরা এক সময়ে একই দেশে বাস করিতেন, যাঁরা একই কাণ্ডের শাখা-প্রশাখা, আজ তাঁরা বিভিন্ন স্থানে বাস কর্‌ছেন বলেই কি তাঁরা আমাদের পর হয়ে গিয়েছেন ? নাড়ীর টান কি মনে কর্‌লেই ভোলা যায় ? কৈ আমার বড় ভাই কি ছোট ভাই দূর প্রবাস হতে ফিরে এলে আমি তো তাঁদের অভ্যর্থনা করি না, তাঁদের আরতি হয় আমার অন্তরের নিভৃত মন্দিরে, কিন্তু সে কি মুখে জানান যায়, না তার কোন প্রয়োজন আছে ? আপনাদের অভ্যর্থনা কর্‌তে উঠে আমার কেবলই সেই কথা মনে হচ্ছে। আমায় মার্জনা কর্‌বেন্, আমি শুধু কথার মালা গেঁথে আপনাদের অভ্যর্থনা কর্‌তে পারব না। তবে এইটুকু বড় গলায় বিজ্ঞাপন কর্‌ছি যে, আপনারা আমাদের, আমরা আপনাদেরই।"

এই অভিভাষণে তিনি এমন কতকগুলি সারগর্ভ উপদেশ দেন যাহা জাতির প্রত্যেকেরই প্রণিধান করা উচিত। তিনি বলিতেছেন—"সকল জাতিরই একটা অতীত আছে ; অতীত শুকতারার মত সুদূর ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করে। আমাদের কাছে এই অতীত এখন লুপ্ত, তাহার সোনার রশ্মিরেখা আর আমাদের পথে পড়ে না, তাই আমরা পথভ্রান্ত, তাই আজ বণিক্ দাসত্ব বরণ করিয়া তিলে তিলে মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে।

আমরা ব্যবসা ভুলিয়াছি, ভুলিয়াছি যে আমরা তাঁহাদেরই সন্তান, এককালে দেশের বাণিজ্য যাঁহাদের করতলগত ছিল।...... ..

"অভাবে পড়িয়া স্বভাব হারাইয়াছি, তাই ধীরে ধীরে পণপ্রথা সমাজ-দেহকে Octopus এর মত নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আছে। পূর্বের সমৃদ্ধি কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিলাসিতা বাড়িয়াছে বহুগুণ। আড়ম্বর ও বিলাসিতায় ব্যয় আছে, তাই হীন প্রবৃত্তির তাড়নায় পুত্রের বিবাহের সময় আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া, বিবেকের কণ্ঠরুদ্ধ করিয়া আমরা কোন রকমে পিনাল কোডের আইন বাঁচাইয়া কন্যার পিতার নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিয়া ধূমধামের সহিত পুত্রের তথাকথিত উদ্বাহক্রিয়া সমাপন করিয়া আত্মীয়-স্বজনের নিকট গণ্যমান্য হইতেছি এবং অপার আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। এই হৃদয়হীনতা দূর করিতে হইলে চাই আত্মসংযম, আড়ম্বরশূন্যতা ও জাতীয় সমৃদ্ধিস্পৃহা। এমন শিক্ষা প্রয়োজন যাহাতে আমাদের মন প্রশস্ত হয়, যাহাতে আমরা আত্মসংযম শিক্ষা করি, আবার আমরা মানুষ হই ; এমন কোন জীবিকা নির্বাচন করিতে পারি,—যাহাতে জাতিতে ধনবানের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।"

ভগবদ্-আরাধনা

ভক্ত ও ভাগবতদিগের সঙ্গেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি ভাবের একটি প্রত্যক্ষ মূর্তি ছিলেন। কীর্তন বা পাঠ চলিতেছে—সেই কীর্তন বা পাঠ শুনিয়া তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অবিরাম ধারায় জলধারা বহির্গত হইতেছে। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী, রায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার 'নিজ জন'-স্বরূপ ছিলেন। ভক্তসঙ্গ ও ভগবদ্-আলোচনাতেই তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হইত। তিনি প্রতিদিন চারিলক্ষ মালা জপ করিতেন।

'নরসিংহ দত্ত করোনেশন সুবর্ণপদক' প্রতিষ্ঠা

সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার একটা আন্তরিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। তাই তিনি হাওড়া

জিলার ভিতরে প্রতি বৎসর যে ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সংস্কৃতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে, তাহাকে "নরসিংহ দত্ত করোনেশন সুবর্ণ-পদক" পারিতোষিক দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ৩৲ টাকা সুদী ১০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদান করেন। এই দান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন তারিখে ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করেন। দশ ও দেশের কাজেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। স্বরাজ-ভাণ্ডারের চাঁদা সংগ্রহের জন্য যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তাঁহার নিকট আসেন, তখন তিনি তাঁহার সোনার ঘড়ি ও চেন তাঁহাকে প্রদান করেন। আর্তের দুঃখ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। অভাব-গ্রস্তের অভাব দূর করিবার জন্য তিনি সর্বদাই মুক্তহস্ত থাকিতেন। বংশ-গরিমার সামগ্রীকে সযত্নে রক্ষা করিবার আগ্রহও তাঁহার বিশেষভাবে ছিল। তাঁহাদের গৌরবভাজন পূর্বপুরুষ সুবর্ণবণিক্‌কুলপাবন উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর মহোদয়ের যে সুবৃহৎ তৈলচিত্র সপ্তগ্রামের শ্রীপাটে আছে, তাহা তাঁহারই চেষ্টায় তাঁহারই বাড়ীতে অঙ্কিত হয় এবং তিনিই উহা শ্রীপাটে উপহার দেন।

মৃত্যু

মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু বাহ্যিক দর্শনে বিশেষ কিছু বুঝা যাইত না। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে শনিবার সকালে, দৈনন্দিন কার্যকলাপ সমাপনপূর্বক, বাসগৃহের সম্মুখস্থ বিল্ববৃক্ষের মূলে নাম জপ করিতে করিতে হঠাৎ অসুস্থতা অনুভব করেন। বাড়ীর সকলে তাঁহাকে লইয়া গিয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষে শোয়াইয়া দিলেন। পুত্র, পরিজন ও আত্মীয়স্বজনকে সম্মুখে বসাইয়া তিনি নাম জপ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মুখে বা শরীরে কোন কষ্টের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। জপের মধ্যে তিনি হঠাৎ নীরব হইয়া গেলেন। এইরূপে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার ইহ-জীবনের পরিসমাপ্তি হইল। দীর্ঘকাল রোগভোগ না করিয়া বা কাহাকেও সেবার কোন অধিকার না দিয়া আনন্দময় পুরুষ আনন্দধামে চলিয়া গেলেন।

পরেশ বাবুর চারি পুত্র ও এক কন্যা। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত গৌরমোহন দত্ত এম্ এ, বি এল্ কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট এবং তাঁহার অন্য একটি পুত্র ডাক্তার।

অনুক্রম